ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালা

বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ

প্রথম খণ্ড

বেদান্তচিন্তার ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় সংস্করণ

—লেখক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ,

"আশুতোষ" সংস্কৃতাধ্যাপক

ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, এম্.এ., পি.এইচ্.ডি.

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার

কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যাবাচস্পতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য ১৫·০০

উৎসর্গ

যিনি আমার জীবনের দুর্দিনের তমসাচ্ছন্ন পথে নব আশার আলোক-
বর্তিকা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, অকাতরে অর্থব্যয়
করিয়া আমার উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন,
যাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় সংসারের নিদাঘ-তপ্ত প্রাণে
শান্তি লাভ করিয়াছি, স্নেহের মাধুর্য অনুভব
করিয়াছি, আমার সেই অগ্রজপ্রতিম
চিরহিতৈষী বন্ধু, কলিকাতার
হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-
চৌধুরী বংশের গৌরব

শ্রীযুক্ত বাবু রুক্মিণীনাথ দত্ত চৌধুরী

জমিদার মহাশয়ের করকমলে আমার এই
গ্রন্থখানি উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া
ধন্য হইলাম

মুখবন্ধ

সত্য শিব সুন্দরের অপার করুণায় ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ, বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে বেদান্ত-চিন্তার ক্রম-বিবর্তনের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বেদান্তোক্ত প্রমাণ, প্রমেয় ও ব্রহ্মতত্ত্ব (Epistemology and Metaphysics) প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে এবং উক্ত দুই খণ্ডে বেদান্ত দর্শন পরিসমাপ্ত হইবে। ভারতের প্রসিদ্ধ ষড়্ দর্শন এবং জৈন ও বৌদ্ধ এই কয়খানি বিভিন্ন দর্শন-চিন্তা-কুসুমের সমাবেশে এই ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালা রচনা করিবার ইচ্ছা আছে। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি প্রত্যেক দর্শনের উপরই এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই দর্শনের পরিচয় সুধী পাঠক-পাঠিকাদিগকে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। আমার পক্ষে অবশ্যই ইহা দুরাশা ব্যতীত কিছুই নহে। আমার এই আশা কখনও পূর্ণ হইবে কি না, তাহা একমাত্র সর্বান্তর্যামীই জানেন। জাতীয় জাগরণ ও দেশাত্ম-বোধের এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয় কৃষ্টি ও জাতীয় চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, বেদান্ত দর্শনের রহস্য কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিবার জন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সেই সর্বজনীন আগ্রহ পরিতৃপ্তির জন্য প্রথমেই বেদান্ত দর্শন লিখিত হইল। বেদান্ত দর্শনের গ্রন্থসম্পদ্ অতুলনীয় এবং যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সম্পদ্ যাঁহারা আহরণ করিয়া বেদান্তের মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনাড়ম্বর জীবনের ইতিহাসও বড় বিচিত্র। ঐ সকল মনীষিবৃন্দের জীবন-ইতিহাসের ধারায় ভারতের জাতীয় ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। ইহারই অন্তরালে হিন্দুর আত্ম-পরিচয়ের প্রকৃত তথ্য লুক্কায়িত আছে। জাতি ইহা জানিতে পারিলে সে নিজের ঐতিহাসিক ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে। এইজন্য বেদান্ত দর্শনের প্রথম খণ্ডে বেদান্ত-চিন্তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক খণ্ডে বেদান্ত-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় দিতে না পারায়, বেদান্তের দার্শনিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। অপরাপর দর্শনের পরিচয় এক এক খণ্ডে দিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই গ্রন্থমালা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে; ফলে, ইহার প্রচার যে বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞের নিকটেই নিবদ্ধ থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইলে সমগ্র ভারত এবং ভারতের বাহিরে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এই গ্রন্থমালার প্রচার ও প্রসার হওয়া যে সম্ভব হইত, ইহা লেখকের অবিদিত নহে। তবে ইহা কেন মাতৃভাষায় লিখিত হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে লেখকের নিবেদন এই যে, যাঁহার পবিত্র করে এই গ্রন্থ উপহার দিয়া লেখক

আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, যাঁহার আগ্রহে লেখক এই গ্রন্থমালা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এই মালা বঙ্গভাষা-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। তিনি একদিন বিশেষ দুঃখ করিয়া লেখককে বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষার দুর্গম অরণ্যে যাঁহাদের প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরাজী ভাষাও যাঁহারা ভাল জানেন না, সেইরূপ আমাদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট ভারতীয় দর্শনের মধুভাণ্ড চিরদিন অনাস্বাদিতই রহিয়া গেল। সেই মধুচক্র হইতে মধু আহরণ করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারার মত মহৎ দান এবং মহৎ কাজ বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। যিনি ইহা পারিবেন, বাঙ্গালী জাতি চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। এত বড় ভারতীয় দর্শনের রত্নাকর সম্মুখে থাকিতেও বাঙ্গালা ভাষায় দার্শনিক সাহিত্যের শোচনীয় দুর্গতি কি কম আক্ষেপের বিষয়? আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রুক্মিণী বাবুর ঐরূপ উক্তি আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিল। আমি আমার সাধ্যানুসারে বঙ্গভাষায় দার্শনিক সাহিত্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। ঠিক এই সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণও মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাদের ঐ চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য উচ্চাঙ্গের দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ মাতৃভাষায় নিবদ্ধ করিয়া বঙ্গভারতীর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য দেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীকে তাঁহারা মাতৃপূজায় আহ্বান করেন। বঙ্গভারতীর পূজার এই শুভ বোধনে আমিও আমার এই যত্নগ্রথিত মালা লইয়া ভারতীর পাদপীঠ সাজাইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যদি বঙ্গবাণীর পাদপীঠের এক কোণেও আমার এই মালা স্থান পায় এবং বাঙ্গালী জাতি আমার মালার কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা মূল্য আছে বলিয়া মনে করে, তবেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

বঙ্গভারতীর পূজায় নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মাতৃভাষায় প্রস্তুত করিয়া ছাপিবার জন্য ইহা যখন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বর্তমান অর্থসচিব, বাঙ্গালীর গৌরব ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করি, তখন তিনি এই পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে দেখিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং লেখকের সঙ্কল্প অবগত হইয়া লেখককে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন; এবং অচিরেই ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গ্রন্থকারকে চিরবাধিত করেন। তাঁহার উৎসাহ এবং সাহায্য না পাইলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা না হইলে এই গ্রন্থ কখনও প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ; সুতরাং এই গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ঋণ গ্রন্থকার চিরদিন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম.এ, মহাশয়ও এই গ্রন্থ-প্রকাশে বহু প্রকারে গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য লেখক চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অনেক দার্শনিক নিবন্ধ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি এবং তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি,

সেইজন্য সেই সকল নিবন্ধ ও প্রবন্ধের লেখকগণের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বরিশালের শঙ্করমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর লিখিত বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং দর্শনরসিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (বর্তমানে সন্ন্যাসী) মহাশয়ের লিখিত অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেইজন্য আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম.এ., পি.আর.এস, মহাশয়ের লিখিত বেদান্ত-পরিচয় ও উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থ হইতেও আমি স্থানে স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্যও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, দার্শনিক-শিরোমণি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম.এ., পি.এইচ.ডি., ডি.লিট., সি.আই.ই. মহাশয়ের লিখিত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (A History of Indian Philosophy, 3 vols.) নামক বিপুলায়তন এবং সুবিখ্যাত গ্রন্থ হইতে আমি এই গ্রন্থ লিখিতে যে কতদূর সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমি শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিতেছি। তাঁহার গ্রন্থের ঋণ ব্যতীতও আমার এই গ্রন্থ-রচনাবসরে আমি মৌখিক তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, সেইজন্যও আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি বিবিধ দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের অনুবাদক এবং টীকাকার, পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যখনই কোন প্রশ্ন আমার মনে আসিয়াছে, তখনই আমি তাঁহার নিকট গিয়াছি এবং তিনি দয়া করিয়া আমাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গত মীমাংসার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং সর্বদা উপযুক্ত হিতোপদেশ দিয়া আমার এই গ্রন্থ-প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন, এইজন্য পূজনীয় মহামহোপাধ্যায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি।

প্রুফ্-সংশোধনে আমি অপটু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঙ্গলী পাব্লিকেশন্ ডিপার্টমেণ্টের (Bengali Publication Department) সুযোগ্য সেক্রেটারী সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় এই কার্যে আমাকে সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়াছেন। সেইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভুল রহিয়া গেল, তাহার জন্য সুধী পাঠকমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কবিতেছি। যে দুই একটি মারাত্মক ভুল দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, তাহা গ্রন্থের শেষে "ভ্রম সংশোধনে" সংশোধন করিয়া দিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ ক্লাসের ষষ্ঠ শ্রেণীর আমার ছাত্র শ্রীমান্ তারকনাথ ঘোষাল, বি.এ. এবং শ্রীমান্ কালী-জীবন ভট্টাচার্য, বি.এ. আমার পুস্তকের নির্ঘণ্ট বা শব্দ-সূচি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ এবং সহ-কর্মিগণ আমার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ-প্রকাশনের দিনে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

শ্রীশ্রীদোল-পূর্ণিমা
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৮ সাল;
ইং ২রা মার্চ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদের প্রথম খণ্ড—"বেদান্তচিন্তার ক্রমবিকাশ" পুস্তক খানির প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পাঠকবর্গের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হন। ফলে, গ্রন্থখানির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদিন পরে পুনরায় সুধী পাঠকমণ্ডলীর পবিত্র করে গ্রন্থখানি উপহার দিতে পারিতেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। যাঁহারা এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অধীর আগ্রহে এতকাল অপেক্ষা করিয়াছেন, চিঠিপত্র লিখিয়া গ্রন্থখানি সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

এই সংস্করণে বৈষ্ণব বেদান্তমতের বিবরণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অন্যতম রীডার শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী আমাকে অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। গ্রন্থখানির পূর্ণতাসাধনে নিরত থাকা কালে শিবপুর নিম্বার্কাশ্রম হইতে প্রকাশিত, শ্রীমাধব মুকুন্দের "পরপক্ষগিরিবজ্র" পুস্তকখানি আমার হস্তগত হয়। শ্রীমাধব মুকুন্দের পরপক্ষগিরিবজ্র নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অপূর্ব বিচারগ্রন্থ। সেই বিচার ধারার সহিত পাঠকবর্গের পরিচিতি-সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রীমাধব মুকুন্দের দার্শনিক মত এই সংস্করণে যোজনা করা হইল।

ভট্টপল্লীনিবাসী সর্বশাস্ত্রার্থদর্শী স্বর্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করতঃ "ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্য" প্রকাশ করেন। মহামনীষী ৺তর্করত্ন মহাশয় শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার এবং সপ্তশতী স্তোত্রেরও শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা সংস্কৃত-সাহিত্যরসিক সুধীমণ্ডলীকে উপহার দিয়াছেন। ৺তর্করত্ন মহাশয়ের এই প্রচেষ্টার পূর্ব পর্যন্ত শক্তিপক্ষে ব্রহ্মসূত্র, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতির ভাষ্য সুধী-সমাজে প্রচলিত ছিল না। পূজ্যপাদ ৺তর্করত্ন মহাশয়ের শক্তিভাষ্য সেই অভাব দূর করতঃ ভাষ্যের দুর্গম পথে নবীন আলোকবর্তিকার সঞ্চার করিয়াছেন। এই শক্তিভাষ্য আধুনিক বঙ্গমনীষীর স্বাধীন চিন্তার অবদান। সেই চিন্তার সহিত পাঠকবর্গের পরিচিতি-সাধনের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে শক্তিভাষ্যের বক্তব্য এই সংস্করণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বেঙ্কটাচার্যের "শতদূষণী"র খণ্ডনে মদীয় অধ্যাপক মঃ মঃ শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেদান্তবিশারদ মহাশয় "শতভূষণী" নামে গ্রন্থ লিখিয়া বেঙ্কটের প্রতিটি বক্তব্যের খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্তোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয়তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় "বেদান্ত-তত্ত্ব-সংগ্রহ" নামে অতি সূক্ষ্ম বিচারবহুল গ্রন্থ রচনা

করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় সংক্ষেপে এই সংস্করণে প্রকাশ করা হইয়াছে। বেদান্তচিন্তার ইতিবৃত্তকে পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। সেই চেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সেই বিবেচনার ভার সুধী পাঠক মণ্ডলীর উপর রহিল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ হেমন্তকুমার গাঙ্গুলী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে, লিখিত বিষয়ের আলোচনাকালে নূতন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দসূচি প্রস্তুত করিয়া আমার প্রভূত পরিশ্রমের লাঘব করিয়াছে। সেইজন্য শ্রীমান্ হেমন্ত ও শ্রীমতী ঝর্ণাকে আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীদুর্গা নবমী,
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৯ সাল,
ইং ৬ই নভেম্বর, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ।

ইতি—
শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

বিষয়-সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দর্শনের নিরুক্ত ১—১৫ পৃঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় দর্শন—আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ১৬—৩২ পৃঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ ৩৩—৫০ পৃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদ ৫১—৭১ পৃঃ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ৭২—৯৮ পৃঃ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মসূত্র-পরিচয় ৯৯—১১০ পৃঃ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেদান্তের প্রাচীন আচার্যগণ ও তাঁহাদের দার্শনিক মত ১১১—১২৪ পৃঃ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আচার্য গৌড়পাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত ১২৫—১৪৬ পৃঃ

নবম পরিচ্ছেদ

শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈত বেদান্ত ১৪৭—১৬৬ পৃঃ

দশম পরিচ্ছেদ

পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্ম যতির বেদান্তমত ১৬৭—১৮৫ পৃঃ

একাদশ পরিচ্ছেদ

মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্য ১৮৬—২১৩ পৃঃ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান ২১৪—২৪৮ পৃঃ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির বেদান্তমত ২৪৯—২৬০ পৃঃ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিমুক্তাত্মন্ ও অদ্বৈতবেদান্ত ২৬১—২৭০ পৃঃ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্তের দশম ও একাদশ শতাব্দী ২৭১—২৭৬ পৃঃ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী ২৭৭—২৯৩ পৃঃ

আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য

প্রকটার্থ বিবরণের দার্শনিক মত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত বেদান্ত ও খৃঃ ত্রয়োদশ শতক ২৯৪—৩০৭ পৃঃ

তত্ত্ব প্রদীপিকা এবং অপরাপর গ্রন্থ ২৯৬, চিৎসুখের তত্ত্বপ্রদীপিকার দার্শনিক মত—আত্মার স্বপ্রকাশত্ব এবং সংবিদ্‌রূপতা সাধন ২৯৭, চিৎসুখের মতে জগতের মিথ্যাত্ব ২৯৮, অবিদ্যার ভাবরূপতা এবং অনির্বচনীয়তা সাধন ৩০০, ভাবরূপ অবিদ্যায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান ৩০১, সাক্ষীর স্বরূপ নিরূপণ এবং জীব ও সাক্ষীর ভেদ উপপাদন ৩০২—৩০৩, অবিদ্যা নিবৃত্তি ও মুক্তির স্বরূপ ৩০৪, আচার্য শঙ্করানন্দ ও তাঁহার গ্রন্থাবলী ৩০৫, অমলানন্দ স্বামী, অমলানন্দস্বামীর পরিচয় ও তাঁহার আবির্ভাব কাল ৩০৬, অমলানন্দের বেদান্ত কল্পতরু ও অপরাপর গ্রন্থমালা ৩০৬, প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী ও আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থমালা এবং অদ্বৈতবেদান্তে তাঁহাদের দান ৩০৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত বেদান্ত ও খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতক ৩০৮—৩২৩ পৃঃ

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রবীণ আচার্য বেঙ্কটনাথ বা বেদান্ত মহাদেশিকাচার্য, দ্বিতীয় রামানুজাচার্য, বরদ বিষ্ণু আচার্য প্রভৃতির আবির্ভাবে রামানুজ মতের জাগরণ ও অদ্বৈতবেদান্ত স্রোতের বাধা ৩০৮—৩০৯, বেঙ্কটের গ্রন্থমালা ৩০৮—৩০৯, দ্বৈত বেদান্তী অক্ষোভ্য মুনির আবির্ভাব এবং বিদ্যারণ্য স্বামীর সহিত অক্ষোভ্য মুনির বাদযুদ্ধ ও তাহার ফলাফল ৩০৯, বিদ্যাতীর্থের শিষ্য এবং বিদ্যারণ্য স্বামীর গুরু ভারতী তীর্থের ও বিদ্যারণ্য স্বামীর আবির্ভাবে অদ্বৈত বেদান্তের অভ্যুত্থান ৩০৯, মাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্য স্বামীর জীবনী ৩১০, মাধবাচার্যের গ্রন্থমালা ৩১১, বিদ্যারণ্যের বেদান্তমত—স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রমাণ উদয়াস্তরহিত নিত্য ব্রহ্ম-সংবিদের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং ঐ নিত্য চৈতন্যের আত্মত্ব উপপাদন ৩১১—৩১২, চৈতন্যময় আত্মার আনন্দময়তা সাধন ৩১২, জীবচৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ ৩১২—৩১৩, সাক্ষীর স্বরূপ নিরূপণ ৩১৪, ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কার এবং জ্ঞানের পূর্ণতা ৩১৪, মাধবাচার্যের সহোদর প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের পরিচয় এবং অদ্বৈতবেদান্তে তাঁহার দান ৩১৫ পৃষ্ঠা।

আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি

সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরির পরিচয় ও তাঁহার আবির্ভাব কাল ৩১৫, আনন্দজ্ঞানের গ্রন্থমালা ৩১৫, আনন্দজ্ঞানের দার্শনিক মত ৩১৬, অখণ্ডানন্দের পঞ্চপাদিকা বিবরণের টীকা তত্ত্বদীপন, আনন্দগিরির সতীর্থ নরেন্দ্রগিরির ঈশা-ভাষ্য-টিপ্পনী প্রভৃতি রচনা ও আনন্দজ্ঞানের বেদান্ত তত্ত্বালোকের উপর প্রজ্ঞানানন্দের তত্ত্ব প্রকাশিকা নামে টীকা রচনা এবং তাহার ফলে অদ্বৈতবেদান্তের অভ্যুদয় ৩১৮ পৃষ্ঠা।

রামাদ্বয় ও অদ্বৈত বেদান্ত

রামাদ্বয়ের বেদান্তকৌমুদী, ঐ কৌমুদীর উপর বেদান্ত-কৌমুদী-ব্যাখ্যান নামে রামাদ্বয়ের টীকা রচনা এবং অদ্বৈত বেদান্তের প্রমা ও প্রমাণ তত্ত্বের বিশ্লেষণ ৩১৮—৩২৩ বেদান্ত কৌমুদীর মতে প্রমার লক্ষণ নির্বচন এবং ধর্মরাজধ্বরীন্দ্রের বেদান্তপরিভাষায় প্রদর্শিত প্রমার লক্ষণের সহিত বেদান্তকৌমুদীর লক্ষণের তুলনামূলক বিচার ৩১৯—৩২০, প্রমাণের নির্বচন এবং স্বরূপ বিচার—প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিশ্লেষণ ৩২০—৩২৩, দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থের আবির্ভাব এবং তাহার ফলে মধ্ব-মতের অভ্যুদয়, জয়তীর্থের গ্রন্থসম্পদ্, মধ্ব-মতে জয়তীর্থের স্থান ৩২৩ জয়তীর্থ অদ্বৈত মত আক্রমণ করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী জয়তীর্থের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া অদ্বৈত বেদান্তের বিজয়পতাকা বহন করেন ৩২৩ পৃষ্ঠা।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩২৪—৩৭৭ পৃঃ

অপ্পয় দীক্ষিত

সদানন্দ যোগীন্দ্র

ব্যাসরাজ স্বামী

মধুসূদন সরস্বতী

বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দর্শনের নিরুক্ত

কোন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতির পরিচয় দিতে হইলেই প্রথমতঃ দর্শন বলিলে আমরা কি বুঝি, তাহা বিচার করা আবশ্যক। 'দৃশ্' ধাতু ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দৃশ্' ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ—প্র+ঈক্ষণ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা সূক্ষ্মভাবে দেখা। ল্যুট্ প্রত্যয়টি যদি ভাববাচ্যে হয়, তাহা হইলে দর্শন শব্দের অর্থ হয় শুধু দেখা, আর করণবাচ্যে হইলে যাহা দ্বারা দেখা যায় তাহাকে বুঝায় অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু; সুতরাং দেখা শব্দে আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানই বুঝিব। চাক্ষুষ জ্ঞানই 'দৃশ্' ধাতুর মুখ্য অর্থ, ইহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন এই, যদি চাক্ষুষ জ্ঞান ও তাহার সাধন দর্শনেন্দ্রিয়ই দর্শন শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে দর্শন বলিলে আমরা দর্শনশাস্ত্রকে বুঝি কেন? চক্ষুরিন্দ্রিয়ই চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন হয়, শাস্ত্র তো আর চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চোখের দেখা বা চাক্ষুষ জ্ঞান বলিলে আমরা কি বুঝি, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। চাক্ষুষ জ্ঞান কেবল চক্ষুর যান্ত্রিক ব্যাপারের মধ্যেই পরিসমাপ্ত নহে। চক্ষু স্থূল বস্তুর বাহিরের রূপটি মাত্র গ্রহণ করে, এবং ফলে উহা মনোরাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। মনোরাজ্যের বিভিন্ন ভাবনার স্তর ও পর্যায়ের মধ্য দিয়া যখন ঐ বাহিরের রূপটি কোন এক নির্দিষ্ট ভূমিতে গিয়া পৌঁছায়, তখন আমরা তাহাকে 'দেখা' সংজ্ঞায় অভিহিত করি, ঐ রূপের স্বরূপটি আমরা জানিতে পারি, কখনও বা ঐ রূপের মালিককেও আমরা চিনিতে পারি। এই রূপ দেখা ও রূপ চেনার মধ্যে যে কোন তফাৎ আছে সাধারণ দর্শক তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু যিনি এই দেখার ও চেনার তত্ত্ব দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করেন, তাঁহার নিকট ইহার জটিলতা ধরা পড়ে। বাহিরের রূপ দেখা কেমন করিয়া রূপ জানায় পর্যবসিত হইল? দেখার ভিতরে জানা আছে কি-না? দেখা ও জানার সম্বন্ধ কি? এইরূপ প্রশ্ন সাধারণ দর্শকের চিত্তকে আলোড়িত করে না। কারণ সে রূপকে দেখিয়া এবং চিনিয়াই সন্তুষ্ট। দার্শনিকের নিকট যখন এই সব প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন নানারূপ

দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি

জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ঐ পরিস্থিতির সমাধানের জন্য দার্শনিককে জীব, জড় ও মনোরাজ্যের অনেক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যাই দর্শন-চিন্তার জননী।

দর্শনের সমস্যা

আমরা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সমস্যাগুলি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমি একটি লাল গোলাপ ফুলকে দেখিলাম এবং তাহাকে লাল গোলাপ বলিয়া চিনিলাম। এই দেখা ও চেনাকে যদি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিতে পাই যে, অদূরস্থিত লাল গোলাপ তাহার অপূর্ব শোভায় আমার হৃদয় স্পর্শ করিল ; চক্ষু তাহার উপর পতিত হইল অথবা ঐ গোলাপটিই আমার চক্ষুর উপর পতিত হইল এবং চক্ষুর মধ্যস্থিত বর্ণ-পটে তাহার লাল রঙের ছাপ আঁকিয়া দিল। বর্ণ-পটের ঐ ছাপের সাড়া তন্ত্রীপথে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় একটা স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল, ফলে, আমার মনোরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। মন ঐ স্পন্দনকে ধরিয়া বসিল। মন স্বচ্ছ এবং চিৎ-প্রভায় সমুজ্জ্বল। সে তাহার আহার্য আলোকচ্ছটায় নেত্রপটে অঙ্কিত চিত্রটি উদ্ভাসিত করিয়া আমার নিকট তাহা উপস্থিত করিল, ফলে, লাল গোলাপের সহিত আমার পরিচয় ঘটিল।

ইন্দ্রিয় ও মন জড়। জড়ের নিজের কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের ন্যায় মনোব্যাপারও এক যান্ত্রিক ক্রিয়ার মূঢ় শক্তির খেলামাত্র। জড় যন্ত্রের পেছনে যেমন একজন যন্ত্রী থাকে, সেইরূপ ঐ জড় ইন্দ্রিয় ও মনোরাজ্যের লীলা-চক্রের অন্তরালে স্বচ্ছন্দচারী একটি জীবশক্তি আছে। ঐ জীবশক্তি নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য মূঢ় জড় শক্তিকে চালিত করিয়া উহার সাহায্যে নিজকে প্রকাশ করিতেছে। স্বতঃসঞ্চারী জীবশক্তি ও মূঢ় জড় শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। জীব জড়কে নির্দিষ্ট কেন্দ্রপথে পরিচালিত করে এবং জড় জীবকে তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধি ও ভোগের সহায়তা করে। জীবপ্রকৃতিকে জড় ও বুদ্ধির মিলনভূমি বলা যাইতে পারে। এই ভূমিতে জ্ঞানালোকের প্রথম বিকাশ, সুপ্ত প্রকৃতির প্রথম জাগরণ। ইন্দ্রিয় কিংবা মনের ব্যাপারকে তো আমরা জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলিতে পারি না, তাহা তো এক প্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র। যদি ফটো তোলার মত ঐ যান্ত্রিক ক্রিয়াকেই আমরা 'জ্ঞান' সংজ্ঞায় অভিহিত করি, তবে যন্ত্র যাহাদের বিকল নহে, এইরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও জ্ঞানের তারতম্য ঘটে কেন ? পণ্ডিত ও মূর্খের, শিশু ও বৃদ্ধের বস্তুবিজ্ঞানের প্রভেদ হয় কেন ? আর, ঐ জড় যন্ত্রের মূঢ় লীলাকে আমরা জ্ঞান বলিব কিরূপে ? জ্ঞান পদার্থটি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে, তাহার সহিত জড়ের কোন যথার্থ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা কল্পনাও করা যায় না। এই জন্যই আমাদের ভারতের দার্শনিকগণ জ্ঞানকে পরমার্থ-সৎ চিৎস্বরূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম বা পুরুষ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন, আর, জড় জগৎকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও জ্ঞানতত্ত্বের বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে-জ্ঞানের আলোকে আমাদের জীবনের যাত্রাপথ উদ্ভাসিত হয়, তাহাতে জড়ের দান ও সম্বন্ধ বড় অল্প নহে। জড় ও চৈতন্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়াই আমাদের জ্ঞানরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। জ্ঞানের আলোকসম্পাতে জড় যেমন আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও

জড়ের আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়াই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জ্ঞান ব্যতীত জড় যেমন মূঢ় ও অপ্রকাশ, সেইরূপ জড়ের সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানও মূক। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জড় পরপ্রকাশ। জ্ঞান ও জড় আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পরবিরোধী হইলেও, যে শক্তির খেলায় এই দুইয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জীব-প্রকৃতিই জ্ঞানকে তাহার প্রকৃত রূপ দান করিয়াছে। লাল গোলাপের যে স্পন্দন-তরঙ্গ আমাদের মনোরাজ্যে আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, জীবপ্রকৃতিই ঐ তরঙ্গকে লাল গোলাপের রূপ ও সংজ্ঞা দিয়া আমাদের নিকট পরিচিত করিয়াছে। ঐ স্পন্দন-তরঙ্গের অন্তরালে জীবশক্তি ক্রিয়াশীলা না হইলে, কোন বস্তুর সহিতই আমাদের প্রকৃত পরিচয় ঘটিত না, সমস্তই এক অব্যক্ত বেদনামাত্রে পর্যবসিত হইত।

জীব চেতন। তাহার চেতনা বা বোধশক্তি তাহাকে স্বার্থসিদ্ধির অধিকার দিয়াছে। জীবের প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলে ঐ অধিকারই ব্যক্ত হইয়া থাকে। কুশলের সাধন ও অকুশলের বর্জনই জীবের প্রবৃত্তির মূল। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃই পুরুষের প্রার্থনীয় বা পুরুষার্থ। আনন্দই তাহার চরম ও পরম লক্ষ্য। তাঁহার সমস্ত কর্ম ও চিন্তাচক্রের অন্তরালে রহিয়াছে সত্যের লালসা, শিবের সাধনা ও সৌন্দর্যের পিপাসা। এই সত্য, শিব, সুন্দরের উপলব্ধিই জীবের পূর্ণতার উপলব্ধি। এইখানে জীবের মানসলোক তাহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আনন্দলোকে মিশিয়া গিয়াছে। জীব যখন এই আনন্দলোকের সন্ধান লাভ করে, তখন সাংসারিক বিষয়ানন্দকে বিষের মত পরিত্যাগ করিয়া ভূমানন্দে তন্ময় হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। উপনিষদের ঋষি এই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধ এই আনন্দোপলব্ধির জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিয়াছিলেন—

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্,
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।।

—ললিতবিস্তর, ৩৬২ পৃঃ

যোগী তাঁহার যোগদৃষ্টিতে, ঋষি তাঁহার দিব্যদর্শনে, ব্রহ্মবিৎ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে, কবি তাঁহার কাব্যপ্রতিভায়, দার্শনিক তাঁহার দর্শনমনীষায় এই আনন্দের উপলব্ধির জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সাধকের এই জিজ্ঞাসার কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও জিজ্ঞাসার কিন্তু বিরাম নাই। সকল দেশের সকল সাধকই এই আনন্দের রসাস্বাদ পাইয়াছেন এবং এই আনন্দরসে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। সমস্ত দর্শনজিজ্ঞাসার মূলেই এই আনন্দলোকের স্পর্শ রহিয়াছে। যে দার্শনিক ইহার সন্ধান লাভ করেন নাই, তিনি অত্যন্তই দীন। এই আনন্দের সন্ধান সুস্পষ্টভাবে যিনি দিতে পারেন, তাঁহার দর্শনই প্রকৃত দর্শন।

দর্শনশাস্ত্রের সংজ্ঞা

চাক্ষুষজ্ঞান যেমন এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপ আমাদের মধ্যে আঁকিয়া দেয়, সেইরূপ যে চিন্তা বা শাস্ত্র আমাদের জীবরাজ্যের, মনোরাজ্যের ও আনন্দরাজ্যের অব্যক্ত, অস্পষ্ট স্পর্শগুলিকে সুব্যক্ত, সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দিতে পারে তাহাই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র।

আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দরাজ্যের সৃষ্টি। আত্মপ্রীতিই মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও প্রবৃত্তির মূল। স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা তাহার নিজের সুখের জন্যই ভালবাসে, স্বামীর সুখের জন্য নহে। স্বামী তাহার প্রকৃত প্রিয়তম নহে, তাহার নিজ আত্মাই তাহার প্রিয়তম।[১] তাহার পতিপ্রেমের মূলে রহিয়াছে আত্মপ্রেম। আত্মার সমধিক প্রীতি সম্পাদন করে বলিয়াই স্বামীকে গৌণভাবে প্রিয়তম বলা হইয়া থাকে। আত্মার সাক্ষাৎকারই আনন্দময়ের, প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার। অতএব আত্মদর্শনই সমস্ত দর্শনজিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্ম-দর্শন সম্ভব হয় কিরূপে? আত্মার তো রূপ নাই, তাহা স্থূল বস্তুও নহে যে, তাহাকে লাল গোলাপ ফুলের মত চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। চাক্ষুষ জ্ঞান বা স্থূল চক্ষুদ্বারা দেখাই যদি 'দৃশ্' ধাতুর অর্থ হয়, তবে অরূপ আত্মাকে যখন চক্ষুদ্বারা দেখা সম্ভবই নহে, তখন 'আত্মদর্শন' এই কথাটাই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় না কি? ইহার উত্তরে দার্শনিকেরা বলেন যে, আত্মদর্শন কথার অর্থ আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দেখা নহে, আত্মাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানা। উপনিষদে এই অর্থেই 'দৃশ্' ধাতুর অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনকের বিচারসভায় উষস্ত ও কহোল ঋষির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মদর্শনের যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আত্মাকে ঐরূপ সাক্ষাৎ ভাবে জানার কথাই বলা হইয়াছে। ঋষি উষস্ত প্রশ্ন করিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে আত্মা সমস্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও কোন আবরণ দ্বারা আবৃত নহেন, সেই চরম ও পরম আত্মতত্ত্ব আপনি জানেন কি? যদি জানেন, তবে শৃঙ্গে ধরিয়া যেমন গরুকে দেখাইয়া দেওয়া যায়, সেইরূপ সেই আত্মাকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন কি?'[২]

আত্মদর্শনই দর্শন-জিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য

উষস্ত ঋষির প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অরূপ নিরবয়ব আত্মাকে শৃঙ্গে ধরিয়া গরু দেখাইবার মত দেখাইয়া দেওয়া তো সম্ভবপর নহে, তবে মানুষ যে জড় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, এই প্রত্যক্ষের অন্তরালে স্বপ্রকাশ আত্মা অবস্থিত আছেন, এবং ঐ জড় বস্তুর প্রত্যক্ষদ্বারাই জড়ের অন্তরালে অবস্থিত জ্যোতির্ময় আত্মার সহিতও সাক্ষাৎসম্বন্ধেই আমাদের পরিচয় হইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ জড়, বিষয়ও জড়। জড় তো জড়কে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং জড় বস্তু যে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাদ্বারাও স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন। আত্মাই নিখিল বিশ্বের একমাত্র সাক্ষী, দ্রষ্টা এবং ভাসক। অন্তঃকরণ আত্মার আলোকেই আলোকিত হয়, সুতরাং অন্তঃকরণ নিজের ভাসক আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, দৃষ্টির অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানের যিনি

১। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।—বৃহদাঃ, ২।৪।৫

২। বৃহদারণ্যক—শাঙ্করভাষ্য সহিত, ৩।৪।১

দ্রষ্টা প্রকাশক তাঁহাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করিবে না ; এইরূপে মনোবৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির যিনি উদ্ভাসক তাঁহাকে মন ও বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না।[১] উক্ত বৃহদারণ্যকশ্রুতির তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। আত্মা ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের অতীত এবং ইহাই তাঁহার স্বভাব। আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে এইরূপেই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, জড় যন্ত্রের ক্রিয়া যেমন চেতনের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হয় না, সেইরূপ এই দেহযন্ত্রের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়াও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন সম্ভবপর নহে। অতএব জড় দেহের অন্তরালে চেতন আত্মা অবস্থান করিতেছেন এবং দেহযন্ত্রের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতেছেন। আত্মা ভোগায়তন শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেও অশরীরী। সাংসারিক সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা শোক-দুঃখের অতীত, জরামৃত্যুরহিত, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ। এই আত্মাই জগদাধার, জীব ও জগতের পতি এবং পোষক। অনাদিকালসঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণে মানুষের বিজ্ঞান-চক্ষু আবৃত রহিয়াছে, সুতরাং ভ্রান্ত মানব সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান স্বপ্রকাশ সেই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিবেক-চক্ষু উন্মীলিত হইলে আত্মাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই মানুষ জানিতে পারে।[২] তাঁহার এই আত্মদর্শনে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের অপেক্ষা নাই এবং তাহা নাই বলিয়াই এই আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ কি মানস, সে বিষয়ে দার্শনিক-গণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, এই আত্মজ্ঞান যে 'সাক্ষাৎ' অনুভব, পরোক্ষ আত্মজ্ঞান নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগচক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষুতে এই আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ উপনিষদের ভাষায় 'সাক্ষাৎ' এবং 'অপরোক্ষ'।[৩] অতএব আত্মসাক্ষাৎকার যে চাক্ষুষ জ্ঞানস্বরূপ, একথা নির্বিবাদে বলা যায়। আমাদের দৃষ্টিকে আমরা লৌকিক ও অলৌকিক, বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকি। যদিও স্থূলভাবে বিচার করিলে, যে-বস্তুর রূপ আছে তাহাই কেবল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু সেই নিয়ম কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলেই প্রযোজ্য। আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে আমরা লৌকিক বলিব না, ইহা অলৌকিক বা যৌগিক। যোগচক্ষু বা দিব্যচক্ষুর সাহায্যে আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি ?

১। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যে-
র্ন শ্রুতেঃ
শ্রোতারং শৃণুয়া
ন মতের্মন্তারং মন্বীথা
ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।

—বৃহদাঃ, ৩।৪।২

২। বৃহদাঃ, শাঙ্করভাষ্য সহিত, ৩।৪।২

৩। যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম
য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ ।।

—বৃহদাঃ, ৩।৪।১

গীতার বিশ্বরূপদর্শনে ভগবান্ পার্থসারথি অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন এবং ঐ দিব্যচক্ষুর সাহায্যে অর্জুন চর্মচক্ষুর অদৃশ্য বিশ্বের অন্তরবিহারী কারণাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান নহে, উহা ভগবৎপ্রসাদলব্ধ প্রকৃত আত্মদর্শন। আমাদের চর্মচক্ষুর প্রত্যক্ষসম্বন্ধে এবং ঐ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানের দেওয়া চক্ষুতে অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহা দর্শনের চরম ও পরম স্তর, আনন্দময়ের যথার্থ উপলব্ধি, আর এই উপলব্ধির সাধনশাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র।

দর্শনশাস্ত্র বুঝাইতে 'দর্শন'-শব্দের প্রয়োগের ঐতিহ্য

দর্শনশাস্ত্র বলিলে আমরা সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবহুল সুসম্বদ্ধ চিন্তাশাস্ত্রকে বুঝি এবং ঐরূপ শাস্ত্রে 'দর্শন'-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন-শব্দের এইরূপ ব্যবহারের মূল কোথায়? বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে দর্শন-শব্দের কোন প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে একবার মাত্র দর্শন-শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়[১], কিন্তু সেখানে সাধারণ 'দেখা' অর্থেই দর্শন-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। বৈদিক সংহিতায় 'দর্শত' পদের একাধিক প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ দর্শনীয়, সেখানেও কোন পারিভাষিক অর্থ পাওয়া যায় না। গোপথ-ব্রাহ্মণ (১।১।১৯), কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ (২৭।৬), ষড়্বিংশ-ব্রাহ্মণ (৪।৫) প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে দর্শন-শব্দের যে প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা দর্শন-শব্দে সাধারণ 'দেখা' অর্থই বুঝায়, দর্শন-শাস্ত্র বুঝায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'দর্শনায় চক্ষুঃ' (৮।১২।৪) এইরূপ যে 'দর্শন'-শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে রূপ দেখার কথাই বলা হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের শেষভাগে (১৪।৫।৪) অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে[২] (২।৪।১-৫) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মদর্শনের যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে আমরা দর্শন-শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই দর্শন-শব্দে রূপ দেখার কথা বলা হয় নাই, অরূপ আত্মদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে এবং আত্মদর্শনের সাধন বিবিধ দর্শনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ হইতে আত্মার স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করিবে, তর্কের সাহায্যে উহার বিচার করিবে এবং আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে।

১। পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায়
বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়। ঋগ্বেদ, ১।১১৬।২৩

২। শতপথব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়ই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে সমস্ত জড় জগৎও জ্ঞাত হইয়া থাকে।[১] উক্ত শ্রুতিতে আত্মদর্শনের যে তিনটী উপায় বিহিত হইয়াছে সেই উপায়মূলে দর্শনকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি—

(১) শ্রবণাত্মক দর্শন,
(২) মননাত্মক দর্শন,
(৩) নিদিধ্যাসনাত্মক দর্শন।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; কারণ, শ্রুতিই মীমাংসার একমাত্র উপজীব্য, শ্রুতিদ্বারা যে ধর্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, মীমাংসাশাস্ত্র তর্কের আলোকসম্পাতে তাহা আরও উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী করিয়াছে। সুতরাং শ্রুতিব্যাখ্যার প্রধান অবলম্বন বলিয়া মীমাংসাদ্বয়কে শ্রবণাত্মক দর্শন বলা যায়। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি যে সকল দর্শনের প্রমা ও প্রমাণের স্বরূপ-নিরূপণই প্রধান লক্ষ্য, তাহাদিগকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিব। কারণ, মনন-শব্দের অর্থ যুক্তির সাহায্যে বিচার, এখানে তর্ক ও যুক্তিপ্রধান শাস্ত্রেরই উপযোগিতা অধিক। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অভ্রান্ত যুক্তিতর্কের স্বরূপ ও কৌশল প্রতিপাদন করিয়া আমাদের সত্যোপলব্ধির সহায়তা করে, সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মননাত্মক দর্শন। সাংখ্যদর্শনেও যুক্তিই প্রধানভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুত্যর্থের মননই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য, সুতরাং সাংখ্যদর্শনও মননাত্মক দর্শন। যোগশাস্ত্র তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যোগের স্বরূপ, সাধন ও ফলনির্ণয় করিয়া যোগশাস্ত্র ধ্যানের সাহায্য করে, অতএব যোগদর্শনকে নিদিধ্যাসনাত্মক দর্শন বলা যায়। 'দৃশ্যতে জ্ঞায়তে অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা দর্শন-শব্দে আত্মজ্ঞানসাধন (দর্শন) শাস্ত্রকে বুঝাইয়া থাকে। বিচারদৃষ্টির সাহায্যে আত্মদর্শন ও তাহার উপায় বর্ণনা করাই দর্শনশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য; সুতরাং কেবল ষড়্‌দর্শন কেন, যে শাস্ত্রেই আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, মুখ্যতঃ তাহাই দর্শনশাস্ত্র। যে শাস্ত্রে আত্মদর্শনের কোন কথা নাই, বা যে শাস্ত্র আত্মদর্শনের সহায় হয় না, এইরূপ শাস্ত্র মুখ্য দর্শন নহে। ইহাই বৃহদারণ্যক শ্রুতির তাৎপর্য। বৃহদারণ্যকোক্ত বিচারদৃষ্টির সাহায্যে কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'দর্শন' সংজ্ঞা লাভ করে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন-শব্দের ব্যবহারের মূলও আমরা খুঁজিয়া পাই।

১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।
মৈত্রেয়ি, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন
মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্।
—বৃহদাঃ, ২।৪।৫

অতি প্রাচীন কালেই সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং ঐ সকল শাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। মহাভারতে সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১] শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[২] মহামতি কৌটিল্য (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতক) ষড়্‌দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এই ত্রিবিধ দর্শনশাস্ত্র কৌটিল্যের মতে 'আন্বীক্ষকী' বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, বেদান্ত ও মীমাংসা, এই মীমাংসাদ্বয় ত্রয়ী বিদ্যা, ন্যায় ও বৈশেষিক তাঁহার দৃষ্টিতে লোকায়তের অন্তর্গত। মহাকবি ভাস (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) প্রতিমা নাটকে মহেশ্বরের যোগশাস্ত্র ও মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] খৃষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথম ভাগে ললিতবিস্তরে গৌতমবুদ্ধের বিদ্যাশিক্ষাপ্রসঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সূত্রাকারে যে ষড়্‌দর্শন প্রচলিত আছে তাহাতে স্থানে স্থানে দর্শন-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা দর্শনশাস্ত্রকে বুঝায় না। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে (১।১।৪) প্রাচীন সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখের যে সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে 'দর্শন'-শব্দের প্রয়োগ

১। সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৯।৬৪-৬৫

সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্‌।

—শান্তিপর্ব, ৩০০।৫

যোগদর্শনমেতাবৎ উক্তং তে তত্ত্বতো ময়া।

—শান্তিপর্ব, ৩০৬।২৬

২। স্তূয়মানো জনৈরেভির্মায়য়া নামরূপয়া।
বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৮।১৪।৯

৩। মহাকবি ভাস ও কৌটিল্য মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে দর্শন-শব্দের কোন প্রয়োগ করেন নাই—এই জন্য কেহ কেহ মহাভারতের শান্তিপর্বের যে সকল শ্লোকে সাংখ্যাদি দর্শনের উল্লেখ আছে, ঐ সকল শ্লোকের প্রামাণ্যসম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই, কেন-না, অনেক পরবর্তী কালের গ্রন্থেও 'সাংখ্য', 'সাংখ্যশাস্ত্র' এইরূপ সাংখ্যাদি দর্শনের নামতঃ বা 'শাস্ত্র' শব্দের দ্বারা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 'দর্শন'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। ভাস কবির নাটকে আমরা 'শাস্ত্র'-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রে ও ললিতবিস্তরে কেবল নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইরূপ উল্লেখ আধুনিক কালেও আমরা করিয়া থাকি, বেদান্ত, বেদান্তশাস্ত্র বা বেদান্তদর্শন এইরূপ যে-কোন ব্যবহারই আজও চলিতেছে, সুতরাং ভাস ও কৌটিল্য প্রভৃতির গ্রন্থে 'দর্শন'-শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়া মহাভারতের শান্তিপর্বের শ্লোকগুলিকে অপ্রমাণ বলিবার কোনই সঙ্গত হেতু নাই।

আছে সত্য, কিন্তু তাহাও দর্শনশাস্ত্রবোধক নহে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে (1–85 A.D.) জৈন পণ্ডিত উমাস্বাতি তাঁহার তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে দর্শন-শব্দের বহু প্রয়োগ করিয়াছেন। উমাস্বাতির প্রয়োগভঙ্গি দেখিলে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, তিনি দর্শন-শাস্ত্রোক্ত চরম দর্শনের কথাই সূত্রে বিবৃত করিয়া তদীয় গ্রন্থের নাম সার্থক করিয়াছেন। খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁহার ন্যায়ভাষ্যে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইতে দর্শন শব্দের একাধিক প্রয়োগ করিয়াছেন।[১] খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে বৈশেষিক-ভাষ্যকার প্রশস্তপাদও দর্শনশাস্ত্র অর্থে দর্শন-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যাখ্যায় কিরণাবলী-রচয়িতা আচার্য উদয়ন (984 A.D.) ও ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধরাচার্য (990 A.D.) ভাষ্যোক্ত দর্শন-শব্দে দর্শনশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন।[২] আত্মতত্ত্ববিবেকের উপসংহারে উদয়নাচার্য 'ন্যায়দর্শনোপসংহারঃ' বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রকেই স্পষ্টতঃ ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন। শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্যও 'বৈদিক দর্শন' 'ঔপনিষদ দর্শন' প্রভৃতি বাক্যে দর্শনশাস্ত্রকেই বুঝাইয়াছেন, সাংখ্যাদি দর্শনের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। মোট কথা, প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, প্রশস্তপাদ, উদয়নাচার্য, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ধুরন্ধর দার্শনিকগণ সকলেই দর্শন-শব্দে দর্শন-শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন-শব্দের প্রয়োগও করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দশম শতকে বৌদ্ধ পণ্ডিত রত্নকীর্তি তদীয় ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিতে দর্শনশাস্ত্র অর্থে দর্শন-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।[৩]

প্রাচীন পালি ত্রিপিটকে (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) সাম্প্রদায়িক মতবাদকে লক্ষ্য করিয়া বহু স্থানে 'দিট্‌ঠি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। পালির এই দিট্‌ঠি শব্দ সংস্কৃত দৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ। দৃষ্টি-শব্দ ও দর্শন-শব্দ একই 'দৃশ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন, অতএব 'দর্শন' অর্থে 'দিট্‌ঠি' শব্দের প্রয়োগ করিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন দৃষ্টি-শব্দ ও দর্শন-শব্দ তুল্যার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রভাষ্যে আচার্য বাৎস্যায়ন

১। (ক) অস্ত্যাত্মা ইত্যেকং দর্শনম্, নাস্ত্যাত্মেত্যপরম্,

—বাৎস্যায়নভাষ্য, সূত্র ১।১।২৩।

(খ) অন্যোন্যপ্রত্যনীকানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি, —বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪।২।৪৯

২। (ক) ত্রয়ীদর্শনবিপরীতেষু শাক্যাদিদর্শনেষু ইদং শ্রেয় ইতি মিথ্যাপ্রত্যয়ো বিপর্যয়ঃ।

—প্রশস্তপাদভাষ্য, পৃষ্ঠা ১৭৭, কাশী সংস্করণ।

(খ) 'দৃশ্যতে স্বর্গাপবর্গসাধনভূতো'র্থো'নয়া' ইতি দর্শনম্, ত্রয্যেব দর্শনং ত্রয়ীদর্শনম্, তদ্‌বিপরীতেষু শাক্যাদিদর্শনেষু শাক্যভিক্ষু-------- শাস্ত্রেষু।

—ন্যায়কন্দলী, পৃষ্ঠা ১৭৯, কাশী সংস্করণ।

(গ) কিরণাবলী—পৃঃ ২৬৭, কাশী সংস্করণ।

৩। যদি নাম দর্শনে দর্শনে নানাপ্রকারং সত্ত্বলক্ষণমুক্তমস্তি।

—ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, *Six Buddhist Nyāya Tracts*, p. 20.

'সাংখ্যদৃষ্টি'-শব্দে সাংখ্যদর্শনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় 'যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ যাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' (মনু, ১২।৯৫)—এই শ্লোকে দর্শনশাস্ত্র অর্থেই 'দৃষ্টি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। চার্বাক প্রভৃতির বেদবিরুদ্ধ দর্শনশাস্ত্রকেই 'কুদৃষ্টি' বা নিন্দিত দর্শন বলা হইয়াছে। টীকাকার কুল্লূক ভট্ট এইরূপেই 'কুদৃষ্টি'-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্র বুঝাইতে দর্শন-শব্দের ব্যবহার প্রাচীন কালেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। মনে হয়, এই জন্যই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে জৈন নৈয়ায়িক পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি[১] তৎকৃত ভারতীয় দর্শনের প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ 'ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়'কে দর্শন নামাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিভদ্র সূরির 'ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়' ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা, বৌদ্ধ ও জৈন—এই ছয়টী দার্শনিক মতবাদের একখানি অতি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থ। পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে মাধবাচার্য বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়া 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' রচনা করেন। 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' ভারতীয় দর্শনের অতি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। মাধবাচার্যের এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার সময়ে দার্শনিক চিন্তাধারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূর পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। মাধবাচার্য চার্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্ত পর্যন্ত ষোলটি বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দর্শন-শব্দ কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সর্ববিধ দর্শনচিন্তার পরিচায়ক। এই জন্যই মাধবাচার্য তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' রাখিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নামকরণ আর সম্ভব হয় না। এই সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিলে দর্শন বলিতে আমরা দর্শন-শাস্ত্রকে বুঝি কেন, এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যায়। আমরা এই মীমাংসার মূলেও প্রদর্শিত বৃহদারণ্যক-শ্রুতিকেই প্রমাণ বলিয়া উপন্যাস করিব। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির বিবৃতিপ্রসঙ্গেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মদর্শনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। ইহাই মুখ্য দর্শন। বিচারের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং ইহার উপায় বর্ণনা করার জন্যই বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি। এই বিচার-প্রক্রিয়া 'পরীক্ষা'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জন্যই দর্শনশাস্ত্রের অপর নাম পরীক্ষাশাস্ত্র। সৃষ্টিতত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষার সূচনা হইয়াছে। যে দিন মানব ধরণীর বুকে আবির্ভূত হইল, সে দেখিল তাঁহার চতুর্দিকে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যে মগ্ন হইয়া সে হইল আত্মহারা। সৌন্দর্যোন্মাদ জাগাইল তাঁহার প্রাণে কাব্য-প্রেরণা।

১। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিভদ্র সূরি নামে দুই জন দার্শনিক পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথম হরিভদ্র সূরির আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক, এবং দ্বিতীয় হরিভদ্র সূরির খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক। এখন প্রশ্ন এই যে, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-রচয়িতা হরিভদ্র সূরি কে? অনেক মনীষী ষড়্দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের প্রাচীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথম হরিভদ্র সূরিকেই ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা এখানে এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে এই সৌন্দর্যোন্মাদ কাটিয়া গেল। মানব-মন প্রকৃতির নানা তথ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হইল। মনের স্বাভাবিক ধর্ম তর্ক। সে প্রশ্ন করিল, এই পরিবর্তনশীলা লীলাময়ী প্রকৃতির মূল কি? প্রকৃতির এই স্বৈর গতির অন্তরালে যে ছন্দঃ ও ঐক্যের সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কে সেই সূত্রধর? জড় প্রকৃতির বুকে প্রাণিজগৎ কোথা হইতে আসিল? ইহার পরিণতি কোথায়? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় আমার ভবিষ্যৎ? এইরূপ অনন্ত প্রশ্ন স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ সহজাত প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঐ সকল প্রশ্নের যে সমাধান করিয়া আসিতেছে তাহাই হইল তাঁহার দর্শন, আর, পদার্থসমূহের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পদার্থসমূহের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্রকেই যদি দর্শন-শাস্ত্র বল, তবে বিজ্ঞানকে[১] দর্শন বল না কেন? পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ই তো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইহার উত্তরে দার্শনিকেরা বলেন যে, পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়-শব্দের অর্থ পদার্থের চরমতত্ত্ব, কারণতত্ত্ব বা অন্তস্তত্ত্ব-নির্ণয়, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপতত্ত্ব-নির্ণয় নহে। জড় বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করে, আর, তাহার অন্তস্তত্ত্ব বা চরমতত্ত্ব নির্ণয় করে দর্শন। জড় জগতের মৌলিক উপাদান কি? প্রকৃতির কার্যাবলী কোন্ নিয়মানুসারে শাসিত হইতেছে? ইহাই মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। জড় জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কিরূপ ছিল? পরিণামেই বা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে? সেদিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নাই। সে জগতের পূর্বাপর অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণই উদাসীন। এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতির সাবলীল গতিভঙ্গির মধ্যে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা

বিজ্ঞান ও দর্শন

১। বিজ্ঞান-শব্দে এখানে জড় বিজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিলে আমরা, বিশেষ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় জড় বিজ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বিজ্ঞান-শব্দের এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। উপনিষদে দার্শনিক চরমজ্ঞানে কিংবা আত্মা ও ব্রহ্মের নামান্তররূপে বিজ্ঞান-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানঘন, বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানাত্মন্, বিজ্ঞানপতি প্রভৃতি বহু শব্দ উপনিষদে কোথাও ব্রহ্মজ্ঞান, কোথাও মোক্ষজ্ঞান, কোথাও বা আত্মজ্ঞানকে বুঝায়। দার্শনিক পরিভাষায় বিজ্ঞান-শব্দে অপরোক্ষ অনুভবকে বুঝায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বহুস্থানে এই অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ জ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এই অর্থেও বিজ্ঞান-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বিচারবুদ্ধিকে বিজ্ঞান বলিয়াছেন। পাতঞ্জল মহাভাষ্যেও এইরূপ অর্থেই বিজ্ঞান-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ অর্থে বিজ্ঞান-শব্দ জড়-বিজ্ঞানেও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু বর্তমানকালে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বলিলে জড় বিজ্ঞানকেই বুঝায়, ইহার কারণ কি? উপনিষদে আমরা ইহার বিপরীত অর্থই দেখিতে পাই। ইহার উত্তরে আমাদের মনে হয়, অমরসিংহ তাঁহার অমরকোষ গ্রন্থে যে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়াছেন (মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ, স্বর্গবর্গ, শ্লোক ১৩৯) বর্তমান বাঙ্গালাভাষা উপনিষদের অর্থ ছাড়িয়া দিয়া এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছে। নিপুণ শিল্পীর যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যথেষ্টই আছে—ইহা কেহই অস্বীকার করে না।

কার্য করিতেছে তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাব নির্দেশ করাই বিজ্ঞানগবেষণার মূল লক্ষ্য।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য

জড় জগৎ যেমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, সেইরূপ আমাদের মনোজগৎও কতকগুলি নিয়মের অনুবর্তন করিয়া চলিতেছে; মনোরাজ্যের ঐ সকল নিয়ম ও কার্যপ্রণালী অনুশীলন করিবার জন্য মনোবিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, মনের স্বরূপ কি? মনের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ? জড়ের সহিতই বা মনের কি সম্বন্ধ? এই সকল প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান করেন দার্শনিক। দার্শনিক তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে বস্তুর মূলতত্ত্ব বিচার করেন। তাঁহার স্বীকার্য বলিয়া কিছুই নাই, সকলই তাঁহার বিচার্য। বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্বিবাদে যাহা মানিয়া নেন দার্শনিক সেখানে প্রশ্ন করেন যে, বৈজ্ঞানিকের ঐ স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্যের অস্তিত্বই আদৌ আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি, এবং ঐ স্বরূপ জানিবার উপায়ই বা কি? দার্শনিক প্রজ্ঞার আলোকসম্পাতে আমরা ঐ সমস্ত মৌলিক সমস্যাসম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, ফলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যতই গভীর হউক না কেন, এই পরীক্ষার ফলে আমরা যে সত্যের সন্ধান লাভ করি তাহা হয় সসীম ও সখণ্ড। স্থাবর, জঙ্গম, চেতন ও অচেতন ভেদে প্রকৃতিশরীরে যেরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ভাগ আছে প্রাকৃতিক নিয়মেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। ঐ ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিজ্ঞান-চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে। একই বস্তুর বিভিন্ন দিক্ বিভিন্ন বিজ্ঞান পরীক্ষা করিতেছে এবং তাহার ফলে আমরা কতকগুলি বিভিন্ন স্তরের খণ্ড সত্যের আভাস পাইতেছি। বিজ্ঞান তাহার আবিষ্কৃত এই সকল খণ্ড সত্যের মধ্যে কোনও অখণ্ড যোগ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সুতরাং ঐরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা বস্তুতত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় লাভ করাও সম্ভব হইতেছে না। দার্শনিক প্রজ্ঞার স্বচ্ছ আলোকে আমরা সসীমের মধ্যে অসীমের সন্ধান লাভ করি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য এবং সাম্যের সূত্র খুঁজিয়া পাই, ফলে বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপূর্ণ রূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিকের সখণ্ড দৃষ্টির মধ্যে যে অখণ্ডের আভাস পাওয়া যায়, বহুত্বের মধ্যে একত্বের, সীমার অন্তরালে অসীমের প্রকাশ অনুভূত হয়, এই অনুভূতিই সত্যের যথার্থ সাক্ষাৎকার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরিতনবর্তী 'প্রজ্ঞানের' সাহায্যে সত্যের এই সার্বভৌম স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তর্দৃষ্টিই এই পরিচয়ের পথে একমাত্র পাথেয়। বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধানই সত্যজিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য। কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, সকলেই ঐক্যের সূত্রই খুঁজিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতি আলোচনা করিলেও বস্তুতত্ত্বের মৌলিক একত্বই প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান প্রকৃতিশরীরকে স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া পরীক্ষা করিতেছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জড় জগতের মূল উপাদান পরমাণু। মৌলিক পরমাণুর সংখ্যা তাঁহাদের মতে ৯২টী।

৯২টী বিভিন্নজাতীয় মূল পরমাণুর বিবিধপ্রকার সংযোগ ও সন্ধানের ফলে এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি বিরচিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-তন্ত্রী সাধনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এই পরমাণুও নিরংশ মূল নহে। উহার দুইটী অংশ আছে। একটী অংশ অপর অংশের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে।

বৈজ্ঞানিকের মতে জড় জগতের উপাদান পরমাণু। পরমাণুও নিরংশ মূল নহে

ঐ ঘূর্ণায়মান অংশ ইলেক্‌ট্রন নামক কতকগুলি বিদ্যুৎকণার সমবায়-মাত্র। পরমাণুর অপর অংশকে কেন্দ্র বলা যায়। এই কেন্দ্রাংশ প্রোটন ও নিউট্রন-দ্বারা গঠিত। প্রোটনও একজাতীয় বিদ্যুৎকণা, নিউট্রন কিন্তু বিদ্যুৎকণা নহে। নিউট্রনের যথার্থ স্বরূপটী কি সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। অনেকের মতে নিউট্রন প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের সমবায়ে গঠিত। পরমাণুর অবয়বগঠনে প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন নামক যে দুই প্রকার বিদ্যুৎকণার সন্ধান দেওয়া গেল তদ্‌ব্যতীত সম্প্রতি পজিট্রন নামে আরও এক প্রকার বিদ্যুৎকণার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পজিট্রনও ইলেক্‌ট্রনের মত বিদ্যুৎকণা, তবে বিশেষ এই যে, পজিট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ (Positive Electricity) আর ইলেক্‌ট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (Negative Electricity)। প্রোটনও ধনাত্মক বিদ্যুৎ, তবে ওজন পজিট্রনের ওজন হইতে ১৮৩৮ গুণ বেশী। বিদ্যুৎ যত প্রকারেই উৎপাদিত হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত ঋণাত্মক (Negative) ও ধনাত্মক (Positive), এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব নাই। পরমাণুর তথ্য বিচার করিয়া দেখা গেল যে, পরমাণুসমূহ বিদ্যুৎকণার সমবায়েই গঠিত বলিয়া বিভিন্নজাতীয় পরমাণুশক্তি (Energy) ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড় ও শক্তি হরগৌরীর ন্যায় নিত্যসম্বদ্ধ, যেখানে জড় সেখানেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেখানেই জড়, এক অন্যের অভিন্ন সহচর। জড় ও শক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন। জড় ও শক্তি যে অভিন্ন তাহা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আইনষ্টাইন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, একটী পজিট্রন ও একটী ইলেক্‌ট্রন মিলিয়া একপ্রকার রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রশ্মিকে গামারশ্মি বলা যায়। এই-জাতীয় রশ্মিই অবস্থাবিশেষে পজিট্রন ও ইলেক্‌ট্রনে পরিণত হইতে পারে। ইহা হইতেই জড় ও শক্তি যে মূলতঃ ভিন্ন নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং একমাত্র শক্তিই যে বিশ্ব-প্রকৃতির মূল, ইহাও অবধারিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিকে আলোক, তাড়িত, চুম্বক প্রভৃতি নানা পর্যায়ে অভিহিত করিলেও শক্তিসকল মূলতঃ স্বতন্ত্র ও নানা নহে। আলোক, তাড়িত, চুম্বক প্রভৃতি শক্তি একই মহিমময়ী মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ। শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, ক্ষয়-ব্যয় নাই, শক্তির শুধু ভাবান্তর ও রূপান্তর হয় মাত্র। সমস্ত শক্তিপুঞ্জের মূলে এক মহাশক্তিই বিদ্যমান। এক হইতেই বহুর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জগজ্জননী এই মহাশক্তি চিন্ময়ী, না মৃন্ময়ী? জগৎ কি অন্ধ জড় শক্তিরই বিকাশ, না চিন্ময়ের বিলাস? এই সমস্যাই দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল সমস্যা। বিজ্ঞানোক্ত শক্তির স্বভাবও ক্রিয়াপদ্ধতি আলোচনা

করিলে বৈজ্ঞানিক শক্তি যে জড় শক্তি, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। বৈজ্ঞানিক মৃন্ময়ের রাজ্য ছাড়িয়া চিন্ময়ের রাজ্যে পেঁাছিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকের সাধনা মৃন্ময়ী শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দার্শনিক কিন্তু এখানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দার্শনিকের মতে নিখিল বিশ্ব জ্ঞানময়ী মহাশক্তিরই বাহ্য অভিব্যক্তি। জড় বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে বিশ্বেশ্বর মহাবিজ্ঞান। ভগবৎ-শক্তি সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়াই জীব জগৎকে প্রকাশ করিতেছে। জগৎ জড় শক্তির খেলা হইলে আচার্য শঙ্করের ভাষায় "জগদন্ধ্যং প্রসজ্যেত"।

ভারতীয় দার্শনিকগণ স্মরণাতীত কাল হইতেই জড় ও জীবশক্তিকে চিন্ময়ী শক্তির অভিব্যক্তিরূপেই বুঝিয়া আসিয়াছেন। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্বত্রই চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বিভিন্ন জাগতিক পদার্থে আমরা দেখিতে পাই। ঐ পুরুষকে দার্শনিক পরিভাষায় আমরা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকি, আর তাঁহার অধিষ্ঠানের নাম 'ক্ষেত্র'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পার্থসারথি অর্জুনকে এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি জড় প্রপঞ্চ আমার অচিৎ প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি, আর জীবপ্রকৃতি আমার পরা প্রকৃতি। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমার অচিৎ ও চিৎপ্রকৃতি আমাতেই অনুস্যূত রহিয়াছে। আমি ইহার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত থাকিয়া জড়শক্তি ও জীবশক্তিকে আমার ঐশী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছি। নিখিল বিশ্বই আমার শরীর এবং প্রতি শরীরে আমারই বিকাশ। সকল পদার্থেরই যাহা সার, যাহা প্রাণ, তাহাই আমি। চন্দ্রসূর্যের যে তেজঃ জগৎ উদ্ভাসিত করে, যে তেজঃ অগ্নিতে আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা আমারই তেজঃ। আমিই জলের রস, আমিই আকাশের শব্দ, আমিই পুরুষের পুরুষত্ব, আমিই জীবের জীবন। যে আমি বাহিরে অগ্নিরূপে আলোক দান করি, সেই আমিই প্রাণিজঠরে প্রবেশ করিয়া বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করি,[১] সুতরাং ভিতরেও আমি, বাহিরেও আমি, আমিময় এ ত্রিভুবন। আমি কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত। আমি লীলাবশে মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করিলেও আমার নিত্য চৈতন্যস্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। সেই রূপে আমি পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমরূপে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষর ও অক্ষর, অচিৎ ও চিৎ, প্রকৃতির অতীত হইয়াও ইহাদের শাসক ও ভাসক। এই জন্যই উপনিষদের ভাষায় পুরুষোত্তমকে বলা হইয়াছে 'প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি'। এখানে আসিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও জীব, এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্যবসান হইয়াছে। জড় প্রপঞ্চ ও জীব পরমাত্মারই বিধা বা প্রকারভেদ মাত্র। আত্মজ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে পরমাত্মার বিভাব এই জীব ও জড়

১। গীতা। ১, ২; ৭।৪, ৫, ৭, ৮; ৯।৪; ১৫।১৭-১৮; ১৫।১২, ১৪।

প্রকৃতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। এই জন্য বেদান্ত বলিয়াছেন—'ব্রহ্মৈবেদং সর্বং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মই মূর্ত ও অমূর্ত রূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে, 'সৎ ও ত্যৎ' রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহার ব্যক্ত ও মূর্ত রূপ জড়-বিজ্ঞানের, অব্যক্ত অমূর্ত চিন্ময় রূপ দর্শনের জিজ্ঞাস্য। তত্ত্বজ্ঞানের পথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যেখানে শেষ, দার্শনিক পরীক্ষার সেখানেই আরম্ভ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় দর্শন—আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

দার্শনিক পরীক্ষা ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কালেই বিভিন্ন মুখে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। সত্যজিজ্ঞাসাই দার্শনিক পরীক্ষার মূল লক্ষ্য। সত্য সর্বতোমুখ, এই সর্বতোমুখ সত্যের যে মুখ যাহার মানসনেত্রে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই হইল তাঁহার 'দর্শন'। আর যিনি সত্যদ্রষ্টা—তিনিই ঋষি। সত্যের যথার্থ সাক্ষাৎকার তর্কের সাহায্যে হয় না, তাহা হয় অন্তর্দৃষ্টি বা 'বোধি'র (Intuition) সাহায্যে। একজন বুদ্ধিমান্ তার্কিক তাঁহার প্রতিভাবলে যে তর্কের অবতারণা করেন, অন্য কোনও তীক্ষ্ণধী তার্কিক তাহার দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। এইরূপে তৃতীয় বুদ্ধিমান্ আবার দ্বিতীয় বুদ্ধিমানের যুক্তিজাল ছিন্ন করেন। সুতরাং তর্কের শেষ কোথায়?[১]

ভারতীয় দর্শনের ধারা

তারপর, তর্ক যতই সূক্ষ্ম, গভীর ও নির্দোষ হউক না কেন, তাহাদ্বারা যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা পরোক্ষ সত্য, তর্কের দ্বারা সত্যের প্রত্যক্ষ হয় না। সার্বভৌম সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধিলোকের ঊর্ধ্বে প্রজ্ঞালোকে চলিয়া যাইতে হয়। বুদ্ধিলোকে হয় সত্যের বিচার, প্রজ্ঞালোকে হয় সত্যের সাক্ষাৎকার। বুদ্ধির ভূমি হইতে প্রজ্ঞার ভূমি সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকার ও টীকাকারের যুগ। এই যুগে আমরা দেখিতে পাই বিচারশক্তির অপূর্ব লীলা। ভারতীয় দার্শনিক প্রতিভা এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাশি রাশি গ্রন্থমালা নূতন নূতন চিন্তার সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে। খণ্ডন ও মণ্ডনে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। তর্ককোলাহলে এই যুগ মুখরিত। এই কোলাহলের মধ্যে বোধির বাণী অস্ফুটই থাকিয়া যায়। জিগীষুর সদম্ভ আস্ফালনই হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু, একথাও এখানে অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়াই দার্শনিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তর্কের আলোকচ্ছটায় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পথ যতদূর সুগম করা যাইতে পারে, ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে, সেই নিশিতবুদ্ধিভেদ্য তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত

১। কশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোহন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুম্।—ব্রহ্মসূত্র, শং-ভাষ্য, ২।১।১১।

হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। তর্কের কণ্টকবনে জ্ঞানকুসুমের বিকাশ হয় না ; সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে, কুলিশকঠোর তর্কাহবেই দর্শনচিন্তার পরিণতি নহে। ভারতীয় দর্শন এক দিকে যেমন তর্কবিজ্ঞান, অপর দিকে ইহা শাশ্বতশান্তিনিদান অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বিচার, বিতর্ক ও সাধনার মধ্য দিয়া আত্মদর্শন ও আত্মমুক্তিই দর্শনের চরম লক্ষ্য। দেহাত্মবাদী চার্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তী পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকই তাঁহার স্বীয় দর্শনচিন্তার অনুরূপ আত্মিক সুখ ও আত্মমুক্তির সন্ধান দিয়াছেন। সমস্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহই মহামানবের মুক্তিসাগরে ছুটিয়া চলিয়াছে। তর্ক ও বিচার জীবের মুক্তি-অভিযানে পাথেয় হিসাবেই ভারতীয় দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই ভারতীয় দর্শন পৃথিবীর অন্যান্য দর্শন হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাহার নিজস্ব সম্পদ্। ভারতীয় ঋষির অধ্যাত্মদর্শনই এই সম্পদের মূল। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভারতীয় আর্যজ্ঞানের যে দুকূলপ্লাবিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, কোন এক খাতে তাহার সংকুলন হইতে পারে না, এইজন্যই দার্শনিক রাজ্যে নানা মতবাদ ও প্রস্থানভেদের সৃষ্টি।

দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান

ভারতীয় দর্শনের ঐ সকল বিভিন্ন প্রস্থানের বিবরণ মাধবাচার্যকৃত সর্বদর্শন-সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সংগ্রহগ্রন্থে মাধবাচার্য (১) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ, (৩) জৈন, (৪) রামানুজ, (৫) মাধ্ব, (৬) পাশুপত, (৭) শৈব, (৮) প্রত্যভিজ্ঞা, (৯) রসেশ্বর, (১০) বৈশেষিক, (১১) ন্যায়, (১২) পূর্বমীমাংসা, (১৩) পাণিনীয়, (১৪) সাংখ্য, (১৫) যোগ ও (১৬) শাঙ্কর বেদান্ত এই ষোলটি বিভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ষোলখানি দর্শনের মধ্যে ষড়্দর্শনই পরবর্তী কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ষড়্দর্শন বলিয়া আমরা কোন্ ছয়খানা দর্শনকে গ্রহণ করিব? জৈন পণ্ডিত

ষড়্দর্শন

হরিভদ্র সূরি তৎকৃত ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে ষড়্দর্শন বলিয়া (১) বৌদ্ধ, (২) ন্যায়, (৩) সাংখ্য, (৪) জৈন, (৫) বৈশেষিক ও (৬) মীমাংসা এই ছয়খানি দর্শনকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ছয়খানি দর্শনই হরিভদ্র সূরির মতে আস্তিক দর্শন। কেহ কেহ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন, তাঁহাদের মতে আস্তিক দর্শনের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ। তাঁহারা নাস্তিক চার্বাক দর্শনকে ঐ পাঁচখানা আস্তিক দর্শনের সঙ্গে যোগ দিয়া ষড়্দর্শনের সংখ্যা পূরণ করিয়া থাকেন।[১]

১। বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা।
জৈমিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শনানামমূন্যহো ॥
—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, ৩য় কারিকা।

এবমাস্তিকবাদানাং কৃতং সংক্ষেপকীর্তনম্।
নৈয়ায়িকমতাদন্যে ভেদং বৈশেষিকৈঃ সহ।
ন মন্যন্তে মতে তেষাং পঞ্চৈবাস্তিকবাদিনঃ ॥

হরিভদ্র সূরির ষড়দর্শনসমুচ্চয়ই ষড়্দর্শনের আদি সংগ্রহগ্রন্থ। সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই ষড়্দর্শন কথাটি জৈন-সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পরে অন্যান্য দার্শনিক-সম্প্রদায় ইহা গ্রহণ করেন। কিন্তু, তাঁহাদের ষড়্দর্শনের বিবরণ হরিভদ্র সূরির প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ নহে। বর্ত্তমান সময়ে ষড়্দর্শন বলিলে আমরা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খানি দর্শনকেই বুঝি। জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এখন আর ষড়্দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নহে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও ব্যাসের দর্শনকে ষড়্দর্শন বলা হইয়াছে।[১] এই ষড়্দর্শনই আস্তিক দর্শন। এই মতানুসারে জৈন ও বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক দর্শন।

এখন প্রশ্ন এই যে, দর্শনের আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের মাপকাঠি কি? কি যুক্তি-বলে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের ঐরূপ সীমারেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে? আস্তিক

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

ও নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা পরলোক, কর্ম ও কর্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা আস্তিক, আর যাঁহারা তাহা মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ঈশ্বর বা বেদ মানেন না তাঁহারাও নাস্তিক।[২]

ষড়্দর্শনসংখ্যা তু পূর্যতে তন্মতে কিল।
লোকায়তমত-ক্ষেপে কথ্যতে তেন তন্মতম্॥
—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, কারিকা ৭৭-৭৮-৭৯

হরিভদ্র সূরির ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন তাঁহার গণনায় সাংখ্য-শব্দে সাংখ্য, পাতঞ্জল উভয় দর্শনকে এবং মীমাংসা-শব্দে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এই উভয়বিধ মীমাংসাশাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, ফলে তাহার গণনায় ভারতের সুপ্রসিদ্ধ আটখানি দর্শনই ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১। গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥
—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র

২। "অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ"—পাণিনিসূত্র, ৪।৪।৬০ ও মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরলোকঃ অস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ, তদ্‌বিপরীতো নাস্তিকঃ—কাশিকা, পৃষ্ঠা ২৫৭ কাশী সংস্করণ।

অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, সূত্র ১৬১০।

পরলোক ইত্যভিধানস্বভাবাল্লব্ধম্।—শব্দেন্দুশেখর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, কাশী-সং।

নাস্তিকঃ পরলোকতৎসাধনাদ্যভাববাদী,
তৎসাক্ষিণ ঈশ্বরস্য অসত্ত্ববাদী চ।
—ভীমাচার্যকৃত ন্যায়কোষ, নাস্তিক-শব্দ।

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।—মনুসংহিতা, ৪।১৬৩
"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"—মনুসংহিতা, ২।১১

নাস্তিক-শব্দের প্রদর্শিত অর্থের মধ্যে যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলা যায় যে, যাঁহারা পরলোক, কর্ম বা কর্মফল মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক, তবে জৈন ও বৌদ্ধদর্শনকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যায় না। কারণ অন্যান্য আস্তিক দর্শনের ন্যায় জৈন ও বৌদ্ধদর্শনেও পুনর্জন্ম, কর্ম ও কর্মফল স্বীকৃত হইয়াছে।[১] পক্ষান্তরে, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহাদিগকে যদি নাস্তিক বলা যায়, তবে কপিলের সাংখ্য-দর্শন নাস্তিক দর্শন হইয়া দাঁড়ায়; কেন-না, মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। জৈমিনির মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, সুতরাং বৈদিক কর্মমীমাংসাও নাস্তিক দর্শনই হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়্‌দর্শনকে আস্তিক দর্শন এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলেন, তাঁহারা বেদপ্রামাণ্যের ভিত্তিতেই আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের সীমারেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন। 'নাস্তিকো বেদ-নিন্দকঃ' (মনু. ২।১১) এই মতের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, যাঁহারা বেদ মানেন তাঁহারাই আস্তিক, আর যাঁহারা বেদ মানেন না, বেদের নিন্দা করেন, তাঁহারা নাস্তিক, তাঁহাদের দর্শনই নাস্তিক দর্শন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, তৃতীয় শব্দপ্রমাণ মানেন না এবং শব্দময় বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার করেন না, বেদ মিথ্যাহিংসাদিদোষকলুষিত বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থে বেদের নিন্দাই শুনিতে পাওয়া যায়।[২] এই জন্যই বৌদ্ধ দর্শনকে নাস্তিক দর্শন

১। হরিভদ্র সূরি এই দৃষ্টিতেই তাঁহার ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলিয়াছেন। হরিভদ্র সূরির "আস্তিকবাদানাম্" (৭৭ শ্লোক) কথাটীর ব্যাখ্যায় টীকাকার গুণরত্ন সূরি লিখিয়াছেন—

আস্তিকবাদানাং জীবপরলোকপুণ্যপাপাদ্যস্তিত্ববাদিনাং
বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক-সাংখ্য-জৈন-বৈশেষিক-জৈমিনীয়ানাম্।

—গুণরত্নসূরিকৃত টীকা, শ্লোক ৭৭

২। (ক) মিথ্যানুরাগসঞ্জাতবেদাধ্যানজড়ীকৃতৈঃ।
মিথ্যাত্বহেতুরজ্ঞাত ইতি চিত্রং ন কিঞ্চন॥
ন হি মাতৃবিবাহাদৌ দোষঃ কশ্চিদপীক্ষ্যতে।
পারসীকাদিভির্মূঢ়ৈস্তদাচারপরৈঃ সদা॥

—শান্তরক্ষিতকৃত তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ২৪৪৬-৪৭

নরাবিজ্ঞাতরূপার্থে তমোভূতে ততঃ স্থিতে।
বেদে'নুরাগো মন্দানাং স্বাচারে পারসীকবৎ॥
অবিজ্ঞাততদর্থাশ্চ পাপনিষ্যন্দযোগতঃ।
তথৈবামী প্রবর্তন্তে প্রাণিহিংসাদিকল্মষে॥

—তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ২৮০৭-৮

সম্ভাব্যতে চ বেদস্য বিস্পষ্টং পৌরুষেয়তা।
কামমিথ্যাক্রিয়াপ্রাণিহিংসা'সত্যাভিধা তথা॥

—তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ২৭৮৭

বলা হইয়া থাকে। জৈন দার্শনিকগণ শব্দপ্রমাণ মানেন এবং জৈন আগমের প্রামাণ্যও স্বীকার করেন, কিন্তু বেদকে প্রমাণ মানেন নাই, বেদের উক্তি মিথ্যা, বৈদিক আচার কদাচার এই বলিয়া বেদের নিন্দাই করিয়াছেন[১], সুতরাং তাঁহাদের দর্শনও নাস্তিক দর্শন।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, বৌদ্ধদর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ মানে, শব্দপ্রমাণ মানে না, সুতরাং তাহা যেমন নাস্তিক দর্শন হইল, সেইরূপ বৈশেষিক দর্শনও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণই মানিয়াছে, শব্দপ্রমাণ মানে নাই; এই অবস্থায় বৈশেষিক দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় নাস্তিক দর্শন হইল না কেন? এই আপত্তির উত্তরে আস্তিক দার্শনিকগণ বলেন যে, বৈশেষিক দর্শন শব্দকে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ না মানিলেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন—'তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' (বৈঃ সূঃ, ১।১।৩; ১০।২।৯), বৌদ্ধ দর্শনের মত বেদকে অপ্রমাণ বা মিথ্যা বলেন নাই; এই জন্যই বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক, আর বৈশেষিক দর্শন আস্তিক দর্শন।

বৈশেষিক দর্শনের বিরুদ্ধে নাস্তিক্যের আপত্তি ও তাহার পরিহার।

বৈশেষিক দর্শন শব্দপ্রমাণ মানে না, কিন্তু শব্দময় বেদকে প্রমাণ মানে, ইহার অর্থ কি? বৈশেষিক শব্দপ্রমাণ মানে না ইহার অর্থ, তাঁহার মতে শব্দ অপ্রমাণ নহে, তবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় উহা একটী স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণও নহে। শব্দপ্রমাণ বৈশেষিকের মতে অনুমান প্রমাণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, অনুমানেরই একটী শাখাবিশেষ। বৈশেষিকের মতে অনুমান প্রমাণদ্বারাই শব্দ-প্রমাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং শব্দকে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। শব্দপ্রমাণের এইরূপ তাৎপর্যই মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক-সূত্রে "অনুমান প্রমাণদ্বারাই শব্দপ্রমাণও ব্যাখ্যা করা গেল" ('এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্'—বৈঃ সূঃ ৯।২।৩) এই উক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন ভাষ্যকার প্রশস্তপাদও শব্দ, উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ('শব্দাদীনাম-প্যনুমানে'ন্তর্ভাবঃ,' প্রঃ ভাষ্য, পৃষ্ঠা ২১৩ বিজয়নগর-সংস্কৃত-সিরিজ)। শব্দপ্রমাণ তাহা হইলে বৈশেষিকের মতে দাঁড়াইল এক রকম অনুমান। এই শব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্যটী (syllogistic form) কিরূপ তাহা সূত্রকার কণাদ বা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ কেহই স্পষ্টতঃ বলেন নাই। বৈশেষিকের মতে শব্দ ও অর্থের

শব্দ প্রমাণ ও বৈশেষিক মত

(খ) বৌদ্ধশাস্ত্রে হি বিস্পষ্টা দৃশ্যতে বেদবাহ্যতা।
জাতিধর্মোদিতাচারপরিহারাবধারণাৎ॥

—ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৬৫

(গ) মহাজনশ্চ বেদানাং বেদার্থানুগামিনাং চ পুরাণধর্মশাস্ত্রাণাং বেদাবিরোধিনাঞ্চ কেষাঞ্চি-দাগমানাং প্রামাণ্যম্ অনুমন্যতে, ন বেদবিরুদ্ধানাং বৌদ্ধাদ্যাগমানাম্।—ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৬৫।

১। বিদ্যানন্দকৃত অষ্টসাহস্রী, পৃষ্ঠা ২২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নাই। নৈয়ায়িকগণের ন্যায় বৈশেষিক-গণও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি খণ্ডন করিয়াছেন।[১] অতএব কোন শব্দ শুনিয়া তাহা হইতে কোন অর্থের অনুমান করাও সম্ভব হয় না। এই জন্যই শব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্য বা হেতু, সাধ্য নির্দেশ করা দুরূহ। সূত্রকার কণাদ বা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শব্দ-অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন না করিলেও বল্লভাচার্য (খৃঃ ১১শ শতক) প্রভৃতি পরবর্তী বৈশেষিক আচার্যগণ অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বৈশেষিকের শব্দ-অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] প্রমাণরহস্যবিৎ মহর্ষি গোতম কিন্তু কণাদের এই শব্দ-অনুমান সমর্থন করেন নাই। তিনি তাঁহার ন্যায়-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কণাদ-মত খণ্ডন করিয়া শব্দকে স্বতন্ত্র একটী তৃতীয় প্রমাণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৩] এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় শব্দপ্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মতে শব্দপ্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা একটী পৃথক্ প্রমাণ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণই ইহাদের স্বীকার্য। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের ব্যোমবতীবৃত্তিতে ব্যোমশিবাচার্য[৪] এই মতের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[৫] হরি-ভদ্র সূরির ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন সূরি (খৃঃ ১৪শ শতক) তাঁহার টীকায় ব্যোমশিবাচার্যের এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৬] শঙ্করাচার্যকৃত বলিয়া কথিত সর্ব-বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহেও বৈশেষিক দর্শনকে স্পষ্টতঃ প্রমাণত্রয়বাদী বলা হইয়াছে।[৭]

১। নাপি অগ্নিধূমযোরিব শব্দার্থযোরস্তি অবিনাভাবনিয়মঃ।
শব্দস্তু ন মানান্তরম্।
—ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ২১৪, বিজয়নগর-সংস্কৃত-সিরিজ

২। পদানি স্মারিতার্থসংসর্গবিজ্ঞপ্তিপূর্বকাণি
যোগ্যতাসত্তিমত্ত্বে সতি সংস্পৃষ্টার্থপরত্বাৎ
গামভ্যাজেতি পদকদম্ববদিত্যনুমানেন সাধ্যসিদ্ধেঃ।
—ন্যায়লীলাবতী, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬, নির্ণয়সাগর সংস্করণ

৩। ন্যায়সূত্র, ২।১।৪৯, ২।১।৫০, ২।১।৫১, ২।১।৫২।

৪। *Vyomavatī* by Vyomaśivācārya is an ancient work, older perhaps (according to some scholars) than Udayana or Śrīdhara or at least equally old.—M.M. Gopinath Kaviraj. See his Preparatory Note on Vaiśeṣika Darśana. See also Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. II, p. 181.

৫। ব্যোমবতীবৃত্তি, পৃষ্ঠা ৫৭৭, কাশী সংস্করণ।

৬। ব্যোমশিবস্তু প্রত্যক্ষানুমানশব্দানি
ত্রীণি প্রমাণানি প্রোচিবান্।—গুণরত্নকৃত তর্করহস্যদীপিকা, পৃঃ ২৮১-৮২,
এসিঃ সোসাইটি সংস্করণ

৭। ত্রিধা প্রমাণং প্রত্যক্ষমনুমানাগমাবিতি॥৩৩
ত্রিভিরেতৈঃ প্রমাণৈস্তু জগৎকর্ত্তাবগম্যতে। ৩৪শ শ্লোক, সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ,
বৈশেষিক দর্শন

ব্যোমশিবাচার্যের ব্যোমবতীবৃত্তির আলোচনা দেখিলে বুঝা যায় যে, এই মত ব্যোমশিবাচার্যের নিজের উদ্ভাবিত নহে। ইহাও এক গুরুপরম্পরাক্রমে আগত সাম্প্রদায়িক মত। এখন প্রশ্ন এই যে, এই মতানুসারে শব্দকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া মানিয়া নিলে বৈশেষিক সূত্রকার কণাদের "অনুমান প্রমাণদ্বারাই শব্দপ্রমাণও ব্যাখ্যা করা হইল" ('এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্'—বৈঃ সূঃ ৯।২।৩) এই উক্তি কেমন করিয়া সমর্থন করা যায়? তারপর, প্রাচীন ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ "শব্দাদীনামপ্যনুমানেঽন্তর্ভাবঃ" বলিয়া স্পষ্টতঃ শব্দপ্রমাণকে যে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহাই বা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়? প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাকার ব্যোমশিবাচার্য তাঁহার বৃত্তিতে 'শব্দাদীনাম্' এই ভাষ্যোক্তির ব্যাখ্যায় 'শব্দ আদিতে যাহার' এই বলিয়া 'শব্দাদি' পদটীদ্বারা উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া উপমান প্রভৃতি প্রমাণকেই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণগণনায় উপমান প্রমাণের পূর্বে শব্দপ্রমাণ থাকায় 'শব্দ আদিতে যাহার' এই বলিয়া 'শব্দাদি' পদে উপমানকেও অবশ্য গ্রহণ করা যায়, কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে, ইহাই কি প্রশস্তপাদভাষ্যের মর্ম? প্রশস্তপাদভাষ্য কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য। সূত্রকার কণাদ অনুমান প্রমাণের দ্বারাই শব্দপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিলেন। সূত্রকারের উক্তির সহিত প্রশস্তপাদভাষ্যের উক্তির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে 'শব্দাদি' পদটীদ্বারা শব্দপ্রমাণকেই আদিতে ধরিতে হয়, শব্দকে বাদ দিয়া উপমানকে ধরা চলে না, এবং তাহা হইলে ব্যোমশিবাচার্যের ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, ভাষ্যের প্রকৃত মর্ম বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যোমশিবাচার্যের ব্যাখ্যা যে প্রশস্তপাদের সম্মত নহে তাহা মনে করিবার আরও একটী কারণ এই যে, শব্দকে তৃতীয় পৃথক্ প্রমাণ মানাই যদি প্রশস্তপাদের অভিপ্রেত হইত, তবে প্রমাণের গণনায় তিনি শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন না কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রশস্তপাদভাষ্যে বা 'ব্যোমবতী'-বৃত্তিতে পাওয়া যায় না। শব্দ স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হইলে সূত্রকার কণাদ যে অনুমানের দ্বারা শব্দপ্রমাণের ব্যাখ্যা করিলেন ('এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্', বৈঃ সূঃ ৯।২।৩) তাহার সঙ্গতি রক্ষা হয় কিরূপে? ব্যোমশিবাচার্য এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর তাঁহার বৃত্তিতে করেন নাই, সুতরাং ব্যোমশিবাচার্যের ব্যাখ্যা সূত্রকার কণাদ ও ভাষ্যকার প্রশস্তপাদের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে, তাঁহার বৃত্তি আলোচনা করিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রাচীন বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শব্দপ্রমাণকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] পরবর্তী কালে এই মত বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। আমরাও এই মতের পক্ষপাতী নহি। এই মত প্রদর্শন করার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা "বৈশেষিক দর্শন শব্দপ্রমাণ মানে না, সুতরাং বৈশেষিক দর্শনও নাস্তিক দর্শন বলিয়াই গণ্য", এইরূপ ভ্রান্ত মত প্রচার করেন তাঁহাদিগকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক

১। ব্যোমবতীবৃত্তি, ৫৭৭-৫৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে, বৈশেষিকগণ কেবল অনুমানের প্রকারভেদ বলিয়াই শব্দপ্রমাণ সমর্থন করিয়াছেন এমন নহে, কোনও সম্প্রদায় শব্দপ্রমাণকে অতিরিক্ত তৃতীয় প্রমাণ বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পরম আস্তিক বৈশেষিক যে পরমেশ্বরের বেদময়ী বাণীকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা আমরা কণাদের সূত্র হইতেই জানিতে পারি। মহর্ষি কণাদ 'তদ্বচনাদ্ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' (বৈঃ সূঃ ১।১।৩; ১০। ।৯) এই সূত্রে স্পষ্ট বাক্যেই আম্নায় বা বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারটীকায় পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় 'তৎ' শব্দদ্বারা পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে. পরমেশ্বররচিত বলিয়াই বেদ প্রমাণ ('তদ্বচনাৎ তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ', উপস্কার, পৃঃ ১৪০, চৌখাম্বা সং)। ন্যায়কন্দলীরচয়িতা শ্রীধরাচার্যের মতে তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণই বেদের কর্তা, পরমেশ্বর বেদের কর্তা নহেন, সুতরাং তাঁহার সূত্রে 'তৎ' শব্দদ্বারা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের কথাই বলা হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা মহর্ষিগণের উক্তি বলিয়াই বেদ প্রমাণ। শঙ্কর মিশ্র ও শ্রীধরাচার্যের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহার মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। কেননা, পরম পিতা পরমেশ্বরই মহর্ষিগণের হৃদয়কন্দরে বেদজ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই মহর্ষিগণ বৈদিক সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া বেদবাণী প্রচার করিয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্রে কোথাও পরমেশ্বরকে বেদের কর্তা বলা হইয়াছে, কোথাও মহর্ষিগণকে বেদের কর্তা বলা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে[১] বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে গিয়া মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে, লৌকিক বাক্যগুলি যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে রচনা করেন, সেইরূপ বৈদিক বাক্যসমূহও কোন তত্ত্বজ্ঞ মনীষী কর্তৃক অসামান্য প্রজ্ঞাবলেই রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ, লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকার বাক্যেরই রচনাভঙ্গি তুল্যরূপ; কিন্তু কে সেই মনীষী যাঁহার অপূর্ব মনীষার আলোকপাতে বৈদিক মার্গ ও ধর্মপথ আলোকিত হইতে পারে? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মতে পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা, পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও বেদ রচনা করার সাধ্য নাই। বেদজ্ঞান পরমেশ্বরেরই নিত্য বিভূতি। যে বস্তু ইহলোক ও পরলোকে আমাদের কল্যাণ সাধন করে তাহারই নাম ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিপাদক বলিয়াই বেদ প্রমাণ। কিন্তু, তাহার এই প্রামাণ্যের মূলে রহিয়াছে শাশ্বতধর্মগোপ্তা পরমেশ্বরের নিত্য প্রজ্ঞা। বেদ সেই ঐশী প্রজ্ঞারই বিকাশ। শ্রীভগবানের বেদার্থবিষয়ক প্রজ্ঞা নিত্য, এই জন্যই ন্যায়বৈশেষিকদিগের মতে শব্দ অনিত্য হইলেও বেদ নিত্য-সত্য পরমব্রহ্ম। এইরূপ বেদকে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারাই আস্তিক।[২]

বৈশেষিক-মতে বেদের স্থান

১। বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে।—বৈঃ সূঃ ৬।১।১

২। বৈশেষিক দর্শনে এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বেদের প্রামাণ্য সমর্থিত হইলেও কোন কোন পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহা কি সত্যের অপলাপ নহে? সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

পক্ষান্তরে, চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকগণ বলেন যে, বেদকে প্রমাণ বলিব কিরূপে? বেদের নির্দেশমত বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না; সুতরাং তাহা হইতে বেদের নির্দেশ যে মিথ্যা, ইহাই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বেদের উক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধও বহু দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বে যে কথা বলা হইয়াছে, পরে আবার তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হইয়াছে। কোন স্থলে বার বার এক কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপ বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারেন না।[১] বেদে বলা হইয়াছে যে, 'পুত্রেষ্টি' যাগ করিলে পুত্রলাভ হয়, 'কারীরী' যাগ করিলে সুবৃষ্টি হয়। অনেকে বেদের এই প্রকার নির্দেশের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া পুত্রেষ্টি ও কারীরী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে, পুত্রও হয় নাই, বৃষ্টিও হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বেদের উক্তিকে কি করিয়া সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? যে সকল যাগযজ্ঞের ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সেই যাগযজ্ঞ যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে যে সকল যজ্ঞের ফল প্রত্যক্ষ নহে, সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ যে মিথ্যা নহে, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যায়? দ্বিতীয় কথা, অগ্নিহোত্র হোম কোন্ সময়ে করিতে হইবে? ইহার উত্তরে বেদে অগ্নিহোত্র হোমের তিনটী সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—(১) সূর্য উদিত হইলে হোম করিবে; (২) সূর্যোদয়ের পূর্বে হোম করিবে; ও (৩) সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশে যখন নক্ষত্র দেখা যাইবে না তখন হোম করিবে। এইরূপ তিনটী বিভিন্ন কালে অগ্নিহোত্র হোমের বিধান করিয়া আবার পরমুহূর্তেই উক্ত তিন কালের হোমের নিন্দা করিয়া বেদে বলা হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি সূর্যোদয় হইলে হোম করে, শ্যাবনামক কুকুর তাহার আহুতি ভোজন করে; যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে হোম করে, শবল নামক কুকুর ইহার আহুতি ভোজন করে; যে ব্যক্তি সূর্য ও নক্ষত্রশূন্য কালে হোম করে, শ্যাব ও শবল এই কুকুরদ্বয়ই তাহার আহুতি ভোজন করে।"[২] এইরূপ বেদের মধ্যেই যেখানে স্পষ্টতঃ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, সেই বেদের উক্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? আর এক কথা, বেদে যখন ঐ প্রকার দুইটী বিরুদ্ধ কথা শুনা গেল, তখন ঐ দুইটী পরস্পরবিরোধী উক্তি তো আর সত্য হইতে পারিবে না; উহাদের একটী মিথ্যা হইবেই, যেটী মিথ্যা হইবে, বেদের সেই অংশ যে মিথ্যা, ইহা তো বেদের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইল। তারপর ঐ পরস্পরবিরোধী উক্তিদ্বয়ের কোন্‌টী মিথ্যা, আর কোন্‌টী সত্য, তাহাও নিশ্চয় করিয়া

বেদের বিরুদ্ধে নাস্তিকের আপত্তি

১। তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ।—ন্যায়সূত্র, ২।১।৫৭

২। শ্যাবো'স্যাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি; শবলো'স্যাহুতিমভ্যবহরতি যো'নুদিতে জুহোতি; শ্যাবশবলৌ বাস্যাহুতিমভ্যবহরতঃ যঃ সময়াধ্যুষিতে জুহোতি।—ন্যাঃ বাৎস্যাঃ ভাঃ ২।১।৫৭

আচার্য জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে 'শ্যাবশবলৌ' পরিবর্তে শ্যামশবলৌ এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৭৩ দেখ।

বলিবার কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় উহাদের কোন একটীকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বেদে এক কথার পুনরুক্তিও বহু শুনিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার সময় এগারটী ঋক্ মন্ত্র পাঠের বিধান আছে, ঐ সকল ঋক্ মন্ত্রের সাহায্যে অগ্নিকে সমিদ্ধ বা প্রদীপ্ত করা হইয়া থাকে বলিয়া ঐ মন্ত্রগুলিকে 'সামিধেনী' ঋক্ বলা হইয়া থাকে।[১] ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐ এগারটী সামিধেনী ঋক্ মন্ত্রের প্রথম ও শেষ মন্ত্রটীর তিন তিন বার পাঠ করিবার বিধান আছে।[২] এখানে আপত্তি এই যে, একটী মন্ত্র একবার পাঠ করিলেই তো মন্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, একই মন্ত্রকে তিন তিন বার পাঠের বিধান করার সার্থকতা কি? ইহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না কি?

নাস্তিকগণের আপত্তির পরিহার

নাস্তিকগণের (১) বেদ মিথ্যা, (২) বেদের উক্তি পরস্পরবিরোধী এবং (৩) বেদ পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট—এই ত্রিবিধ আপত্তির উত্তরে মহর্ষি গোতম ও বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, ঐ সকল আপত্তির একটীও বিচারসহ নহে। প্রথম হইতেই ধরা যাউক—পুত্রেষ্টি যাগ করা গেল, পুত্র হইল না, সুতরাং বেদের উক্তি মিথ্যা, এইরূপ সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য নাই; কারণ, পুত্রেষ্টি যাগ ও পুত্রজন্ম ইহার মধ্যে অনেক বিষয় বিচার করিবার আছে। প্রথমতঃ, যাগটি পূর্ণাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না দেখা দরকার, যজমান ও যজ্ঞকর্তা পুরোহিত সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, বেদবিশ্বাসী ও যজ্ঞকুশল কি না, ইহাও বিচার করা আবশ্যক। যজ্ঞকুশল আচার্যকর্তৃক পূর্ণাবয়ব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে। এই তো গেল যজ্ঞের দিকের কথা। তারপর, যজ্ঞই তো পুত্রজন্মের একমাত্র কারণ নহে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরই আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি পতিত হয়, সেইরূপ পুত্র পতিত হইতে পারে না। পুত্রের জন্ম পিতা-মাতার সহবাস-সাপেক্ষ। যথাকালে স্ত্রীসহবাস পুত্রজন্মের প্রত্যক্ষ কারণ। যজ্ঞ আমাদিগকে পুত্রলাভের শুভাদৃষ্টের অধিকারী করিয়া থাকে মাত্র। পিতা বা মাতার পুত্রজন্মের প্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি থাকিলে কেবলমাত্র যজ্ঞই পুত্র দিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের পর পুত্রলাভ হইল না, অতএব বেদ মিথ্যা, এইরূপ সাব্যস্ত করা চলে না। বেদ বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। বেদ যদি মিথ্যা হইত, তবে কোন স্থলেই বৈদিক যজ্ঞ করিয়া ফল পাওয়া যাইত না। যজ্ঞই যেখানে ফল দান করে, অন্য কোন কারণকে অপেক্ষা করে না, সেইরূপ স্থলে বিশুদ্ধ পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহা জয়ন্ত ভট্ট (880 A. D.) তৎকৃত ন্যায়মঞ্জরীতে

১। সমিন্ধে সামিধেনীভির্হোতা তস্মাৎ সামিধেন্যো নাম।—শতপথব্রাহ্মণ, ১।৩।৫

কাত্যায়নের মতে যে সকল ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া হোতা যজ্ঞীয় সমিধ্ আধান বা গ্রহণ করেন, ঐ সকল ঋক্ মন্ত্রের নাম 'সামিধেনী' ঋক্। 'সমিধামাধানে ষেণ্যণ্'—কাত্যায়নকৃত বার্তিকসূত্র, সিঃ কৌঃ পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য, 'যয়া ঋচা সমিদাধীয়তে সা সামিধেনীত্যর্থঃ'—তত্ত্ববোধিনী, পৃঃ ২৬৫, নির্ণয়সাগর সং।

২। 'স বৈ ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ, ত্রিরুত্তমাম্—শতপথব্রাহ্মণ, ১।৩।৫

নিজ প্রপিতামহের নাম করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "আমার প্রপিতামহই গ্রাম-লাভের আশায় 'সাংগ্রহণী'নামক যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞ-সমাপ্তির পরই 'গৌরমূলক' নামে গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।"[১] বেদ পরমেশ্বরের বাণী, তাহা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? বাৎস্যায়নের উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ন্যায়বার্তিকরচয়িতা উদ্দ্যোতকর (খৃঃ ষষ্ঠ শতক) বলিয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও পুত্র হয় নাই, ইহা সত্য কথা। এখানে বিচার করা আবশ্যক যে, পুত্র না হওয়ার কারণটা কি? বেদের উক্তি যদি মিথ্যা হয়, তবেও পুত্র না হইতে পারে, আবার বেদ সত্য হইলেও বৈদিক অনুষ্ঠানটী যদি ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ হয়, তবেও পুত্র না হইতে পারে। এরূপ স্থলে আমাদের নাস্তিক প্রতিপক্ষ বলিবেন যে, বেদ মিথ্যা বলিয়াই পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াও পুত্রলাভ হয় নাই, আস্তিকগণ বলিবেন যে, যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুণই পত্র হয় নাই। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট বলিবার যুক্তিও আছে এবং উভয়েই স্বীয় যুক্তি প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই অবস্থায় যে পর্যন্ত এক পক্ষের যুক্তি অসার বলিয়া প্রমাণিত না হয়, সে পর্যন্ত কোন পক্ষের যুক্তিকেই অভ্রান্ত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফলে, পুত্র না হওয়ার প্রকৃত হেতুটী যে কি, সে বিষয়ে সংশয় অনিবার্য। হেতুতে সংশয় উপস্থিত হইলে ঐ সন্দিগ্ধ হেতু-দ্বারা কোন সত্যই নির্ণীত হইতে পারে না। সন্দিগ্ধ হেতু হেতুই নহে, উহা হেত্বাভাস বা দুষ্টহেতু। ঐরূপ সন্দিগ্ধ হেতুদ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য সাধন করা চলে না।[২]

নাস্তিকগণের বেদ মিথ্যা—এই প্রথম আপত্তির পরিহার দেখা গেল। এখন নাস্তিকগণ বেদবাক্যে যে বিরোধের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা আলোচনা করা যাউক। সূর্যের উদয়ে, অনুদয়ে এবং সূর্যনক্ষত্রশূন্যকালে অগ্নিহোত্র হোমের বিধান আছে। উক্ত কালত্রয়ের যে-কোন কালেই যজমান অগ্নিহোত্র হোম করিতে পারেন। তবে বিশেষ এই যে, অগ্নি আধান বা অগ্নি গ্রহণের কালে যিনি যে সময়ে হোম করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিবেন তাঁহাকে সেই সময়েই হোম করিতে হইবে। সূর্যোদয়ে হোম করিবেন বলিয়া অগ্নি আধান করিলে তাঁহাকে সূর্যোদয়েই হোম করিতে হইবে, সূর্যের অনুদয়ে কিংবা সূর্যনক্ষত্রশূন্য কালে হোম করা চলিবে না। হোমের সঙ্কল্পিত সময় পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কালে কেহ হোম করেন, তবেই তাঁহার যজ্ঞীয় আহুতি শ্যাব ও শবল নামক কুকুরের ভোজ্য হইবে। শ্যাব, শবলনামক কুকুরদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্পিত কাল ত্যাগ করিয়া কালান্তরে কৃত হোমেরই নিন্দা করা হইয়াছে। বেদবিধিতে কোন বিরোধ সূচনা করা হয় নাই। তিনই হোমের কাল। যজমান যে সময় ইচ্ছা করিবেন, সেই সময়েই হোম করিতে পারিবেন। এইরূপ বিধান বেদে বিধিবিকল্প বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিধিবিকল্প বেদরহস্যজ্ঞ

১। অস্মৎপ্রপিতামহ এব গ্রামকামঃ সাংগ্রহণীং কৃতবান্। স ইষ্টিসমাপ্তিসমনন্তরমেব গৌরমূলকং গ্রামমবাপ।—ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৭৪।

২। উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্তিক, সূত্র ২।১।৫৯ দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ মনুও সমর্থন করিয়াছেন।[১] বিধিবিকল্পস্থলে বিরোধের আশঙ্কা করা বেদে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

বেদে যে সামিধেনী-মন্ত্রের পুনরুক্তি-দোষের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে বক্তব্য এই যে, নিষ্প্রয়োজনে যদি এক কথা বার বার বলা হয়, তবেই তাহা দোষাবহ। পনরুক্তির সঙ্গত কারণ থাকিলে তাহা দোষাবহ নহে। ঐতরেয় (১।২।৫) ও শতপথব্রাহ্মণে (১।৩।৫) এগারটী সামিধেনী ঋক্ মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঐ শতপথব্রাহ্মণেই দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগে আবার পনরটী সামিধেনী মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, সামিধেনী ঋক্ মন্ত্র হইল মোট এগারটী। এই অবস্থায় দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগে পনরটী সামিধেনী ঋক্ মন্ত্র পাঠের যে বিধান করা হইল, ইহার অর্থ কি? ইহার উত্তরে শতপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে, এগারটী সামিধেনী ঋকের প্রথম ঋক্‌টী তিনবার ও শেষ ঋক্‌টী তিনবার পাঠ করিবে, ফলে এগারটী মন্ত্রই পনরটী মন্ত্রের কাজ করিবে,[২] বেদের বিধানও সার্থক হইবে। বেদে এইরূপ মন্ত্রের আবৃত্তির বিধান আছে। ইহা পুনরুক্তি নহে, অনুবাদ। হোতা যজ্ঞে বিশেষ ফললাভের জন্য এইরূপ অনুবাদ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রানুবাদ মীমাংসকশিরোমণি মহর্ষি জৈমিনি ও প্রাচীন মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী সমর্থন করিয়াছেন। এই অনুবাদ বা পুনরুক্তি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি নহে বলিয়া দোষাবহ নহে। নিষ্প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তিই দোষাবহ।[৩]

আস্তিক দার্শনিকগণ এইরূপে নাস্তিকগণের সমস্ত আপত্তি পরিহার করিয়া বেদ যে অভ্রান্ত প্রমাণ, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় বিভিন্ন দার্শনিক মতের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈশেষিকগণ পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদকে প্রমাণ মানিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। নৈয়ায়িকগণের মতে বেদ 'আপ্ত' মহাপুরুষের বাক্য এবং আপ্তবাক্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ। 'আপ্ত' কাহাকে বলে? যিনি লৌকিক, অলৌকিক সমস্ত বস্তু অভ্রান্ত প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বদর্শী হইয়াছেন, ধর্মের গূঢ় রহস্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের সুফল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে, ঈশ্বরাবতার সেই মহাপুরুষই 'আপ্ত'। তিনি সত্যদ্রষ্টা, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার বাক্যই প্রমাণ।

বেদের প্রামাণ্য ও বিভিন্ন আস্তিক-মত; বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক-মত

আপ্তবাক্য দুই প্রকার—দৃষ্টার্থ ও অ-দৃষ্টার্থ। যে বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বস্তু আমরা এই জগতেই স্থূল চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্য। আর যে বাক্যের অর্থ আমাদের চর্মচক্ষুর বিষয় হয় না, তাহা অ-দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্য। স্বর্গ, নরক, পরলোক, দেবতা প্রভৃতি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না,—যদিও

১। মনুসংহিতা, শ্লোক ২।১৪-১৫।

২। শতপথব্রাহ্মণ, ১।৩।৫

৩। অভ্যাসেন তু সংখ্যাপূরণং সামিধেনীষ্বভ্যাসপ্রকৃতিত্বাৎ।
—জৈমিনিকৃত মীমাংসাসূত্র, ১০।৫।২৭ এবং শবরস্বামিকৃত সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

উহা যোগচক্ষু বা প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে আপ্ত মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবু তাহা আমাদের দৃষ্টিতে অ-দৃষ্টার্থ। যে বস্তু আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে পরীক্ষিতব্য তাহা যেমন সত্য, সেইরূপ মহর্ষিগণের যোগদৃষ্টিতে পরীক্ষিতব্য আমাদের অ-দৃষ্টবস্তুও সত্য। আমাদের দৃষ্টবস্তু যেমন প্রমাণ, আমাদের অ-দৃষ্টবস্তুও সেইরূপই প্রমাণ। মহর্ষি গোতম তৎকৃত ন্যায়দর্শনে বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় বলিয়াছেন যে, আয়ুর্বেদের ফল সকলেরই প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই জন্যই আয়ুর্বেদের উক্তি যে সত্য, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। ওঝারা সাপের বিষের শান্তি করিবার জন্য যে সকল মন্ত্রের প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহারও ফল সর্বজনপ্রত্যক্ষ। এই জন্য ঐ সকল মন্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ নাই। আয়ুর্বেদ অথর্ববেদেরই উপাঙ্গ। বিষ-নিবৃত্তির মন্ত্রগুলিও বেদেরই অংশবিশেষ। বেদের ঐ সকল অংশ দৃষ্টফল বলিয়া যদি ঐ অংশে বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের দৃষ্টান্তে একথাও অবশ্য বলা যায় যে, বেদের ঐ সকল অংশ যেমন সত্য, সেইরূপ অদৃষ্টার্থ স্বর্গাদিসাধক বেদভাগও সত্য। দৃষ্টফল মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যেমন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের উক্তি, অ-দৃষ্টার্থ বেদভাগও সেইরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরই উক্তি। দৃষ্টফল বেদও যিনি রচনা করিয়াছেন, অ-দৃষ্টার্থ বেদও তিনিই রচনা করিয়াছেন। সত্যদর্শী মহাপুরুষের রচিত বেদের কোন অংশ সত্য, কোন অংশ মিথ্যা, এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত, বরং মহাপুরুষের বাণী বলিয়া সমগ্র বেদকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।[১] মহর্ষি গোতম এই জন্যই বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় আপ্ত মহাপুরুষের উক্তিকেই ('আপ্তপ্রামাণ্যাৎ') হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আপ্তবাক্য মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ সত্য। বেদ আপ্তবাক্য, সুতরাং বেদও সত্য। বেদরচয়িতা এই 'আপ্ত' পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ নহেন। সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বেদ রচনা করিবার শক্তি নাই। মহর্ষি গোতমের এই মত বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি সমস্ত ন্যায়াচার্যগণই সমর্থন করিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন হয় এই যে, নিরাকার পরমেশ্বর কেমন করিয়া বেদ রচনা করিলেন? তারপর মহর্ষি গোতম যদি 'আপ্ত'-শব্দে পরমেশ্বরকেই বুঝিয়া থাকেন, তবে পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই তো বেদকে প্রমাণ বলিতে পারেন, তাহা না বলিয়া আপ্তবাক্যের প্রামাণ্যনিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে গেলেন কেন? একই পরমেশ্বরকে বেদের কর্তা না বলিয়া বহু আপ্তকে বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিবার অভিপ্রায় কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সমস্ত আপ্ত মহাপুরুষই পরমেশ্বরের বিভিন্ন অবতার। জগতের কল্যাণের জন্য লোকশিক্ষা ও ধর্মরক্ষার জন্য ভগবান্ বিভিন্ন আপ্তশরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রই পরমেশ্বরের উক্তি। সমস্ত শাস্ত্রকারই পরমেশ্বরের মূর্ত বিগ্রহ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে বুদ্ধ, অর্হন্ বা জিন প্রভৃতি শাস্ত্রকারও

১। মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।—ন্যায়সূত্র, ২।১।৬৯
বাৎস্যায়নভাষ্য, ন্যায়বার্তিক, তাৎপর্যটীকা ও ন্যায়সূত্র-বিশ্বনাথ-বৃত্তি, সূঃ ২।১।৬৯ দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বরেরই অবতার। তাঁহাদের বাণীও পরমেশ্বরেরই বাণী। মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তদীয় ন্যায়মঞ্জরীতে এইরূপ পরম উদার আস্তিক মতের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আপ্ত কপিল, বুদ্ধ, অর্হন্ প্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্রও আগমতুল্য, ঐ সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্যও যুক্তিসিদ্ধ। ঈশ্বরই সমস্ত আগমের রচয়িতা। তিনি প্রাণিগণের বিভিন্ন প্রকার কর্ম ও কর্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণিগণের প্রতি করুণাবশতঃ উহাদের কর্ম, চিন্তা ও যোগ্যতার অনুরূপ বিবিধ প্রকার মুক্তিপথের সন্ধান দিবার জন্য স্বীয় ঐশী বিভূতিবলে নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধ, অর্হন্, কপিল প্রভৃতি নামে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।[১] সুধী পাঠক! বিচার করিয়া দেখিবেন, জয়ন্ত ভট্টের উক্তি কি উদার। এই উদার দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুদ্ধ ও অর্হন্ প্রভৃতি ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নাস্তিক ও আস্তিকের যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহারও সম্পূর্ণ অবসান হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিকের মত বিচার করিয়া দেখা গেল যে, তাঁহাদের মতে ঈশ্বর-রচিত বেদ নিত্য ঐশী প্রজ্ঞারই বিকাশ এবং পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদ প্রমাণ।

বেদান্ত-মত

আচার্য শঙ্করের মতেও পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা। সর্বজ্ঞানাকর বেদ রচনাদ্বারাই ভগবানের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভগবান্‌ই ব্রহ্মযোনি। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নিঃশ্বাস। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন অনায়াসে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির উষায় পরমেশ্বরের হৃদয়কন্দর হইতে সহজ ও সাবলীল গতিতে বেদপ্রবাহ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সুবিশাল সহস্রশাখ বেদকাননের সৃষ্টি করিতে তাঁহাকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় নাই। বেদরচনায় শ্রীভগবানের যে কোন প্রয়াস নাই তাহা "এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ববেদ মহাপুরুষেরই নিঃশ্বাস" এই বলিয়া শ্রুতিই স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন।[২] পুরুষোত্তমই বেদের রচয়িতা, ইহাই যদি শ্রুতির সিদ্ধান্ত হয়, তবে বেদকে 'অপৌরুষেয়' (পুরুষকৃত নহে) বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বেদান্তী বলেন যে, সাধারণ পুরুষের রচিত গ্রন্থে রচয়িতার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে ভাব ও ভাষার যাহা খুসী অদল বদল করিতে পারেন, লেখকের দোষ-গুণ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে,

---

১। তস্মাৎ সর্বেষামাগমানামাপ্তৈঃ কপিলসুগতার্হৎপ্রভৃতিভিঃ প্রণীতানাং প্রামাণ্যমিতি যুক্তম্। ----সর্বাগমানামীশ্বর এব ভগবান্ প্রণেতেতি স হি ----স্ববিভূতিমহিম্না চ নানাশরীরপরিগ্রহাৎ স এব সংজ্ঞাভেদানুপগচ্ছতি অর্হন্নিতি, কপিল ইতি, সুগত ইতি, স এবোচ্যতে ভগবান্।—জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৬৯।

২। ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য, ১।১।৩ দ্রষ্টব্য।

দেবর্ষয়ো মহাপরিশ্রমেণাপি যত্রাশক্তাঃ, তদয়মীষৎপ্রযত্নেন লীলয়ৈব করোতীতি নিরতিশয়মস্য সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চোক্তং ভবতি। ভামতী, ১।১।৩

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো'থর্বাঙ্গিরসঃ—বৃহদাঃ, ২।৪।১০

গ্রন্থ পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় হয়; এই জন্যই ঐরূপ গ্রন্থকে পৌরুষেয় বা পুরুষকৃত বলা হইয়া থাকে। বেদ কিন্তু সাধারণ গ্রন্থজাতীয় নহে। বেদরচনায় ভগবান্ ভগবান্ হইলেও তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই, বেদমন্ত্রের একটী অক্ষরকে এদিক্ ওদিক্ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। কল্পকল্পান্তরে ভগবান্ একই রূপ বেদ রচনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে উপদেশ করিয়া থাকেন। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ভগবানের বেদরচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা অস্বীকার করার অর্থ এই যে, পুরুষোত্তমের মানস উৎস হইতে একইরূপ বেদপ্রবাহ একই ছন্দে জগতের নানা সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং অনন্তকাল চলিবে। বৈদিক-সম্প্রদায়ের অনুচ্ছেদই আমাদের কাম্য, নতুবা যিনি সর্বজ্ঞানাকর বেদ রচনা করিতে পারেন, তিনি বেদের একটী বর্ণও অদল-বদল করিতে পারেন না, ইহার অর্থ কি? বেদ চিন্ময় ভগবানের শব্দময় বিগ্রহ। এই শব্দশরীর সর্বদা অপরিবর্তনশীল, সৃষ্টি-প্রলয়ের নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও বেদের এই শব্দময় অপরিবর্তনীয় রূপের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। বেদ-ভগবানের নিত্য অপরিবর্তনীয়তা বুঝাইবার জন্যই বেদরচনায় পরমেশ্বরকে 'অস্বতন্ত্র' বা স্বাধীন নহেন বলা হইয়াছে।[১] পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বেদের রচয়িতা হইয়াও স্বীয় রচনার পরিবর্তন পরিবর্ধনে স্বেচ্ছাধীন নহেন বলিয়াই পরমপুরুষ-রচিত বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলা হইয়া থাকে। পুরুষের স্বাধীন কর্তৃত্বের অভাবই 'অপৌরুষেয়' শব্দদ্বারা সূচিত হয়।

মীমাংসক-মত

এই অর্থেই মীমাংসকগণও বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন।[২] মীমাংসকদিগের মতে অক্ষর নিত্য, সুতরাং অক্ষরময় বেদও নিত্য, বেদের কোন কর্তা নাই। বেদ চির-সত্য সনাতন। বৈদিক ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা, বক্তা ও অধ্যেতা মাত্র। কঠ-কলাপ প্রভৃতি ঋষিগণের নাম অনুসারে যে সকল বিভিন্ন বৈদিক শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, কঠ-কলাপ প্রভৃতি ঋষিগণ সেই সকল শাখার কর্তা বা রচয়িতা নহেন। উঁহারা বেদের ঐ সকল অংশের দ্রষ্টা ও অধ্যেতামাত্র। উঁহারা বেদের ঐ সকল অংশ বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ফলে, উঁহাদের নাম অনুসারে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় এবং বেদের ঐ সকল অংশ তাঁহাদের নামানুসারেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রব্যাখ্যাতা ঋষিগণও বেদকে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় যেরূপ পাইয়াছেন ও পড়িয়াছেন, সেইরূপেই শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। একটী মন্ত্রের একটী অক্ষরেরও অদল-বদল করার সাধ্য তাঁহাদের নাই। এই স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই বলিয়াই বেদকে মীমাংসকগণ বলিয়াছেন 'অপৌরুষেয়'। ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্তের মতে বেদ অকর্তৃক নহে, পরমেশ্বরই বেদের কর্তা। শব্দ

১। বৈয়াসিকন্তু মতমনুবর্তমানাঃ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিসিদ্ধ-সৃষ্টিপ্রলয়ানুসারেণানাদ্যবিদ্যোপধান-লব্ধসর্বশক্তিজ্ঞানস্যাপি পরমাত্মনো নিত্যস্য বেদানাং যোনেরপি ন তেষু স্বাতন্ত্র্যম্; পূর্বপূর্বসর্গানুসারেণ তাদৃশতাদৃশানুপূর্বীবিরচনাৎ।—ভামতী, ১।১।৩

২। পুরুষাস্বাতন্ত্র্যমাত্রং চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি।—ভামতী, ১।১।৩

অনিত্য, সুতরাং শব্দময় বেদ নিত্য হইতে পারে না, উহাও অনিত্য। ঈশ্বরের বেদজ্ঞান নিত্য, সেই হিসাবেই বেদকে নিত্য বলা হইয়া থাকে। নতুবা বাগিন্দ্রিয়জ্ঞ শব্দময় বেদ নিত্য হইবে কিরূপে? মীমাংসকগণ সৃষ্টি ও প্রলয় মানেন না, কাজেই তাঁহাদের মতে বৈদিক-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইবার কোন কথা উঠে না। গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বেদ অধ্যয়নকে তাঁহারা অনাদি এবং অনবচ্ছিন্ন বলিয়া থাকেন। বেদ-প্রবাহ অনাদি ও নিরবচ্ছিন্ন বলিয়াই নিত্য। বেদের এইরূপ প্রবাহনিত্যতা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্তী প্রভৃতি কোন দার্শনিকই স্বীকার করেন না; কেন-না, তাঁহারা সকলেই সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিয়া থাকেন, সৃষ্টি এবং প্রলয় স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, মহাপ্রলয়ে বেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ পুনরায় বেদের উপদেশ দেন। এই অবস্থায় বেদের অনাদি প্রবাহনিত্যতা ব্যাখ্যা করা যায় না। বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বাক্যমাত্রই পৌরুষেয় বা পুরুষ-বিরচিত। বেদবাক্যও বাক্য, সুতরাং তাহাও পৌরুষেয়ই হইবে, 'অপৌরুষেয়' হইবে কিরূপে? এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাক্যমাত্রই কোন না কোন পুরুষরচিত হইলেও প্রত্যেক কল্পেই যখন একই প্রকার বেদ রচিত হইয়া আসিতেছে, একটী বর্ণও অদল-বদল হয় নাই, তখন একথা বলিলে অশোভন হয় না যে, রচনার স্বাধীন গতিবেগ যেখানে প্রতিহত এবং যে রচনায় রচয়িতার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সেইরূপ রচনা পুরুষকর্তৃক রচিত হইলেও বস্তুতঃ 'অপৌরুষেয়'। বেদান্তী ও মীমাংসকের এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকের মতেও বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে কোন বাধা নাই। সাংখ্যদর্শনেও বেদকে ঐরূপ অর্থেই 'অপৌরুষেয়' বলা হইয়াছে। যেখানে লেখকের স্বাধীন রচনার অবাধ গতি আছে তাহাই 'পৌরুষেয়'; পুরুষকর্তৃক উচ্চারিত হইলেই তাহা পৌরুষেয় হয় না, পুরুষকর্তৃক স্বীয় মনীষাবলে রচিত হইলেই তাহা পৌরুষেয় হয়। স্বয়ম্ভূ হিরণ্যগর্ভ বেদের কর্তা নহেন, বক্তা বা দ্রষ্টা মাত্র। কল্পের প্রারম্ভে আদি পুরুষ স্বয়ম্ভূ বেদ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব পূর্ব কল্পেও যেই বেদ যে ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, পরকল্পেও সেই বেদবাণীই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাতে আদি-পুরুষ স্বয়ম্ভূ বা হিরণ্যগর্ভের কোন বুদ্ধির খেলা নাই। হিরণ্যগর্ভ যেন বেদপ্রকাশের একটী যন্ত্রমাত্র। শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন আমাদের কোন প্রয়াস ব্যতীতই স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল গতিতে বেদ-প্রবাহ অনায়াসে স্বয়ম্ভূর মুখবিবর হইতে উচ্চারিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং স্বয়ম্ভূকর্তৃক উচ্চারিত বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিতে কোন বাধা নাই।[১] বেদ

১। ন পুরুষোচ্চরিততামাত্রেণ পৌরুষেয়ত্বং, কিন্তু বুদ্ধিপূর্বকত্বেন। বেদাস্তু নিঃশ্বাসবদেবাদৃষ্ট-বশাদবুদ্ধিপূর্বকাঃ স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি। অতো ন পৌরুষেয়াঃ।

—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৫।৫০

সাংখ্যদর্শনের মতে অনিত্য। সাংখ্যেরা বলেন যে, বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং বেদ নিত্য হইবে কিরূপে? স্বয়ম্ভূ-মুখনিঃসৃত বেদপ্রবাহ অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন। শব্দময় বেদশরীরের কোন কালে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নাই এবং হইবে না। এই অর্থেই বেদকে নিত্য বলা হইয়া থাকে।[১] বেদ হইতে বিজ্ঞানময় পুরুষের স্বরূপ জানা যায়। ঐ চিন্ময় পুরুষ নিত্য। অতএব শব্দময় বেদ অনিত্য হইলেও বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ-বিজ্ঞান নিত্য, এই হিসাবেও বেদকে নিত্য বলিতে কোন বাধা নাই। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, সুতরাং সাংখ্যমতে ঈশ্বর বেদের কর্তা হইতে পারেন না। আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভই বেদের দ্রষ্টা, বক্তা বা প্রকাশক। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। পাতঞ্জলের মতে ঈশ্বরই বেদযোনি। ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হইলেও বেদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়, সুতরাং বেদ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ অনাদি। ঈশ্বর কালপরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি কালাতীত, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অনন্ত। তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুরু, তিনিই ব্রহ্মাদি দেবগণের হৃদয়মন্দিরে বেদজ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। পাতঞ্জলের মতে অন্তর্যামী ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য এবং বেদ সেই নিত্য-জ্ঞানেরই বিকাশ, সুতরাং বেদও নিত্য এবং 'অপৌরুষেয়'।

সাংখ্য-মত

পাতঞ্জল-মত

বেদ প্রমাণ হইতে পারে কি না, এই প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া আমরা প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের মতেরই আলোচনা করিলাম। বৈদিক জ্ঞান যে নিত্য-সত্য, এ বিষয়ে কোন আস্তিক দর্শনেরই বিবাদ নাই। পরব্রহ্ম বেদই আস্তিকগণের আস্তিক্যের মূল। দর্শনের আলোকসম্পাতে বৈদিক জ্ঞানের বন্ধুর পথ সুগম হইয়া থাকে। বেদ ও দর্শনশাস্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। বেদ প্রাণ, দর্শন শরীর। প্রাণ ব্যতীত শরীর যেমন অসার, সেইরূপ বৈদিক ভিত্তি ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র নিরর্থক কোলাহল মাত্র। পক্ষান্তরে, শরীর, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গাদি ব্যতীত প্রাণ যেমন নিষ্ক্রিয়, সেইরূপ দার্শনিক তর্কের স্নেহধারা ব্যতীত বেদজ্ঞানপ্রদীপও নিষ্প্রভ। দর্শনের চক্ষুতে নিত্য চিন্ময় বেদপুরুষকে দেখিতে পারিলেই মানবজীবন মধুময় হয়।

> 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥'—মুণ্ডক, ২।২।৮

১। বেদনিত্যতাবাক্যানি চ সজাতীয়ানুপূর্বীপ্রবাহানুচ্ছেদরূপাণি।
—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৫।৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ

আত্মদর্শন বা আনন্দময় প্রেমময়ের সাক্ষাৎকারই ভারতীয় দর্শনজিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য, ইহা আমরা পূর্ব প্রবন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। উপনিষৎ পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান ও ভূমানন্দের সন্ধান দেয় বলিয়া উপনিষৎ বেদ-জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। পরমাত্মাই পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই জন্যই উপনিষদের[১] অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ত—"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা"—বৃহদাঃ, ১।১।১। বেদের চরমভাগ বা শিরোভাগই বেদান্ত (বেদ+অন্ত)। বেদ কাহাকে বলে? মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বাক্যসমষ্টিই বেদ—"মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ বেদঃ"—শাবরভাষ্য, ২।১।৩৩। ইহা অবশ্য বেদের কর্মকাণ্ড, এতদ্ব্যতীত আরণ্যক ও উপনিষদ্ভাগ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। মন্ত্র বলিতে এখানে যাহাতে মন্ত্রসকল সঙ্কলিত হইয়াছে, সেই ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি সংহিতাকে বুঝায়, আর ব্রাহ্মণ-শব্দে ঐ সকল সংহিতার ব্যাখ্যা বা সংহিতোক্ত যাগযজ্ঞের বিবরণীকে বুঝায়। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ,

'বেদান্ত' কাহাকে বলে?

১। 'উপনিষৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে, উপ-, নি-সদ্ ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া উপনিষৎ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সদ্ ধাতুর নানাবিধ অর্থ গণপাঠে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গতি, অবসান প্রভৃতি অর্থ প্রসিদ্ধ। 'উপ' এই উপসর্গটি সমীপবর্তিতা সূচনা করে, 'নি' উপসর্গটি নিশ্চয়ার্থক; সুতরাং শুশ্রূষু হইয়া গুরুর সমীপবর্তী হইলে যে শাস্ত্র বা উপদেশদ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান সমূলে বিদূরিত হয় তাহাই উপনিষৎ। কাহারও কাহারও মতে 'নি' উপসর্গটি শিষ্যের বিনীত ভাবেরই সূচনা করে। এই মতানুসারে গুরুসমীপে উপসন্ন বা উপবিষ্ট বিনীত শিষ্যকে গুরু যে রহস্যবিদ্যার উপদেশ করিতেন, ঐ গুহ্য উপদেশ, কিংবা ঐ উপদেশ প্রদান ও গ্রহণ করিবার জন্য গুরু ও শিষ্যের নির্জনে গুপ্ত অবস্থানকে উপনিষৎ বলা হইয়া থাকে।

শিষ্যের প্রতি গুরুর রহস্য-উপদেশই উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ হইলেও যে সকল শাস্ত্রে ঐ সমস্ত রহস্য-উপদেশ নিপিবদ্ধ হইয়াছে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ঐ সকল গ্রন্থও উপনিষৎ নামে পরিচিত। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অবলম্বন করেন তাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি সাংসারিক অনর্থসমূহের শাতন বা বিনাশ হয়; সংসার-কারণ অবিদ্যার সমূলে উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং পরব্রহ্মপদ লাভ হয়। এই জন্যই ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম উপনিষৎ।

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ, উপনিপূর্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ।—শংভাষ্য, বৃহদাঃ, ১।১।১

য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপযন্তি, আত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ তেষাং গর্ভজন্মজরারোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি, পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ অত্যন্তম্ অবসাদয়তি বিনাশয়তি ইত্যুপনিষৎ।—মুণ্ডক-শংভাষ্য, পৃঃ ৪, আনন্দাশ্রম সং

এই উভয়েরই প্রয়োজন। এই জন্য বেদের কর্মকাণ্ড বলিলে এই উভয় প্রকার বৈদিক সাহিত্যকেই বুঝাইয়া থাকে। বেদের কর্মকাণ্ডের উপর জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসাদর্শন ও জ্ঞানকাণ্ডের উপর ব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন প্রসিদ্ধ। বেদান্ত কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ যোগী তৎকৃত বেদান্তসারে বলিয়াছেন যে, "বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্"—বেদান্তসার, পৃঃ ৩, নির্ণয়সাগর সং। "উপনিষৎপ্রমাণম্" এই কথাটীর দুই প্রকার অর্থ বুঝা যায়। প্রথম অর্থে উপনিষদের যাহা প্রমাণ ('উপনিষদঃ এব প্রমাণম্') তাহাই বেদান্ত, বেদান্তের অপর নাম উত্তরমীমাংসা, তর্কের আলোকসম্পাতে যে শাস্ত্রের সাহায্যে উপনিষদের অর্থবোধ সুগম হইয়া থাকে তাহাই উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত; পক্ষান্তরে, যে মীমাংসার মূলে উপনিষৎ প্রমাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ('উপনিষদো যত্র প্রমাণমিতি বা') তাহারই নাম বেদান্ত। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, উপনিষৎই বেদান্ত-শব্দের মুখ্য অর্থ, উপনিষদের অর্থবোধের সহায় হয় বলিয়া ব্রহ্মসূত্র বা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি বেদান্ত-শব্দের গৌণ অর্থ।[১] ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী তাঁহার ন্যায়রত্নাবলী-টীকায় বেদান্তশাস্ত্রের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার মতে বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্র, আচার্য শঙ্কর-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্র-কৃত ভাষ্যটীকা ভামতী, অমলানন্দের ভামতীটীকা বেদান্তকল্পতরু এবং অপ্যয়দীক্ষিতের বেদান্তকল্পতরুটীকা, বেদান্তকল্পতরুপরিমল এই পাঁচখানি গ্রন্থই বেদান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।[২] বেদান্ত বলিলে সাধারণতঃ ব্রহ্মসূত্রকেই বুঝায় এবং ব্রহ্মসূত্রমূলক উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থই যে অদ্বৈতবেদান্তের মূল গ্রন্থ ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রভৃতি অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থসম্ভারের দৃঢ় ভিত্তিতে অদ্বৈত-বেদান্তের যে অভ্রভেদী সৌধ রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বেদান্তের পরিগণনায় গ্রহণ না করিলে অদ্বৈতমত যে পঙ্গু হইয়া পড়িবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তারপর, বেদান্তের চিন্তারাজ্যে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন বেদান্ত মতবাদ উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার ভিত্তিতে ভারতের বক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে, ঐ সকল মতবাদকে বেদান্তচিন্তার বিভিন্ন ধারা বলিয়া গ্রহণ না করিলে এই বেদান্তমত যে একদেশী হইবে, ইহা তো কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, তিনি অদ্বৈতবাদী আচার্য, সুতরাং তাঁহার মতে অদ্বৈতবাদই

১। উপনিষদ এব প্রমাণমুপনিষৎপ্রমাণম্। উপনিষদো যত্র প্রমাণমিতি বা। তদুপকারীণি বেদান্তবাক্যসংগ্রাহকাণি শারীরকসূত্রাদীনি। আদিশব্দেন ভগবদ্‌গীতাদ্যধ্যাত্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে, তেষামপ্যুপনিষচ্ছব্দবাচ্যত্বাৎ।—বেদান্তসারনৃসিংহসরস্বতীকৃত টীকা, পৃঃ ৩, নির্ণয়সাগর সং

২। বেদান্তশাস্ত্রেতি শারীরকমীমাংসারূপচতুরধ্যায়ী-তদ্‌ভাষ্য-তদীয়টীকা-বাচস্পত্য-তদীয়টীকা-কল্পতরু-তদীয়টীকা-পরিমলরূপগ্রন্থপঞ্চকেত্যর্থঃ।—ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতীকৃত সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা, ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৩

বেদান্ত এবং ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যবিবৃতি প্রভৃতিই অদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি বলিয়া তিনি বেদান্ত অর্থে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদান্তশাস্ত্র প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত। প্রস্থান-শব্দের অর্থ আকর গ্রন্থ।[১] উপনিষৎ বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র তর্কপ্রস্থান এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে, শ্রুতি আত্মদর্শনের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ সাধনের উপদেশ করিয়াছেন। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শুনার নামই শ্রবণ। উপনিষৎ বাক্য হইতে বেদান্তার্থ শ্রুত হইয়া থাকে, এই জন্য উপনিষৎকে বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। উপনিষদের শ্রুত অর্থ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্য-টীকা প্রভৃতিতে নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করা হইয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তের তর্কপ্রস্থান বলে। এই তর্ক আত্মজিজ্ঞাসায় মননস্থানীয়। তর্কের সাহায্যে বিচারিত অর্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সনৎসুজাতীয় প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনার ফলে পুনঃ পুনঃ চিত্তে উদিত হইয়া স্থির ও দৃঢ় হইয়া থাকে, এই জন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্মৃতিপ্রস্থান আত্মজ্ঞানের পথে নিদিধ্যাসনস্বরূপ। বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের পরিচয় দেওয়া গেল।

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়

বেদান্তের অনুবন্ধ-অধিকারী নিরূপণ

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদান্ত-বিদ্যালাভের অধিকারী কে? অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দুর্গম পথে বিচরণ করিতে হইলে পথিককে নানাবিধ পাথেয় সংগ্রহ করিতে হয়। এই পাথেয় কি? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, (২) ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ, (৩) শমদমাদিসাধনসম্পৎ, (৪) মুমুক্ষুত্বঞ্চ। এই চতুর্বিধ সাধন যিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন, তিনিই বেদান্ত-শ্রবণের যথার্থ অধিকারী।[২] আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বেদান্ত-বিজ্ঞান-মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করিতে হইলে জিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মচর্যের

১। 'প্রস্থান' শব্দটি প্র—স্থা ধাতু, প্রতিষ্ঠতি অত্র এই অর্থে অনট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'প্র' উপসর্গটি প্রকৃষ্টার্থের সূচনা করে, সুতরাং যেখানে প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ বিশেষভাবে বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু নিহিত আছে এবং আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদান্তের সেই সকল আকর-গ্রন্থকেই 'প্রস্থান' বলা হইয়া থাকে।

২। দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতাবলম্বী বৈদান্তিক আচার্যগণ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পূর্বাঙ্গ-রূপে মীমাংসোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠান না করিলে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তজিজ্ঞাসার অধিকার লাভ হয় না। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুক বা না করুক, কিছু আসে যায় না; জিজ্ঞাসুর যদি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, চিত্ত নিষ্কলুষ হয়, কামনার পাশ ছিন্ন হয়, তবেই সে বেদান্তজিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করে। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যেত ইত্যুচ্যতে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্মজিজ্ঞাসায়াঃ ঊর্ধ্বঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং, জ্ঞাতুঞ্চ, ন তদ্‌বিপর্যয়ে।—ব্রহ্মসূত্র, শংভাষ্য, ১।১।১

অনুষ্ঠানপূর্বক অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়, তাহার ফলে জিজ্ঞাসু জানিতে পারেন যে, পরমাত্মা পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু; তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য ও অসার। সংসারের অসারতা উপলব্ধি হইলে সংসার-সুখভোগের দুরাশা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না এবং কি এই জগতে কি পরজগতে ফলভোগের দরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, কামনার ক্রীতদাস হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম ও কর্মফলভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতেই হইবে এবং এই কর্মচক্রের আবর্তনে অনন্তকাল ঘুরিয়া মরিতে হইবে; সুতরাং কামনার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক চিত্তের আবিলতা দূর করিতে হইবে,—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্বক চিত্তের শুচিতা, সমতা সাধন করিতে হইবে। এইরূপ পবিত্রচেতাঃ নিষ্কাম সাধকের বিশুদ্ধ চিত্তভূমিতে উপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানবীজ প্রস্ফুটোন্মুখ হইলেই তিনি বেদান্তজিজ্ঞাসার ও মুক্তিমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। উষর চিত্তে উপ্ত বীজ কখনও ফলপ্রসূ হয় না। যদি কোনও ভাগ্যবান্ জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবশে উজ্জ্বল মনীষা, তীব্র বৈরাগ্য ও মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়াই জন্মগ্রহণ করেন, তবে এই জন্মে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মানুষ্ঠান না করিলেও তাঁহার নিরাবিল চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হইবার কোনও বাধা নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই মহর্ষি বামদেবের হৃদয়কন্দরে ব্রহ্মজ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের ফলে জীব ও ব্রহ্ম যে বস্তুতঃ অভিন্ন এই সত্য প্রত্যক্ষ হয়। জীবব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় বা প্রতিপাদ্য, আর বেদান্তশাস্ত্র জীবব্রহ্মের ঐক্যের প্রতিপাদক। প্রতিপাদ্য ঐক্য ও প্রতিপাদক শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। শাশ্বতমুক্তিই বেদান্তজিজ্ঞাসার একমাত্র প্রয়োজন।

বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন

অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি ও আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি জীবের মুক্তি। এই মুক্তি জীবব্রহ্মের একত্বসাক্ষাৎকারের ফলে লাভ হইয়া থাকে। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকার হইলেই জীব "অহং ব্রহ্মাস্মি"—'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপে বুঝিয়া মুক্ত হইয়া থাকে, বেদান্ত অনুশীলনের চরম প্রয়োজন সাধিত হয়। এই বেদান্ত-মতবাদ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া 'অদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদান্ত-মতবাদের সহিত ইহার বিরোধও প্রসিদ্ধ।

দার্শনিক চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দার্শনিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদেরও সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, ভারতের প্রধান দার্শনিক মতগুলি বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এই দুই মতবাদই পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছে। দ্বৈতবাদ জীব ও ব্রহ্ম এই দুই-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে; জীবাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন, জীবাত্মাসকলও পরস্পর

অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বিভিন্ন এবং এইরূপ ভেদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অদ্বৈতবাদ এক ভিন্ন দুই-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন, ভেদ মিথ্যা, অভেদই সত্য, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এইরূপ একত্ব-বাদই বেদ ও উপনিষদের লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ আলোক এবং অন্ধকারের মত পরস্পরবিরোধী। ইহাদের একটিকে স্বীকার করিলেই অপরটি অস্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, ভারতীয় দর্শনে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিরোধ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

বিচারপূর্বক শ্রুতির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বৈতবাদই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিলে দ্বৈতবাদী দার্শনিকের মতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই অদ্বৈতশ্রুতি অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় নাকি? দ্বৈতবাদী আচার্যগণ অদ্বৈতশ্রুতির সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য অদ্বৈতবাদের স্ব স্ব দর্শনচিন্তার অনুকূল বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু তদীয় সাংখ্যদর্শনে শ্রুত্যুক্ত একত্ববাদের সমাধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মাসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকল আত্মাই একজাতীয়। একজাতীয় বলিয়াই আত্মাকে এক বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা এক নহে বহুই বটে, কিন্তু সমস্ত আত্মাতেই একই আত্মত্বজাতি বিরাজমান। সেই জন্য ঐ জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে আত্মাকে এক বলা হইয়াছে। যেমন মনুষ্যসকল বিভিন্ন হইলেও একই মনুষ্যত্ব সকল মনুষ্যের মধ্যেই অবস্থিত বলিয়া মনুষ্য বহু হইলেও মনুষ্যজাতি এক, সেইরূপই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। এরূপ অদ্বৈতবাদকে দার্শনিক পরিভাষায় **জাত্যদ্বৈতবাদ** বলা যাইতে পারে।

কোন কোন সাংখ্যাচার্য এইরূপ জাত্যদ্বৈতবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সাদৃশ্যবাদকে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতশ্রুতির উপপত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আত্মা এক, এই অর্থে অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য নহে, আত্মা একরূপ এই অর্থেই অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য। সাংখ্যমতে সকল আত্মাই চৈতন্য-স্বরূপ, অসঙ্গ, নিত্য, কূটস্থ ও অবিকারী, সুতরাং আত্মা বহু হইলেও সকল আত্মারই স্বভাব একরূপ, সকল আত্মাই সমান ও সদৃশ; এই দৃষ্টিতেই সাংখ্যমতে আত্মাকে এক বলা হইয়া থাকে। এই মত সাংখ্যদর্শনে **সদৃশাদ্বৈতবাদ** বলিয়া পরিচিত। এইরূপ, **অবিভাগাদ্বৈতবাদ, সাময়িকাদ্বৈতবাদ** প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও আমরা ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দ্বৈতবাদী দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত মতবাদের তাৎপর্য এই যে, সকল আত্মাই চেতন, বিভু ও সর্বগত। তাঁহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অবিভক্তরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া, তাঁহাদের বিভাগ লক্ষ্য করা যায় না, তাহাদের ভেদের প্রতীতিও হয় না বরং অভেদেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ অভেদই অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য। সাময়িকাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, সংসার অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন হইলেও মোক্ষদশায় সমস্ত জীবই ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকে না।

যতক্ষণ সংসার ততক্ষণই এই ভেদ। সমস্ত জীবনপ্রবাহই মুক্তিসাগরে ছুটিয়া চলিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে বিলীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত যেমন নদীসকল বিভিন্ন বিভিন্ন থাকে, সমুদ্রে বিলীন হইলে যেমন তাহাদের কোন ভেদ থাকে না, সেইরূপ সংসারের এই রঙ্গমঞ্চে নটরূপী জীবসকল পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মুক্তিতে ব্রহ্মসমুদ্রে যখন জীব-জীবনপ্রবাহ মিশিয়া যায়, তখন জীব ও ব্রহ্মের কোনরূপ দ্বিতা বা দ্বৈতভাব থাকে না। সংসারদশায় দ্বৈতভাব এবং মোক্ষ-দশায় অদ্বৈতভাব প্রতীতি হইয়া থাকে, এই জন্যই এই মতবাদ **সাময়িকাদ্বৈতবাদ** বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বৈতবাদী আচার্যগণের অদ্বৈতবাদের এই প্রকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহারা কেহই শ্রুত্যুক্ত অদ্বৈতবাদকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রত্যেক দ্বৈতবাদী দার্শনিকই অদ্বৈতশ্রুতির উপপত্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈতশ্রুতির কোনরূপ সঙ্গত মীমাংসা না করিলে, তাঁহার দর্শনের অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে, এইরূপ ধারণা দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে প্রথম হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তিতে সুগঠিত অদ্বৈতমতের বিরোধী বলিয়া তাঁহাদের প্রচারিত দ্বৈতবাদ উপেক্ষিত হইবে, এইরূপ আশঙ্কাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়।

অদ্বৈতবাদের প্রধান উপাসক নির্বিশেষব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক আচার্যগণ। ইঁহাদের মতে দ্বৈতবাদ মায়িক ও মিথ্যা অদ্বৈতব্রহ্মই একমাত্র সত্য। বেদান্ত-চিন্তারাজ্যে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদান্তিক মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী। ন্যায়-দর্শনের ষোড়শ পদার্থ ও বৈশেষিক দর্শনের সপ্ত পদার্থের ন্যায় আচার্য মধ্ব জাগতিক সমস্ত পদার্থকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, বিশেষত্ব, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব এই দশটি পদার্থের মধ্যে তিনি জাগতিক সমস্ত পদার্থের অন্তর্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল পদার্থ অস্বতন্ত্র বা হরির পরতন্ত্র। কেবল মাত্র হরিই একমাত্র স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, আর সমস্ত বস্তুই শ্রীহরির অধীন। এই জন্যই মধ্বাচার্যের এই মত **স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্র** বাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জীব ভগবানের দাস, সে ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। জীব সেবক, ব্রহ্ম বা শ্রীহরি তাহার সেব্য। সেবক যদি প্রভুর সমান হইতে চায়, তবে প্রভু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া থাকেন। অতএব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধ জীবের অধঃপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। 'অগ্নির্মাণবকঃ' এই কথা বলিলে অগ্নির সঙ্গে মাণবকের (ব্রহ্মচারীর) অভেদ সম্ভব নহে বলিয়া যেমন মাণবকটি জ্বলন্ত বহ্নি-সদৃশ এইরূপ সাদৃশ্যই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ অপূর্ণ জীব ও পূর্ণ ব্রহ্মের অভেদ অসম্ভব বলিয়া জীব ব্রহ্মের সদৃশ—এইরূপ সাদৃশ্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে বুঝাইয়া থাকে। জীবের ঐ ব্রহ্মসাদৃশ্য, স্বীয় গুণোৎকর্ষের ফলে, সারূপ্য, সালোক্য প্রভৃতি মুক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। জীব অপূর্ণ, সে চিরকাল অপূর্ণই থাকিবে,

কখনও পূর্ণ হইবে না। ব্রহ্মই পূর্ণ ও অনন্ত-কল্যাণ-গুণময়। জীব ও জগৎ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পৃথক্ত্ব ভগবানের নিত্য সিদ্ধ। তিনি জীব ও জগৎ হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু জীব ও জগৎ তাঁহার নিয়ম্য, তিনি তাহাদের নিয়ন্তা, তিনি সগুণ, সবিশেষ। জীবের সহিত তাঁহার সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। জীবের মুক্তি তাঁহারই প্রসাদলভ্য। ভগবানের জগৎ-নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মধ্বাচার্য ও রামানুজাচার্যের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে।

আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতেও ব্রহ্ম "নিখিল-কল্যাণ-গুণাকর", নিকৃষ্ট কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই, তিনি দোষ-গন্ধ-শূন্য। দৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জড় প্রপঞ্চই তাঁহার শরীর। তিনি বিরাট্ শরীরী। তিনি সর্বাত্মা, সর্বেশ্বর, সর্বান্তর্যামী ও সর্বকর্ম-ফলদাতা। কার্য ও কারণ উভয়ই তিনি। স্থূলরূপে তিনি কার্য, সূক্ষ্মরূপে তিনি কারণ। জীব ও জগৎ তাঁহারই শরীর, তাঁহারই অংশ। সুতরাং জীব ও জগতের সহিত তাঁহার অংশাংশি-ভাব ও শরীর-শরীরি-ভাবই সম্বন্ধ। জীব অণু, নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ, চেতন ও প্রতি শরীরে বিভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মে স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় কোন ভেদ নাই, কিন্তু অণু-জীব ও বিরাট্-ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ আছে। জীব ব্রহ্মের শরীর হইলেও জড়প্রকৃতির তুলনায় সে শরীরী, কর্তা এবং ভোক্তা। জগৎ ব্রহ্মশক্তিরই বিকাশ বা পরিণাম, সুতরাং সত্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন না হইলেও প্রভাকরের প্রভা যেমন প্রভাকর হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মসূর্যের প্রভা-স্থানীয় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু, প্রভাকর যেমন প্রভা হইতে অধিক, ব্রহ্মও সেইরূপ জীব হইতে অধিক। জীব অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি। ব্রহ্মের অংশ ও শরীর হিসাবে জীব ও জগতের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইঁহারা ব্রহ্মশরীর বিধায় সেই বিরাট্ শরীরী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অংশাংশি-ভাবে ব্রহ্মে নিত্য জড়িত হইয়া জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে। চিদচিৎ বা জীব-জড়বিশিষ্ট ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিয়াই এই মত 'বিশিষ্টাদ্বৈত' মত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই মতে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদ্-বাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সূচনা করে না। 'তস্য ত্বম্' তুমি তাঁর শ্রীভগবানের, এইরূপ ভগবদানুগত্য ও চিরদাস্যভাবই উক্ত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়া থাকে। "ত্বামহং শরণং প্রপদ্যে" এইরূপ ভগবৎ-শরণাপত্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। মুক্তাবস্থায় জীব বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করে এবং সর্বদা ভগবানের সেবা করিয়া দিব্য আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপ মুক্তির পক্ষে আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর প্রতিবন্ধক। এই প্রাকৃত দেহ বিচ্যুত না হইলে মুক্তি বা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ কোনমতেই সম্ভব হয় না, সুতরাং আচার্য রামানুজের মতে জীবন্মুক্তি অসম্ভব।

অদ্বৈতবেদান্তীর নির্বিশেষ-আত্মবাদও জগন্মিথ্যাত্ববাদের বিরুদ্ধে আচার্য রামানুজ তাঁহার দর্শনে তীব্র আপত্তি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার 'সপ্তধা অনুপপত্তি' (সাতটি দোষ) বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থলে রামানুজ তাঁহার অদ্ভুত বিচারশক্তির এবং অপূর্ব মনীষার পরিচয় প্রদান

করিয়াছেন। আমরা বেদান্তের মায়ার স্বরূপ বিচারপ্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব। ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অনেকান্তবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন মতবাদ বেদান্তের চিন্তারাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই নামান্তর মাত্র; সুতরাং তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আচার্য ভাস্কর ও নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী আচার্য ছিলেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম একও বটেন, অনেকও বটেন। একত্ব ও নানাত্ব, ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সত্য। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, বহুশাখ বনস্পতি যেমন বৃক্ষরূপে এক এবং শাখারূপে নানা; অর্থাৎ একই বৃক্ষ যেমন নানা শাখাকে অঙ্গীভূত করিয়া এক হইয়া থাকে; মূল বৃক্ষদৃষ্টিতে তাহা এক, আবার বৃক্ষের শাখা নানা, সুতরাং শাখার দৃষ্টিতে উহা নানা। একই বৃক্ষে একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়প্রকার বোধই যথার্থ। শাখা বৃক্ষেরই অবয়ব এবং বৃক্ষ অবয়বী। অবয়বী এক এবং তাহার অবয়ব নানা। এই দুইটী বোধের কোনটীই মিথ্যা নহে। যেমন সমুদ্র সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু তাহার ফেন, তরঙ্গ, জলবুদ্‌বুদ ও জলাবর্ত্তরূপে নানা। মৃত্তিকা মৃত্তিকারূপে এক, ঘটকলসাদিরূপে তাহা নানা। একই কালে একই বস্তুতে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই অবস্থিত থাকে এবং উভয় প্রকার বোধ সত্যই হয়। কেবল, দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র। মৌলিক বা ঔপাদানিক দৃষ্টিতে সমস্ত কার্যই অভিন্ন। কারণ, সমস্ত কার্যের মধ্যেই একই উপাদান-কারণ অনুস্যূত থাকিয়া বিভিন্ন কার্যবর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ঐ কার্যগুলি আমাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া কার্যবর্গের সত্যতা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই জন্য সমস্ত কার্যই কারণ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। জগৎ ব্রহ্মকার্য, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম এবং সত্য। মাকড়শা যেমন নিজের শরীর হইতেই জাল বিস্তার করে এবং নিজ শরীরেই উহা লয় করে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হয় এবং পরিণামে ব্রহ্মতেই উহা লীন হইয়া থাকে। আচার্য ভাস্করের মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম কিন্তু প্রপঞ্চস্বরূপ নহেন। "ব্রহ্মাত্মকো হি নামরূপ-প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম"—ভাস্করভাষ্য, ২।১।১৪। জগৎকারণ ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অরূপ, নির্বিকার নির্বিশেষ অথচ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্।[১] নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ হন কিরূপে? কারণ, শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে, ক্রিয়া থাকিলে বিকারও অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই আচার্য ভাস্করের এই মত স্পষ্ট বুঝা যায় না।

জীব ব্রহ্মেরই অংশ। জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। ব্রহ্মের ভোক্তৃশক্তিই জীব। 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যান করিলে জীব দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় এবং

১। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। (৩।২।১৩ ব্রঃ সূঃ) এই ভাস্কর সূত্রটীর ব্যাখ্যা এবং ইহার সহিত জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২ ব্রঃ সূঃ) এই সূত্রের ভাস্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থেই অস্থূলমনণু ইত্যাদি সূত্র দেখা যায়; শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক আচার্যগণ কেহই এইরূপ কোন সূত্র করেন নাই।

পরিপূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়। আচার্য রামানুজের মতে মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য পরিস্ফুট। জীব দাস, ব্রহ্ম প্রভু; ভাস্করের মতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, জীব ও ব্রহ্মের কোন পার্থক্য থাকে না। এই অংশে ভাস্করের মতের সহিত শৈব-বেদান্তী আচার্য শ্রীকণ্ঠের মতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন্মুক্তি অস্বীকার করায় এবং জ্ঞানীর উৎক্রান্তি বর্ণিত হওয়ায়, ভাস্করীয় মুক্তির সহিত আচার্য শঙ্করের মুক্তির পার্থক্যও সুস্পষ্ট হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের মতে এইরূপ মুক্তি, আপেক্ষিক মুক্তি, চিরনির্বাণ নহে। ভাস্কর জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী। আচার্য শঙ্করের ন্যায় অখণ্ডজ্ঞানবাদী নহেন। ভাস্করের মতে মুক্তি উপসনালভ্য। জ্ঞান-শব্দে তাঁহার মতে উপাসনাই অভিপ্রেত। মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা আচার্য ভাস্কর তাঁহার ভাষ্যে যেভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে ভেদ ঔপাধিক ও অভেদই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। জীব ও ব্রহ্মের ঘটাকাশ, মহাকাশের মত অভেদ স্বীকার করায়, তিনি শঙ্কর-মতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহারই কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।[১]

আচার্য নিম্বার্কের মত অনেক অংশে ভাস্করাচার্যের অনুরূপ হইলেও মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আচার্য নিম্বার্ক স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মুক্ত জীবের জীবত্ব থাকিবেই। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব বিভু-ব্রহ্ম নহে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যে জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদিত হইলেও, অল্পজ্ঞ জীব ও সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের যে ভেদ আছে, এবং চিরদিন থাকিবে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। এই জন্যই তাঁহার মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে উপনিষদ প্রভৃতি তত্ত্বশাস্ত্রে জীবের যে ব্রহ্মভাবের উপদেশ করা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হয়, পক্ষান্তরে, জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ স্বীকার করিলে আমাদের ব্যাবহারিক জীবন অচল হইয়া পড়ে, কারণ, কি লৌকিক, কি বৈদিক সমস্ত ব্যবহারই ভেদসাপেক্ষ। এই জন্যই ব্রহ্ম কথঞ্চিৎ ভিন্ন ও কথঞ্চিদভিন্ন। জীব পরমাত্মার অংশ ও কার্য, কার্য ও কারণ অভিন্ন। এই জন্যই জীব পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। জীবভাব মুক্তিতেও বিলুপ্ত হয় না। জীব ও ঈশ্বর অজ ও নিত্য। এই জন্যই তাহা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

এখানে আচার্য নিম্বার্কের মত পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতিভাত হয়। কারণ, নিম্বার্ক জীবকে ব্রহ্মকার্য বলিয়া জীবের সহিত পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জীবের নিত্যত্বও তিনি স্পষ্টভাষায় তাঁহার ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। জীব ব্রহ্মকার্য হইলে কেমন করিয়া নিত্য হইতে পারে?

জগতের উৎপত্তি ও লয়সম্বন্ধে আচার্য নিম্বার্কের মত ভাস্করাচার্যেরই অনুরূপ। ভাস্করের মতে ব্রহ্ম জগদ্‌রূপে পরিণত হইলেও ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপ নহেন। ব্রহ্ম কারণরূপে

১। সিদ্ধান্তী মন্যতে অবিভাগেনেতি। কথম্? দৃষ্টত্বাৎ। তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মি, পয়োদকে শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃশো ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি, গৌতমেন বিভাগ-প্রতিপাদকস্য শব্দস্য দৃষ্টত্বাৎ। যথা চ ভগ্নে ঘটে ঘটাকাশো মহাকাশ এব ভবতি দৃষ্টত্বাৎ এবমত্রাপীতি। জীবপরয়োস্তু স্বাভাবিকো'ভেদ ঔপাধিকস্তু ভেদঃ, স তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ততে।—ভাস্করভাষ্য, ৪।৪।৪

নিরাকার, কার্যরূপে তিনি জীব ও প্রপঞ্চ। জীব তাঁহার ভোক্তৃশক্তি, আর জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহার ভোগ্যশক্তি; এই শক্তি যথার্থ, সুতরাং জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ যথার্থ। আচার্য নিম্বার্কের মতেও ব্রহ্মই জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়া থাকেন এবং প্রলয়ে জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মেতেই বিলীন হইয়া থাকে। চেতন ব্রহ্ম কেমন করিয়া অচেতন জগদ্‌রূপে পরিণত হন? জড় জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্মে লীন হইলেও ব্রহ্ম কেমন করিয়া অবিকৃত থাকেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান্ বলা হইয়া থাকে। চেতন হইয়াও তিনি জড়ের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; সমস্ত বিকারের মধ্যেও তিনি অবিকারী। ইহাতেই তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার বিকাশ। ব্রহ্মশক্তির এই বিভাব অচিন্ত্য বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্তী যুগে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্বার্কের দর্শনে ব্রহ্মের সগুণভাবই সর্বত্র পরিস্ফুট। সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের গুণের ইয়ত্তা করা যায় না বলিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। নির্গুণ অর্থ গুণশূন্য নহে। রামানুজাচার্যের মতে নির্গুণ-শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট-গুণরহিত। নিম্বার্কের মতে নির্গুণ-শব্দের অর্থ অনন্ত-গুণময়। জীবের এবং সেই অনন্তগুণ ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ গুণসাম্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ অনেকাংশে নিম্বার্কের ভেদাভেদ-বাদেরই অনুরূপ। তবে, এই মতে দ্বৈতবেদান্তী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ভগবদবতার শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় সম্প্রদায়ের কোন বেদান্তভাষ্য রচনা করেন নাই। তাঁহার মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই বেদান্তভাষ্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতবাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুমোদিত বলিয়া তিনি মাধ্বভাষ্যকেই তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বলিয়া একপ্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কেবল যে সকল স্থলে মাধ্ব-মত শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিরোধী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সকল স্থলের সঙ্গত মীমাংসার পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণও ব্রহ্মসূত্রের কোন ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের এক হইতে এগার সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে। বাকি সমস্ত গ্রন্থই ঐ একাদশ সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ। বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে তত্ত্ব পাঁচটী —ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজ ঈশ্বর, চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ) এই তিনটী পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। রামানুজের মতে কাল ও কর্ম জড় পদার্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। বলদেব প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া আরও দুইটী পদার্থকে সংযোগ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্বের স্বরূপ বিচারপ্রসঙ্গে বলদেব বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চারিটী পদার্থই নিত্য। জীব নিত্য হইয়াও প্রকৃতি ও কালবশ্য; কাল, প্রকৃতি সমস্তই ঈশ্বরাশ্রিত ও ঈশ্বরবশ্য। ঈশ্বরের দুইটী শক্তি—ভোক্তৃশক্তি ও ভোগ্যশক্তি, ভোক্তৃশক্তি জীব

ও ভোগ্যশক্তি প্রকৃতি। কর্ম বা অদৃষ্ট অনিত্য ও বিনাশী। জীব ঈশ্বরের গুণ, ঈশ্বর গুণী ; জীব দেহ, ঈশ্বর দেহী ; জীব শক্তি, ঈশ্বর শক্তিমান্। ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়াই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরের প্রসাদেই মুক্তির আনন্দভোগ করিয়া থাকে। মুক্তি সাধ্য ও ভগবৎ-প্রসাদলভ্য। মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকিলেও গুণ-গুণি-ভাবে, দেহ ও দেহি-ভাবে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নও বটে। ভগবান্ প্রভু, জীব সেবক ; এই সেব্য-সেবক-ভাব ব্যতীত শান্ত, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য প্রভৃতি ভাব-চতুষ্টয়েরও স্থান বলদেব তাঁহার দর্শনে নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত ভাব-চতুষ্টয়ের সাহায্যে ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাধুর্য-ভাবই পরম রমণীয় ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এই ভাবে বিশুদ্ধ জীব কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া পতিরূপে তাঁহাকে সেবা করিয়া নিরাবিল আনন্দরসে বিভোর হইয়া থাকে।

প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। উক্ত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। ঈশ্বরের বীক্ষণের ফলে প্রকৃতি-শরীরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, ফলে বিচিত্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলদেবের প্রকৃতি ও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অনেক সাম্য আছে। তবে, সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, বলদেবের প্রকৃতি নিত্য হইয়াও ঈশ্বর-পরতন্ত্র। বলদেব সাংখ্য-দর্শনের মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বও স্বীকার করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার দর্শন যে সাংখ্য-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রভৃতি ব্যবহার আমরা কালের সাহায্যে করিয়া থাকি সুতরাং উক্তরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ কাল। কাল সর্বদা পরিবর্তনশীল হইলেও নিত্য। কর্ম শব্দের অর্থ অদৃষ্ট। কাল, কর্ম সমস্ত ঈশ্বর-পরতন্ত্র। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি। নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য তাঁহার গুণশূন্যতা প্রতি-পাদন করে না। ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃত-গুণ নাই। তিনি অতিপ্রাকৃত-গুণশালী বা অনন্ত-কল্যাণগুণময়। বলদেবের এই সিদ্ধান্ত অনেকটা রামানুজের অনুরূপ। ঈশ্বরই প্রকৃতি-শরীরে প্রবেশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনিই কারণরূপে চেতন এবং কার্যরূপে তিনিই জড়। জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তিনি নির্বিকার। চেতন ঈশ্বর কিরূপে জড়রূপে পরিণত হইলেন ? জড় ও চৈতন্য এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ কেমন করিয়া নিত্য-চৈতন্য-বিগ্রহ ভগবানে সম্ভব হইল ? এই সমস্যার উত্তরে বলদেব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির দোহাই দিয়াছেন "অবিচিন্ত্য-শক্তিকত্বাৎ"। এই অবিচিন্ত্য-শক্তির স্বরূপ কি, তাহা তিনি নির্ণয় করেন নাই ; যেহেতু ইহা অচিন্ত্য সেই হেতু ইহা নির্ণয় করা যায় না। জীব ও ব্রহ্ম দেহ-দেহি-ভাবে, গুণ-গুণি-ভাবে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। এই ভেদাভেদবাদ নিম্বার্ক-মতেরই অনুরূপ। নিম্বার্কের অচিন্ত্য-শক্তিই অবিচিন্ত্য-শক্তি-রূপে বলদেবের দর্শনে প্রসার লাভ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বল্লভাচার্যের শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদও ভগবানের এই অচিন্ত্য-শক্তির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আচার্য বল্লভ তাঁহার অণুভাষ্যে এই মতবাদ বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার মত অনেক অংশে মাধ্ব-মতেরই অনুরূপ। তিনি অবিকৃত-পরিণামবাদ স্বীকার করায় শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তির শরণ লইতে

বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মকার্য জগৎ সৎ। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশেই জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়া থাকেন। জগৎ মায়িক নহে, ভগবান হইতে ভিন্নও নহে। কারণরূপে জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত আছে এবং তাহা ভগবদিচ্ছায় কার্যরূপে আবির্ভূত হয়। ভগবান্ লীলাবশে জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে, তিনি শুদ্ধ ও অবিকারিরূপেই অবস্থান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান্ অথচ গুণাতীত। শ্রুতিতেও তিনি নির্গুণ বা গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে, শ্রুতি তাঁহারই জগৎকর্তৃত্বও অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই তাহাতে এই বিরুদ্ধ-ধর্মের সমাবেশ সম্ভব হয়।[১] আচার্য বল্লভ প্রেমের সাধক। শ্রীগোলোকধামে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড-রাসরসোৎসবে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই জীবের মোক্ষ।

আচার্য বল্লভের মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎও কারণরূপে শুদ্ধব্রহ্মে অবস্থিত, সুতরাং বিশুদ্ধ। কার্য-কারণের অভেদ-নিবন্ধন বল্লভাচার্যের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক জীব ও জগতের শুদ্ধ সত্তা স্বীকার করায় এই মতকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বলাই সঙ্গত। কার্য-কারণ এবং জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচার করিলে ভেদাভেদবাদের ছায়া স্পষ্টরূপেই বল্লভের দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। রামানুজ, মাধ্ব ও নিম্বার্কের ভক্তিবাদ বল্লভীয় দর্শনে প্রেমের রক্তিম রাগে মধুর হইয়া প্রেমের সাধকের হৃদয় জয় করিয়াছে। পক্ষান্তরে, অনধিকারীর সংস্পর্শে পবিত্র বৈষ্ণবপ্রেম কদর্থিত ও কলুষিত হইয়া 'সহজিয়া' 'কর্তাভজা' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া সুধীগণের বিরাগভাজন হইয়াছে।

বৈষ্ণব-বেদান্তিগণের এই ভেদাভেদবাদ শৈব ও অদ্বৈত বেদান্তিগণ নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী। একই বস্তুতে একই কালে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ থাকিতে পারে না। যদি ভেদ থাকে, তবে অভেদ থাকে না; যদি অভেদ থাকে, তবে ভেদ থাকিতে পারে না। ভেদাভেদ উভয় কোনমতেই সত্য হইতে পারে না। এই জন্য কোন কোন বৈদান্তিক আচার্য অবস্থাভেদে ভেদ ও অভেদের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন; অর্থাৎ একত্ব ও নানাত্ব, এই উভয়ই অবস্থাভেদে সত্য। মোক্ষা-বস্থায় জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়, সুতরাং তখন একত্ব সত্য; আর, সাংসারিক অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও ভেদমূলক ব্যবহার সত্য বলিয়া নানাত্বও সত্য। এই সিদ্ধান্তও অসঙ্গত। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি যে সকল শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কোন অবস্থা-বিশেষের উল্লেখ নাই, বরং 'অসি' এই অস্ত্যর্থ অস্ ধাতুর প্রয়োগদ্বারা শ্রুতিবাক্যে স্বতঃসিদ্ধ অভেদের কথাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে একত্বদর্শীকে সত্যাভিসন্ধ ও মুক্ত বলিয়া এবং নানাত্বদর্শীকে অনৃতাভিসন্ধ বা বদ্ধ বলিয়া যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একত্ব ও অভেদজ্ঞানই সত্য, নানাত্ব বা ভেদবোধই অসত্য বা

১। অচিন্ত্যানন্তশক্তিমতি সর্বভবনসমর্থে ব্রহ্মণি বিরোধাভাবাচ্চ।—অনুভাষ্য। ২।১।২৭

মিথ্যা। এই প্রসঙ্গে আরও বিচার্য এই যে, নানাত্ব- বা ভেদ-দৃষ্টি যদি মিথ্যা বা অসত্য না হয়, তবে একত্বজ্ঞানদ্বারা নানাত্ব বা ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইতে পারে না। কারণ, সত্যজ্ঞান মিথ্যা জ্ঞানকেই বিদূরিত করে, সত্যজ্ঞানকে বিদূরিত করিতে পারে না। রজ্জুজ্ঞান কল্পিত ও অসত্য সর্পবোধকেই নিবৃত্ত করিয়া থাকে। সর্পজ্ঞান সত্য হইলে তাহা রজ্জুজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারিত না। ভেদদৃষ্টি সত্য হইলে, অভেদজ্ঞান ভেদজ্ঞানকে বিদূরিত করিতে পারে না এবং অভেদজ্ঞানের বিরোধী ভেদ-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে, অভেদজ্ঞান উৎপন্ন ও হইতে পারে না। উপনিষদে যে অভেদ-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা স্ববিরুদ্ধ ভেদবুদ্ধিকে নিবৃত্ত করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া নানাত্ববোধের মিথ্যাত্বও প্রমাণিত হয়।

চেতন ব্রহ্ম কেমন করিয়া জড়রূপে পরিণত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক আচার্যগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য-শক্তির স্বরূপ বা স্বভাব কি? তাহা আমরা তাঁহাদের দর্শনে স্পষ্ট দেখিতে পাই না। ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য-শক্তি যদি অদ্বৈত-বেদান্তীর অনির্বাচ্য মায়াশক্তিস্থানীয় হয়, তবে শক্তির এইরূপ অচিন্ত্যতা স্বীকার করায় এই মতবাদ অলক্ষিতভাবে মায়াবাদেরই কুক্ষিগত হইয়া পড়ে না কি?

শৈব-বেদান্তিগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহারা ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন না, প্রদর্শিত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ভেদাভেদবাদ খণ্ডনই করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব-বেদান্তি-গণের ন্যায় তাঁহাদের মতেও ব্রহ্মে অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি অবস্থিত আছে। সেই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়া থাকেন এবং জগদ্‌রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার একত্ব ও অবিকারিত্ব বিলুপ্ত হয় না। শৈবাচার্যদিগের মতে জীব ও জড়-প্রপঞ্চবিশিষ্ট শিবরূপী ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। জীব ও জড় তাঁহার শরীর; তিনি শরীরী, সূক্ষ্মরূপে তিনিই কারণ, স্থূলরূপে তিনিই কার্য। রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শৈব দর্শনের এই মতবাদ বিবৃত করিয়া খৃষ্টীয় ১০ম শতকে আচার্য শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের শৈবভাষ্য রচনা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে অসাধারণ মনীষী পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠের শৈবভাষ্যের 'শিবার্কমণি-দীপিকা' নামে এক অতি উপাদেয় টীকা রচনা করেন। তাহাদ্বারা আমাদের শৈবদর্শন বুঝিবার পথ সুগম হইয়াছে। শৈব-বেদান্তিগণের মতে জীব ও প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের শরীর হইলেও জীব ঈশ্বর-পরবশ। এই পরাধীনতাই জীবের অনন্ত দুঃখের আকর। জীব শিবাজ্ঞা অনুবর্তন না করিলে দুঃখভাগী হয়। আর, শিব স্বাধীন, এই জন্যই তাঁহার কোন দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। আজ্ঞানুবর্তিতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ। বশ্য জীব অনাদি অজ্ঞান-বাসনা-বশতঃ বদ্ধ হইয়া নানা শরীর ধারণ করে। এই জীব প্রতি শরীরে বিভিন্ন ও বিভু। অসীম জীবের এই সসীম বদ্ধভাব তাঁহার পাশজাল। 'আমি ব্রহ্ম' এই উপাসনার ফলে শিবের অনুগ্রহে জীবের পাশজাল ছিন্ন হয় এবং জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শিবের সমান জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও আনন্দ প্রভৃতি লাভ করে। রামানুজের দাস্যভাব

শ্রীকণ্ঠ স্বীকার করেন নাই। শ্রীকণ্ঠের মতে পূর্ণ শিবভাবই মুক্তি। মুক্তি উপাসনা-সাধ্য ও ভগবৎপ্রসাদ-লভ্য। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই তুল্যরূপে মুক্তির প্রতি কারণ। এই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ আচার্য শঙ্কর বিশেষভাবে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ্-ভাষ্যে খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের মতে মুক্তি সাধ্য নহে, উহা জীবের নিত্যসিদ্ধ। জীব ব্রহ্মস্বরূপ ও নিত্যমুক্ত। কেবল অজ্ঞানবশতঃ জীব নিজকে বদ্ধ ও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। জ্ঞানসাধনার ফলে ঐ অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলেই জীবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মভাব স্ফূর্ত হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদই স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত শুদ্ধাদ্বৈত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীকণ্ঠের মতে জীব ও ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। এই বিষয়ে শ্রীকণ্ঠের মত রামানুজমতের অনুরূপ। তবে, রামানুজের জীব অণু, শ্রীকণ্ঠের জীব বিভু ও প্রতি শরীরে বিভিন্ন। ব্রহ্মকার্য জীব কেমন করিয়া বিভু হয়? আর, প্রত্যেক আত্মাই বিভু হইলে প্রতি জীবেই অনন্ত বিভু আত্মার সমাবেশ মানিয়া লইতে হয়। ইহা সঙ্গত মনে হয় না; কারণ, তাহাতে প্রত্যেক জীবাত্মারই প্রত্যেক জীবের সুখদুঃখভোগের আপত্তি অপরিহার্য হয়।

জগৎপ্রপঞ্চও ব্রহ্মের শরীর। প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, অতএব ব্রহ্ম প্রপঞ্চবিশিষ্ট; কারণ, যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না, সে-ই তদ্‌বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, দেহ ভিন্ন দেহীকে বুঝা যায় না, শক্তি ব্যতীত শক্তিমান্‌কে ধারণা করা যায় না; সেই জন্যই গুণী গুণবিশিষ্ট, দেহী দেহ-বিশিষ্ট, শক্তিমান্ শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি। অনন্ত ও অচিন্ত্য-শক্তি-বলে ব্রহ্মই কারণ ও কার্যরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। উপাদান কারণ ব্যতীত কার্যের কোন সত্তা নাই। মৃত্তিকাকে বাদ দিলে ঘটের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত প্রপঞ্চ থাকিতে পারে না। ইহাই আচার্য শ্রীকণ্ঠের মতে প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা অভেদ। ব্রহ্ম বিবিধ প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইলেও ব্রহ্মের অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই তাঁহার একত্ব, অবিকারিত্ব বিলুপ্ত হয় না। নানাবিধ বিকারের উপাদান হইয়াও তিনি অবিকারী। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য ও অসম্ভব নাই। সেই জন্যই পরমেশ্বর স্বীয় শক্তিবলে প্রপঞ্চাকারে পরিণত হইয়াও স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত রূপেই অবস্থান করেন। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়? পরমেশ্বরের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে না; কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরমেশ্বরের শক্তি ও মাহাত্ম্য অচিন্ত্য।

উক্ত ব্রহ্ম-পরিণামবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম যে প্রপঞ্চাকারে পরিণত হইয়া থাকেন, এখানে কি ব্রহ্মের সমস্তটুকুই (কৃৎস্ন ব্রহ্মই) প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, না, ব্রহ্মের কতক অংশ পরিণত হয়? যদি সমস্ত ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি তাঁহার সমস্তটুকুই কার্যজগতের মধ্যে বিলাইয়া দেন, তবে বলিতে হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান স্থূল কার্যপ্রপঞ্চই ব্রহ্ম, কার্যজগতের বাহিরে আর ব্রহ্ম নাই। কার্য সর্বদাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার স্বরূপ বিচার করিতেছি ও

ধারণা করিতেছি ; ইহার জন্য উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশের কোনই আবশ্যকতা নাই ; উপনিষদুক্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কোনই মূল্য নাই ; বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কার্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহার যথার্থ রূপ পরীক্ষা করাই প্রকৃত ব্রহ্ম-পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্র-সেবার কোনই আবশ্যকতা নাই, শম-দমাদি সাধনসম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার-স্থাপন ও কার্যের নূতন তথ্যসংগ্রহই সমধিক উপযোগী বলা যায়। আর, কার্যই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে কার্য ঘটাদির অবয়ব ধ্বংস হইলে ব্রহ্মের অবয়ব ধ্বংস হইল, ঘটাদি বিনষ্ট হইলে ব্রহ্ম নষ্ট হইল, এইরূপ বুদ্ধি হওয়া আমাদিগের স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব, সমগ্র ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিতে হয়। ব্রহ্ম যদি সাবয়ব হন, তবে বলিতে হয় যে, তাঁহার এক অংশের পরিণাম হয়, অপর অংশের পরিণাম হয় না, সেই অপর অংশে ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীত-রূপে অবস্থান করেন। এইরূপ ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাতেও ব্রহ্মের অনিত্যতা ও বিনাশিত্ব প্রভৃতি অপরিহার্য হইয়া পড়ে ; কারণ, যাহা সাবয়ব তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পরিণামবাদের এই সকল অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে না পারিয়াই পরিণাম-বাদী বৈদান্তিকগণ ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। ভগবানের অবিচিন্ত্য-শক্তিবলে তাঁহাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়। লৌকিক প্রমাণ ও মানুষের ক্ষুদ্র-বুদ্ধির সাহায্যে সর্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের অলৌকিক শক্তি ও কার্যপরীক্ষার প্রয়াস বদ্ধজীবের পক্ষে ধৃষ্টতার নামান্তর মাত্র।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ পরিণামবাদের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে মননশাস্ত্রে এইরূপ 'অচিন্ত্য-শক্তির' কোন অবকাশ নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণ পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিকে অনির্বাচ্য মায়াশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাঁহাদের দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নহে, ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত। বিবর্তবাদের রহস্য এই যে—কারণ অবিকৃত থাকিয়াই কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। রজ্জুই যখন আমাদের সর্পভ্রম উৎপাদন করে, সেখানে সর্প রজ্জুর পরিণাম নহে, তাহা রজ্জুর বিবর্ত। কারণ, সর্পভ্রমের উৎপত্তিতে রজ্জুর স্বরূপের কোন হানি হয় নাই, সে যে রজ্জু সেই রজ্জুই আছে, তাহার মিথ্যা সর্প-রূপ আমাদের মানস-কল্পনা মাত্র ; আমাদের মানস-কল্পনাপ্রসূত সর্প-রূপ রজ্জুর নিজ রূপের কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। রজ্জু অপরিবর্তিত থাকিয়াই মিথ্যা সর্পের কারণ হইয়াছে। এইরূপ এই জগৎও ব্রহ্মের বিবর্ত। এই জগতের উৎপত্তিতে তাহার বিবর্তকারণ ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ব্রহ্ম অপরিবর্তিত থাকিয়াই কার্য জগৎ উৎপাদন করিতেছেন। অতএব, পরিণামবাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বিবর্তবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে। বিবর্তবাদীর ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ, এক ও অদ্বিতীয়। অনাদি মায়াবশতঃ এক

ব্রহ্মই বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। উহা মিথ্যাদৃষ্টি; সুতরাং জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই অদ্বৈতবাদীর মূলসূত্র। এক ব্রহ্মকে জানিলেই নিখিল বস্তুকে জানা যায় এবং সকল জানার শেষ হয়। এই এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানই অদ্বৈতবেদান্তীর মূল প্রতিজ্ঞা। সমস্ত কার্যবর্গ এক উপাদান কারণেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। উপাদান কারণকে বাদ দিলে ঐ কার্য-বর্গের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। মাটির সত্তাই ঘট, কলস প্রভৃতি মৃন্ময়বস্তুর সত্তা। মাটিকে বাদ দিলে মৃন্ময় কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না। কার্যবর্গের কোন স্বাধীন সত্তা নাই এবং উহা নাই বলিয়াই কার্যবর্গকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। উপাদান মাত্রই সত্য। উপাদানকে জানিলে কার্যবর্গকেও জানা হইল। জগতের কারণ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মকার্য জগৎপ্রপঞ্চকেও জানা হয়। এই জন্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই বেদান্তের প্রথম সূত্র। সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্ম কারণরূপে জাগতিক সমস্ত পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছেন। সেই নিত্য সত্য ব্রহ্মবস্তুই সকলের আত্মা। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে এই আত্মতত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে সেই একমাত্র সদ্‌ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। পরিদৃশ্যমান নাম ও রূপ কিছুই ছিল না, এবং পরিণামেও উহা থাকিবে না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই চিরকাল আছেন ও থাকিবেন।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হইয়াছে; ফলে, ঐ ব্রহ্মে সকল প্রকার ভেদের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে; অর্থাৎ স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়রূপে যে তিন প্রকার ভেদ জগৎপ্রপঞ্চে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে 'একম্', 'এব', 'অদ্বিতীয়ম্' এই তিনটি পদদ্বারা শ্রুতিব্রহ্মে ঐ ত্রিবিধ ভেদেরই বারণ করিয়াছেন। অবয়বীর সহিত অবয়বের যে ভেদ, অর্থাৎ পত্র, পুষ্প ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ; কারণ, দুইই বৃক্ষ-জাতীয়। বৃক্ষ হইতে পর্বতাদির যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ; কেন-না, বৃক্ষ ও পর্বত দুই জাতীয় পদার্থ। ব্রহ্ম এক, নিরবয়ব এবং নিরংশ, সুতরাং তাহাতে অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান, সেই স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। যদি ব্রহ্মকে নিরবয়ব না বলিয়া সাবয়ব বলা যায়, তবে সেই সাবয়ব ব্রহ্ম উৎপন্ন ও বিনাশী হইবে; কারণ, সমস্ত সাবয়ব বস্তুই উৎপন্ন ও বিনাশী। উৎপন্ন ও বিনাশী বস্তু কারণান্তরসাপেক্ষ বটে, সুতরাং তাহা কোন মতেই জগতের আদি কারণ হইতে পারে না. ইহা আমরা পরিণামবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গেই দেখিয়া আসিয়াছি। 'একমেব' এই শ্রুতিবাক্যে 'একম্' পদের পর 'এব' পদের দ্বারা সদ্‌ব্রহ্মের একত্বই সূচিত ও সমর্থিত হইতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, তাঁহার সজাতীয় অন্য কোন পদার্থ নাই। ফলে, ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদের আশঙ্কাও বিদূরিত হইয়াছে। শ্রুতির 'অদ্বিতীয়ম্' পদ ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদেরও যে সম্ভাবনা নাই, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সতের যাহা বিজাতীয়, তাহা সৎ নহে, অসৎ। যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার ভেদের প্রশ্ন উঠে না। যাহা বিদ্যমান তাহা অপর বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অপর বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে।

যাহার অস্তিত্বই নাই তাহা কিছুই নহে। তাহার আবার অপর বস্তু হইতে ভেদ হইবে কি? অতএব, সৎ পদার্থের বিজাতীয় ভেদও অসম্ভব।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দ্বৈতবিশ্বপ্রপঞ্চকে তো আমরা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। জাগতিক বস্তুগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন সাধন করিতেছে। উহাকে অসত্য বা মিথ্যা বলিব কিরূপে? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, সৃষ্টির পূর্বে তো ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সুতরাং সেই সময়ে যে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না তাহাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সৃষ্টির পরে সৃষ্টিক্রিয়ার ফলে যে দ্বৈত প্রপঞ্চের উদ্ভব হইল তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহাই আমাদের বিচার্য। একত্ব ও নানাত্ব পরস্পরবিরোধী বলিয়া এই দুইটিই আর সত্য হইতে পারিবে না। ইহার একটি মিথ্যা হইবেই। এখন ইহার কোন্‌টি মিথ্যা হইবে তাহাই বিচার করা যাইতেছে। একত্ব-জ্ঞান নানাত্ব-জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না, পক্ষান্তরে নানাত্ব-জ্ঞান একাধিক বস্তুকে লইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া একত্ব-জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। একত্ব ও নানাত্ব এই দুই জ্ঞানের মধ্যে (নানাত্ব-নিরপেক্ষ) একত্ব-জ্ঞান পূর্বে উৎপন্ন হয়, আর (একত্ব জ্ঞানসাপেক্ষ) নানাত্ব-জ্ঞান পরে উৎপন্ন হয়। অতএব, পূর্বোৎপন্ন (নানাত্ব-নিরপেক্ষ) একত্ব-জ্ঞান পরভাবী নানাত্ব-জ্ঞানদ্বারা বাধিত হইতে পারে না, বরং পরভাবী (একত্ব-সাপেক্ষ) নানাত্ব-জ্ঞানই, নিরপেক্ষ একত্ব-জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ। শ্রুতিতে একত্ব ও নানাত্ব, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইলেও যুক্তিদ্বারা শ্রুতিতাৎপর্য বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, একত্ব-বিজ্ঞান বা অদ্বৈতবাদই সত্য, নানাত্ব বা দ্বৈতবোধ মিথ্যা। দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও তাহা অদ্বৈতবেদান্তীর মতে আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে আমরা তাহার সত্যতা প্রতিদিন উপলব্ধি করিয়া থাকি, অতএব অদ্বৈতবেদান্তীও তাহার ব্যাবহারিক সত্যতা অস্বীকার করেন না। তবে, তিনি বলেন, যতক্ষণ ব্যাবহারিক জীবন আছে, ততক্ষণই তাহা সত্য; মুক্তি-অবস্থায় যখন জীব ও ব্রহ্মের নির্বিশেষ একত্ব ও অদ্বৈতভাব পরিস্ফুট হয়, তখন ঐরূপ মুক্ত আত্মার ব্যাবহারিক জীবনও থাকে না, ব্যাবহারিক জগৎও থাকে না। তাঁহার নিকট সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চই বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারই পক্ষে উহা মিথ্যা। ফলতঃ, দার্শনিক রাজ্যে প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর অপলাপ করা অসম্ভব। সেই জন্যই অদ্বৈতবেদান্তী গভীর নিষ্ঠার সহিত প্রমাণ ও প্রমেয় বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি স্থূল আত্মজ্ঞান প্রচার করিয়া থাকে। উহা যথার্থ আত্মজ্ঞান নহে। যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অদ্বৈতবেদান্তেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। আমরা দেখিতে পাই সৎ-বাদীরা অসৎ-বাদ খণ্ডন করেন। আবার, অসৎ-বাদীরা সৎ-বাদ খণ্ডন করেন। অদ্বৈতবেদান্তী কাহারও সহিত বিবাদ করেন না; তিনি বলেন যে, ঐ উভয় মতই তাঁহার মতে প্রকারান্তরে সত্য। কারণ, যাহা সৎ তাহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে। কারণের সাহায্যে তাহার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? অতএব, সৎপদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব; পক্ষান্তরে, যাহা অসৎ তাহার কোনকালেই উৎপত্তি হইতে পারে না। আকাশকুসুম কোন দিন উৎপন্ন হয় নাই, হইবেও না। সুতরাং

সত্যের অনুরোধেই বলিতে হয় যে, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষদৃষ্ট, সেই জাগতিক পদার্থগুলি সৎ-ও নহে, অসৎ-ও নহে। যাহা সৎ-ও নহে অসৎ-ও নহে, তাহা অনির্বাচ্য ও মিথ্যা। এক ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই যদি মিথ্যা হয়, তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রও তো মিথ্যা। শাস্ত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বলা হইয়াছে। মিথ্যা শাস্ত্র হইতে কেমন করিয়া সত্য ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে? কারণের বিরুদ্ধ কার্যের উৎপত্তি তো দেখা যায় না। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে, উহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। অসত্য সর্প ও মিথ্যাদর্শীর সত্য ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। অসত্য স্বপ্নদর্শন হইতে সত্য শুভাশুভ সূচিত হয়। আচার্য রামানুজ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে অসত্য হইতে সত্য উৎপন্ন হয় না, সত্য হইতেই সত্য উৎপন্ন হয়। স্বপ্নজ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান সকলই রামানুজের মতে সত্য। ইহা আমরা ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপবিচারপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

আমরা দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্ত-মতবাদের মূলসূত্র বিচার করিলাম। এই সকল মতবাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও যৌক্তিকতা আলোচনা করিলাম। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অদ্বৈতবেদান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবাদের মূল—ঋগ্‌বেদ

আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত। উপনিষদে যে চিন্তা পরিপূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে ঋগ্‌বেদসংহিতা[1] প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেই

১। ঋগ্‌বেদ আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ। প্রাচীন ভারতবর্ষে শিষ্যগণ গুরুর মুখে শুনিয়া শুনিয়া বেদ অভ্যাস করিতেন, এই জন্যই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। তখন আমাদের দেশে লেখার কৌশল কাহারও জানা ছিল না, সেই জন্য মুখে মুখেই বেদ অভ্যাস করা হইত। পরবর্তী কালে বৈদিক-সংহিতা লিপিবদ্ধ হয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত এই শিষ্য-চতুষ্টয়ের সহায়তায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারি সংহিতা সঙ্কলন করিয়া 'বেদব্যাস' এই সার্থক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কোন্ সুদূর অতীতে বৈদিকসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল, এ বিষয় এই দেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জার্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলরের (Max Müller)-মতে ঋগ্‌বেদের সঙ্কলনকাল খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক, পণ্ডিত কোলব্রুকের মতে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। হাউ (Haug) সাহেবের মতে বেদের সঙ্কলনকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্বিংশ শতক (2400 B.C.), পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনালের (Macdonell) মতে বেদের সঙ্কলনকাল খৃষ্টপূর্ব দশম শতক। এইরূপ আরও নানাবিধ মত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত আছে। এই দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে বেদের সঙ্কলন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনা। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কলিযুগের বর্তমান বয়স পাঁচ হাজারের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব, সুতরাং বেদও যে পাঁচ হাজার বৎসর বা তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহা অবশ্য বেদের সঙ্কলনকাল। বেদ কোন্ স্মরণাতীত কালে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। এই জন্যই বেদকে অনাদি ও নিত্য বলা হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত তিলক তাঁহার 'ওরায়ন'-নামক গ্রন্থে বৈদিকসূক্ত হইতে জ্যোতিষিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৬000 হইতে 8000 বৎসরের মধ্যে বৈদিকসাহিত্য সঙ্কলিত ও সুগঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন পৌরাণিক মতের সহিত তিলকের ওরায়নের মতের মিল পাওয়া যায় এবং মহামতি তিলক তাঁহার ওরায়ন-গ্রন্থে তাঁহার মতই যে প্রাচীন ভারতের সুচিন্তিত মত তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (Tilak's *Arctic Home*, p. 44 ; pp. 449-50)। আমরা জিজ্ঞাসু পাঠককে তিলকের ওরায়ন-গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। জেকবি (Jacobi) সাহেবও ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া বেদ-সঙ্কলনকাল খৃষ্টপূর্ব 8৫00 হইতে 8000 চার হাজার বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জেন (Jena) সাহেব তাঁহার *Theogony of the Hindus* নামক গ্রন্থে (১৩৪ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, "ছয় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে (6000 B.C.) হিন্দুরাজগণ (মহাবদরনীশ রাজবংশ) ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন, ইহা হইতে বৈদিক কাল অন্ততঃ ৬000 খৃষ্ট-পূর্বাব্দ বলিয়া নিদেশ করা যাইতে পারে।" ভারতীয় সভ্যতা চীন ও মিশরীয় সভ্যতার বহু পূর্বেই ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অতএব, বৈদিকসভ্যতা যে অতি প্রাচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই আমরা বেদের সঙ্কলনকাল-সম্বন্ধে বেদবির্দ্যাবিশারদ তিলকের মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

তাহার বীজ নিহিত আছে। বৈদিকসংহিতায় বেদোক্ত দেবতার স্তুতি নিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল স্তুতিবাদের মধ্যে দেবতাবর্গের স্বরূপ, স্বভাব ও কার্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে ঐ সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্মযজ্ঞ। সংহিতার এই কর্ম যজ্ঞ আরণ্যকে ভাবনাযজ্ঞে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যজ্ঞীয় দ্রব্যসংগ্রহের কোন আড়ম্বর নাই। আরণ্যক সাধক মানস উপকরণে তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। আরণ্যকের চিন্তা প্রতীক বস্তুতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রতীককে ছাড়িয়া ঐ চিন্তা তখনও উচচতম সোপানে আরোহণ করে নাই। উপনিষদে ঐ চিন্তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নাম ও রূপের রাজ্য ছাড়িয়া চিন্তার প্রবাহ তখন অরূপের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং নিরাকার নির্বিকার চিৎসমুদ্রে বিলীন হইয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের কর্মবিজ্ঞান আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়াছে। এই জন্যই ভারতবর্ষে সংহিতার পর আরণ্যক ও উপনিষদের জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়াছিল। বৈদিক ঋষির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ

বৈদিক দেবতাবর্গের স্বরূপ

করিতে হইলে প্রথমতঃই বৈদিক দেবতাবর্গের স্বরূপ বিচার করা আবশ্যক। বৈদিক দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। ইঁহাদের স্বভাব, স্বরূপ ও কার্যাবলীর বর্ণনায় বৈদিকসংহিতা ভরপুর। ঐ বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রকৃতির রুদ্ররূপের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবানল প্রভৃতি প্রকৃতির রুদ্র লীলাকেই বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ বলিয়া বেদে উপদেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই কেহ কেহ বৈদিক আর্যগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক বলিয়া নিন্দাও করিয়াছেন। কিন্তু, বৈদিক দেবতাতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বৈদিক ঋষি জড় প্রকৃতির উপাসক নহেন। তিনি প্রকৃতিশরীরে অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিশরীরে এই যে বিভিন্ন অভিব্যক্তি সঙ্ঘটিত হইতেছে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে, ইহার মধ্যেও একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে; ইহার পিছনেও অবশ্যই একজন কর্তা ও শাসক আছেন যাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মে এই লীলাময়ী প্রকৃতি তাহার নির্দিষ্ট কেন্দ্রপথে পরিচালিত হইতেছে। ঐ যে আকাশপথে চন্দ্র, সূর্য আবর্তিত হইতেছে, স্রোতস্বিনী পৃথিবীর বুকে প্রবাহিত হইতেছে, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এই দিনরাত্রির চক্র ঘুরিতেছে, এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে এক পরম দেবতা অবস্থিত আছেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতা ঐ পরম সর্বান্তর্যামী অব্যক্ত দেবতারই ব্যক্ত রূপ। ঐ দেবতাই জগতের কর্তা শাসক ও ভাসক। প্রাকৃতিক প্রত্যেক কার্যেরই একটি কারণ আছে। জগতের যিনি কর্তা তিনিই জাগতিক ঘটনাবলীর কারণ। তিনিই উহা সঙ্ঘটিত করান। এইরূপে জাগতিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়া অলক্ষিতভাবে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বোধ পরিস্ফুট হয়। বিশ্বরাজ্যের এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাকেই বেদে 'ঋত' (course of things) বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে যেমন একটি অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature) বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মনোজগৎ ও আন্তরজগতের মধ্যেও নিয়মের শাসন চলিতেছে। বহির্জগতের কার্যকারণ নিয়মকে যেমন 'ঋত' বলা হয়, সেইরূপ আন্তরজগতের যে নিয়ম তাহাকেও 'ঋত' বা সত্য বলা হয়। এই 'ঋতই' বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নাভিমূল বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে।[১] সুতরাং এই 'ঋত'কে জানিতে পারিলেই অন্তঃ- ও বহিঃ-প্রকৃতির মূল জানা যায়। ক্রিয়াশীলা এই বহিঃপ্রকৃতির 'ঋত' বা মৌলিকতত্ত্ব জানিতে পারিলেই ক্রিয়ার স্বরূপ ও কর্মনীতি (Law of Karma) বুঝা যায়। আর, অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মজ্ঞানের ফলে জগদাধার 'ঋত' বা সত্য ব্রহ্ম-বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য-কারণ-নিয়মের জ্ঞানোদয়ের ফলেই দার্শনিক পরীক্ষার সূচনা আরম্ভ হয় এবং বৈদিক দেবতাবর্গের মূলেও যে ঐরূপ দার্শনিক ভিত্তি বিদ্যমান আছে, ইহা বুঝা যায়। বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক এই লোকত্রয়ে বিভক্ত। সুতরাং এই লোকত্রয়ের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতাবর্গকেও সাধারণতঃ দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের দেবতা বলিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু, এই বিভাগ পূর্ণাঙ্গ নহে, এতদ্‌ব্যতীত নানা বৈদিক দেবতার কল্পনাও বৈদিকসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি বিভিন্ন-মুখী। উহার বিভিন্নমুখে বিভিন্ন দেবতার কল্পনামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ফলে, অনন্ত অসংখ্য বৈদিক দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন দেবতাবর্গকে বেদে একই দেবতার মহিমা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন দেবতাবর্গকে বসু, রুদ্র, মরুৎ, আদিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন গণদেবতার (class gods) পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া 'বিশ্বেদেবাঃ' বা নিখিল দেবসমূহ বলিয়া এক বিরাট্ দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে এবং সমগ্র দেবসমাজকে ঐ 'বিশ্বে-দেবতা'র বিশাল কায়ে একীভূত করা হইয়াছে। ইহা হইতে ঋগ্‌বেদের নানা দেবতার অন্তরালে যে একত্বের সূত্র বিরাজমান তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। বৈদিক দেবতাবর্গের স্বভাব ও কার্যাবলীর আলোচনার মধ্যে তাঁহাদের যে স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা-দ্বারা তাঁহাদিগকে অশরীরী না বুঝিয়া শরীরী দেবতা বলিয়াই বুঝা যায় এবং তাঁহাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্ণনাও বৈদিকসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, পরবর্তী কালে পৌরাণিক যুগে মনুষ্যাকৃতি দেবতার যে কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে, বৈদিক-সূক্তে দেবতার আকৃতির বর্ণনা থাকিলেও বৈদিক দেবতা মনুষ্যাকৃতি নহেন বলিয়া মনুষ্যাকৃতি পৌরাণিক দেবতা বা গ্রীস্ দেশের দেবতা হইতে বৈদিক দেবতার রূপ স্বতন্ত্র। এই দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যে বৈদিকধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ নানা দেবতাবাদ স্বীকার করিলেও পরিণামে বৈদিক বহু-দেবতাবাদ এক-দেবতা-বাদেই পর্যবসিত হইয়াছে। বৈদিক অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি নানা দেবতার মধ্যে

১। ঋগ্‌বেদ ১।২।৮, ৪।৪০।৫, ৪।২৩।৮-১০, ১০।৬৫।৭, ১০।১২৭।১২ দ্রষ্টব্য।

যে দেবতা বিরাজ করেন, তিনিই পরম দেবতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ইহাই শ্রুতি স্পষ্ট বাক্যে 'তদেকম্' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিশরীরে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রে,—এক কথায় সমস্ত চরাচর জগতে, নানা ভাবে ক্রিয়াশীলা হইতেছে। শক্তির এই লীলা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্বের, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের সন্ধান পান। বৈদিক ঋষি এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বরুণ দেবতাকে স্তব করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "হে বরুণ! সমুদ্রজলে বাড়বাগ্নিরূপে তোমার যে তেজঃ ও শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাই অন্তরিক্ষে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। ঐ তেজঃশক্তিই প্রাণিজঠরে জঠরাগ্নিরূপে, প্রাণিহৃদয়ে আয়ুঃশক্তি-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। উহাই মেঘমণ্ডলে বিদ্যুদগ্নিরূপে বিরাজ করে, রণ-ভূমিতে বীরহৃদয়ে শৌর্যাগ্নিরূপে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তোমার শক্তির লীলা-লহরী নানা ভাবে তাহার স্বীয় রূপের মধুধারা বর্ষণ করিতেছে।"[১]

ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন দেবতাবর্গ একেরই বিভিন্ন বিকাশ।

বৈদিক দেবতাবর্গের মৌলিক শক্তি যে এক তাহা ঋগবেদে (তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫শ সূক্তে) স্পষ্টতঃ ঘোষণা করা হইয়াছে—'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্'।[২] সেখানে আরও বলা হইয়াছে যে, দেবতাবর্গের ঐ এক মৌলিক শক্তিই নানা পদার্থে নানা রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। আকাশে, পৃথিবীতে, বনমধ্যে ও ওষধির মধ্যে একই শক্তি বিরাজ করিতেছে। আকাশে সূর্যরূপে যে শক্তির বিকাশ হয় সেই শক্তিই আবার পৃথিবীবক্ষে অগ্নিরূপে, বনমধ্যে দাবানলরূপে, ওষধিবর্গের মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শক্তিই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। জগদাধার এই মহাশক্তি অসীম ও অখণ্ড। দেবতাবর্গ সেই অখণ্ড মহাশক্তির সখণ্ড অভিব্যক্তি। দেবতাবর্গের বাহ্য ও দৃশ্যরূপ স্বতন্ত্র বা নানা হইলেও ঐ বাহ্য রূপের অন্তরালে যে অখণ্ড চৈতন্যরূপ বিরাজ করিতেছে ঐ রূপের যিনি সন্ধান পান তাঁহার সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়। তিনি সর্বত্রই ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করেন। এই জন্যই বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, কার্যবর্গের স্থূল, দৃশ্যরূপে বৈদিক ঋষি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কার্যবর্গের অন্তরালবর্তী অখণ্ড জ্যোতির্ময় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ঋষির প্রাণে ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "আমার মন ও বুদ্ধি, অতি দূরে অমৃতজ্যোতির সন্ধানে চলিয়া যাইতেছে। হৃদয়গুহায় অবস্থিত সেই অমৃতজ্যোতির নিকটে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের ঐন্দ্রিয়ক বিজ্ঞান-

---

১। ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতম্
অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি।
অপামনীকে সমিথে য আভৃত-
স্তমশ্যাম মধুমন্তং ত উর্মিম্॥—ঋগবেদ, ৪।৫৮।১১

২। উল্লিখিত মন্ত্রাংশের 'অসুর' শব্দের অর্থ বল, সামর্থ্য। সায়ণভাষ্য দেখ।

সকল উপহার অর্পণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ সেই অমৃতজ্যোতির সন্ধান পাইলে সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়।"[১]

বৈদিক ঋষি ব্যক্ত ও স্থূলের মধ্যে অব্যক্তের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই জন্যই বৈদিকসংহিতায় সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গের স্থূল ও ব্যক্ত রূপ ব্যতীত এক সূক্ষ্ম অব্যক্ত গূঢ় রূপের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। সূর্যকে বলা হইয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্র (বা রূপ) আছে, একটি স্থূল চক্র, অপরটি সূক্ষ্ম চক্র। ঐ সূক্ষ্ম চক্র সূর্যের গূঢ় রূপ। এই রূপ সাধারণে জানিতে পারে না, ঋষিগণ তাঁহাদের ধ্যাননেত্রে ঐ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[২] ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে আমরা সূর্যের তিন প্রকার রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই। একটি তাহার 'উৎ' বা উৎকৃষ্ট রূপ। ঐ রূপে সূর্য এই পৃথিবীবক্ষে তাঁহার কিরণ বিকীর্ণ করেন। দ্বিতীয়টি সূর্যের 'উত্তর' বা উৎকৃষ্টতর রূপ। ঐরূপে সূর্য অনন্ত আকাশে ও উর্ধ্বতম লোকে তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। সূর্যের যাহা তৃতীয় রূপ তাহা তাঁহার 'উত্তম' বা উৎকৃষ্টতমরূপ; উহাই সূক্ষ্ম অমৃতজ্যোতিঃ। ঐ অমৃতজ্যোতির উদয়ও নাই, অস্তও নাই। ইহা সূর্যের নিগূঢ় ব্রহ্মরূপ।[৩] সূর্যের এই ব্রহ্মরূপের যিনি পরিচয় পান তিনিই যথার্থ সূর্যতত্ত্ব জানিতে পারেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্রে (জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ) সূর্যজ্যোতিঃ যে স্থূল জ্যোতিঃ নহে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'ন নিম্লোচ নোদিয়ায়', অস্তও যায় না, উদয়ও হয় না বলিয়া সূর্যের এই অমৃতজ্যোতির কথাই বর্ণিত হইয়াছে। সূর্যের এই অমৃতরূপ দেখিবার জন্যই বৈদিক ঋষি ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে সূর্য, তোমার ঐ স্থূল রূপ ও রশ্মিসকল সংযত কর। ঐ স্থূল রশ্মিদ্বারা আবৃত তোমার যে কল্যাণময় রূপ আছে, আমি সেই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।"[৪] সূর্যের এই কল্যাণময় রূপ যে তাঁহার আনন্দময় ব্রহ্মরূপ, ইহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোনই সন্দেহ নাই।

বৈদিক দেবতাবর্গের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ।

১। বি মে কর্ণা পতয়তো বিচক্ষু-
বীঁদং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ
কিংস্বিদ্ বক্ষ্যামি, কিমু নূ মনুষ্যে?—ঋগ্‌বেদ, ৬।৯।৬

২। দ্বে ত চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা তদ্ ধ্যায়ত ইদ্ বিদুঃ।—ঋগ্‌বেদ, ১০।৮৫।১৬

৩। উদ্‌বয়ং তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্।—ঋগ্‌বেদ, ১।৫০।১০

৪। পূষন্নেকর্ষে যমসূর্য-প্রাজাপত্য-ব্যূহরশ্মীন্ সমূহঃ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥
—বাজসনেয়ী সংহিতা, ৪০।১৬; ঈশোপনিষদ্, ১৬

সূর্যের অনুরূপ অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণেরও স্থূল ও সূক্ষ্ম এই রূপদ্বয়ের বর্ণনা ঋগ্‌বেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বেদে বলা হইয়াছে,—"হে অগ্নি! তোমার পরম কল্যাণময় নিগূঢ় রূপেই তুমি মৃত জীবকে স্বর্গে লইয়া যাও। তোমার কল্যাণময় রূপেই তুমি দেবতাদিগের নিকট যজ্ঞের হবিঃ বহন করিয়া থাক। এইরূপেই তুমি 'জাতবেদাঃ' অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে জানিয়া থাক। হে অগ্নি! তোমার যে নিগূঢ় সূক্ষ্ম রূপ আছে এবং তুমি যেই উৎস হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছ তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।"[১] অগ্নি তাঁহার এই সূক্ষ্ম ব্রহ্মরূপেই যজ্ঞে আহুত হইয়া থাকেন। যজ্ঞবিদ্‌গণ যজ্ঞের রহস্য অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মাগ্নির উদ্দেশ্যেই আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (বেদান্তদর্শন, ১।১।২৫ সূত্রভাষ্য) ঐতরেয় আরণ্যকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা ঋগ্‌বেদী অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল বিকারের মধ্যে অবস্থিত সেই অবিকারী জগৎ-কারণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। যাঁহারা যজুর্বেদী তাঁহারাও যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই ধ্যান করেন। যাঁহারা সামবেদী তাঁহারাও মহাব্রতে অর্থাৎ যজ্ঞে ব্রহ্মকেই ভজনা করেন।"[২]

ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"হে ইন্দ্র তোমার দুইটি শরীর আছে, তন্মধ্যে একটি স্থূল ও ব্যক্ত, অপরটি সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়। তোমার ঐ নিগূঢ় শরীর অতি বৃহৎ। ইহা বহুস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ শরীরের দ্বারা তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ তুমি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহাও তুমি উৎপাদন করিয়াছ। তোমার ঐ শরীরটি প্রাচীন জ্যোতিঃ (প্রত্নং জ্যোতিঃ)-স্বরূপ। যজ্ঞকারী ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন (বুবুধানাঃ) তাঁহারাই ইন্দ্রের এই নিগূঢ় পদকে জানিতে পারেন। ইহা তাঁহার অমৃতময় পদ।"[৩]

১। যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদ-
স্তাভির্বহৈনং সুকৃতামুলোকম্। —ঋগ্‌বেদ, ১০।১৬।৪
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা
দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ —ঋগ্‌বেদ, ১০।১৬।৭
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যৎ
বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ॥ —ঋগ্‌বেদ, ১০।৪৫।২

২। এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে, এতমগ্নাবধ্বর্যবঃ,
এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ।—ঐতরেয় আরণ্যক, ৩।২।৩।১২

৩। দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈঃ,—ঋগ্‌বেদ, ১০।৫৫।১
মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্
যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ম্, —ঋগবেদ, ১০।৫৫।২
অবাচচক্ষং পদমস্য সস্বরুগ্রং
নিধাতুরন্বায়মিচ্ছন্।
অপৃচ্ছমন্যাঁ উত তে ম আহুঃ
ইন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেম। —ঋগ্‌বেদ, ৫।৩০।২

বায়ুর সূক্ষ্মরূপকে উদ্দেশ করিয়া ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলে বলা হইয়াছে "এই বায়ুই বিশ্ব ধারণ করে। বায়ুর ক্রোড়েই দেবতাসকল নিজ নিজ বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই বায়ুই সমস্ত পার্থিব বস্তুকে ও আকাশস্থ জ্যোতির্মণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়াছে। কেহই এই বায়ুর জন্মকথা জানে না। মরুদ্‌গণ নিজেরাই কেবল নিজের জন্মকথা জানিতে পারেন এবং যাঁহারা ধীর ও বিদ্বান্ তাঁহারাই ইঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। রথচক্রের অর বা শলাকাসমূহ যেমন চক্রের নাভি বা মধ্য-প্রদেশে সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ মরুদ্‌গণ নিখিল বিশ্বের যাহা নাভিমূল সেই পরব্রহ্মে সংযুক্ত রহিয়াছে।"[১]

রথচক্রের দৃষ্টান্তে বৈদিক দেবতার সর্বাশ্রয়ত্ব-সমর্থন

এই রথচক্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বৈদিক দেবতাবর্গ যে একই পরম দেবতার আশ্রিত, তাহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহার শক্তিদ্বারাই অনুপ্রাণিত, একথা ঋগ্‌বেদে একাধিকবার বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বৈদিক যে-কোন দেবতাই যে মূলতঃ সর্বান্তর ও সর্বান্তর্যামী পরম দেবতা, ইহাই সূচিত হইয়া থাকে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ঋগ্‌বেদে বলা হইয়াছে যে, "রথচক্রের নেমি যেমন অর বা শলাকাগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে, অর্থাৎ নেমির বন্ধনে যেমন চাকার শলাগুলি নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ হে অগ্নি! তোমার বন্ধনে সমস্ত দেবতা নিবদ্ধ রহিয়াছে। তুমি সকল দেবতায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমাতে অবস্থিত থাকিয়া তোমারই সাহায্যে দেবতাগণ নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।"[২] "তুমি বিভু, সর্বব্যাপী ও সর্বৈশ্বর্যশালী, তোমার ঐশ্বর্যই দেবতা-দিগের ঐশ্বর্য। তুমিই দেবতাদিগের হৃদয়ে ধ্রুব জ্যোতিঃরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছ। সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ তোমাকেই তাঁহাদের আহৃত শব্দস্পর্শাদিরূপ বিবিধ বিজ্ঞান উপহার প্রদান করিয়া থাকে।"[৩] এইরূপ ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, "রথচক্রের নাভিতে যেমন চাকার শলাগুলি গ্রথিত আছে, ইন্দ্রশরীরেও সেইরূপ এই নিখিল বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। হে ইন্দ্র! তোমারই বল ও প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া অন্যান্য দেবতাগণ প্রজ্ঞাবান্ ও বলশালী হইয়াছেন। সমস্ত দেবতাই তোমাতে অবস্থিত, তোমার ব্রতই

১। (ক) যস্যা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বা ধারয়ন্তে।—ঋগ্‌বেদ, ৮।৯৪।২
(খ) আ যে বিশ্বা পার্থিবানি পপ্রথন্ রোচনাদিবঃ।—ঋগ্‌বেদ, ৮।৯৪।৯
(গ) রথানাং ন যে অরাঃ সনাভয়ঃ।—ঋগ্‌বেদ, ১০।৭৮।৪

২। (ক) অগ্নে নেমিররানিব দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি।—ঋগ্‌বেদ, ৫।১৪।৬
(খ) ত্বয়া হি অগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো মিত্রঃ শাশদ্রে অর্যমা সুদানবঃ।
যৎসীমনু ক্রতুনাবিশ্বথা বিভুঃ অরান্ন নেমিঃ পরিভূরজায়থাঃ॥—ঋগ্‌বেদ, ১।১৪১।৯
(গ) ত্বে অগ্নে বিশ্বে অমৃতাসঃ অদ্রুহঃ, —ঋগ্‌বেদ, ২।১।১৪
(ঘ) তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব দেবাঃ।—ঋগ্‌বেদ, ৫।৩।৪

৩। ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়েকং মনোজবিষ্ঠং পতয়ৎ স্বন্তঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভিবিয়ন্তি সাধু॥ —ঋগ্‌বেদ, ৬।৯।৫

তাঁহাদের ব্রত, তোমার কর্মই তাহাদের কর্ম। তাঁহাদের যে নিজ নিজ শক্তি আছে তাহার মূলেও তোমার অনন্ত শক্তিই বিদ্যমান, তুমিই তাহাদের মধ্যে শক্তি আধান করিয়াছ।"[১]

বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধেও বেদে অনুরূপ বর্ণনাই শুনা যায়। "রথ-চক্রের নাভিতে যেমন শলাকাগুলি গ্রথিত থাকে, বরুণদেবের মধ্যেও সেইরূপ এই বিশ্বই গ্রথিত রহিয়াছে। হে বরুণ! কোন দেবতাই তোমার কর্মের পরিমাপ করিতে পারেন না!"[২] এইরূপ সোমদেবতাকে বলা হইয়াছে, "হে সোম! তেত্রিশ দেবতা তোমাতেই অবস্থিত আছেন।"[৩] বৈদিক দেবতাবর্গের উক্ত প্রকার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক ঋষি যে-কোন দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী পরব্রহ্মকেই স্তব করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যানদীপ্তনেত্রে প্রত্যেক দেবতাবিগ্রহেরই অন্তরালবর্তী সেই সর্বদেবময় সর্বাধার ব্রহ্মতত্ত্বই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। নতুবা, রথচক্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যে-কোন বৈদিক দেবতাকেই যে অন্য সকল দেবতার আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় না কি? এই সর্বময় দেবতাকে ঋগ্বেদে 'অদিতি' বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ভাষায় "অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই পিতা, অদিতিই মাতা, অদিতিই পুত্র, যত কিছু দেবতা সমস্তই অদিতি, অদিতিই সমগ্র মানবসমাজ, এবং যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে এবং হইবে সমস্তই অদিতি।"[৪] এই অদিতিই পরমব্রহ্ম।

একই সৎ ব্রহ্মবস্তুকে ঋগ্বেদে নানা নামে নানা ভাবে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অভিধানটি এতই স্পষ্ট যে, তাহা পাঠ করিলে বৈদিক দেবতাবর্গ যে সর্বব্যাপী সর্বান্তর পরমব্রহ্মেরই বাহ্য অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। "একই সদ্বস্তুকে তত্ত্বদর্শিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন—একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬। একই সদ্বস্তুকে পণ্ডিতেরা বহুরূপে বহুনামে কল্পনা করিয়া থাকেন—'একং সন্তং বহুধা

১। (ক) অরান্ নেমিঃ পরিতা বভূব।—ঋগ্বেদ, ১।৩২।১৫
(খ) বিশ্বে ত ইন্দ্র। বীর্যং দেবা অনুক্রতুং দদুঃ।—ঋগ্বেদ, ৮।৬২।৭
(গ) যদ্দেবেষু ধারয়থা অসুর্যম্। —ঋগ্বেদ, ৬।৩৬।১

২। (ক) যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিব শ্রিতা।—ঋগ্বেদ, ৮।৪১।৬
(খ) ন বাং দেবা অমৃতা আমিনন্তি,
ব্রতানি মিত্রাবরুণা ধ্রুবাণি।—ঋগ্বেদ, ৫।৬৯।৪

৩। তব ত্যে সোম পবমান নিন্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।—ঋগ্বেদ, ৯।৯২।৪

৪। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষ-
মদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।—ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০।

কল্পয়ন্তি', ঋগ্‌বেদ, ১।১১৪।৫। একই অগ্নি বহুরূপে বহু স্থানে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। একই সূর্য নিখিল বিশ্বে আলোক বিকীর্ণ করে। একই উষা সকল বস্তুকে বিবিধরূপে প্রকাশিত করে। একই (সদ্) বস্তু বিবিধ বস্তুর আকার ধারণ করে।"[১] ঋগ্‌বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতাবর্গ একই পরম দেবতার ছায়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ।

উল্লিখিত বৈদিক মন্ত্রের 'বদন্তি, কল্পয়ন্তি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে নানাত্ব এবং বহুত্ব যে কল্পনামাত্র তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। যাহা কল্পনা তাহা বস্তুতঃ সত্য হইতে পারে না। সুতরাং নানাত্ব সত্য নহে, একত্বই সত্য, ইহাই বেদমন্ত্রের তাৎপর্য। একের বহু রূপ যে মায়িক অভিব্যক্তি তাহা ঋগ্‌বেদে অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন যে, "ইন্দ্র মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে,' ঋগ্‌বেদ, ৬। ৪৭।১৮, এবং বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হন।"[২] এক ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধি। ইন্দ্রই পরম দেবতা, পরমেশ্বর। এই দেবতাকে 'একং সৎ' বলিয়া শ্রুতিতে যে ক্লীবলিঙ্গে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে, সেই পরম দেবতা কোন বিশেষণে বিশেষিত হন না, কোন বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হন না, তিনি সর্ব-বিশেষরহিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব।

ঐ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই জীব ও জগতের স্রষ্টা। জীব ও জগতের স্রষ্টা বলিয়াই তাঁহাকে বিশ্বকর্মা বলা হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদে এই বিশ্বকর্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, "তিনিই আমাদের পিতা, পালক ও বিধাতা। তিনি নিখিল বিশ্ব ও বিশ্বের প্রাণি-বর্গের স্রষ্টা ও রহস্যজ্ঞ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকে উৎপাদন করিয়াছেন, এবং উহাদিগকে ঐ সকল নামাঙ্কিত করিয়া

ঋগ্‌বেদে একেশ্বরবাদ

১। (ক) ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু-
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।—ঋগ্‌বেদ, ১।১৬৪।৪৬

(খ) সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।—ঋগ্‌বেদ, ১০।১১৪।৫

(গ) যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।—ঋগ্‌বেদ, ৮।৫৮।১

(ঘ) এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধঃ,
একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষা সর্বমিদং বিভাতি
একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্॥—ঋগ্‌বেদ, ৮।৫৮।২

২। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥ ঋগবেদ, ৬।৪৭।১৮

উল্লিখিত শ্রুতিতে মায়া-শব্দের পর বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। মায়া বহু নহে, এক ও অনাদি, ইহা সংহিতা ও উপনিষদে বহুস্থলে বলা হইয়াছে; সুতরাং 'মায়াভিঃ' এই বহুবচনদ্বারা মায়া এক হইলেও মায়ার শক্তি যে অনন্ত তাহাই বুঝা যায়। উক্ত মন্ত্রটির সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই এক অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভূ দেবতাকে প্রাণিগণ পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই পরমেশ্বরই হৃদয়গুহায় অবস্থিত থাকিয়া অহংরূপে আমাদের প্রত্যগের বিষয় হন। আমাদের দৃষ্টি অজ্ঞানের আবরণে আবৃত আছে, সুতরাং অহং-প্রত্যয়বেদ্য সেই পরমেশ্বরকে আমরা বুঝিতে পারি না, দেহাভিমানী জীবকেই বুঝিয়া থাকি। পরমেশ্বর বলিয়া নিজেকে পরিচিত করি না, দেবতা, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এইরূপ শ্রেণী ও জাতিবিভাগদ্বারা পরিচিত করিয়া থাকি। নিজের উদরের চিন্তায়, দেহমনের তৃপ্তিসাধনে ব্যাকুল হইয়া আমাদের অন্তর্যামী পরম দেবতাকে ভুলিয়া যাই।"[১]

ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে ১২১শ সূক্তে এই একেশ্বরবাদ আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত সূক্তে পরমেশ্বরকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রজাপতির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির ঊষায় একমাত্র প্রজাপতিই বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই ছিলেন নিখিল প্রাণীর এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর —'ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ'। তিনিই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করেন, প্রাণিগণের আত্মারূপে বিরাজ করেন এবং প্রাণিগণের হৃদয়ে শক্তি আধান করেন (আত্মদাঃ বলদাঃ)। তাঁহার শাসন নিখিল জগৎ ও দেবগণ মানিয়া চলেন। তিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা প্রাণি-জগতের একচ্ছত্র রাজা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনিই দেবগণের আদিদেব—'যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ'। উক্ত প্রজাপতিসূক্তের বর্ণিত ঈশ্বরবাদ আলোচনা করিলে নানা বৈদিক দেবতার অন্তরালে এক সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই যে বিরাজ করিতেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।[২]

এতদ্‌ব্যতীত বেদান্তের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ব্রহ্মভাব এবং সো'হং-ভাবের কথাও ঋগ্‌বেদসংহিতা-পাঠে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ

১। যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥—ঋগ্‌বেদ, ১০।৮২।৩, ৭

২। এই প্রজাপতিসূক্তটি পাঠ করিয়া পণ্ডিত মোক্ষমূলর মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন :—

The whole hymn must have been the expression of a yearning after one supreme deity, who had made heaven and earth, the sea and all that in them is." See Max Müller : *The Six Systems of Indian Philosophy*, p. 60। পুনশ্চ তিনি তাঁহার *History of Ancient Sanskrit Literature* গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"I add only one more hymn, in which the idea of one God is expressed with such power and decision, that it will make us hesitate before we deny to the Aryan nations an instinctive Monotheism."

বাক্‌সূক্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা স্বীয় আত্মায় সমস্ত দেবতা ও চরাচর-নিখিলবিশ্বের অন্তর্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন। অন্তরেও আমি, বাহিরেও আমি, আমিময় এ ত্রিভুবন, আত্মার এই সর্বাত্মভাব বা বিরাট্‌ রূপ ঋষিকন্যার জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই জন্যই ঋষিকন্যা তাঁহার বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

ঋগ্‌বেদে সো'হংভাব ও সর্বাত্মভাব

"আমিই রুদ্র ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই আদিত্যগণের সহিত, এমন কি নিখিল দেবতার সঙ্গে অবস্থান করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। অখিল বিশ্বে সর্বত্র আমিই অধিষ্ঠিত। আমিই জীবাত্মারূপে প্রাণিগণের মধ্যে আবিষ্ট আছি। আমি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের অন্তরালে অধিষ্ঠিত আছি। আমার এরূপ মহিমা যে আমি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া এখানেই নিঃশেষ হইয়া যাই নাই, দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষলোককে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করিতেছি। এই বিশ্বরাজ্যের আমিই অধীশ্বরী। যাঁহারা যাজ্ঞিক তাঁহাদিগের মধ্যে আমিই প্রথমে জ্ঞানযজ্ঞের তত্ত্বালোক বিকীর্ণ করি। দেবতাগণ আমাকেই নানা স্থানে নানা রূপে বিকাশ করিয়াছেন। আমার আশ্রয়ের অন্ত নাই, এক আমিই বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়াসকল আমারই সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা আমাকে জানে না, তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রুদ্রদেব যখন শত্রুনাশে উদ্যত হন, আমিই তাঁহাকে শক্তি দান করি, আমিই তাঁহাকে ধনুঃ ও শত্রুনাশক অস্ত্র প্রদান করিয়া থাকি। আমিই বায়ু বা স্পন্দনশক্তি-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টির গোড়া পত্তন করি। আমিই আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি। সমুদ্রজলে, বাষ্পে ও নীহারিকাপুঞ্জে আমি বিশ্বসৃষ্টির বীজ আধান করিয়াছি।"[১]

ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলের বামদেবীয় সূক্তে (৪।২৬) ঋষি বামদেব বলিয়াছেন, "আমিই মনু ও সূর্য হইয়াছি। কক্ষীবান্‌ নামক যে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা শুনিতে পাও তাহাও আমি। আমিই কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর। আমিই ইন্দ্ররূপে শম্বরাসুরের নিরানব্বইটী পুর বা নগর ধ্বংস করিয়াছি।"[২] বামদেবীয় সূক্তের অনুরূপ

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্‌।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্‌॥
ইত্যাদি।—বাক্‌সূক্ত, ১০।১২৫।১-৮ দ্রষ্টব্য।

২। অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবান্‌ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥—ঋগ্‌বেদ, ৪।২৬।১
অহং পুরোমন্দসানো ব্যৈরং
নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।—ঋগ্‌বেদ, ৪।২৬।৩

উক্তি চতুর্থ মণ্ডলের স্থানান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। ৪র্থ মণ্ডলের ৪২শ সূক্তে ঋষি বলিতেছেন, "আমিই সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। সমস্ত দেবগণই আমার আশ্রিত। দেবতাসকল বরুণের ক্রিয়ারই অনুসরণ করেন, আমিই বরুণ ; অতএব দেবগণ আমার ক্রিয়ারই অনুবর্তন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের মধ্যেও আমিই রাজা। আমিই ইন্দ্র। আমার মহিমা সুগভীর ও অপরিমেয়, আমার শক্তি অপ্রতিহত। আমিই জড়ে চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি। আমিই সর্বত্র ক্রিয়াশীল। যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য, সকলই আমি।"

ঋগ্‌বেদোক্ত সার্বভৌম আত্মজ্ঞানবাদের পরিচয় দেওয়া গেল। এই সার্বভৌম আত্মজ্ঞানই বেদোক্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। এই জ্ঞান ঋগ্‌বেদে কি ভাবে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে ঋগ্‌বেদোক্ত আত্মতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা আবশ্যক। ঋগ্‌বেদে অনেক স্থলে 'আত্মন্'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের সেই সকল স্থলের তাৎপর্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বেদে আত্মন্-শব্দদ্বারা প্রথমতঃ আমাদের প্রাণবায়ুকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের যোড়শ সূক্তে 'সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা' (ঋগ্‌বেদ, ১০।১৬।৩) বলিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে বায়ুতে মিশিয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে, এবং উক্তমণ্ডলের ৫৮শ সূক্তে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যমলোক, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, আকাশ, সূর্য প্রভৃতি হইতে পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিয়া অক্ষয় জীবন লাভ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। ইহা হইতে বৈদিক ঋষি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। পাঞ্চভৌতিক দেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না, দেহপাতের পরেও আত্মা অবস্থান করে, এই সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এই সকল সূক্তে আত্মন্-শব্দে সাধারণতঃ মনঃ, প্রাণ (life) বা অসুকে (vital breath) বুঝাইয়া থাকে। এই প্রাণই মৃত্যুকালে জীবশরীরকে পরিত্যাগ করে। ফলে, জীবের মৃত্যু হয়, শরীর বিনষ্ট হয়। প্রাণের বন্ধনেই শরীর সুস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল থাকে ; সুতরাং মানুষের মধ্যে যাহা সত্য (real essence) তাহাই এই প্রাণ, এই প্রাণই আত্মা। স্থানান্তরে দেখা যায় যে, ঋগ্‌বেদের ঋষি এই প্রাণ-আত্মবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে প্রাণের অভ্যন্তরে কোন সর্বান্তর আত্মা বিরাজ করেন কি-না, তাহা জানিবার জন্য বৈদিক ঋষি অধীর হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, অস্থিময় এই দেহ অস্থিবিহীন হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কে জানে? জগতের প্রাণ বা আত্মা কোথায় অবস্থান করে, ইহাই বা কে জানে?[১] অশরীরী আত্মা হইতে কি ভাবে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই উক্ত মন্ত্রে বৈদিক ঋষি প্রশ্ন

১। কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-
মস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা
ক্ব স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥—ঋগ্‌বেদ, ১।১৬৪।৪

করিতেছেন। এখানে আত্মন্‌-শব্দে প্রাণকে বুঝায় নাই, প্রাণের অভ্যন্তরে যে আত্মা বিরাজ করে, সেই আত্মাকেই এখানে সূক্তস্থ আত্মন্‌-শব্দে বুঝাইয়াছে। কখনও-বা ব্যক্তি-আত্মা বা জীবাত্মাকে বেদে আত্ম-শব্দে বুঝা যায়। ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলে 'বলং দধান আত্মনি' (ঋগ্‌বেদ, ৯।১১৩।১) বলিয়া যে আত্ম-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃ আত্ম-শব্দে জীবাত্মাকে (Individual spirit or soul) বুঝাইতেছে। এই জীবাত্মাই মৃত্যুর পর পরলোকে স্বীয় কর্মানু-যায়ী সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। শুভ কর্মের ফলে স্বর্গসুখের অধীকারী হয়, অশুভ কর্মের ফলে নিরয়গামী হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করে এবং কর্মশেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মচক্রের আবর্তনে বার বার পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করে, এবং জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। জন্মান্তরবাদ-সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের উপদেশ অতিস্পষ্ট না হইলেও[১] শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।[২] বৈদিক শুভাশুভ কর্ম বলিতে এখানে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মকেই বুঝাইয়া থাকে। পরবর্তী কর্মবাদ ও তাহার ফলে যে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির কথা অন্যান্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বৈদিক কর্মবাদই যে তাহার বীজ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঋগ্‌বেদোক্ত ব্যক্তি-আত্মবাদই ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া ভূমা-আত্মবাদে পরিণত হইয়াছে, এবং প্রস্তাবিত বাক্‌ ও বামদেবসূক্তে সেই ভূমা-আত্মবাদ এবং ব্যক্তি-আত্মার ও ভূমা-আত্মার অভেদই অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় যে, প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঐ প্রজাপতিই জগদাত্মারূপে প্রকাশিত হইলেন (তৈঃ আঃ ১।২৩)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঐ আত্মাকে সর্বব্যাপী সর্বান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (তৈঃ ব্রাঃ ২।২।৯, ২।৮।৯)। শতপথব্রাহ্মণেও জগদন্তর আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, সে-ই এই আত্মা, নিখিল ভূতজগতের অধিপতি এবং সকলের রাজা —'স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা'—শতপথ, ১৪, ৫, ৫, ১৫। এই ভূতাত্মা বা জগদাত্মার সহিত আমিত্বের বা জীবাত্মার অভেদদর্শনই বেদান্তের চরম ও পরম দর্শন, এই দর্শনই উল্লিখিত বাক্‌ ও বামদেবসূক্তে বিবৃত হইয়াছে।

বৈদিক আত্মজিজ্ঞাসার সূচনায়ই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বৈদিক ঋষি নিজের অন্তরও যেমন পরীক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ বিশ্বের অন্তরতত্ত্বও পরীক্ষা করিতেছেন এবং এই পরীক্ষার ফলে জীব ও জগতের অন্তরবিহারী পরমাত্মাসম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। জীব ও জগতের মধ্যে যে একই আত্মসূত্র বিরাজ করে তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাই বৈদিক আত্মজিজ্ঞাসার রহস্য। এই রহস্যজ্ঞানের ফলেই ঋষিকন্যা ও বামদেবের হৃদয়ে সর্বাত্মভাবের উদয় হইয়াছিল।

১। ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৪, ১।১৬৪।৩০, ৩৮, ৪।২৬।১, ১০।৮৮।১৫, ৪।২৭।১ সূক্ত আলোচ্য।

২। শতপথব্রাহ্মণ, ১।৯।৩।২, ১১।২।৭।৩৩, ১।৫।৩।৪, ১০।৩।৩।৮ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বের দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিরহস্যও ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নাসদীয় সূক্তে (ঋগ্‌বেদ, মঃ ১০ সূঃ ১২৯) সৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন যে, "সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় সৎ-ও ছিল না, অসৎ-ও ছিল না। সকলই অব্যক্ত ও অনিবাচ্য ছিল। শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, যদিও সৎ মূল কারণ হইতেই অসৎ জগৎপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হইয়াছিল, তথাপি তখন ঐ মূল কারণকে সৎ-শব্দদ্বারা অভিহিত করা সম্ভব হয় নাই, অর্থাৎ সৎ থাকিলেও তাহা অবাঙ্‌মনসগোচর, এই জন্য তাহাকে সৎ-ও বলা চলে না, অসৎ-ও বলা চলে না, তাহা সদসতের অতীতাবস্থা। প্রলয়াবস্থায় পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, ভোগ্যও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, আবরণও ছিল না, আবরণীয় বস্তুও ছিল না। সর্বসংহারকারী মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, প্রাণিবর্গও ছিল না, সূর্যও ছিল না, চন্দ্রও ছিল না, সুতরাং দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। একমাত্র অধ্যক্ষ পরম পুরুষ বা পরব্রহ্মই অবস্থিত ছিলেন, তিনি ভিন্ন কিছুই ছিল না।"[১]

ঋগ্‌বেদোক্ত সৃষ্টিরহস্য

রাত্রির অন্ধকারে যেমন সমস্ত পদার্থ আবৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত আবৃত ছিল—'তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে'প্রকেতম্'—ঋগ্‌বেদ, ১০।১২৯।৩। সর্বাচ্ছাদক অজ্ঞানই শ্রুতিতে 'তমঃ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। সেই তমঃ-স্বভাবা মায়া হইতেই নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপ আবির্ভাবের নামই জন্ম।[২] এই মায়া অনাদি, এই মায়াই ছিল জগৎসৃষ্টিতে

১। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥—ঋগ্‌বেদ, ১০।১২৯।১-২
[ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে সূক্তস্থ স্বধা-শব্দের অর্থ মায়া।]
স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে
আশ্রিত্য বর্ততে ইতি স্বধা মায়া। তয়া
তদ্ ব্রহ্ম অবিভাগাপন্নমাসীৎ। যদ্যপি
অসঙ্গস্য ব্রহ্মণঃ তয়া সহ সম্বন্ধো ন সম্ভবতি
তথাপি তস্মিন্নবিদ্যয়া তৎস্বরূপমিব সম্বন্ধো'ধ্য-
বস্যতে, যথা শুক্তিকায়াং রজতস্য।—সায়ণ-ভাষ্য, ১০।১২৯।২
[বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টির আদিম অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নাসদীয় সূক্তেরই প্রতিধ্বনি।]
নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥—বিঃ পুঃ ২।৩২

২। আত্মতত্ত্বস্যাবরকত্বান্মায়াপরসংজ্ঞং ভাবরূপাজ্ঞানমেব তম ইত্যুচ্যতে।
তেন তমসা নিগূঢ়মাচ্ছাদিতং ভবতি। আচ্ছাদকাত্তস্মাত্তমসো নামরূপাভ্যাং
যদাবির্ভবনং তদেব জন্ম ইত্যুচ্যতে।—সায়ণভাষ্য, ১০।১২৯।৩

সেই অধ্যক্ষ পুরুষের একমাত্র সহচরী। মায়ার সাহচর্য করার ফলে সেই মায়াতীত পরম পুরুষও মায়াময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঐ মায়াধীশ অধ্যক্ষই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে পরমেশ্বরের যে সিসৃক্ষা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইয়াছিল শ্রুতির ভাষায় তাহাই তাঁহার কাম বা কামনা। ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-উন্মুখ মনের প্রথম বিস্ফুরণ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিয়াছেন—কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ—ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯।৪। এই কামনাই মায়া। প্রলয়ের তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে মায়ার গর্ভে সমস্ত জগৎ লুক্কায়িত ছিল। সমস্তই ছিল তখন অব্যক্ত ও অনির্বাচ্য। জগতের এই অব্যক্ত অনির্বাচ্য অবস্থাকেই শ্রুতিতে অসৎ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অব্যক্ত অনির্বাচ্য অবস্থা হইতে ব্যক্ত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সাগর, ভূধর প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপ-বিশিষ্ট বিচিত্র জগতের উৎপত্তিই অসৎ হইতে সতের, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি বলিয়া ঋগ্‌বেদে বর্ণিত হইয়াছে—দেবানাং পূর্ব্যে যুগে অসতঃ সদজায়ত।—ঋগ্‌বেদ, ১০।৭২।২। উপনিষৎও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছে—অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত—তৈত্তিরীয় উপঃ, ২।৭।১; তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত—ছাঃ, ৬।২।১। সৃষ্টির আদিতে জগতের অব্যক্ত অনির্বাচ্য অবস্থাই নাসদীয় সূক্তে "নাসদাসীৎ নো সদাসীত্তদানীম্" বলিয়া অতি গম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রুতিতে আত্মবাদ বা সৎ-অদ্বিতীয়-বাদই আদৃত হইয়াছে, অসদ্‌বাদ বা শূন্যবাদ আদৃত হয় নাই। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সৎ হইতেই ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সৎ-কারণবাদই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।[১] কার্য-জগৎ উৎপত্তির

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি

১। শ্রুতির অসৎ শব্দে শূন্যবাদি-বৌদ্ধগণ শূন্যকে বুঝিয়া থাকেন। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকেই অসৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই অসৎ ব্রহ্মের তুলনায় পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎকে সদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অসৎ শব্দের শূন্য অর্থ গ্রহণ করিলে শূন্যবাদি-বৌদ্ধমত বৈদিক মতই হইয়া দাঁড়ায়। অসৎ বা শূন্য হইতে যে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আস্তিক দর্শন একমত। আস্তিক দার্শনিক গণ সকলেই উৎপত্তির পূর্বে সদ্‌বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন। অসৎ হইতে সৎ-বস্তুর উৎপত্তির কোনও দৃষ্টান্ত নাই। যদি বল যে, বীজ হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহাই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হইতে পারে; কেননা, সেখানে প্রথমতঃ বীজের ধ্বংস হয় এবং তাহার পরই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়; বীজ-ধ্বংসরূপ অসৎ কারণ হইতে অঙ্কুররূপ সৎ কার্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার উত্তরে আস্তিক দার্শনিকেরা বলেন যে, বট-বীজ হইতে বটের অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অশ্বত্থের অঙ্কুর হয় না, অশ্বত্থের বীজ হইতে অশ্বত্থের অঙ্কুর জন্মে, বটের অঙ্কুর জন্মে না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, সৎ বট-বীজের অবয়বই বটের অঙ্কুরের কারণ, অসৎ বটবীজ-ধ্বংস বটের অঙ্কুরের কারণ নহে। অসৎ বীজ-ধ্বংস অঙ্কুরের উৎপত্তির কারণ হইলে বটবীজ-ধ্বংস ও অশ্বত্থবীজ-ধ্বংস, এই দুইটি ধ্বংসের মধ্যে যখন কোন পার্থক্য নাই, তখন বট-ধ্বংস হইতে অশ্বত্থের ও অশ্বত্থ-ধ্বংস হইতে বটের অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি বল যে, বট-ধ্বংস ও অশ্বত্থ-ধ্বংস তুল্য নহে, তবে বলিতে হয় যে, বট-ধ্বংস ও অশ্বত্থ-ধ্বংসের অন্তরালে যে বট-বীজ ও অশ্বত্থ-বীজ আছে তাহাই বট-ধ্বংস ও অশ্বত্থ-ধ্বংসের

পূর্বে কারণ-শরীরেই বিদ্যমান ছিল। কারণ হইতে কার্যের কোন পৃথক্ সত্তা ছিল না। কেবল একমাত্র জগৎ-কারণই বিদ্যমান ছিল, অন্য কিছুই ছিল না, ইহাই নাসদীয় শ্রুতিতে 'নাসীদ্ রজঃ' এইরূপ নিষেধমুখে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সৃষ্টির রহস্য নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, এই জন্যই বৈদিক ঋষি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ', আর, এই সৃষ্টিরহস্য কে জানে? দেবতারা এই রহস্য অবগত নহেন, কারণ, তাঁহারাও সৃষ্টির পরেই প্রাদর্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং সৃষ্ট দেবতারা সৃষ্টির পূর্ব-রহস্য জানিতে পারেন না। এই বিশ্বসৃষ্টি কিভাবে কোথা হইতে হইল? কে সৃষ্টি করিল, বা করিল না, তাহা একমাত্র সর্বসাক্ষী পরমপুরুষই বলিতে পারেন।[১] সেই পুরুষ সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন ও সহস্রচরণ। তিনি বিশ্বব্যাপী হইয়াও বিশ্বাতিগ। এই নিখিল বিশ্ব তাঁহার এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাঁহার তিন-চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজ করে। তাঁহার এক অংশেই তিনি সমস্ত চেতন ও অচেতনে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যাহা কিছু ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহাও সেই পুরুষেরই আত্মস্বরূপ।[২] সেই একমাত্র প্রভু যাহাকে সহস্রলোচন, সহস্রনয়ন

ঋগ্বেদোক্ত পরম পুরুষের স্বরূপবর্ণনা এবং পুরুষ হইতে বিশ্বের সৃষ্টিবিশ্লেষণ

ভেদ সাধন করে, নতুবা বট-ধ্বংস ও অশ্বত্থ-ধ্বংসের বট ও অশ্বত্থ অংশ বাদ দিলে শুধু ধ্বংসটুকুই থাকিয়া যায়, তাহার মধ্যে কোন ভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বট-ধ্বংসকে কারণ বলিলেও সেখানে ঐ ধ্বংসের মধ্য দিয়া সদ্ বট-বীজ বা অশ্বত্থ-বীজকে কারণ বলিতে হয়। এই অবস্থায় অসদ্বাদ শূন্যবাদ শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। অন্যান্য শ্রুতিতে স্পষ্ট বাক্যেই সৎ পরমাত্মাকে জগতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ'। ঐতঃ উপঃ, ১।১। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৬।২।১) 'তদ্ধ এক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্', এই অসদ্বাদকে খণ্ডন করিয়া, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' বলিয়া সদ্বাদ স্থাপন করা হইয়াছে। এই সৎকে প্রকৃতপক্ষে সৎ ও অসৎ কিছুই বলা যায় না, সেই জন্যই ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন—নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্। ঋগ্বেদের উক্তির তাৎপর্য এই যে, জগতের পূর্বাবস্থায় সকলই অব্যক্ত এবং অনির্বাচ্য ছিল। অনির্বাচ্য হইতেই নামরূপাত্মক জগতের উদ্ভব হইয়াছে।

১। কো'দ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। ১০।১২৯।৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো'স্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো'ঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥—নাসদীয় সূক্ত, ১০।১২৯।৭

২। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি॥
এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদো'স্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
ত্রিপাদূর্ধ্বং উদৈৎ পুরুষঃ পাদো'স্যাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥—পুরুষসূক্ত, ১০।৯০।১-৪,

বলিয়াও ঋষি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহার অপরিমিত শক্তি ও গতির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন যে, সকল দিকেই তাঁহার চক্ষুঃ, সকল দিকেই মুখ এবং সকল দিকেই তাঁহার কর ও চরণ বিসারিত।

এই পুরুষ-সৃষ্ট জীবসমূহের সমষ্টি বলিয়া অনন্ত অসংখ্য জীবের অনন্ত অসংখ্য মস্তকই তাঁহার মস্তক। এই জন্যই ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে পুরুষকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু, সহস্রপাৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূক্তে বিশ্বের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে একটি বিরাট্ যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ এই বিশ্বসৃষ্টিযজ্ঞে নিজেকে বলি দিলেন। বলির পশুর মত ছিন্ন পুরুষের বিভিন্ন অবয়ব হইতে বিশ্বের বিচিত্র বিভিন্ন সৃষ্টির বিকাশ হইল। তাঁহার মস্তক হইতে আকাশ, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ ও পদ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাঁহার মনঃ হইতে চন্দ্রের, চক্ষুঃ হইতে সূর্যের এবং নিঃশ্বাস হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল। এক কথায়, চরাচর বিশ্বের যাহা কিছু বর্তমান আছে এবং হইবে সমস্তই সেই বিরাট্ পুরুষেরই আংশিক বিকাশ। জড় জগৎ ও প্রাণিজগৎ পুরুষেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই পুরুষই শতপথ ব্রাহ্মণে বৃহত্তম বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনিই দেবতাদিগকে এবং ঐ চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া ভূলোকে অগ্নিকে, অন্তরিক্ষলোকে বায়ুকে ও দ্যুলোকে সূর্যকে সংস্থাপিত করিলেন। এই জগতের ঊর্ধ্বে যে লোক এবং এই দেবতাদিগের ঊর্ধ্বে যে সকল দেবতা বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্ম তাহারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেলেন। তারপর তাঁহার মনে হইল কেমন করিয়া আবার চরাচর জগতে প্রত্যাবর্তন করিব। তিনি মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, নাম ও রূপ এই দুইকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় তিনি জগতে প্রত্যাবর্তন করিবেন—রূপেণৈব চ নাম্না চ। যাহা কিছু নাম ও রূপে বিদ্যমান সমস্তই সেই ব্রহ্ম। নাম ও রূপ সেই ব্রহ্মেরই মায়িক বিকাশ (Illusive manifestation)[১]। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে এই ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষের আশ্রয় কি ছিল? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি এই সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিলেন? সে কোন্ বন? কোন্ বৃক্ষের কাঠ, যাহা হইতে বিশ্বপতি এই দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতি গঠন করিয়াছেন? হে মনীষিগণ! তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ,

ঋগ্‌বেদের পুরুষই ব্রহ্ম এবং নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ

১। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদ্দেবানসৃজত, তদ্দেবান্ সৃষ্ট্বা এষু লোকেষু ব্যারোহয়দস্মিন্নেব লোকে'গ্নিং বায়ুমন্তরিক্ষে দিব্যেব সূর্যম্। অথ যে অত ঊর্ধ্বা লোকাস্তদ্ যা অত ঊর্ধ্বা দেবতাস্তেষু তা দেবতা ব্যারোহয়ৎ। অথ ব্রহ্মৈব পরার্ধমগচ্ছৎ। তৎ পরার্ধং গত্বৈক্ষত, কথং নু ইমান্ লোকান্ প্রত্যবেয়ামিতি। তদ্ দ্বাভ্যামেব প্রত্যবেৎ রূপেণৈব চ নাম্না চ - - - তে হৈতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে।
—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।২।৩

বিশ্বপতি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন?[১] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই সেই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ।—তৈঃ ব্রাঃ ২ কাঃ ৮ প্রঃ ৯ অনুবাক। সেই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মই সৃষ্টির ঊষায় হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভূতের ও বিশ্ব-প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোককে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। আমরা 'ক' অর্থাৎ সুখস্বরূপ, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয় সেই পরম দেবতাকে হবির দ্বারা যজ্ঞে পূজা করিব। যিনি জীবকে আত্মা দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, দেবতারা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্তও যাঁহার বশ, অমৃত যাঁহার ছায়া সেই আনন্দময় দেবতাকে আমরা যজ্ঞ দ্বারা পরিতুষ্ট করিব। যিনি নিজ অপার মহিমা দ্বারা প্রাণিজগতের, সমস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদের এক অদ্বিতীয় প্রভুরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি অভ্রভেদী পর্বতমালা ও কাননকুন্তলা, সাগরমেখলা এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন, বায়ুমণ্ডলকে স্ববশে রাখিয়াছেন, নির্মল জলরাশিকে প্রবর্তিত করিয়াছেন, স্বর্গলোককে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এক কথায়, চরাচর জগতের যিনি রাজা, সেই অমৃতময়, কল্যাণময়, প্রজাপতিকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করিব।[২] উল্লিখিত

বিশ্বসৃষ্টির দুর্জ্ঞেয়তা

১। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥
কিং স্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥—বিশ্বকর্মসূক্ত, ১০।৮১।৩-৪

দ্রষ্টব্য বিশ্বকর্মসূক্তে বন ও বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বিশ্বকর্মার যে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করার কথা বলা হইয়াছে, ইহার অনুরূপ বর্ণনা অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সূক্তে জল হইতে যে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে এবং ঐ জলের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিহিত আছে বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, অনুরূপ বর্ণনাও পুরাণে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বেদের এই সৃষ্টিব্যাখ্যাকে পৌরাণিক ব্যাখ্যার বীজ বলিয়া ধরা যায়। ঋগ্বেদে—"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্" বলিয়া অব্যক্ত অসৎ হইতে যে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং "পুরুষ এবেদং সর্বং" বলিয়া এই নিখিল জগৎই পুরুষের বিবর্তনের ফল বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এই সৃষ্টিব্যাখ্যার মূলে ক্রম-বিবর্তনকে অঙ্গীকার করা হইয়াছে বলিয়া উহাই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃত দার্শনিক ব্যাখ্যা। এই দার্শনিক ব্যাখ্যাই নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা এক ইদ্ রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

সূক্তে বৈদিক ঋষি তাঁহার শ্রদ্ধার হবিতে বেদান্ত-বেদ্য সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকেই যে অর্চনা করিয়াছেন তাহাতে সত্য-জিজ্ঞাসুর কোনও সন্দেহ নাই। সেই পরম পুরুষকে এক দিকে যেমন আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ড কারণরূপে এবং সমস্ত জাগতিক শক্তির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠারূপে উপলব্ধি করিতে পারি, অন্য দিকে তেমন আমাদের পিতা, জনিতা, বিধাতা রূপে, আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের আস্পদরূপে, আমাদের বুদ্ধির প্রেরকরূপে তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া শান্তিলাভ করি। জগৎকারণ পুরুষের বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ এই দুই রূপেই ঋষি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই দুই-এর মধ্যে ঐক্যের সন্ধানও তিনি লাভ করিয়াছেন। যে প্রেরণায় উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার উদ্‌বোধ হইয়াছিল সেই প্রেরণা ঋক্‌-মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিও লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ঋগ্‌বেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্তগুলির সহিত উপনিষদুক্ত তত্ত্ববিদ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ পরিলক্ষিত হয়।

ঋক্‌-সংহিতার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তদনুরূপ চিন্তাধারা আমরা অথর্ববেদেও দেখিতে পাই। অথর্ববেদে স্কম্ভ (support)-ব্রহ্মের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, স্কম্ভ-ব্রহ্মের বিরাট্‌ দেহের মধ্যেই এই নিখিল বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে, শুধু কেবল বিশ্বই নহে, সেই বিরাট্‌ স্কম্ভেরই বিভিন্ন অঙ্গে তপঃ, শ্রদ্ধা, ঋত ও সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার কোন অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, চন্দ্র আলোক প্রদান করিতেছে। তাঁহারই কোনও অঙ্গে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও স্বর্গোত্তরলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাখা যেমন বৃক্ষেতে সনুদ্ধ থাকে, সেইরূপ সমস্ত দেবতাগণ সেই বিরাট্‌শরীরী ব্রহ্মে সনুদ্ধ রহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি অন্ধকার বিদূরিত করেন এবং চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি যে সকল জ্যোতিঃপদার্থ প্রজাপতির শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সকলই স্কম্ভ-ব্রহ্মে অবস্থিত আছে।[১]

অথর্ববেদোক্ত স্কম্ভ-ব্রহ্মের বর্ণনা

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো'ন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥—ঋগ্‌বেদ, ১০।১২১।১-৪

উল্লিখিত শ্রুতির "কস্মৈ" পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

—কিংশব্দো'নির্জ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ প্রজাপতৌ বর্ততে।
যদ্বা, কং সুখং তদ্রূপত্বাৎ ক ইত্যুচ্যতে।—সায়ণ-ভাষ্য।

১। কস্মিন্নঙ্গে তপো'স্যাধিতিষ্ঠতি,
কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্‌।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি
কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্‌।—অথর্ববেদ, ১০।৭।১

কস্মাদঙ্গাৎ দীপ্যতে অগ্নিরস্য
কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা।
কস্মাদঙ্গাৎ বিমিমীতে'ধি চন্দ্রমাঃ
মহ স্কম্ভস্য মিমানো'ঙ্গম্‌।—অঃ বেঃ, ১০।৭।২

এই ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া অথর্ববেদে বলা হইয়াছে যে, যিনি অতীত ও অনাগত, ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, স্বর্গলোক যাঁহার অধীন সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যাহা কিছু স্থাবর, জঙ্গম ও বিমানচারী, যাহা কিছু প্রাণবান্ ও প্রাণহীন এবং যাহা এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্যের মূল, তাহা সমস্তই সেই ব্রহ্মে একীভূত হইয়া রহিয়াছে। যাহা কিছু অনন্ত ও যাহা কিছু সান্ত, সমস্তই তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যাহা হইতে সূর্য উদিত হয় এবং যাহাতে অস্ত যায়, তিনিই সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। সেই অকাম, অমৃত, ধীর, আত্মতৃপ্ত, স্বয়ম্ভূ এবং সর্বতঃ-পরিপূর্ণ, অজর, চির-তরুণ আত্মাকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না।[১]

অথর্ববেদে স্কম্ভ-ব্রহ্মের যে বর্ণনা পাওয়া গেল তাহাতে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মকে সর্ব-ব্যাপী এবং জগদাধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের বেদে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, বেদোক্ত প্রার্থনা, প্রার্থনাকারী ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝায়। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি-অর্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহা সব চেয়ে বড় বা বৃহত্তম তাহাই ব্রহ্ম অথবা যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহাই ব্রহ্ম। 'বৃহ্' ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃহ্' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধির যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই পরমমহান্ এবং ভূমা বলিয়া বেদান্তে পরিচিত। বিবৃদ্ধি অর্থ হইতে যাহা জীব ও জগতের বিবৃদ্ধির হেতু সেই জীব-জগদ্ব্যাপিনী চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

তস্মিন্ শ্রয়ন্তে যে উকে চ দেবাঃ
বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ।—অথর্ববেদ, ১০।৭।৩৮
অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্মনা
সর্বাণি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ।—অঃ বেঃ, ১০।৭।৪০

১। যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি,
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।—অঃ বেঃ, ১০।৮।১
যদেজতি পতি যচ্চ তিষ্ঠতি
প্রাণদপ্রাণং নিমিষচ্চ যদ্ভুবৎ।
তদ্দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং
তৎ সম্ভূয় ভবত্যেকমেব।—অঃ বেঃ, ১০।৮।১১
অনন্তং বিততং পুরত্রা
অনন্তমন্তবচ্চা সমন্তে।—অঃ বেঃ, ১০।৮।১২
যতঃ সূর্য উদেতি অস্তং যত্র চ গচ্ছতি
তদেব মন্যে'হং জ্যেষ্ঠং তদু নাত্যেতি কিঞ্চন।—অঃ বেঃ, ১০।৮।১৬
অকামো ধীরো'মৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো-
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্।—অঃ বেঃ, ১০।৮।৪৪

স্কম্ভ-ব্রহ্মের বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। এই এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই সকলের আত্মা। আত্মবাদ এবং ব্রহ্মবাদের উপরেই ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি, সুতরাং ভারতীয় দর্শন বুঝিতে হইলে এই আত্মবাদ ও ব্রহ্মবাদই বুঝা আবশ্যক। বৈদিক বিভিন্ন দেবতাবর্গ বিশ্বদেবের শরীরে একীভূত হইয়া প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি রূপে বেদে যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টতঃই দেবতাবর্গের বহুত্ব হইতে একত্বে পর্যবসান সূচিত হইয়া থাকে। ঐ একদেবতা-বাদ পুরুষ-সূক্তে পুরুষবাদের মধ্যে বিলীন হইয়াছে এবং বৈদিক পুরুষবাদ আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে।[১]

১। ঋগ্‌বেদোক্ত দেবতাবর্গের মৌলিক একত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া আমি আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্.এ. মহাশয়ের 'অদ্বৈতবাদের মূলে ঋগ্‌বেদ'-নামক প্রবন্ধ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

সংহিতা ও ব্রাহ্মণের বন্ধুর পথে অদ্বৈত বেদান্তের যে চিন্তাধারা ফল্গুধারার মত স্থূলদর্শীর অলক্ষিতে মৃদুগতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল তাহাই আরণ্যক ও উপনিষদে নানাভাব-তরঙ্গময়ী জ্ঞান-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত মোক্ষমূলর সত্যই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব আকস্মিক নহে। বহু পার্বত্য উৎসের ধারা ও পার্বত্য সরিৎপ্রবাহ একত্র মিলিত হইয়া যেমন সুবিশাল নদীরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ উপনিষদের গভীর আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ, বেদরূপ দূরবর্তী উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।[১]

১। These Upanishads did not spring into existence on a sudden : like a stream which has received many a mountain torrent, and is fed by many a rivulet, the literature of the Upanishads proves, better than anything else, that the elements of their philosophical poetry came from a more distant fountain.—Max Müller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 566.

উপনিষদের সংখ্যা অনেক। মুক্তিকোপনিষদে নিম্নলিখিত ১০৮খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে:—১ ঈশ, ২ কেন, ৩ কঠ, ৪ প্রশ্ন, ৫ মুণ্ডক, ৬ মাণ্ডূক্য, ৭ তৈত্তিরীয়, ৮ ঐতরেয়, ৯ ছান্দোগ্য, ১০ বৃহদারণ্যক, ১১ ব্রহ্ম, ১২ কৈবল্য, ১৩ জাবাল, ১৪ শ্বেতাশ্বতর, ১৫ হংস, ১৬ আরুণি, ১৭ গর্ভ, ১৮ নারায়ণ, ১৯ পরমহংস, ২০ অমৃতবিন্দু, ২১ অমৃতনাদ, ২২ অথর্বশিরঃ, ২৩ অথর্বশিখা, ২৪ মৈত্রায়ণী, ২৫ কৌষীতকী, ২৬ বৃহজ্জাবাল, ২৭ নৃসিংহতাপনীয়, ২৮ কালাগ্নিরুদ্র, ২৯ মৈত্রেয়ী, ৩০ সুবাল, ৩১ ক্ষুরিকা, ৩২ মন্ত্রিকা, ৩৩ সর্বসার, ৩৪ নিরালম্ব, ৩৫ শুকরহস্য, ৩৬ বজ্রসূচিকা, ৩৭ তেজোবিন্দু, ৩৮ নাদবিন্দু, ৩৯ ধ্যানবিন্দু, ৪০ ব্রহ্মবিদ্যা, ৪১ যোগতত্ত্ব, ৪২ আত্মবোধ, ৪৩ পরিব্রাট্, ৪৪ ত্রিশিখী, ৪৫ সীতা, ৪৬ যোগচূড়া, ৪৭ নির্বাণ, ৪৮ মণ্ডল, ৪৯ দক্ষিণামূর্ত্তি, ৫০ শরভ, ৫১ স্কন্দ, ৫২ মহানারায়ণ, ৫৩ অদ্বয়, ৫৪ রামরহস্য, ৫৫ রামতাপনীয়, ৫৬ বাসুদেব, ৫৭ মুদ্গল, ৫৮ শাণ্ডিল্য, ৫৯ পৈঙ্গল, ৬০ ভিক্ষু, ৬১ মহা, ৬২ শারীরক, ৬৩ যোগশিখা, ৬৪ তুরীয়াতীত, ৬৫ সন্ন্যাস, ৬৬ পরিব্রাজক, ৬৭ অক্ষ-মালিকা, ৬৮ অব্যক্ত, ৬৯ একাক্ষর, ৭০ অনুপূর্ণা, ৭১ সূর্য, ৭২ অক্ষি, ৭৩ অধ্যাত্ম, ৭৪ কুণ্ডিকা, ৭৫ সাবিত্রী, ৭৬ আত্মা, ৭৭ পাশুপত, ৭৮ পরব্রহ্ম, ৭৯ অবধূত, ৮০ ত্রিপুরাতাপনী, ৮১ দেবী, ৮২ ত্রিপুরা, ৮৩ কঠরুদ্র, ৮৪ ভাবনা, ৮৫ রুদ্রহৃদয়, ৮৬ যোগকুণ্ডলী, ৮৭ ভস্মজাবাল, ৮৮ রুদ্রজাবাল, ৮৯ গণপতি, ৯০ জাবালদর্শন, ৯১ তারাসার, ৯২ মহাবাক্য, ৯৩ পঞ্চব্রহ্ম, ৯৪ প্রাণাগ্নিহোত্র, ৯৫ গোপালতাপনীয়, ৯৬ কৃষ্ণ, ৯৭ যাজ্ঞবল্ক্য, ৯৮ বরাহ, ৯৯ শাট্যায়নীয়, ১০০ হয়গ্রীব, ১০১ দত্তাত্রেয়, ১০২ গরুড়, ১০৩ কলিসন্তরণ, ১০৪ জাবালি, ১০৫ সৌভাগ্য, ১০৬ সরস্বতীরহস্য, ১০৭ বহ্বৃচ ও ১০৮ মুক্তিক।

বৈদিক সংহিতার অনুরূপ প্রশ্ন ও উত্তর আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই। উপনিষদের ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন—কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া আমাদের মন

উল্লিখিত একশত আটখানির সঙ্গে নৃসিংহোত্তরতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, রামোত্তরতাপনীয় ও অপর একখানি নারায়ণোপনিষৎ যোগ করিয়া ১১২ খানি উপনিষৎ বোম্বে নির্ণয়-সাগর-প্রেসকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০ খানি উপনিষৎ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাহাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার উদ্‌যোগে পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ পারস্য অনুবাদ ১৮০১-২ সালে ল্যাটিন ভাষায় পুনরায় অনুবাদিত হয়। ইহা হইতেই পাশ্চাত্ত্য দেশে উপনিষদুক্ত তত্ত্ব-আলোচনার সূত্রপাত হয়। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা হিসাবে উপনিষদে নিম্নলিখিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের নাম শুনা যায়—মহীদাস ঐতরেয়, রৈক্ব, শাণ্ডিল্য, সত্যকাম জাবল, জৈবলি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, ভারদ্বাজ, গার্গ্যায়ণ, প্রতর্দ্দন, চাক্রায়ণ, বালাকি, অজাতশত্রু, যাজ্ঞবলক্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ী।

উল্লিখিত উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর এই কয়খানি উপনিষদের উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ফলে, এই কয়খানি উপনিষদের প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে সুধীজনের কোন সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ঐ সকল উপনিষদের উক্তি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইহাদের সহিত কৌষীতকী, জাবাল, মহানারায়ণ এবং পৈঙ্গ উপনিষদের উক্তিও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ঐ সকল উপনিষদেরও প্রামাণ্য সাব্যস্ত হয়। কৌষীতকী উপনিষদের উপর শাঙ্কর-ভাষ্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যায় না।

যে সকল উপনিষদের উপর আচার্য শঙ্কর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ঐ সকল সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদে বেদান্ততত্ত্ব আলোচিত, বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষৎ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে মৌলিক চিন্তার সমাবেশ নিতান্তই অল্প। উহারা হয়তো পূর্বোক্ত উপনিষদের রহস্য-উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, অথবা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতের বিবরণ, যোগ এবং যোগবিভূতি প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ। ঐ বিদ্যার আলোচনার দৃষ্টিতে ঐ সকল উপনিষদের স্থান ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের অনেক নিম্নে। ইহাদের রচনাকালও যে প্রাচীন উপনিষদের তুলনায় অনেক পরবর্তী, তাহা নিঃসন্দেহ। উইনটারনিজ্ (Winternitz) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সমগ্র উপনিষৎ সাহিত্যকে চারটি বিভিন্ন যুগ-পর্যায়ে (Four Periods) বিভক্ত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকী এবং কেন, ইহারা প্রথম শ্রেণী বা প্রথম যুগপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; কঠ, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মহানারায়ণীয় উপনিষৎ দ্বিতীয় যুগপর্যায়ে; প্রশ্ন, মৈত্রায়ণী, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ তৃতীয় যুগপর্যায়ে ও অবশিষ্ট উপনিষৎসমূহ চতুর্থ যুগপর্যায়ে বিভক্ত। প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব এক হাজার হইতে তৃতীয়, কি চতুর্থ শতক—1000 B.C. to 300. 400 B.C. কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে প্রাচীনতম উপনিষৎসমূহ রচিত হয়। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপনিষৎগুলির মধ্যে কতকগুলি তাঁহাদের মতে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কতকগুলি বুদ্ধের পরবর্তী কালের রচনা। সাম্প্রদায়িক উপনিষৎগুলি যে প্রাচীন নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু প্রাচীনতম বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের রচনাকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলনের অনতিকাল পরেই আরণ্যক ও উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল। সংহিতার সঙ্কলনকাল যে কুরুক্ষেত্র সমরের সমসাময়িক ঘটনা, ইহা এই দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই

ক্রিয়াশীল হয়? কাহার ইচ্ছায় আমাদের বাক্যস্ফূর্তি হয়? কোন্ দেবতা আমাদের চক্ষু ও কর্ণকে তাহাদের স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? উত্তর হইল—তিনি আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু। চক্ষু যেখানে যায় না, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন যেখানে প্রবেশ করে না, তাঁহাকে আমরা স্থূল বস্তুর মত দেখিতে পারি না, জানিতে পারি না। তাঁহার কথা আমরা কেমন করিয়া বলিব? তিনি জানা ও অজানার বাহিরে।[১]

তিনি বিরাট্, পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও মহান্, দ্যুলোক অপেক্ষাও মহান্, এমন কি, সমস্ত লোকসমষ্টি হইতেও তিনি মহান্। এইজন্যই তাঁহাকে ব্রহ্ম বা বৃহত্তম (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম) বলা হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আমরা তাঁহার এই বিরাট্ রূপেরই পরিচয় পাইয়াছি। সেই বিরাট্ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন—তাঁহার কর ও চরণ সর্বত্র বিসারিত, সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার শির। সকলের মুখই তাঁহার মুখ, সকলের শিরই তাঁহার শির, সকলের গ্রীবাই তাঁহার গ্রীবা। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী। নিখিল বিশ্বই তাঁহার রূপ। মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মের বিরাট্ রূপের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে যে, দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য তাঁহার

ব্রহ্মের স্বরূপ

স্বীকার করেন। এ-দেশীয় পণ্ডিতগণের মতে ৫০০০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র সমর সঙ্ঘটিত ও বৈদিক সংহিতা সঙ্কলিত হয়, ইহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে পাদটীকায় (৫১ পৃঃ) আলোচনা করিয়াছি। শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থও খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে তিলক তাঁহার 'ওরায়ন' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়ই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ তিন অধ্যায়ই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত, ইহা হইতেই বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষৎ যে খৃষ্টপূর্ব দুই হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের প্রাচীনতা উপনিষদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও জানা যায়। বৈদিকসংহিতা ও উপনিষদে তত্ত্ববিদ্যার একই স্বর ধ্বনিত হইতেছে। তারপর, উপনিষদে অনেক প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত আছে, ঐ সকল শ্লোকের ভাষা অতি প্রাচীন, উহা আর্য-বৈদিক সংস্কৃতে রচিত। উহা পাঠ করিলে উপনিষদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। উপনিষদের মধ্যে যে রহস্য-উপদেশ ও গুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে তাহা হইতে উপনিষদের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

১। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ------
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি------

—কেনোপনিষৎ, প্রারম্ভ

চক্ষুঃ, দিক্ তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাণী, বায়ু তাঁহার প্রাণ, পৃথিবী তাঁহার চরণ, সর্বভূতের হৃদয় তাঁহার আবাসগৃহ।[১]

তিনি অনাদি অনন্ত, ধ্রুব এবং ক্ষয়ব্যয়রহিত। এই অক্ষর ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, ছায়াও নহেন, তমঃও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, রসও নহেন, শব্দও নহেন, গন্ধও নহেন, চক্ষুও নহেন, শ্রোত্রও নহেন, বাক্যও নহেন, মনও নহেন, তেজও নহেন, প্রাণও নহেন, অন্তরও নহেন, বাহিরও নহেন। তিনি প্রজ্ঞানঘনও নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। তিনি দর্শনের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ব্যবহারের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত, একমাত্র আত্মারূপেই প্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।[২] শ্রুতিতে এইরূপে নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, যেভাবেই ব্রহ্মকে জানিতে যাও না কেন, তাঁহার যে নামই দেও না কেন, তাঁহার কোনটিও ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্ম-বস্তু সর্ববিধ জ্ঞাত ও পরিচিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন। তিনি অবাঙ্মনসগোচর। তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়ের বাহিরে। এই জন্যই ব্রহ্মকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'তিনি এইরূপ' এই ভাবে (Positively) প্রকাশ করা যায় না, নিষেধমুখে (Negatively) অর্থাৎ নেতি, নেতি, তিনি ইহা নহেন, তিনি তাহা নহেন, এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে

নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম

১। জ্যায়ান্ পৃথিব্যাজ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।—ছাঃ, ৩।১৪।৩
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতো'ক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৬
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।—শ্বেতাশ্বতর, ৩।৩
সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১১
অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা।—মুণ্ডক, ২।১।৪

২। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।—কঠ, ৩।১৫
এতদ্ বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্ অচ্ছায়-
মতমো'বায়ু, অনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাক্
অমনো'তেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্।—বৃহদাঃ, ৩।৮।৮
নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞ-
মদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্—স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ।—মাণ্ডুক্য, ৭
এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্ম।—ছাঃ, ৪।১৫।১; অক্ষরং ব্রহ্মযৎপরম্,—কঠ, ৩।২;
শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।—ঈশ, ৮

পারা যায়। তাঁহার উর্ধ্বে আর কিছুই তত্ত্ব নাই, ব্রহ্মতত্ত্বই চরম ও পরম তত্ত্ব।[১] ব্রহ্ম জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয়ও নহেন, দ্রষ্টা নহেন, দৃশ্য নহেন, দর্শনও নহেন, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; তিনি চিৎ নহেন, জড়ও নহেন, তিনি সুখও নহেন, দুঃখও নহেন; অথচ তিনি সবই বটেন, তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-সমন্বয়। দেশ, কাল ও নিমিত্ত যখন তাঁহার বাহিরে নহে, তখন দ্বৈতই বা কি? আর অদ্বৈতই বা কি? ফলতঃ, তিনি দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন। ব্রহ্ম সকল দ্বৈতাদ্বৈতের একান্ত অবসান (Supreme Unity of all contradictions) ইহাই শ্রুতির ব্রহ্ম উপদেশের তাৎপর্য। এই জন্য উপনিষদে পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ের ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি অণু হইতেও অণু, আবার মহৎ হইতেও মহত্তম। তিনি অমূর্ত অথচ জগন্মূর্তি। তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। তিনি অসীমও বটেন সসীমও বটেন, অখণ্ডও বটেন সখণ্ডও বটেন। তিনি স্থির অথচ গতিশীল। এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ উপদেশ করিয়া শ্রুতি ব্রহ্মে চিরদ্বন্দ্বের সমন্বয়েরই নির্দেশ দিয়াছেন। ব্রহ্ম সৎ, অসৎ, চিৎ, জড়, সুখ, দুঃখ এই সকলেরই চির অবসানভূমি। ব্রহ্মবস্তু বেদান্তের ভাষায় অনির্বেদ্য। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিরুপাধি। নিরুপাধি শব্দের অর্থ কি? সমস্ত ব্যাবহারিক

নির্গুণ, নিরুপাধি ব্রহ্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত

জগৎই দেশ, কাল, নিমিত্ত বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ, এই ত্রিবিধ উপাধির অধীন। ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। এই দৃষ্টিতেই ব্রহ্মকে উপনিষদে নির্বিশেষ ও নিরুপাধি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের দেশাতীত অবস্থা বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে এবং পৃথিবীর অধোদেশে বর্তমান, দ্যুলোক এবং ভূলোক যাহার মধ্যে

ব্রহ্ম দেশের অতীত

অবস্থিত, সেই আকাশ-ব্রহ্মে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয় ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে।" ছান্দোগ্য বলিয়াছেন ব্রহ্মই উর্ধ্বে, ব্রহ্মই অধোদেশে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই সম্মুখে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই উত্তরে, সমস্তই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম এক এবং অনন্ত, তিনি পূর্বেও অনন্ত, পশ্চিমেও অনন্ত, দক্ষিণেও অনন্ত, উত্তরেও অনন্ত, সব দিকেই অনন্ত।[২]

১। স এষ নেতি নেতি আত্মা। বৃহদাঃ, ৪।৫।১৫; অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি। —বৃহদাঃ, ২।৩।৬

২। স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী
ইমে যদ্ ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।—বৃহদাঃ, ৩।৮।৭
স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বম্।—ছাঃ, ৭।২৫।১
ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ
প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত উর্ধ্বং চ অবাক্ চ সর্বতোঽনন্তঃ।—মৈত্র্যুপনিষৎ, ৬।১৭

দেশের অতীত ব্রহ্ম কালাতীতও বটেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ স্পষ্টতঃ ব্রহ্মকে কালত্রয়ের অতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—পরঃ ত্রিকালাৎ, শ্বেতঃ, ৬।৫। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম চির-সত্য, সনাতন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তাঁহার পরিমাপ করিতে পারে না; তিনি ভূত এবং ভব্যের (ভবিষ্যতের) অধীশ্বর,—ঈশানং ভূতভব্যস্য, বৃহদাঃ, ৪।৪।১৫। তিনি কালাধীশ, কাল তাঁহার অন্তরে অবস্থিত। যিনি দেশের অতীত ও কালের অতীত, শাশ্বত, ধ্রুব, অক্ষর, অব্যয় ও কূটস্থ, তিনি যে নিমিত্তের অর্থাৎ কার্য-কারণের অতীত এবং স্বয়ং সর্বকারণ-কারণ তাহাতে সন্দেহ কি?[১]

ব্রহ্ম কালের অতীত

ব্রহ্ম নিমিত্ত বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত

দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয় এবং অনির্দেশ্য। নির্বিশেষ ব্রহ্মে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষবোধের উদয় হইতে পারে না। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ব্রহ্মে একীভূত, দ্রষ্টা, দৃশ্য একাকার, সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়' হইবেন কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম বেদান্তের ভাষায় বিষয়ী (subject), আর, জ্ঞেয় জড়বস্তু বিষয় (object)। জ্ঞাতা বিষয়ী (subject) ও জ্ঞেয় বিষয়ের (object) ভেদ সুপ্রসিদ্ধ। বিষয়ী (subject) বিষয় (object) হইতে পারে না, কারণ, বিষয় (object) হইলে উহা আর বিষয়ী (subject) থাকিতে পারে না, জ্ঞেয় জড় বস্তুর মত জড় বস্তুই হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি বিষয় এবং বিষয়ী এই উভয়েরই উর্ধ্বে, বিষয় ও বিষয়ীর, জড়ও জীবের অন্তরে বিরাজ করেন। তিনি নিখিল বিশ্বের দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে?[২]—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহদাঃ, ২।৪।১৪। তিনি অবিজ্ঞাত অজ্ঞেয় হইয়াও বিজ্ঞাতা—অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, বৃহদাঃ, ৩।৮।১১, অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই, অন্য কোন জ্ঞাতা নাই, তিনিই সর্বান্তর সর্বান্তর্যামী অমৃত আত্মা। এই আত্মাই সূত্র। এই সূত্রেই নিখিল বিশ্ব গ্রথিত আছে। আত্মাই সর্বত্র সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে সদা বিরাজমান এবং যাহা কিছু চতুর্দিকে বিদ্যমান সমস্তই

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়

১। In Indian language Brahman, in contrast with the empirical system of the universe, is not like it in space but is spaceless, not in time but timeless, not subject to but independent of the law of causality. —Deussen's *Philosophy of the Upanishads*, p. 150.

২। The supreme atman is unknowable, because he is all-comprehending unity, whereas all knowledge presupposes a duality of subject and object.—Deussen's *Philosophy of the Upanishads*, p. 79.

The Atman, as the knowing subject, is itself always unknowable. —*Ibid.*, p. 236.

সেই আত্মা।[১] আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই ভূমা। ভূমা কাহাকে বলে? যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনিই ভূমা, আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন; যিনি ভূমা তিনিই অমৃত। যাহা অল্প তাহাই মর্ত্ত্য ও বিনাশী।[২] এই ভূমা ব্রহ্মে দ্বৈতের বা ভেদের কোনও স্থান নাই। ভেদ থাকিলেই, দ্বৈত থাকিলেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়; ভূমার সকল প্রকার ভেদ তিরোহিত হয়, সুতরাং ভূমা ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইবেন কিরূপে?

ভূমা ব্রহ্মবাদ

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয়, অনির্দেশ্য হইলেও নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপনিষদে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই সদ্‌ভাব, চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাবের বিশ্লেষণ আমরা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রামাণিক উপনিষদে দেখিতে পাই।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ

ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে সত্যই ব্রহ্মের নাম—তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্—ছাঃ ৮।৪।৪, বৃহদারণ্যক উপনিষদে আবার ব্রহ্মকে 'সত্যস্য সত্যম্' বলা হইয়াছে—তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি—বৃহদাঃ, ২।১।২০, এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনারও উপদেশ করা হইয়াছে।[৩] ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সত্য বস্তু, তাহার তুলনায় বিশ্বের অন্য সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, ব্রহ্মের এই পরমার্থ সত্যতা (Absolute Reality) বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মকে 'সত্যস্য সত্যম্' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের সদ্‌ভাব

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই চিন্ময় বা জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ। বিশ্বের অন্য সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম-জ্যোতিদ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই; এই জন্যই উপনিষদে ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পুরুষ বা আত্মাকে প্রকাশ করে কে? জনকের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ ও প্রকাশক। আত্মার জ্যোতিদ্বারাই সমস্ত জীব ও জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া থাকে। পুরুষ, আত্মা

ব্রহ্মের চিদ্‌ভাব

১। আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণতঃ আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি। —ছাঃ, ৭।২৫।১

২। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং; যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।—ছাঃ, ৭।২৪।১।

৩। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,—তৈত্তিঃ, ২।১, সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম—নৃসিংহতাপনীয়, ১।৬, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,—বৃহদাঃ, ৩।৯।২৮।

প্রজ্ঞা ইত্যেনদুপাসীত, সত্যমিত্যেনদুপাসীত, আনন্দ ইত্যেনদুপাসীত।

বা ব্রহ্মই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম জ্যোতিঃ।[১] এই জ্যোতিঃ নিত্যভাস্বর, এই জ্যোতির কখনও বিলোপ হয় না। যেখানে সূর্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতারার প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের বিকাশ নাই, অগ্নির আলোক নাই, সেখানেও এই নিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থই এই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-প্রভায়ই প্রভাবান্, ব্রহ্মের আলোকেই দ্যুতিমান্, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি জড়-জ্যোতিঃ ব্রহ্মজ্যোতির ছায়ামাত্র।[২]

> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।—কঠ ৫।১৫; শ্বেত, ৬।১৪

উক্ত কঠশ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া গীতায় শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, সূর্যের যে তেজঃ নিখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজঃ বিদ্যমান তাহা আমারই তেজঃ বলিয়া জানিবে।[৩] আত্মার চিন্ময় রূপ বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন যে, লবণখণ্ডের যেমন ভিতর ও বাহির সমস্তই লবণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ বিজ্ঞানময় আত্মার অন্তর ও বাহির বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।[৪] এই বিজ্ঞান বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নহে, উহা জন্য জ্ঞান, ঐ জন্য জ্ঞানের উৎপত্তিও হয়, বিনাশও হয়। আত্মবিজ্ঞান নিত্য সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না। কারণ, বিজ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। যতক্ষণ বিজ্ঞানময় আত্মা আছে ততক্ষণ বিজ্ঞানও থাকিবে, বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না, হইতে পারে না। সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপও বটেন—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—বৃহদাঃ, ৩।৯।২৮,

ব্রহ্মের আনন্দভাব

ব্রহ্ম আনন্দের সমুদ্র, ব্রহ্মই প্রাণ, ব্রহ্মই প্রজ্ঞা, ব্রহ্মই আনন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ অপরিমিত আনন্দ, ইহার কোন সীমা নাই, ইহা অসীম অখণ্ড ভূমানন্দ। এই আনন্দ সাংসারিক বিষয়ানন্দ নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখের অতীতাবস্থা।[৫] মানুষ যখন এই

১। কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি, আত্মনা এবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি।—বৃহদাঃ ৪।৩।৬,
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে'মৃতম্।—বৃহদাঃ, ৪।৪।১৬

২। ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো'য়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥—কঠ, ৫।১৫; শ্বেত, ৬।১৪
ও মুণ্ডক, ২।২।১০

৩। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥—গীতা, ১৫।১২

৪। স যথা সৈন্ধবঘনো'নন্তরো'বাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরো'বাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।—বৃহদাঃ, ৪।৫।১৩

৫। এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দো'জরো'মৃতঃ।—কৌষীঃ, ৩।৮
আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপো'পরিমিতানন্দসমুদ্রো'বিশিষ্টসুখরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে—সর্বোপনিষৎ, ৩৫২ পৃঃ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

আনন্দের সন্ধান পায় তখন সাংসারিক বিষয়ানন্দকে দুঃখেরই রূপান্তর বলিয়া বিষের মত পরিত্যাগ করে। জাগতিক ভোগবিলাসের মধ্যে মানুষের যে আনন্দবোধ রহিয়াছে, তাহা অনন্ত ব্রহ্মানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম কণিকামাত্র। সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ, পূর্ণ ব্রহ্মই জীব ও জগতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছেন এবং জীবের বিষয়ভোগের মধ্যে আনন্দরূপে ও রসরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে বিষয়ের মধ্য দিয়া আস্বাদন করে বলিয়াই জীব বিষয়ভোগেও আনন্দ লাভ করে।[১] তবে, এই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিষয়ানন্দ অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহার সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পষ্ট ধারণা আছে, এই জন্যই তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে বিষয়ানন্দকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সমৃদ্ধিশালী এবং সমস্ত জাগতিক ভোগ যাঁহার করায়ত্ত, যিনি সকলের অধিপতি, তাঁহার যে আনন্দ সেই আনন্দই মানুষের পরম আনন্দ বা আনন্দের পরাকাষ্ঠা ; পিতৃলোকের আনন্দ ঐ মনুষ্যলোকের আনন্দের শতগুণ ; গন্ধর্বলোকের আনন্দ আবার পিতৃলোকের আনন্দের শত গুণ। যাঁহারা স্বীয় কর্মফলে দেবত্ব-লাভ করিয়াছেন ঐ কর্ম-দেবগণের আনন্দ গন্ধর্বলোকের আনন্দের শতগুণ, যাঁহারা স্বভাবতঃই দেবতা অর্থাৎ কর্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করেন নাই তাঁহাদের আনন্দ কর্ম-দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ। নিষ্পাপ, নিষ্কাম, শ্রোত্রিয়ের আনন্দও স্বভাবদেবতার আনন্দেরই তুল্য। প্রজাপতি-লোকের আনন্দ আবার এই দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ। ব্রহ্মলোকের আনন্দ প্রজাপতিলোকের আনন্দের শতগুণ। ইহাই পরম আনন্দ, আনন্দের পরাকাষ্ঠা বা ব্রহ্মানন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক।[২] তৈত্তিরীয় উপনিষদেও ঐরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ সকল দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, ব্রহ্মানন্দ অপরিমেয় ও অসীম, ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। শ্রুতি বলিয়াছেন, বাক্য ও মন যাহাকে ধরিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মানন্দকে জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকে না।[৩]

১। এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহঃ, ৪।৩।৩২
রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।—তৈঃ, ৭।২

২। স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দো’থ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দো’থ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দো’থ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে’থ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়ো’বৃজিনো’কামহতো’থ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়ো’বৃজিনো’কামহতোহথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়ো’বৃজিনো’কামহতো’থ এষ পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩৩; তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী ৮।২ দ্রষ্টব্য।

৩। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।।—তৈত্তিরীয়, ২।৯।১

এইরূপে উপনিষদে ব্রহ্মের সদ্‌ভাব, চিদ্‌ভাব, আনন্দভাবের বর্ণনা করিলেও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হইবেন কিরূপে? আর, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হইলে তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ রহিবেন কিরূপে? ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়াই তো শ্রুতি কেবল "নেতি নেতি" দ্বারা অর্থাৎ "ইহা ব্রহ্ম নহে", "উহা ব্রহ্ম নহে", এইরূপে নিষেধমুখে নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য নিষেধসূচক 'ন'-এর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ হইলে বিধিমুখে (positive process)-ই তো শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে পারিতেন? শ্রুতি তাহা করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত বেদান্তী বলেন যে, ব্রহ্মের সদ্‌ভাব, চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাব ব্যাখ্যা করায় আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকে সগুণ, সবিশেষ বলিয়া মনে হইলেও ব্রহ্ম সেরূপ নহেন। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই পদত্রয় বস্তুতঃ 'নেতি'রই প্রতিরূপ, অভাবের সূচক মাত্র; সৎ শব্দের অর্থ মিথ্যা নহে, চিৎ শব্দের অর্থ জড় নহে, আনন্দ শব্দের অর্থ দুঃখরূপ নহে। পরব্রহ্মকে সৎ বলিলে বুঝায় যে, জগৎ যেমন ভঙ্গুর ও মিথ্যা, ব্রহ্ম সেরূপ মিথ্যা নহে। চিদ্ বলিলে বুঝায়, জড়বস্তু যেমন অপ্রকাশ এবং তমঃস্বভাব, ব্রহ্মবস্তু সেরূপ নহে, ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং স্বপ্রকাশ; আনন্দ বলিলে বুঝায় যে, ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, দুঃখস্বরূপ নহে। এইরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি পদ অভাব-পরিচয়েই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে; এবং ব্রহ্ম যে অন্য সকল জাগতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণ তাহা বুঝাইয়া দেয়।[১] এই অভাবও এখানে একটি অতিরিক্ত পদার্থ বা বিশেষধর্ম নহে, ইহা সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপব্যাখ্যামাত্র। যেমন সাদা বলিলে স্বভাবতঃই বুঝায় যে কালা নহে, এই কৃষ্ণতার অভাব যেমন শুক্লতারই স্বরূপ, কোন অতিরিক্ত বস্তু নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বলিলে স্বভাবতঃ ব্রহ্ম মিথ্যা, জড় ও দুঃখস্বভাব নহে, ইহাই বুঝা যায়। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই পদত্রয় যথাক্রমে ব্রহ্মে মিথ্যাত্ব, জড়তা ও দুঃখস্বরূপের অভাব সাধন করে বলিয়া সার্থকও বটে। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন, জড়ও নহেন, অজড়ও নহেন, আনন্দও নহেন নিরানন্দও নহেন। ইহা সদসতের অতীত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত, ব্রহ্ম বিজ্ঞান। ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলেও অজ্ঞাত তত্ত্ব নহে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরিতনবর্তী 'প্রজ্ঞানের' সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায়; সাধারণ জ্ঞানের তিনি অগম্য হইলেও যোগদৃষ্টির সাহায্যে তাঁহাকে দেখা যায়। যোগদৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ্ বলেন যে, অধ্যাত্মবোধ অধিগত হইলে সেই দেবকে জানিয়া ধীরব্যক্তি সাংসারিক সুখদুঃখ অতিক্রম করেন। জীব যখন জ্যোতির্ময় কর্তা ঈশ্বর বা ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করে, তখন সে

১। All three definitions of Brahman as being, thought or bliss are in essence only negative. Being is the negation of all empirical being, thought, the negation of all objective being, bliss, the negation of all being that arises in the mutual relation of knowing subject and known object.—Deussen's *Philosophy of the Upanishads*, p. 147.

পাপপুণ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নির্মল হইয়া ব্রহ্মের সমতা লাভ করে। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত সাধক ধ্যানযোগে অখণ্ড পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।[১] 'তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যে এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে। নির্গুণ, নির্বিশেষ, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া গেল। এতদ্‌ব্যতীত ব্রহ্মের সগুণ ভাবের বর্ণনাও উপনিষদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মের সগুণ ভাব

উপনিষদের মতে সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে। নির্গুণ ও সগুণ একই তত্ত্ব। যিনি স্বতঃ নির্গুণ, তিনিই মায়াবশে সগুণ হন। গুটিপোকা যেমন জাল রচনা করিয়া নিজকে সেই জালে আবৃত করে, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মও অনাদি মায়াজালে আপনাকে আবৃত করিয়া সগুণ ও সবিশেষ হন। মায়াই ব্রহ্মের যবনিকা, এই মায়াই জগজ্জননী প্রকৃতি, মায়াময় ব্রহ্মই ঈশ্বর বা মহেশ্বর।[২] এইরূপেই তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সগুণ ব্রহ্মের একটি রহস্যনাম দিয়াছেন 'তজ্জলান্' (ছাঃ ৩।১৪।১) তজ্জ, তল্ল ও তদন; অর্থাৎ (তজ্জ) তাহা হইতেই জগৎ জাত, (তল্ল) তাহাতেই লীন এবং (তদন) তাহাতেই অবস্থিত। ছান্দোগ্যের এই রহস্য উপদেশটি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আরও স্পষ্টবাক্যে বলা হইয়াছে। যাহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হইতেছে এবং উৎপন্ন হইয়া যাহাদ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং পরিণামে যাহাতে বিলীন হইবে তাহাই ব্রহ্ম।[৩] এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ করা হইয়াছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ, ১।১।২)[৪]।

এই বিশ্বযোনি ব্রহ্মই, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি। ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপালক, সর্বলোকের বিভাজক, ধারক এবং পোষক। ইনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। ইনি ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর,

---

১। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—কঠ, ২।১২
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি দিব্যম্ ॥—মুণ্ডক, ৩।১।৩
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। মুণ্ডক, ৩।১।৮

২। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। শ্বেতাশ্বঃ, ৪।১০

৩। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।—তৈত্তিঃ, ৩।১

৪। নির্বিশেষব্রহ্মবাদী আচার্য, শঙ্করের মতে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২), ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ (তৈঃ, ২।১), ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ বিভাবই যে উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আচার্য শঙ্কর তৎকৃত শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্র-শংভাষ্য, ১।২।১১ দ্রষ্টব্য। কিন্তু, তাঁহার মতে সগুণ ভাব মায়িক, নির্গুণ ভাবই সত্য। সগুণব্রহ্মবাদী আচার্য রামানুজের মত শঙ্করমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আচার্য রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম অসত্য। তিনি তাঁহার শ্রীভাষ্যে শঙ্কর-মত পূর্বপক্ষরূপে উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১১, ৩।২।১৪ ও ৩।২।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য।

দেবতাগণেরও পরম দেবতা; প্রজাপতিরও ইনি পতি, ইনি বিশ্বপতি, এই নিখিল বিশ্বের ইনি কর্তা ও শাসক।[১] জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই বিভাব বা মায়িক বিকাশ। প্রলয়ের অন্ধকারে যখন নিখিল বিশ্ব আবৃত ছিল, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছুই ছিল না, চরাচর জগৎ ব্রহ্মেই বিলীন ছিল। স্বষ্টির উষায় সেই প্রলয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বয়ং-জ্যোতিঃ ব্রহ্ম জীব ও জগৎ রূপে প্রকাশিত হইলেন। আপনার মধ্যে বিলীন জগৎকে আবির্ভাব করাইলেন। স্বষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার কাম, কামনা বা স্বজনীবৃত্তির উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন "এক আমি বহু হইব", আমি জন্মগ্রহণ করিব। তাঁহার এই বহু হইবার প্রবৃত্তি, জগৎস্বষ্টির ইচ্ছা, মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মায়া বা কাম প্রলয়ের অবস্থায় ব্রহ্মের মধ্যেই সুপ্ত ছিল, স্বষ্টির প্রথম মুহূর্তে ঐ সুপ্তকামনা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে জগৎস্বষ্টির প্রেরণা দিল। মায়ার উদরে বিলীন বিশ্বকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ দিয়া প্রকাশ করিলেন। এই প্রকাশই বিশ্বের জন্ম। তারপর, তিনি স্বয়ং স্বষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জড়জগতে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিলেন, নিজকে স্বষ্টির জালে আবৃত করিলেন কিন্তু তিনি ইহাতেই নিঃশেষ হইয়া গেলেন না, তিনি যেমন জগৎকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, সেইরূপ জগতের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান রহিলেন। জগতের অন্তরেও তিনি, বাহিরেও তিনি। যাহা কিছু ব্যক্ত যাহা কিছু অব্যক্ত সমস্তই তিনি। সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মবাসিত।—ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—নৃঃ তাঃ ৭, আত্মৈবেদং সর্বম্—ছাঃ, ৭।২৫।১, ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্—ঈশ, ১। বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, ব্রহ্মই মায়াবশে জগৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন, দ্বৈত জগতের স্বষ্টি করিলেন। এই নামরূপ ও দ্বৈত জগৎ সমস্তই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। যেমন একখণ্ড মাটীকে জানিলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তুই জানা হয়, কেননা, সমস্ত মৃন্ময় বস্তু এক মাটীরই বিভিন্ন বিকার। ঐ বিভিন্ন মৃন্ময় পদার্থের রূপ ও নাম ভিন্ন হইলেও উহা মাটী ব্যতীত আর কিছুই নহে; সেইরূপ সাগর, ভূধর, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। জাগতিক পদার্থের মধ্যে নাম ও রূপের পার্থক্য থাকিলেও ইহার মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজমান! জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখিলেই যথার্থ

ব্রহ্ম ও জগৎ

১। সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ,----এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।—বৃহদাঃ, ৪।৪।২২

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষো'ন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।—মাণ্ডুক্য, ৬।

সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।—ছাঃ, ৮।১।৫

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পুরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৭

দেখা হইল, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎরূপে দেখিলেই সেই জগৎ-দর্শন মিথ্যা হইবে। ব্রহ্মই মূর্ত ও অমূর্ত রূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে, মর্ত্য ও অমৃত রূপে প্রকাশিত হন। মূর্ত, ব্যক্ত রূপ, ব্রহ্মের মায়িক রূপ সুতরাং মিথ্যা, অমূর্ত, অব্যক্ত, অমৃত রূপই সত্য। এক ব্রহ্মই বহু নামে, বহু রূপে প্রতিভাত হন। এই তত্ত্বই ঋগ্বেদের ঋষি উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬।

জগৎ যে ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ এবং তত্ত্বতঃ মিথ্যা, তাহা আলোচনা করা গেল। এখন আমরা জীবের স্বরূপ বিচার করিব। জীব ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দুমাত্র। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পরিণামে তাহাতেই বিলীন হয়। অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও ভূতসমূহ নির্গত হয়।[১] জীব ব্রহ্মেরই অংশ। জীব যে ব্রহ্মাংশ একথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অতি স্পষ্টবাক্যেই বলা হইয়াছে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গী, ১৫।৭। ব্রহ্মসূত্রের মতও গীতার অনুরূপ (অংশো নানাব্যপদেশাৎ, ব্রঃ সূ, ২।৩।৪৩)। কিন্তু, প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম তো নিরবয়ব ও নিরংশ। নিরংশ ব্রহ্মের জীব অংশ হয় কিরূপে? জীবকে যে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে ইহার অর্থ কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তী বলেন—নিরংশ ব্রহ্মের অংশ অসম্ভব বলিয়া জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মের অংশ নহে, তবে অংশের মত (অংশ ইব), অর্থাৎ জীব অখণ্ড চৈতন্যের সখণ্ড অভিব্যক্তি। জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। অনন্ত মহাব্যোম যেমন ঘটাদি বিষয়ের আবরণে আবৃত হইয়া ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধারণ করে, বস্তুতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ, সেই মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। অনন্ত মহাকাশের উপাধি ঘট, আর অনন্ত চিদাকাশের উপাধি জীবের অন্তঃকরণ বা হৃদয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সকলের হৃদয়েই আমি অবস্থিত—সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। গীতা ১৫।১৫। হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। গীতা, ১৮।৬১। সর্বভূতের হৃদয়ই আত্মার আবাসগৃহ। এই জন্যই উপনিষদে হৃদয়কে ব্রহ্মের 'গুহা' এবং জীবদেহকে 'ব্রহ্মপুর' বলা হইয়াছে। এই হৃদয়গুহা বা ব্রহ্মপুরের বর্ণনায় ছান্দোগ্য বলিয়াছেন যে, এই দেহে (ব্রহ্মপুরে) একটি ক্ষুদ্রপদ্ম (পুণ্ডরীক) আছে, এই পদ্মটি একটি গৃহ। ঐ গৃহের মধ্যে ক্ষুদ্রতর

ব্রহ্ম ও জীব

১। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।—মুণ্ডক, ২।১।১

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদাঃ, ২।১।২০

অন্তরাকাশ বিরাজ করে। ঐ আকাশের অভ্যন্তরে যিনি অবস্থান করেন তাঁহার অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে।[১] ব্রহ্মই ঐ দহরাকাশে বিরাজ করেন। এই জন্যই ঐ দহরাকাশকে শাস্ত্রে ব্রহ্মকোষ বলা হইয়াছে। এই কোষই ব্রহ্মের উপাধি এবং জীবভাবের মূল,—কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্। পঞ্চদশী, ৩।৪১। এই ব্রহ্মকোষের বর্ণনায় উপনিষৎ বলিয়াছেন যে, নীল মেঘের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুতের মত ভাস্বর নবীন ধান্যের শিষের (অগ্রভাগের) ন্যায় ক্ষুদ্রতম, জ্যোতির্ময় এই কোষ অণুর সহিত উপমেয়।[২] অণু দহরাকাশকে লক্ষ্য করিয়াই জীবকে অণু বলা হইয়াছে। কেশের শতভাগের এক ভাগকে পুনরায় যদি শত খণ্ড করা যায়, তবে সেই কেশাংশ যেমন ক্ষুদ্রতম হয়, ব্রহ্মাংশ জীবকে সেইরূপই ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া জানিবে। সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ জানিলেই অমর হওয়া যায়।[৩] জীবকে এইরূপে অণু-পরিমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও জীব বাস্তবিক অণু নহে। জীবের উপাধি অণু, সেই জন্যই জীবকে অণু বলিয়া মনে হইয়া থাকে।[৪] জীব স্বভাবতঃ অণু হইলে কোন কোন শ্রুতিতে জীবকে যে আকাশের ন্যায় বিভু এবং মহত্তম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে[৫]—আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ, এই বর্ণনার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। বিভিন্ন উপনিষৎ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীবকে কোথায়ও অণু হইতেও অণু, আবার মহৎ হইতেও মহত্তম বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে।[৬] জীব সম্বন্ধে এইরূপ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, জীবের নিজের কোন পরিমাণ নাই, উপাধির পরিমাণ জীবে আরোপিত হইয়া জীবকে অণু বা বিভু বলা হইয়া থাকে। জীবের উপাধি যেখানে অণু, জীবও সেখানে অণু, উপাধি যেখানে মহান্ জীবও সেখানে মহান্। নিরুপাধি জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সে যে মহত্তম ও বৃহত্তম হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ, এইরূপে যে উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বেদান্তের পরিভাষায় ইহা 'অবচ্ছেদবাদ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম
দহরো'স্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং
তদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্,—ছাঃ, ৮।১।১।

২। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যনূপমা।—মহানারায়ণ উপনিষৎ; ১১।১২, তৈঃ আঃ, ১০।১১

৩। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।—শ্বেতাশ্ব, ৫।৯

৪। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহ্যবরো'পি দৃষ্টঃ।—শ্বেতাশ্ব, ৫।৮
এষো'ণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।—মুণ্ডক, ৩।১।৯

৫। স বা এষ মহানজ আত্মা যো'য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—বৃহদাঃ, ৪।৪।২২

৬। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।—কঠ, ২।২০; শ্বেতাশ্ব, ৩।২০; তৈঃ আঃ, ১০।৩০

এতদ্ব্যতীত উপনিষদে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বই জীব। ব্রহ্ম বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব, বুদ্ধি সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দর্পণ। এই প্রতিবিম্ববাদের বিশ্লেষণে উপনিষৎ বলিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় আত্মাই ভূতে ভূতে বিরাজ করিতেছেন, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় একই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। একই সূর্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হন, সেইরূপ একই চিৎসূর্য বিভিন্ন জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে বিভিন্ন বলিয়া প্রকাশিত হন।[১]

এই প্রতিবিম্ববাদ বেদান্তচিন্তায় বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সূর্যের এই উপমাটি বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রেও গ্রহণ করিয়াছেন—(অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৮), এবং জীব যে ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব তাহাও সূত্রে স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে—আভাস এব চ—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৫০। বুদ্ধি-প্রতিবিম্ব জীব স্বীয় অজ্ঞানবশতঃ বুদ্ধির ধর্ম সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করে; মোহগ্রস্ত হইয়া শোক ও দৈন্যের অধীন হয়, স্বীয় নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব বিস্মৃত হয়—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—মুণ্ডক, ৩।২। জীবের এই বিভ্রান্তিই জীবের মোহনিদ্রা। মায়াই ইহার মূল। এই মায়া অনাদি, এক এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। এই মায়াই ব্রহ্মের তিরস্করণী, আবার এই মায়াই জগজ্জননী প্রকৃতি এবং এই মায়াধীশই জগৎ-কর্তা পরমেশ্বর বা মহেশ্বর।[২] এই মহেশ্বরই সকল প্রকার শক্তি সামর্থ্যের প্রস্রবণ। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহার শক্তি বিবিধ বলিয়া শুনা যায়, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি তাঁহার বিবিধ শক্তিদ্বারা সমস্ত জীব-জগৎ শাসন করেন। তিনি এক অদ্বিতীয় রুদ্র, তিনি ঈশান, সকলের অধিপতি, সর্বজ্ঞ ও সর্বান্তর্যামী। স্থাবর জঙ্গম জগৎ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিবর্গের তিনি প্রভু।[৩] তিনি মায়ার অধীশ হইলেও মায়ার বশ নহেন, মায়াই তাঁহার বশ;

১। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ।।—ব্রহ্মবিন্দু, ১২

২। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।—শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।—শ্বেতাশ্ব, ৪।১০

৩। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।—শ্বেতাশ্ব, ৬।৮
একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।
য ইমান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—শ্বেতাশ্ব, ৩।২
এষ সর্বেশ্বর এব সর্বজ্ঞ এষো'ন্তর্যামী,—মাণ্ডুক্য, ৬।
সর্বস্য প্রভুরীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ।—শ্বেতাশ্ব, ৩।১৭
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ—শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৮
য ঈশে'স্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ।—শ্বেতাশ্ব, ৪।১৩

পক্ষান্তরে জীব অনীশ সুতরাং মায়ার বশ। জীব অজ্ঞ, ঈশ্বর প্রাজ্ঞ। অজ্ঞ জীব তাঁহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারে না, এই জন্যই শোকে মোহে অভিভূত হইয়া সংসার-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে; যদি ভাগ্যবশে কখনও সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করে এবং গুরু তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, হে ভ্রান্ত জীব, তুমি জরামরণশীল বা শোকমোহের অধীন নহ, তুমি ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তোমার এই আত্মাই ব্রহ্ম—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "তত্ত্বমসি"। এইরূপ সদ্‌গুরুর উপদেশে যখন তাহার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হয়, সে বুঝিতে পারে, আমিই সেই ব্রহ্ম, নিত্যমুক্ত এবং সদা পূর্ণ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" "সো'হম্", সচ্চিদানন্দরূপো'হং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। এইরূপ আত্মবোধ উদিত হইলে জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়। প্রতিবিম্ব বিম্বে মিলিত হয়, জীববিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে পড়িয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে। নদী যেমন একদিন না একদিন মহাসাগরে মিশিবেই, জীবের জীবনপ্রবাহ ও সেইরূপ একদিন না একদিন ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিবেই মিশিবে। ইহাই জীবের নিয়তি। জীব-জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। এই অবস্থায় বর্ণনায় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—নদীসকল যেমন সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সমুদ্রে পতিত হইয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে, তখন তাহাদের কোন নামও থাকে না, রূপও থাকে না, একমাত্র সমুদ্রই বর্তমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শী জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে অন্তর্হিত হয়, তখন তাঁহার কোন নামও থাকে না, রূপও থাকে না, কেবলমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে।[১]

নাম-রূপ-বন্ধন-বিমুক্ত জীবের ও ব্রহ্মের তখন কোনই ভেদ থাকে না; সর্বপ্রকার বিভেদ তিরোহিত হয়। চিদাভাস চিদাকাশে সম্প্রসারিত হয়। জীবসংবিৎ ব্রহ্ম-সংবিতে পরিণত হয়। সঃ ও অহম্, তৎ ও ত্বম্, জীব ও ব্রহ্ম একীভূত হইয়া যায়। জীবের ইহা আত্মবিনাশ নহে, ইহা জীব-জীবনের পূর্ণতা। এই পূর্ণতায় পৌঁছিতে হইলে জ্ঞান-তরবারীর সাহায্যে জীবকে সর্ববিধ বন্ধন ছেদন করিতে হয়। অবিদ্যা, কামকর্মের উচ্ছেদ করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানের বিনাশ অসম্ভব। যে পর্যন্ত জীবের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইবে, সেই পর্যন্ত জীবকে অবিদ্যা, কামকর্মের ফলে সংসারচক্রে জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া অনন্তকাল ঘুরিয়া মরিতে হইবে। দেহধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

ব্রহ্মস্বরূপাপত্তিই জীবের মুক্তি। জীবের ব্রহ্মভাব আত্মবিনাশ নহে, আত্মার পূর্ণতা।

১। যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে, এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এষো'কলো'মৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে'স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

পরিণাম। মৃত্যুতে জীবদেহের ধারক ও পোষক জীবাত্মার সহিত জড়দেহের নিবিড় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে শীর্ণ দেহ বিধ্বস্ত হয়

জীবের সহিত তাহার দেহের সম্বন্ধ ও জীবদেহের পরিণাম

জীবাত্মা শীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন নূতন দেহ আশ্রয় করে। এইরূপে জীবাত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন-মৃত্যুর আবর্ত চলিতেছে। জীবাত্মার কিন্তু বস্তুতঃ জন্ম-মৃত্যু নাই। জীবাত্মা অজর, অমর, অমৃত ও ধ্রুব।[১]

মৃত্যুকালে মুমূর্ষু জীবের বাক্‌শক্তি বহ্নিতে বিলীন হয়। প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া যায়, চক্ষু সূর্যে, মনঃ চন্দ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা মহাব্যোমে, লোমসমূহ তৃণলতা প্রভৃতিতে, কেশপাশ বৃক্ষে, রক্ত ও শুক্র জলমধ্যে বিলীন হয়।[২] এইরূপে শরীরাবয়ব বিনষ্ট হইলেও ঐ জীব-পুরুষ বিনষ্ট হয় না। জীবাত্মা তখন কোথায়, কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে? বৃহদারণ্যকে আর্তভাগের এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, স্বীয় কর্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই জীব-পুরুষ তখন বিরাজ করে। কর্ম ও অবিদ্যাই জীবের জীবভাবের মূল। জীবের মৃত্যুর পরেও কর্ম-শেষ বিদ্যমান থাকে, ঐ কর্মমূলেই জীব দেহাবসানের পরে পরলোকে গমন করে, নবীনদেহ পরিগ্রহ করিয়া সংসারপথে বিচরণ করে। কর্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, কর্মানুষ্ঠান জীবকে করিতেই হয়। জীব স্বীয় স্বভাববশেই কর্মানুষ্ঠান করে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম যদি শুভ হয়, জীব শুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যাত্মা জীব ব্রাহ্মণাদি উচচ কুলে জন্মগ্রহণ করে; অশুভ কর্মের ফলে শূকরযোনি, কুক্কুর-যোনি, চণ্ডালযোনি প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়।[৩] এইরূপ হীনকর্মা জীবের দুর্গতি অবর্ণনীয়। তাহাদের উর্ধ্বগতি নাই, জন্ম এবং মৃত্যুই তাহাদের নিয়তি, তাহারা কেবল একবার জন্মে আবার মরে, আবার জন্মে, আবার মরে; এইরূপেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরিতে থাকে। শ্রুতি এই পথকে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" নাম দিয়া তৃতীয় পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানম্—ছান্দোগ্য, ৫।১০।৮। এতদ্‌ব্যতীত পরলোকে পৌঁছিবার আরও দুইটী পথ আছে—একটি দেবযান, অপরটি পিতৃযান বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা

দেবযান, পিতৃযান ও জীবের সংসারগতি

যজ্ঞাদি ও অপরাপর কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠান করেন, পরহিতার্থে পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি পুণ্যকর্ম ও জনসেবার জন্য গৃহাদি নির্মাণ করেন, উদ্যানাদি রচনা করেন, উপযুক্ত পাত্রে যথাশক্তি দান করেন, দুঃখীর দুঃখ মোচন করেন, এইরূপ পরহিতৈষী কর্মী গৃহস্থ মৃত্যুর পর পিতৃযান-মার্গে পরলোকে গমন করেন। এই পিতৃযান-মার্গটি

১। জীবাপেতং বাব কিল ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে,—ছাঃ, ৬।১১।৩
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।—কঠ, ২।১৮; গীতা ২।২০

২। বৃহদাঃ, ৩।২।১৩

৩। ছান্দোগ্য, ৫।১০।৭

কিরূপ? এই পথটি ধূমাচ্ছন্ন, ঐ ধূমের অন্তরালে এক দেবতা আছেন, তিনি পিতৃযান-পন্থীকে ধূমের মধ্যে পথ দেখাইয়া নিয়া যান এবং রাত্রি-দেবতার কাছে তাহাকে পৌঁছাইয়া দেন, অর্থাৎ এই পথের প্রথমে ধূম, পরে আসে রাত্রি, তারপর আসে অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ; কৃষ্ণপক্ষের পরে আসে সূর্যদেব যে ছয়মাস দক্ষিণায়নে অবস্থান করেন সেই দক্ষিণায়নকাল, দক্ষিণায়নে পৌঁছিয়া পরে ঐ কর্মী পিতৃলোকে গমন করে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে। ইহাই পিতৃযান-পন্থা। চন্দ্রলোকে কর্মী তাহার অনুষ্ঠিত শুভকর্মের ফল ভোগ করে। ভোগশেষ হইলে চন্দ্রকিরণকে অবলম্বন করিয়া, অথবা আকাশ, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর বুকে শস্যের মধ্যে পতিত হয়, সেই শস্য স্ত্রী এবং পুরুষে ভোজন করে। স্ত্রীশরীরে তাহা রক্তরূপে পরিণত হয়, পুরুষশরীরে উহা শুক্ররূপে বর্ধিত হয়; এবং যথাকালে স্ত্রী ও পুরুষের সহবাসের ফলে চন্দ্রলোক-ভ্রষ্ট জীব পুনরায় পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। এই পিতৃযান পথেও দেখা গেল যে, জীবের যাহা চরমগতি সেই মুক্তি মিলিল না, কর্মক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। তবে, তৃতীয় পথ হইতে এই দ্বিতীয় পথের উৎকর্ষ এই যে, এই পথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া জীব অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও নিরাবিল স্বর্গসুখ আস্বাদন করিতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, চন্দ্রমণ্ডল-প্রত্যাগত জীব যে সকল ধান্য-যবাদি শস্যে পতিত হয়, ঐ শস্যাদি যখন কৃষক কাটিয়া আনে এবং মুগুরাদি দ্বারা পীড়ন করে, সেই অবস্থায় তো সেই জীবের অনন্ত পীড়নাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তখন সেই পুণ্যকর্মা জীবের এবং যাহারা দুষ্কৃত কর্মের ফলে ধান্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন পার্থক্য থাকে কি? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পাপাত্মা দুষ্কৃতকারীদিগের ধান্যাদিদেহ ভোগদেহ, সুতরাং তাহাদের ঐ দেহবিনাশে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। চন্দ্রমণ্ডল-প্রত্যাগত জীবের উহা ভোগদেহ নহে, আশ্রয় মাত্র; কর্মসূত্রে আবদ্ধ জীব সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধান্যাদি শস্যে পতিত হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না, সুতরাং তাহার তখন তাড়নাদি দুঃখভোগের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। চন্দ্রমণ্ডলে ভোগদেহের শেষ হইলে সুখী জীবের হৃদয়ে অসহ্য যাতনার সঞ্চার হয়, ক্লেশাধিক্য-বশতঃ তখন তাহার শরীর এতই উত্তপ্ত হয় যে, উহার ফলে তাহার চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জলীয় দেহ বিগলিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হয়। সংজ্ঞাহীন মূর্ছিত দেহ যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে নিয়া গেলেও ঐ দেহের কোন অনুভূতি থাকে না, সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডল-প্রত্যাগত কর্মীর কোন সুখদুঃখের অনভূতির উদয় হয় না।[১] ঐরূপ মূর্ছিত সংজ্ঞাহীন জীবের সর্বপ্রকার সংস্কারই তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। মূর্ছিত জীব দেহ ধারণ করে কিরূপে? প্রাণিমাত্রেরই দুইটি দেহ আছে, একটি তাহার স্থূল দেহ, অপরটি তাহার সূক্ষ্ম দেহ, স্থূল দেহটি পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত, সূক্ষ্ম দেহটি পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশকের

১। ছান্দোগ্য, শংভাষ্য, ৫।১০।৬ দ্রষ্টব্য।

সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা গঠিত।[১] স্থূল দেহই বার বার জন্মে ও মরে, সূক্ষ্ম দেহটি জন্মেও না মরেও না, জীবের চরম মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহ লইয়াই জীবের পুনর্জন্ম। জীব ইহলোক ও পরলোকে কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত গমনাগমন করিতে থাকে। জোঁক যেমন অপর একটি তৃণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্বে গৃহীত তৃণটি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীব অপর একটি স্থূল দেহ গ্রহণ না করিয়া বর্তমান স্থূল দেহটি পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য মৃত্যু-সময়ে জীব তাহার কর্মানুযায়ী ভাবী অভিনব দেহটি মনে মনে চিন্তা করিয়া জোঁকের ন্যায় আশ্রয় করে এবং তাহার পর তাহার বর্তমান জীর্ণ দেহটি পরিত্যাগ করে। স্বর্ণকার যেমন সুবর্ণের কতক অংশ গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া পিটিয়া একটি অভিনব এবং মনোরম অলঙ্কার নির্মাণ করে, সেইরূপ পরলোকগমনেচ্ছু আত্মা স্থূল দেহের উপাদান সুবর্ণস্থানীয় পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকে বারবার ভাঙ্গিয়া পিটিয়া কল্যাণময় অভিনব আকৃতির সৃষ্টি করে।[২] মৃত্যুসময়ে মুমূর্ষু জীবের চিত্তে তাহার জীবনে কৃতকর্মের ফলে যেরূপ সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়, যেরূপ কর্মবীজ ফলোন্মুখ হয়, তদনুরূপ দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অবিদ্যা, ধর্মাধর্ম এবং জন্মজন্মান্তরের সংস্কার, জীবের জীবনযাত্রা-পথে অপরিহার্য পাথেয়—তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে, পূর্বপ্রজ্ঞা চ। বৃহদাঃ, ৪।৪।২। এই পাথেয় যতদিন আছে জীবের এই মহাযাত্রাও ততদিন আছে। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের অজ্ঞান বিলুপ্ত, কর্মবীজ দগ্ধ, সংস্কার বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেই জন্য তাঁহারাই শুধু জন্ম-মরণ-প্রবাহ অতিক্রম করিতে পারেন। যাঁহাদের জ্ঞান পরিপক্ক না হইলেও প্রস্ফুটোন্মুখ তাঁহারাও ক্রমশঃ জ্ঞানবিকাশের ফলে জন্মমৃত্যুর কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করিতে পারেন। ইঁহারাই দেব-যান-পন্থী। যাঁহারা স্থূল দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যাজ্ঞিকেরা পিতৃযান-মার্গে গমন করিয়া থাকেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ঐ স্থূল যজ্ঞ যখন ভাবনাময় সূক্ষ্ম যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়, তখন আরণ্যকের ঐ ভাবনা-যজ্ঞ ক্রমে জ্ঞান-যজ্ঞে পরিণতি লাভ করে এবং ঐ আরণ্যক যাজ্ঞিক জ্ঞানীর পর্যায়ে উন্নীত হন। উপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা ভাবনা-যজ্ঞের অতি উত্তম দৃষ্টান্ত। এই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় দ্যুলোক, ভূলোক, পর্জন্য (মেঘ), পুরুষ এবং স্ত্রী (যোষা)

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা

১। বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥—পঞ্চদশী ১।২৩

২। তদ্ যথা, তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি, এবমেবায়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি।—বৃহদাঃ, ৪।৪।৩
তদ্ যথা, পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায় অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে।—বৃহদাঃ, ৪।৪।৪
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।—গীতা, ২।২২

এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া জীবের উৎপত্তিকে একটী বিরাট্ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে দেবতাগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতির ফলে দেবলোক ও পিতৃলোকেরও পোষক সোম (সোমরস বা চন্দ্র) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্জন্য বা মেঘরূপ অগ্নিতে দেবতারা ঐ সোমকে আহুতি দিয়া থাকেন, ফলে সোম বা চন্দ্র হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। পৃথিবীরূপ অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করেন, ফলে শস্য উৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে সেই শস্য ভোজ্যরূপে আহুত হয় এবং সেই আহুতির ফলে পুরুষ-শরীরে বীর্যের উৎপত্তি হয়। ঐ বীর্য স্ত্রী-রূপ অগ্নিতে নিহিত হয়, ফলে হস্তপদাদি-যুক্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে যিনি জীবের সৃষ্টি-যজ্ঞরহস্য বুঝিতে পারেন তিনি অশুচি শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হন না, অসহ্য গর্ভযাতনার কথা স্মরণ করিয়া স্বীয় শরীরে এবং সংসারে বৈরাগ্য দৃঢ় করেন। ঐরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি গৃহস্থ হইলেও জ্ঞানী। তিনি এবং অপরাপর বানপ্রস্থিগণ, যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেহাবসানে দেবযানপথে দেবলোক, সূর্যলোক এবং ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন এবং ব্রহ্মলোকেই বাস করেন। এই দেবযান-মার্গ সর্বদা আলোকমালায় সমুজ্জ্বল, এই মার্গে যাঁহারা গমন করেন তাঁহারা প্রথমতঃ সূর্যকিরণকে (অর্চিঃ) আশ্রয় করেন, পরে সূর্যকরোজ্জ্বল দিবস ও চন্দ্রকিরণস্নাত শুক্লপক্ষ অতিক্রম করিয়া সূর্যের যে ছয় মাস কাল উত্তরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই উত্তরায়ণকাল প্রাপ্ত হন। সেখানে মাস ও বৎসর অতিবাহিত করিয়া তথা হইতে আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক ও বিদ্যুল্লোকে গমন করেন; সেখানে এক জ্যোতির্ময় অতিমানব পুরুষের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। ঐ পুরুষই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান। অতিমানব জ্যোতির্ময় পুরুষ দেবযানপন্থীকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করেন; ফলে, ব্রহ্মজ্ঞ দেবযানপন্থীর আর মরজগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।[১] ইহা ক্রম-মুক্তি, বানপ্রস্থীর ন্যায় গৃহস্থও এই ক্রম-মুক্তির অধিকারী। গৃহস্থের তো কর্মনিঃশেষ হয় না, কর্ম থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় কি? কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সুতরাং কর্মী গৃহস্থ দেবযানপথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যেখানে কর্মের মূলে কামনা বা ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা আছে, কর্ম সেখানেই পুণ্যাপুণ্য ফল প্রসব করে এবং জীবের সংসারবন্ধন দৃঢ় করে। কামনাই কর্মফলের কারণ। কামনা না থাকিলে কর্ম ফল-উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যাহারা কামনার দাস হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কোন দিনই কর্মপাশ ছেদন করিতে পারে না; পক্ষান্তরে, ঐরূপ কর্মানুষ্ঠানের ফলে অন্ধকার হইতে গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া বিভ্রান্ত হয়। ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও কর্মপাশ শিথিল হয় না। ঐরূপ বেদমার্গী ব্যক্তি অজ্ঞ কর্মী হইতেও

উপনিষদুক্ত মুক্তির সাধন

১। বৃহদাঃ, ৬।২।১৪-১৫; ছান্দোগ্য, ৫।১০।১-৮।

অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।[১] বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি যদি সর্বভূতপ্রীত্যর্থে, 'জগদ্ধিতায়' অনুষ্ঠান করা যায়, তবে ঐ নিষ্কাম ত্যাগমূলক যজ্ঞাদি বন্ধের কারণ হয় না, মুক্তিরই কারণ হয়—যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ, গীতা ৩।৯। নিষ্কাম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যজমানের চিত্ত নির্মল, উজ্জ্বল ও প্রশান্ত হয়; ঐরূপ চিত্তে স্বতঃই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় কর্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে, সহায়ক। ঐরূপ কর্ম জ্ঞানেরই নামান্তর, পরিণামে জ্ঞানেই পর্যবসিত হয়—সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—গীতা, ৪।৩৩। কর্মত্যাগ জীবের পক্ষে অসম্ভব, কেন-না, জীবের জীব-ভাবের মূলেও রহিয়াছে কর্ম, সুতরাং কর্মী জীব কর্ম ত্যাগ করিবে কিরূপে? কর্ম নিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে—কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। ঈশোপনিষৎ, ২। কর্মফলত্যাগই যথার্থ কর্মসন্ন্যাস বা কর্মযোগ, ফলত্যাগীই প্রকৃত ত্যাগী।[২] এইরূপ ত্যাগকে জীবনে বরণ করিতে পারিলে ফলত্যাগী সাধকের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মুক্তি কর্মসাধ্য নহে, উহা সিদ্ধ বা নিত্য। জীবের শিবভাব বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই মুক্তি, শিবভাব বা ব্রহ্মভাব নিত্য, সুতরাং মুক্তিও নিত্য। মুক্তি কর্মসাধ্য হইলে তাহা নিত্য হইতে পারিত না। প্রথমতঃ, যাহা সাধ্য তাহা নিত্য হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, কর্ম যখন ভঙ্গুর ও অনিত্য তখন সেই কর্মলভ্য মুক্তি নিত্য হইবে কিরূপে? অধ্রুবের (কর্মের) দ্বারা ধ্রুবফল (মুক্তি) লাভ হইবে কিরূপে? ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ—কঠ, ২।৯। মুক্তি কর্মলভ্য নহে বলিয়াই শ্রুতি যজ্ঞাদি কর্মকেও সংসারসমুদ্রতরণের পক্ষে 'অদৃঢ় ভেলা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—প্লবা হ্যেতা অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ, মুণ্ডক উপঃ, ১।২।৭। কর্ম স্বাধীনভাবে যেমন মুক্তির কারণ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত বা মিলিত হইয়াও তাহা মুক্তির সাধন হইতে পারে না, কেন-না, জীবের অবিদ্যার উচ্ছেদই মুক্তি, অবিদ্যা একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই উচ্ছিন্ন হয়, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না, সুতরাং বিদ্যা বা জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র সাধন বলিয়া জানিবে—বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে, ঈশ ১১,—সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্—মুণ্ডক, ৩।১।৫। এই মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি এ জগতে থাকিয়াই লাভ করেন, ইহার জন্য তাঁহাকে পরজগতে গমন করিতে হয় না। যখন তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিদূরিত হয়, তিনি নিষ্কাম আপ্তকাম বা আত্মকাম হন, তখন তিনি মরজগতে থাকিয়াই অমৃতত্ব লাভ করেন, এই ভৌতিক জড়দেহে অবস্থান করিয়াই মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করেন।[৩] তাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ,

১। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে,
ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।—বৃহদাঃ, ৪।৪।১০, ঈশা-৯

২। কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ,
সর্বকর্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুর্বিচক্ষণাঃ।।—গীতা, ১৮।২
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর,
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।। গীতা, ৩।১৯

৩। যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ,
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।—কঠ, ৬।১৪; বৃহদাঃ, ৪।৪।৬-৭

কিছুই উর্ধ্বে বা পরলোকে গমন করে না, এখানেই স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়। সাপের খোলস যেমন উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই ভৌতিক শরীরও ব্রহ্মদর্শি-কর্তৃক অনাদরে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে। যে পর্যন্ত শরীরাভিমান থাকে, সেই পর্যন্তই আত্মাও সশরীরী থাকেন, শরীরাভিমানশূন্য হইলে শরীরের ধর্ম জরা, মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন তিনি অমৃত, জ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ হন। ব্রহ্মভাব সুস্থির করিতে হইলে কাম বা কামনার (এষণার) উচ্ছেদ যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ অহমিকা বা আত্মাভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান, আভিজাত্যের অভিমান, ধনের অভিমান প্রভৃতি অভিমানের পরিহারও একান্ত আবশ্যক। যে পর্যন্ত কোনরূপ অভিমান বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্যন্ত সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। সন্ন্যাস ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, সুতরাং সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্বক এষণাকে (বাসনাকে) জয় করিতে হইবে, অভিমানের কণ্ঠরোধ করিতে হইবে; ফলে, নিরভিমান, বালকস্বভাব, সরল, উদার, সন্ন্যাসী জ্ঞানবলে আত্মাকে মনন ও ধ্যান করিয়া ক্রমে ব্রহ্মে তন্ময় হইবেন। এইরূপ ব্রহ্মদর্শীর নিকট জীবও জগৎ কিছুই থাকিবে না, একমাত্র ব্রহ্মই থাকিবে, ব্রহ্মই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা।[১] ব্রহ্মে কোন দ্বৈতবোধ নাই, দ্বৈতবোধ যে উদয় হয় তাহা বিভ্রমমাত্র, এই বিভ্রমদর্শী পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণপ্রবাহে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করে—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—বৃহদাঃ, ৪।৪।১৯, এই নানাত্ব-বোধ যে মিথ্যা তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "হে মৈত্রেয়ি, দ্বৈতজগৎ বস্তুতঃ না থাকিলেও যখন কোনও ব্যক্তি কোন বস্তুকে দর্শন করে তখন এক আত্মাই দ্রষ্টা, দৃশ্য এই দুইরূপে (দ্বৈতমিব) প্রতিভাত হইয়া থাকে। দর্শন-স্পর্শনাদি জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দৃশ্য, প্রভৃতি দ্বৈতভাব ব্যতীত সম্ভব হয় না, সুতরাং ব্যাবহারিক জীবনে ব্যবহার নির্বাহের জন্য দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। সেই অস্তিত্ব কল্পিত, যথার্থ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি 'দ্বৈতমিব' (দ্বৈতের ন্যায়) এই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যখন সমস্ত জীবজগৎই ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে?"[২]— অর্থাৎ ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর দ্বৈতভাব থাকিবে না, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা মিথ্যা তাহাই বিলুপ্ত হয়, আত্মবোধ মিথ্যা নহে, সত্য; এই জন্য তাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, জীব ও জগদ্‌বোধ মিথ্যা বলিয়াই তাহা বিলুপ্ত হয়। এই জন্যই বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে নানাত্বের নিষেধ ঘোষণা করিয়াছেন—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন— বৃহদাঃ, ৪।৪।১৯। ঈশ, কঠ প্রভৃতি উপনিষদেও এই নানাত্বের অসত্যতা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে ব্রহ্মবস্তুকে জ্যোতির্মণ্ডলস্বরূপ বলিয়া

জীব ও জগৎ মিথ্যা, অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য

১। বৃহদাঃ, ৩।৫।১

২। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ?—বৃহদাঃ, ৪।৫।১৫

বর্ণনা করা হইয়াছে এবং জড়জগৎকে সেই ব্রহ্মজ্যোতিশ্চক্রের বিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১] মনে হয়, এই মৈত্রায়ণীর ব্যাখ্যাকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াই গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডূক্য-কারিকার অলাতশান্তি-প্রকরণে আলোক-বলয়ের দৃষ্টান্তে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।[২] পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্বই যে উপনিষদের অভিপ্রেত তাহাই বুঝা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মার ঔপাধিক অভিব্যক্তি। উপাধির বিলয়ে জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং জীবাত্মাও স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ইহাই উপনিষদের রহস্য। কঠ ও মুণ্ডকশ্রুতিতে[৩] (বৃক্ষ ও পক্ষীর দৃষ্টান্তে) জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথগুল্লেখ থাকিলেও জীবাত্মাকে পরমাত্মার ছায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করায় জীবাত্মার পরমাত্মার ন্যায় স্বতন্ত্র সত্যতা প্রমাণিত হয় না, পরমাত্মার আভাস বলিয়াই বুঝা যায়। জীবাত্মা সংসারী সাজিয়া সংসারে সুখদুঃখ, শোকমোহের অভিনয় করেন; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিচরণ করেন; শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের বন্ধনে নিজকে বদ্ধ করেন। এই শরীরাভিমানী জীব অশরীরী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইবেন কিরূপে? জীব-পুরুষকে অশরীরী আত্মার ছায়া বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে?

জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনা ও তাহ দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ নির্দেশ

এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহদারণ্যক বলেন যে, জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা পরীক্ষা করিলে জীব-পুরুষ যে অবস্থার অতীত, সর্ববিধ বন্ধনের অতীত, শরীরে বিচরণ করিয়াও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী, অসঙ্গ ও নির্লেপ —অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ, বৃঃ, ৪।৩।১৫, তাহা বুঝা যায়। এইরূপ আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদি-বন্ধন সত্য হইতে পারে কি? জাগরিত অবস্থায় জীব শরীর ও মনের সাহায্যে স্থূল বিষয় অনুভব করে, সুতরাং বিষয়-অনুভবিতা জীবকে তখন শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্নাবস্থায় জীব শরীর ও ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয় করিয়া শরীরের বাহিরে স্বীয় জ্ঞানশক্তিবলে

১। অলাতচক্রমিব স্ফুরন্তমাদিত্যবর্ণ-মূর্জস্বন্তং ব্রহ্ম, মৈঃ—২৪; অলাতচক্রমিব সংসারচক্রমালোকয়তীত্যেবং হ্যাহ—মৈঃ, ২৮।

২। "In the late Maitrāyaṇīya Upaniṣad we find the comparison of the absolute with the spark, which, made to revolve, creates apparently fiery circle, an idea which is taken up and expanded by Gauḍapāda in the Māṇḍūkya-kārikā, and which undoubtedly is consistent with the conception of the illusory nature of empirical reality."—Keith : *The Philosophy of the Veda*, pp. 530-31.

৩। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।।—কঠ, ১।৩।১
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো'ভিচাকশীতি।।—মুণ্ডক, ৩।১

বিচরণ করে এবং স্বীয় বাসনার অনুরূপ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকে। ইহা হইতে জীবাত্মার শরীরবন্ধন যে যথার্থ নহে, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। স্বপ্ন-অবস্থায় মন ক্রিয়াশীল থাকে, আত্মার মনের বন্ধন বিলুপ্ত হয় না। সুষুপ্তি-অবস্থায় মনের বন্ধনও বিলুপ্ত হইয়া যায়। বন্ধন-বিনির্মুক্ত জ্যোতির্ময় আত্মা তখন আনন্দময়রূপেই অবস্থান করেন, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করেন। বিষয়বন্ধন-বিমুক্ত, শোকমোহের অতীত সদাপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ কি? সুষুপ্তির আনন্দ জীবের সাময়িক মাত্র, অজ্ঞানের বীজ তখনও ধ্বংস হয় না, সুতরাং পুনরায় সুষুপ্তিভঙ্গে জীবকে স্বপ্নরাজ্যের পথ ধরিয়া বিষয়রাজ্যে পৌঁছিতে হয় এবং সংসারী সাজিয়া জীবন-নাটকের অভিনয় করিতে হয়। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অজ্ঞানবীজ দগ্ধ হইলে জীব সর্ববিধ বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করে এবং জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে বিলীন হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়। জীবকে যে পরমাত্মার ছায়া বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, কায়া ব্যতীত ছায়ার যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সেরূপ পরমাত্মা ব্যতীত জীবেরও কোন স্বাধীন সত্তা নাই। ছায়া কায়ারই প্রতিবিম্ব, জীবও ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব, বিম্বও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্ম সুতরাং বস্তুতঃ অভিন্ন।[১]

কঠ ও মুণ্ডকশ্রুতিতে (ঋতং পিবন্তৌ, দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি দ্বিবচনপ্রয়োগ দ্বারা) জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভেদ যে বাস্তব এবং সত্য শ্রুতিতে এমন কোন কথা শুনা যায় না, বরং শ্রুতির পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে ভেদ যে বাস্তব নহে, কল্পিত, তাহাই বুঝা যায়। পরবর্তী কঠশ্রুতিতে দ্বৈতদর্শীর নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে ভেদ বা নানাত্বের কোন স্থান নাই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মে বিন্দুমাত্রও ভেদ দর্শন করে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়।[২] এইরূপে স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদের নিন্দা করায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে ভেদ উল্লিখিত শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে, সেই ভেদ কল্পিত বা অবাস্তব, ইহাই বুঝা যায়, নতুবা পরবর্তী শ্রুতিতে ভেদ-দর্শীর যে নিন্দা করা হইয়াছে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। ভেদ সত্য হইলে শ্রুতির পূর্বাপর বিরোধ অপরিহার্য হইয়া উঠে। দেহকুলায়ে অবস্থিত সহচর পক্ষিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়া মুণ্ডকশ্রুতিতে দ্বৈতসত্যতার অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির খণ্ডনেও কঠশ্রুতিরই অনুরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। মুণ্ডক উপনিষদে কাহাকে জানিলে সকল জানার শেষ হয়?—

কস্মিন্ নু খলু বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?

এই শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন যে, "পুরুষই এই বিশ্ব, ব্রহ্মই

১। বৃহদাঃ, অঃ ৪, ব্রাঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

২। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥—কঠ, ৪।১

এই বিশ্ব—পুরুষ এবেদং বিশ্বম্, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্, নিখিল বিশ্বই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জানার শেষ হয় এবং যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান। এইরূপে মুণ্ডক উপনিষদে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পূর্বোক্ত "দ্বা সুপর্ণা"। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদের কথা বলা হইয়াছে, সেই ভেদ মায়িক ও অসত্য, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত মুণ্ডকশ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, ঐ শ্রুতিবাক্যটির পৈঙ্গি-রহস্যব্রাহ্মণে একটি ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ, ১।২।১১) উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের মন্ত্রব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, জীবাত্মা, পরমাত্মা বা তাঁহাদের ভেদ প্রভৃতি কিছুই এই মুণ্ডকশ্রুতির আদৌ প্রতিপাদ্যই নহে। অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা, এই দুই-এর কথাই উক্ত শ্রুতিতে আলোচিত হইয়াছে।[১] অন্তঃকরণই ফলভোক্তা, জীবাত্মা শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র, সে ভোক্তা নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্তঃকরণ তো জড়, সে ফল ভোগ করিবে কিরূপে? ব্রাহ্মণের এই অর্থ কি প্রকারে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্য শঙ্কর উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অচেতন অন্তঃকরণের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদন করা এই মন্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য নহে, চেতন জীবাত্মাকে দ্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা এবং জীবাত্মা যে ভোক্তা নহে, স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ, ইহা প্রদর্শন করাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।[২]—জীব যদি ভোক্তা না হয় তবে ভোক্তা কে? জড় অন্তঃকরণের ভোক্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেন যে, বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মই অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণ ও চৈতন্যের অধ্যাসের ফলে অন্তঃকরণের ধর্ম, সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি চেতন জীবে আরোপিত হয়, জীব তাঁহার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া নিজকে শোকদুঃখাকুল, কর্তা, ভোক্তা বলিয়া মনে করে, জীব বাস্তবিক ভোক্তা নহে, সে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ভোক্তৃত্ব কল্পিত ও অসত্য। পক্ষান্তরে, অন্তঃকরণে চৈতন্যাধ্যাসের ফলে অন্তঃকরণেও মিথ্যা কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব-বোধের উদয় হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও চৈতন্যের এইরূপ অধ্যাসের কথাই উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সূচিত হয় নাই।

ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ বিভাবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানেও দেখা যায় যে, ঐ দুইটি বিভাব আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পরবিরোধী। সুতরাং

১। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি (মুঃ, ৩।১।১) সত্ত্বম্, অনশ্নন্নন্যো'ভি চাকশীতি, ইতি অনশ্নন্নন্যো'ভি পশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি সত্ত্বশব্দো জীবঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মেতি যদুচ্যতে, তন্ন।—ব্রঃ সূঃ, শংভাষ্য, ১।২।১১

২। নেয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা, কিন্তুহি, চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য অভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং বক্ষ্যামীতি, তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্ব-মধ্যারোপয়তি।—ব্রঃ সূঃ, শংভাষ্য, ১।২।১১

ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবেই, দুইটি কখনই সত্য হইতে পারিবে না। ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, এই দ্বিবিধ বিভাবের মধ্যে কোন্ বিভাবটি সত্য, এবিষয়ে বৈদান্তিক মহাচার্যগণের মধ্যে সুস্পষ্ট মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্বিশেষ বিভাবই সত্য, সগুণ ও সবিশেষ বিভাব মায়িক ও অসত্য।[১] আচার্য রামানুজের মত শঙ্করাচার্যের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আচার্য রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্ম অনন্ত-কল্যাণগুণময়, তিনি গুণরহিত হইবেন কিরূপে? ব্রহ্মকে শ্রুতিতে যে নির্গুণ, নির্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদ্বারা ব্রহ্মে গুণশূন্যতা বুঝায় না, ব্রহ্মে কল্যাণগুণ-গণেরই সমাবেশ আছে, কোনরূপ নিকৃষ্ট গুণ নাই, ইহাই বুঝা যায়। আচার্য রামানুজ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে শঙ্করোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ অপূর্ব মনীষার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। রামানুজের মত অপরাপর বৈষ্ণব বেদান্তিগণেরও অনুমোদিত। দ্বৈত বেদান্তী মাধবও আচার্য শঙ্করের নির্বিশেষ-বাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক বৈদান্তিক আচার্যই উপনিষদের পটভূমিতে তদীয় দার্শনিক মত চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদান্তিক মহাচার্যগণের মধ্যে উক্তরূপ মতবিরোধের ফলে উপনিষদের দার্শনিক রহস্য জিজ্ঞাসুর নিকট দুজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পূর্বেই উপনিষদের ব্রহ্ম-তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উপনিষদের মতে সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, যিনি স্বতঃ নির্গুণ, তিনিই মায়া উপাধি অবলম্বন করিয়া সগুণ হন এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন করেন—গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্মৃতঃ, ভাগবত, ২।৬।২৯। সগুণ রূপ ব্রহ্মের মায়িক রূপ, সুতরাং পরমার্থরূপ নহে, নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই চরম ও পরম তত্ত্ব। নির্গুণ শব্দের স্বভাবতঃ গুণরহিত এই অর্থই বুঝা যায়, এই স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'নিঃ' উপসর্গের 'নিকৃষ্ট' অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম নিকৃষ্ট-গুণরহিত এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে শব্দার্থের স্বাভাবিক মর্যাদা ও সহজবোধ্য রীতি পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া আমরা রামানুজের ব্যাখ্যাকে শ্রুতির সহজ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। উপনিষদে ব্রহ্মের নির্বিশেষ

নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মবাদই উপনিষদের প্রতিপাদ্য

১। দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে, নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধিবিবর্জিতম্।—ব্রঃ সূঃ, শংভাষ্য, ১।১।১১
সন্তি চ উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ, সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ; অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমিত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ।
অতশ্চ অন্যতরলিঙ্গপরিগ্রহে'পি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্, ন তু তদ্বিপরীতম্, সর্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়-মিত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—ব্রঃ সূঃ, শংভাষ্য, ৩।২।১১

ও নির্গুণ রূপ অনেক শ্রুতিতে অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা আমরা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের আলোচনায় দেখাইয়াছি, সেই আলোচনার সহজভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করার কোন সঙ্গত হেতু নাই। ব্রহ্ম উপাধি অঙ্গীকার করিয়াই যে সগুণ পরমেশ্বর হন, জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট বাক্যে উল্লেখ করা হইয়াছে— অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, মায়িনন্তু মহেশ্বরম্,—শ্বেতাশ্ব, ৪।৯-১০। শ্বেতাশ্বতরের উল্লিখিত উক্তি হইতে ব্রহ্মের সগুণ বিভাব যে মায়িক, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। যাহা মায়িক তাহা পরমার্থ সত্য হইতে পারে না, সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম চরম তত্ত্ব নহে। জীব-ভাব এবং জগদ্-বিভাব অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং তাহা যে সত্য নহে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। একমাত্র অদ্বয় নির্গুণ পরব্রহ্মই সত্য, ইহাই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মসূত্র-পরিচয়

অদ্বৈত বেদান্তের চিন্তাধারা বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির ভিতর দিয়া কি ভাবে সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। দার্শনিক আচার্য-গণের প্রতিভার অবদানে সেই ভাবধারা যে নবীন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি আকর গ্রন্থে বেদান্তচিন্তা পরিপুষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেও তখনও উহা প্রকৃত দর্শনা-কারে গড়িয়া উঠে নাই। আচার্য বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রেই প্রথমতঃ আমরা বেদান্তের দার্শনিক রূপের পরিচয় পাই। তর্কই দর্শনের প্রাণ, তর্কের সূত্রে বেদান্তের বিক্ষিপ্ত চিন্তাকুসুমকে গ্রথিত করিয়া বাদরায়ণাচার্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ ব্রহ্ম-সূত্রের অপর নাম বেদান্তদর্শন। পরবর্তী যুগে বৈদান্তিক মহাচার্যগণ উক্ত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের উপর ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। খণ্ডনমণ্ডনে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিল। মনীষার উজ্জ্বল আলোকে বেদান্তচিন্তা-রাজ্যের দিক্‌চক্রবাল উদ্ভাসিত হইল। বেদান্তচিন্তার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা দেখা দিল। এই যুগের পরিচয় দিতে হইলেই প্রথমতঃ যে ব্রহ্ম-সূত্রকে ভিত্তি করিয়া বেদান্তচিন্তার অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে হয়। অমরকীর্তি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। তিনি কোন্ সুদূর অতীতে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কারণ, বেদব্যাসের কাল, ব্যক্তিত্ব নিয়া সুধীসমাজে নানা বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা কি না, এবিষয়েও কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন; কিন্তু মহাভারতের সময় যে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ই দেখিতে পাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ" (গীঃ, ১৩।৪ শ্লোক) বলিয়া যে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে তাহা যে বেদান্তদর্শনকেই বুঝাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সুধীগণের কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং মহাভারতের সময়ে যে বেদান্তদর্শন প্রচলিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। মহাভারতের রচনাকাল জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে যত দূর জানা যায় তাহাতে খৃষ্টপূর্ব ২,৫০০ বৎসর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রও এরূপ সময়েই বিরচিত হইয়াছিল। একই বেদব্যাস উভয় গ্রন্থের প্রণেতা এবং সমকালেই গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, মহাভারতে

যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রেও 'স্মৃতি' বলিয়া বহুসূত্রেই[১] মহাভারতকে কিংবা মহাভারতান্তর্গত গীতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্ততঃ শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্যগণের ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনতার আরও একটি নিদর্শন এই যে, পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে পারাশর্যভিক্ষুসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] পারাশর্যের অর্থ পরাশরের পুত্র অর্থাৎ বেদব্যাস। বেদব্যাস-প্রণীত ভিক্ষু বা সন্ন্যাসিগণের পাঠ্য বেদান্তসূত্র ব্যতীত অপর কোন সূত্রের পরিচয় আমরা কোথায়ও পাই না, সুতরাং পাণিনি পারাশর্যভিক্ষুসূত্র বলিতে যে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রকেই বুঝিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক টীকাকার সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও ভিক্ষুসূত্র বলিয়া বেদান্তসূত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দার্শনিক আচার্যের নাম শুনা যায়, পাণিনি-সূত্রেও তাঁহাদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,[৩] সুতরাং পাণিনির পারাশর্যভিক্ষু-সূত্র ও ব্রহ্মসূত্র যে অভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সঙ্গত কারণ আছে। পাণিনি-সূত্রে যেমন ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রোক্ত প্রাচীন আচার্যগণের পরিচয় আছে, সেইরূপ মহাভারতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধ-পুরুষগণেরও নামোল্লেখ আছে[৪], ইহা হইতেও ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত যে সমসাময়িক এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। পাণিনি বুদ্ধদেবের বহুপূর্ববর্তী। ঐতিহাসিক-দিগের মতে বুদ্ধদেবের নির্বাণকাল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ (খৃঃ পূঃ ৫৮৩ অব্দ), সুতরাং পাণিনি যে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকেরও পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ পাণিনির আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব নবম বা দশম শতক বলিয়া মনে করেন। পাণিনির আবির্ভাবের বহুপূর্বেই মহাভারত ও বেদান্তদর্শন রচিত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। দার্শনিক সূত্রগুলি সকলই সমসাময়িক। ষড়্‌দর্শনের সূত্রাবলির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মতখণ্ডনের যে প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেই তাহাদের সমসাময়িকতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-সূত্র মহাভারতের সমকালে বিরচিত হইয়াছে, ইহা মানিয়া নিলে অন্যান্য দার্শনিক সূত্রগুলিও মহাভারতের রচনার সমকালেই বিরচিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মসূত্রে সর্বমোট ৫৫৫ সূত্র আছে। ঐ সূত্রগুলি চার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রে ষোলটি

১। স্মৃতেশ্চ, ১।২।৬ ; অপিচ স্মর্যতে, ২।৩।৪৫ ; স্মর্যতে'পি চ লোকে, ৩।১।১৯ ; স্মর্যতে চ, ৪।২।১৪ (ব্রহ্মসূত্র)।

২। পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ, ৪।৩।১১০ (পাণিনিসূত্র)।

পাণিনির উল্লিখিত নটসূত্র এখন পাওয়া যায় না। নাম দেখিয়া যতদূর বোধ হয় তাহাতে নাটকে বিধানাদি উক্ত পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

৩। পাণিনির গণসূত্র, ৪।১।৭৩, ৪।১।১০৫ দ্রষ্টব্য।

৪। পাণিনিসূত্র, ৮।৩।৯৫, ৪।১।১০৩, ৪।১।৯৬, ৫।২।১১০, ৪।৩।৯৮, ৩।৪।৭৪ দ্রষ্টব্য।

পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেক পাদে কতকগুলি অধিকরণ আছে। এক একটি অধিকরণ কয়েকটি সূত্রের সমবায়ে গঠিত। বিভিন্ন বিচার্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন এক একটি অধিকরণে আলোচিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে। অধিকরণের আলোচনার পদ্ধতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, অধিকরণগুলি পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণেরই পাঁচটি অঙ্গ বা অংশ আছে : (১) প্রথম অঙ্গে বিচার্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, (২) দ্বিতীয় অঙ্গে বিচার্য বিষয়ে সংশয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, (৩) তৃতীয় অঙ্গে সংশয়ের পোষক যুক্তির উপন্যাস করা হইয়াছে, (৪) চতুর্থ অঙ্গে সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে, (৫) পঞ্চম অঙ্গে বিচারের ফল বা সিদ্ধান্ত বিবৃত করা হইয়াছে।[১] এইরূপে প্রত্যেক অধিকরণকেই একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার বলা যায়। এইরূপ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সূত্রোক্ত দার্শনিক রহস্য আলোচনা করা হইয়াছে।

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে বেদান্তচিন্তার ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা পরস্পরবিরোধী মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। ঐ বিভিন্নমতাবলম্বী আচার্যগণের তর্ক-কোলাহলের মধ্যে সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এরূপ ক্ষেত্রে বাদরায়ণের বেদান্তমতবাদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা, বিবৃতি প্রভৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র সূত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সূত্রগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, অনেক স্থলেই ঐ সূত্র পড়িয়া সূত্রকারের রহস্য উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে, তবুও ধীরতার সহিত পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ সূত্রগুলি সহজবোধ্য হইয়া আসিবে এবং সূত্রের অব্যক্ত তাৎপর্য সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকভাবেও আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে।

ব্রহ্মই বেদান্তের চরম ও পরম তত্ত্ব, অতএব ব্রহ্ম-নিরূপণই বেদান্তদর্শনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণও এই জন্য সূত্রের প্রারম্ভেই বেদান্তের একমাত্র জিজ্ঞাস্য নিত্য ব্রহ্মবস্তুর উপন্যাস করিয়াছেন এবং পর পর বহুসূত্রে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব বর্ণনার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। উপনিষদের রহস্যই তর্কের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী করিয়া ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্যই বেদান্তদর্শনকে বেদান্তের তর্কপ্রস্থান বলা হইয়া থাকে। উপনিষদে ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষকে একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্তই আর্ত্ত বা বিনাশশীল। এই নিত্য, সত্য ব্রহ্মবস্তুকে উপনিষদে কোথাও বলা হইয়াছে 'সেতু', সমস্ত চরাচর জগতের বিধারক। কোথায়ও বা সেই ভূমা ব্রহ্মকে মানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া বলা হইয়াছে,

---

১। বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥—ভাট্টচিন্তামণি, পৃষ্ঠা ৫, চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, চতুষ্পাৎ, ষোড়শ-কল বা ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের মিলনের কথা শ্রুতি স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন (সতা সম্পন্নো ভবতি, ছাঃ, ৬।৮।১)। জীব-ব্রহ্মের ঐরূপ মিলন স্বীকার করিতে গেলে জীবেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় কি না, ইহা বিশেষ বিচার্য; কারণ, মিলন তো একে হয় না। আর, ঐরূপ মিলনের ফলে অসঙ্গ ব্রহ্মের জীব-সঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে না কি? ব্রহ্মকে যে 'সেতু'রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে 'সেতুং তীর্ত্বা' বলিয়া যে সেতুর পরপারে যাইবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই পরপার আবার কোথায়? ব্রহ্মের পরেও কোন তত্ত্ব আছে কি? বিশ্বের চরম তত্ত্ব কি? সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে মানের গণ্ডীতে বিচার করা যায় কি? এইরূপ নানা প্রশ্ন সূত্র-কারের মনে উদিত হইয়াছিল এবং সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম অধিকরণে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্মই যে বিশ্বের চরম তত্ত্ব তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সূত্রকারের মীমাংসা এই যে, উপনিষদে ব্রহ্ম 'সেতু'রূপে বর্ণিত হইলেও এবং 'সেতুং তীর্ত্বা' বলিয়া সেতুর পরপারে যাইবার কথা উল্লিখিত হইলেও ব্রহ্ম সেতুর তুল্য নহেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা, তাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনিই বিশ্বের আশ্রয়; এই জন্যই উপনিষদে রূপকভাবে তাঁহাকে সেতু (সেতুরিব সেতুঃ) বলা হইয়াছে। এই সেতুই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ইহার পারাপার নাই। জড়জগৎকে বাদ দিয়া জগতের অন্তর-বিহারী কারণাত্মাকে প্রত্যক্ষ করাই সেতুর তরণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে 'সেতুং তীর্ত্বা' বলিয়া এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

'চতুষ্পাৎ', 'ষোড়শকল' বলিয়া সর্বব্যাপী আত্মার যে সসীম-ভাবের কথা উপনিষদে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা শুধু সেই বিরাট্ পুরুষের উপাসনার সুবিধার জন্যই করা হইয়াছে। মনের সাহায্যে চিন্তা করার নাম উপাসনা। আমাদের সসীম মন অসীমকে ধারণা করিতে পারে না, সেইজন্য আমরা অসীমকেও সীমার গণ্ডীতে আনিয়া আমাদের ভাবনা-বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করি। সসীমের অন্তরালেও অসীমের স্ফুরণ আছে। সসীমকে অবলম্বন করিয়া অসীমের সন্ধানই প্রকৃত পরম-তত্ত্বের সন্ধান। ব্রহ্ম নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, মনের সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায় না, মনোবৃত্তি বিলীন হইলেই ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ হয়। মনের সাহায্যে যতটুকু জানা যায়, তাহা জানিবার জন্যই অসীমের এই কল্পিত সসীম-ভাবের স্ফূর্তি ও বিকাশ। ব্রহ্মবস্তু চির অসঙ্গ, তাহার কোনরূপ সঙ্গতি বা সম্বন্ধ নিছক কল্পনামাত্র। যাহা কল্পিত বা ঔপাধিক, তাহাই মায়িক ও মিথ্যা, তাহা দ্বারা সত্য বস্তুর কোনও রূপান্তর ঘটে না। যেমন, চন্দ্র বা সূর্যকিরণ গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা আকা-বাঁকা বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ কিরণ কিন্তু আকাবাঁকা হয় না, কিরণমালা যেই পথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে সেই গবাক্ষপথের বক্রতা গৃহভিত্তিতে পতিত কিরণমালাকে আকাবাঁকা করিয়া তোলে, সেইরূপ স্বপ্রকাশ, নিরাকার, পরব্রহ্ম অন্তঃকরণাদি নানা উপাধি-পথে প্রকাশিত হইয়া ছোট-বড় বিবিধ আকার ধারণ করেন, অসঙ্গ ব্রহ্মও সসঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হন। উহা উপাধিরই দোষ, ঐ দোষ ব্রহ্মে কল্পিত হইয়া

থাকে মাত্র। ঐ উপাধি যখন বিলীন হইয়া যায়, তখন ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেইরূপ উপাধিকল্পিত বিবিধ আকারও ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। এইরূপ ব্রহ্মতাদাত্ম্যের কথাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে অসঙ্গ ব্রহ্মের সসঙ্গতার বা অসীমের সসীম ভাবের কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না।[১] এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মই যে পরম তত্ত্ব তাহা প্রতিপাদন করিয়া সূত্রকার নানাভাবে আমাদিগকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সূত্রকার শ্রুতি-রত্নাকর মন্থন করিয়া এই ব্রহ্মামৃত উদ্ধার করিয়াছেন। শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে জানিবার উপায়। যদিও শাস্ত্রে নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ব্রহ্মতত্ত্বে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির অবসান সূচিত হওয়ায় সেখানে এক মহা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।[২] ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দ্যুলোক, ভূলোকের আশ্রয়, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। তিনি অক্ষর, তিনি নিত্য, সৎস্বরূপ, প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময়। নিখিল বিশ্বের তিনি শাস্তা, অন্তর্যামী এবং জীবের কর্মফলদাতা। তিনি জগদ্‌যোনি, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান, এই জগতের নিমিত্তও তিনি, উপাদানও তিনি। এইজন্যই স্বতন্ত্রভাবে অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।[৩] এই জগৎ-সৃষ্টি একটা অন্ধ প্রচেষ্টা নহে। কানন-কুন্তলা, সমুদ্রমেখলা, বিচিত্র ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতি-মুহূর্তেই বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য, অপূর্ব শক্তি ও অসামান্য নৈপুণ্যের কথা মনের মধ্যে উদিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার সৃজনী-বৃত্তির মূলে তাঁহার বীক্ষণ বা কামলীলা চলিতেছে, সেই লীলাবশেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় পুরুষ বহুনামে এবং বহুরূপে প্রতিভাত হন। এই সিসৃক্ষা-বৃত্তি বা বহু হইবার প্রবৃত্তি তাঁহার লীলামাত্র। কামের এই লীলাদ্বারা কামাতীত

১। পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ।—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।৩১

উক্ত সূত্রটি পূর্বপক্ষসূত্র। ব্রহ্মসূত্রকার "সামান্যাত্তু" ৩।২।৩২, "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ" ৩।২।৩৩, "স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ" ৩।২।৩৪, "উপপত্তেশ্চ" ৩।২।৩৫, এই চার সূত্রে পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত যুক্তির পরীক্ষাপূর্বক খণ্ডন করিয়া অসঙ্গ, অসীম ব্রহ্মের সসীম ভাবের যে কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। "অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ," ৩।২।৩৭, এই সূত্রে আত্মার সর্বব্যাপিত্ব সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন এবং "তথান্যপ্রতিষেধাৎ" ৩।২।৩৬, এই সূত্রে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত বস্তুর নিষেধ করিয়া ব্রহ্মই যে একমাত্র তত্ত্ব, ইহার উপরে আর যে কোন তত্ত্ব নাই, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।১।৩, তত্তু সমন্বয়াৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।১।৪, জন্মাদ্যস্য যতঃ, ব্রঃ সূঃ, ১।১।২, যোনিশ্চ হি গীয়তে, ব্রঃ সূঃ, ১।৪।২৭।

৩। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।৩।১; ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।৩।৮; সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ, ব্রঃ সূঃ, ২।১।৩০; সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ, ব্রঃ সূঃ, ২।১।৩৭; অসত্ত্বমস্তু সতো'নুপপত্তেঃ, ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৯; বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ, ব্রঃ সূঃ, ১।২।২; অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ব্রঃ সূঃ, ১।৩।১০; আহ চ তন্মাত্রম্, ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৬; আনন্দময়ো'ভ্যাসাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।১।১২; সা চ প্রশাসনাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।৩।১১; অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।২।১৮; ফলমত উপপত্তেঃ, ব্রঃ সূঃ, ৩।২।৩৮; প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ, ব্রঃ সূঃ, ১।৪।২৩।

লীলাময় পুরুষ অণুমাত্রও বিচলিত হন না। তিনি আপ্তকাম; তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যুগে যুগে জীবের কর্মফল-ভোগসিদ্ধির জন্য সুখদুঃখময় এই বিশ্বনাটকের অভিনয় করেন। জীবের সুকৃত বা দুষ্কৃত তাঁহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুকৃতকারী সুখ ভোগ করেন, দুষ্কৃতকারী দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া মরেন। পরমেশ্বরের কোন পক্ষপাত নাই। তিনি কাহারও প্রতি অধিক দয়াপ্রবণও নহেন, কাহারও প্রতি অত্যন্ত নিষ্করুণও নহেন। ভগবানের লীলাচক্র সমভাবে চলিতেছে। জীব তাহার কর্মানুরূপ ফল ভোগ করিতেছে।[১] পরমেশ্বর আনন্দময়। তিনি একক এই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, সেই জন্যই তাঁহার লীলাময়ী মায়া বা অবিদ্যাকে সহচরী করিয়া বিশ্বলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই মায়ার খেলা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নিখিল বিশ্বই তাঁহার কুক্ষিতে প্রলয়ের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। লীলাময়ের ধ্বংসের রুদ্রলীলা চলিতে লাগিল। চরাচর সমস্ত বিশ্বই তিনি গ্রাস করিলেন। সমস্তই তাঁহার অন্ন বা ভক্ষ্য, আর তিনিই একমাত্র ভোক্তা।[২] এক দিকে তিনি যেমন বিশ্বপতি, বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বযোনি; অপর দিকে তেমন তিনি বিশ্বভুক্, বিশ্বকাননের তিনি দাবানল, তিনি উদ্যত মহাভয় বজ্র। এইরূপে কোমলে কঠোরে তিনি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নটবর সাজিয়া কত বিভিন্ন অভিনয় করিতেছেন। একাই তিনি অন্তরে বাহিরে অব্যক্ত ও ব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-যবনিকার অন্তরালে নিজকে আবৃত করিয়া একই তিনি বহু হইয়াছেন, নানা রূপে, নানা নামে প্রকাশিত হইতেছেন।

ভোক্তাও তিনি, ভোগ্যও তিনি; দ্রষ্টাও তিনি, দৃশ্যও তিনি; স্রষ্টাও তিনি, সৃষ্টও তিনি। ইহাই যদি বেদান্তের সৃষ্টিরহস্য, তবে ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি? চেতন ব্রহ্ম কেমন করিয়া অচেতন জগতের উপাদান হইলেন? তিনি কেমন করিয়া অচেতন জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন, জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বা বিসদৃশ, তাহা তো কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায়ই জড়জগৎ ও চিন্ময়ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।[৩] এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, কার্য ও কারণ বিসদৃশ বা বিলক্ষণ হইলে, ঐরূপ কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হইতে পারে কি? চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি সম্ভব কি-না, ইহাই বিচার্য। সূত্রকার বলেন যে, চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চেতন জীবশরীরে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি

১। ঈক্ষতের্নাশব্দম্, ব্রঃ সূঃ, ১।১।৫; ঈক্ষতিকর্মব্যপদেশাৎ সঃ, ব্রঃ সূঃ, ১।৩।১৩; কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা, ব্রঃ সূঃ, ১।১।১৮; লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্, ব্রঃ সূঃ, ২।১।৩৩; বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি, ব্রঃ সূঃ, ২।১।৩৪।

২। বিপর্যয়েণ তু ক্রমো'ত উপপদ্যতে চ—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১৪;
অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ১।২।৯।

৩। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ—ব্রঃ সূঃ, ২।১।৪।

ও বৃদ্ধি সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।[১] তারপর জড়জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশই বা বলি কিরূপে? জড়প্রপঞ্চে ব্রহ্মসত্তা সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি অন্তর্যামিরূপে নিখিল বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন, জগতের প্রকাশের মূলেও রহিয়াছে তাঁহারই প্রকাশ, আনন্দের মূলে রহিয়াছে তাঁহারই আনন্দঘনরূপ, সুতরাং জড়প্রপঞ্চকে ত চিন্ময়ব্রহ্মের একান্তই বিসদৃশ বলা যায় না। তবে নাম-রূপাত্মক জগতের সহিত অরূপ ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ("আরম্ভণ") শ্রুতির তাৎপর্য বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাম ও রূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাদের অস্তিত্ব তাহাদের কারণ-বস্তুরই অস্তিত্বের অধীন। মাটী হইতে ঘট, শরা, কলস প্রভৃতি বিবিধ মৃন্ময়বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ ঐসকল মৃন্ময়বস্তু মাটীরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি নহে কি? এক মাটীই কোন রূপে সে ঘট, কোনও রূপে সে শরা, কোনও রূপে সে কলস। মাটীকে বাদ দিলে ঐসকল মৃন্ময়বস্তুর কোনও অস্তিত্ব থাকে কি? ঐসকল বস্তু মাটীরই বিভিন্ন বিকাশ, পরিণামেও উহা মাটীতেই বিলীন হইবে। কার্যমাত্রেরই কোন স্বাধীন সত্তা নাই, উহা মিথ্যা, তাহা তাহাদের উপাদানেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র; উপাদান-কারণই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মকার্য জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, উহা পরিণামে ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া দাঁড়াইবে। নাম ও রূপের সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত বস্তুই সেই সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। তখন বস্তুর কোন নিজরূপ থাকিবে না, সকলই তখন ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিবে। এই সত্যই সূত্রকার কার্য যে কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নহে, এই "অনন্যত্ব" বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন, ফলে সূত্রকারের মতে কার্যের মিথ্যাত্বই আসিয়া পড়িয়াছে।[২] জীব, জড়, ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, চেতন, অচেতন, কার্য, কারণ প্রভৃতি যত প্রকার ভেদের কল্পনা আমাদের মনে আসিতে পারে, তাহা সমস্তই সেই লীলাময় পরমপুরুষের বিভিন্ন বিলাস। তাঁহার সৃজনী-বৃত্তিবশে তিনিই নানারূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। মহাবারিধির ফেনা, বীচি, তরঙ্গ যেমন পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহা জলেরই বিকার, জলময় বারিধি হইতে বস্তুতঃ উহা ভিন্ন নহে, কিন্তু তবুও ফেনা, বীচি, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের ভেদ যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেইরূপ অসীম অনন্ত ব্রহ্মপারাবারে অগণিত জড়প্রপঞ্চের যে লীলালহরী ভাসিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাত্মক হইলেও জড়প্রপঞ্চরূপে তাহাদের মায়িক ভেদও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সুতরাং ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, স্রষ্টা, সৃষ্ট প্রভৃতি ভেদ বাহ্যদৃষ্টিতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।[৩] মূলে সকলই ব্রহ্মময়—"সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ," ইহাই বেদান্তের রহস্য।

১। দৃশ্যতে তু,—ব্রঃ সূঃ, ২।১।৬

২। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।১।১৪

৩। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ,—ব্রঃ সূঃ, ২।১।১৩

আমরা গুণময়, লীলাময় পরমপুরুষের সৃষ্টিলীলা আলোচনা করিলাম, কিন্তু ব্রহ্মের যে প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ, নির্লেপ, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ রূপ বেদ-উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সূত্রকারের অভিপ্রায় কি? সূত্রকার বলিলেন, ব্রহ্ম অরূপ, অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অগোত্র, অবর্ণ, শব্দহীন, স্পর্শহীন, রসহীন ইত্যাদি।[১] এইরূপে সূত্রকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় বিভাবের কথা শ্রুতিতে উক্ত হইলেও একের এই পরস্পর-বিরুদ্ধ উভয় রূপ ত কোনমতেই সত্য হইতে পারে না। ইহার একটিকে ত মিথ্যা বলিতেই হইবে। বহুসংখ্যক শ্রুতিতে তাঁহার নির্বিশেষ রূপ বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সবিশেষ হইলে ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অর্থহীন ও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, সগুণ সবিশেষ ভাবকে মায়িক বলিলে শ্রুতির উভয়বিধ নির্দেশেরই সার্থকতা প্রমাণিত হয়। অতএব সূত্রকারের সিদ্ধান্ত এই যে, নির্বিশেষ রূপটিই ব্রহ্মের যথার্থ রূপ। নির্গুণ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম মায়াশরীর অবলম্বন করিয়া সবিশেষ হন, বহুরূপে বিরাজ করেন। একত্ব ও নানাত্ব, ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য, কেবল দৃষ্টির প্রভেদ-মাত্র। সর্পকে সর্পরূপে দেখিলে তাহা অভিন্ন, আবার ঐ সর্পেরই কুণ্ডলী, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তাহা বিভিন্ন। এইরূপ, ব্রহ্মও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন, আর মায়িক দৃষ্টিতে তাহাই নানারূপ ও বিভিন্ন।[২] এই দৃষ্টিতেই সূত্রকার তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আকাশাদি ভূতপ্রপঞ্চের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি মৌলিক ভূতপ্রপঞ্চেরই তিনি এইভাবে উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন এমন নহে, জড়বস্তুর লৌকিক দৃষ্টিতে যত প্রকার বিভাগ অনুভূত হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন ভৌতিক বিকারের উৎপত্তিও সূত্রকার বিবৃত করিয়াছেন।[৩] এই অসংখ্য বিভিন্ন ভৌতিক বস্তু মূলভূতের বিকার হইলেও উহা জড়ভূতের স্বাধীন অভিব্যক্তি নহে; সমস্ত ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টির

১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ।—ব্রঃ সূঃ, ১।২।২১; অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৪; তদব্যক্তমাহ হি,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।২৩।

২। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১১; ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১২; অরূপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৪; প্রকাশবচ্চা-বৈয়র্থ্যাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৫; দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যতে,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।১৭; বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্ত-র্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।২০; দর্শনাচ্চ,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।২১; উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহি-কুণ্ডলবৎ,—ব্রঃ সূঃ, ৩।২।২৭, ৩।২।২৮-৩০।

৩। যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ,—ব্রঃ সূঃ ২।৩।৭; তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১৩।

ন বিয়দশ্রুতেঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১; প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৬; এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৮; তেজোঽতস্তথা হ্যাহ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১০; আপঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১১ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য।

অন্তরালেই সেই বিশ্বানুগ আত্মা অবস্থিত আছেন। সৃষ্টির প্রতি স্তরে স্তরেই তিনি অনুস্যূত আছেন, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন; অথচ তিনি নির্লেপ, নির্বিকার, নিরঞ্জন ও প্রপঞ্চাতীত। ব্রহ্ম সমস্ত বিকারে অনুগত হইয়াও যে-ই ব্রহ্ম সে-ই ব্রহ্মই থাকেন, অথচ তিনি জগৎ বলিয়াও প্রতিভাত হন, জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া অন্য-রূপে তাঁহার যে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তাহাই তাঁহার বিবর্তরূপ। ইহাই বেদান্তের অধ্যাস, মায়া বা অবিদ্যা। ইহা মিথ্যা, একমাত্র তাঁহার বিশ্বাতীত রূপই সত্য।

জড়প্রপঞ্চের সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকার চেতনের উৎপত্তি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই সূত্রকারের মনে আসিল আকাশাদি ভূতপ্রপঞ্চের যেমন উৎপত্তি হয়, জীবও সেইরূপ উৎপন্ন হয় কি-না? জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? পরমাত্মাকেই জীব বলা যায় কি-না? জীবের যে জন্ম-মৃত্যুর কথা এবং ইহলোক ও পরলোকপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য কি? জীব এক, না বহু; অণু, না বিভু; জীবতত্ত্ব সত্য, কি মিথ্যা? এইরূপ নানা প্রশ্ন সূত্রকারের মনে উদিত হইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় সূত্রে তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যটি মনে পড়িয়া গেল "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে"—ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩। জীবশূন্য হইলেই সমস্ত চেতন, অচেতন জগৎ মৃত্যুকবলিত হয়, জীব বস্তুতঃ মরে না। এই শ্রুতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা যদি জীবকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া নেই, তবে বেদান্তের মতে দ্বৈত-সত্যতা অনিবার্য হয়, অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সাধক শ্রুতিবাক্যসকল অর্থহীন ও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। একই ব্রহ্মকে জানিলে নিখিল বস্তু জানা যায় বলিয়া (একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা) বেদান্তে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা নিরর্থক হয়। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সূত্রকার বলিলেন যে, জন্ম-মৃত্যু বলিয়া যে কথা আছে, তাহা কি প্রকৃতপক্ষে জীবেরই জন্ম-মৃত্যু সূচনা করে, না, জীব যে শরীরকে অবলম্বন করে, সেই শরীরেরই উৎপত্তি ও ধ্বংস সূচনা করে, ইহা বিচার্য। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমস্ত জাগতিক পদার্থেরই এক একটি শরীর আছে এবং সেই শরীরে জীবনপ্রবাহও স্পন্দিত হইতেছে, ইহাই সেই বিশ্বপ্রাণ পরমাত্মা। শরীরের উৎপত্তিই জন্ম এবং শরীরের ধ্বংসই মৃত্যু বলিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। রাম জন্মিল, রাম মরিল বলিয়া লোকে যে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও ঠিক ঐরূপ রামের শরীরের উৎপত্তিই তাঁহার জন্ম এবং ঐ শরীরের ধ্বংসই মৃত্যু বলিয়া লোকে মনে করে। এইরূপ জন্ম-মৃত্যুর অন্তরালে যে অনন্ত জীবন স্পন্দিত হইতেছে, তাহাই জীবাত্মা, সত্য-সনাতন-পরব্রহ্ম। জীবাত্মা কর্মস্রোতে অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই, কেবল তাঁহার এই গতিপথে চরাচর শরীরের সহিত সম্বন্ধই জন্ম, আর ঐ সম্বন্ধের বিয়োগই মৃত্যু। শরীরের সহিত তাঁহার ঐ সম্বন্ধ হইবার ফলে শরীরের ধর্ম জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি তাহাতে আরোপিত হইয়া থাকে; ফলে, অজ্ঞ লোকেরা জীবাত্মারই জন্ম-মৃত্যু কল্পনা করিয়া থাকে। এই কথাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সূত্রকারও এইরূপ সিদ্ধান্তই তাঁহার সূত্রে প্রতিপাদন

করিয়াছেন।[১] সূত্রকারের মতে জীবাত্মা বাস্তবিক নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ, তবে তাঁহার শরীর-সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় যতক্ষণ শরীর ও অন্তঃকরণাদির সহিত সম্বন্ধ আছে, ততক্ষণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঘটাকাশ-মহাকাশের মত ঔপাধিক ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই সূত্রকার জীবাত্মাকে বলিয়াছেন পরমাত্মার আভাস। দেহভেদে পরমাত্মার এই আভাস ভিন্ন ভিন্ন, অতএব বস্তুতঃ জীব এক হইলেও শরীরভেদে তাঁহার ভেদ স্বীকৃত হওয়ায় জীবের কর্মফলভোগের কোনরূপ ("ব্যতিকর") গোলযোগ উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ একের কৃত কর্ম অপরে ভোগ করিবার প্রশ্ন উঠে না।[২]

জীব অণু নহে, তাহা বিভু। প্রশ্ন হইতে পারে, জীবাত্মা যদি বিভু ও সর্বব্যাপী হয়, তবে তাঁহার ইহলোক, পরলোক-গমনাগমন সম্ভব হয় কিরূপে? আর, শাস্ত্রে কখনও কখনও তাঁহাকে যে অণু ও পরমাত্মার অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহার অর্থ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলেন যে, পরমাত্মা বুদ্ধিকে যখন স্বীয় উপাধিরূপে আশ্রয় করেন, তখন বুদ্ধির ধর্ম সুখদুঃখ প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয়, ফলে অসংসারী আত্মা সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়া শোকদুঃখের কণ্টকাঘাতে জর্জরিত হন। স্বীয় শুদ্ধাবস্থা বিস্মৃত হইয়া, তিনি হন সংসারী, কর্তা এবং ভোক্তা। এই অবস্থায় তাঁহাকে কর্মফলভোগের জন্য ইহলোক, পরলোক-যাতায়াত করিতে হয়। পরে যখন বিশুদ্ধ কর্ম, শাস্ত্রসেবা ও গুরূপদেশের ফলে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠে, তখন জীব নিজ ব্রহ্মরূপ উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হন। তখন তাঁহাকে সংসারের আবিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না। এই সত্যই সূত্রকার সর্বশেষ সূত্রে (অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ) জীবের অনাবৃত্তি ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। বুদ্ধি অণু, সেই জন্য বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীবকে কল্পিতভাবে অণু বলা হইয়া থাকে। জীব ব্রহ্মের সোপাধিক রূপ, অতএব তাঁহাকে ব্রহ্মের একপাদ বা অংশরূপে শাস্ত্রের যে বর্ণনা আছে তাহাও অর্থহীন নহে।[৩]

১। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১৬; নাত্মা-শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১৭।

২। যোত এব,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১৮; আভাস এব চ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৫০; অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৪৯; বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং তু অস্য প্রবিভাগপ্রতিভানমাকাশস্যেব ঘটাদিসম্বন্ধ-নিমিত্তম্,—ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর-ভাষ্য, ২।৩।১৭।

আভাস এব চৈষ জীবঃ পরমাত্মনো জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ,—ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর-ভাষ্য, ২।৩।৫০।

ন হি কর্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি। উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো ন ভবিষ্যতি।—ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর-ভাষ্য, ২।৩।৪৯।

৩। নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে সূত্রকার জীবাণুত্ববাদকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন:

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।১৯; তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।২৯; কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৩৩; বিহারোপদেশাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৩৪; ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৩০, ২।৩।৩৫, ২।৩।৩৬, ২।৩।৪০, ২।৩।৪৩-৪৫ দ্রষ্টব্য।

আমরা উক্ত প্রবন্ধে সগুণ ব্রহ্মবাদ ও ভেদবাদ মায়িক এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদই ব্রহ্মসূত্রের বেদান্তসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এই ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা পরস্পরবিরোধী বেদান্তমতের অভ্যুদয় ভারতের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই এবং প্রত্যেক বেদান্তসম্প্রদায়ই তাঁহাদের ব্যাখ্যাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন; ফলে, ব্রহ্মসূত্রের রহস্য ক্রমেই জিজ্ঞাসুর নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছে। আমরা আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকলে দুই-একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা অদ্বৈতবাদকেই যে সূত্রকারের বেদান্তমত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মসূত্র সকল উপনিষদেরই সারসঙ্কলন, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব পরিচেছদে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদই যে উপনিষদের দার্শনিক রহস্য তাহা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং দ্বৈতবাদের অনুকূলে যেসকল শ্রুতি-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও যে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদেরই পোষকতা সম্পাদন করে তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। অদ্বৈতবাদ উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে ব্রহ্মসূত্রেরও যে তাহাই লক্ষ্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, ষড়্‌দর্শনের প্রাচীন সূত্রকারগণের মধ্যে পরস্পর মতখণ্ডনের যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তাহাতে দেখা যায় যে, সূত্রকার আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রোক্ত বেদান্তমত বলিয়া অদ্বৈতবাদকেই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা হইতে অদ্বৈত-বাদই যে ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। আচার্য বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যে-সকল প্রতিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহাতে ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের সহিত পঞ্চরাত্রমতবাদকেও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমতবাদ ভাগবত-মত। ঐ ভাগবত-মতবাদের ভিত্তিতেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈষ্ণব-দর্শন-চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে, একথা সত্যজিজ্ঞাসু অস্বীকার করিতে পারেন না। আচার্য বাদরায়ণ পঞ্চরাত্রমতবাদকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সূত্রে খণ্ডন করায় প্রকারান্তরে সমস্ত বৈষ্ণব দর্শনের মতবাদই খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ফলে, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি কোন বেদান্তমতই যে সূত্রকারের অনুমোদিত নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়।

আমরা জগৎ ও ব্রহ্মের কার্য-কারণ-ভাব-বিচার-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, জড় অচেতন ও অবিশুদ্ধ জগৎ, বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ বা বিসদৃশ। কার্য-জগৎ ও কারণ-ব্রহ্মের এই বৈলক্ষণ্য সূত্রকার স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন।[১] শ্রুতিও উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।[২] কার্য-কারণের বৈলক্ষণ্য সূত্রের অভিপ্রেত বলিয়া প্রমাণিত হইলে রামানুজোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে

১। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ,—ব্রঃ সূঃ, ২।১।৪

২। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ,—তৈঃ, ২।৬

সূত্রকারের বেদান্তমত বলিয়া কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না ; কারণ, আচার্য রামানুজ পরিণামবাদী, তাঁহার মতে কার্য-কারণ বিলক্ষণ বা বিসদৃশ নহে, উহা সদৃশ বা সলক্ষণ ("সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম" তাঁহার মতে কারণ, আর "স্থূলচিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম" কার্য), এই জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন। কারণ-ব্রহ্ম অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম, কার্য-ব্রহ্ম স্থূল ও ব্যক্ত। কারণরূপে যাহা অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত থাকে, কার্যরূপে তাহা ব্যক্ত ও প্রকাশিত হয়। কার্য ও কারণ অবস্থার বিভেদ মাত্র। কার্য ও কারণের মধ্যে মৌলিক কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টতঃ কার্য ও কারণের বৈসাদৃশ্য (বৈলক্ষণ্য) উক্ত হওয়ায় রামানুজোক্ত পরিণামবাদ সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রামানুজ-মত যে সূত্রানুমোদিত নহে তাহা মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, রামানুজাচার্য জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদী। তিনি তদীয় শ্রীভাষ্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পূর্বাঙ্গরূপে কর্ম-মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাঁহারা কর্মমীমাংসোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহাদের মীমাংসোক্ত যজ্ঞাদিকর্মে অধিকার নাই তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার নাই। রামানুজোক্ত এই অধিকারবাদ অঙ্গীকার করিলে দেবতাদিগকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া সংব্যস্ত করা চলে না, কেন-না, দেবতা-দিগের পূর্ব-মীমাংসোক্ত যজ্ঞাদিকর্মের অধিকার নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যেই আহুতি প্রদান করা হইয়া থাকে। ইন্দ্র আবার কোন্ ইন্দ্রকে উপাসনা করিবেন? কাহার উদ্দেশ্যে আহুতি অর্পণ করিবেন? ফলে, অসম্ভব বিধায় দেবতাদিগের যাগযজ্ঞে অধিকার নাই, ইহাই বুঝা গেল। স্থূল বৈদিক যজ্ঞে কেন, মধুবিদ্যা প্রভৃতি প্রতীক বিদ্যার উপাসনায়ও দেবতাদিগের অধিকার নাই, ইহা মীমাংসক-শিরোমণি জৈমিনির মত বলিয়া ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে ("মধ্বাদিষ্ব সম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ", ব্রঃ সূঃ, ১।৩।৩১)। ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণও জৈমিনির ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিকর্মে দেবতা-দিগের অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যায় যে তাঁহাদের অধিকার আছে, ইহা বাদরায়ণ তদীয় সূত্রে স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন—"ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি", ব্রঃ সূঃ, ১।৩।৩৩। সূত্রকারের এই সিদ্ধান্ত রামানুজ স্বীকার করিবেন কিরূপে? তাঁহার মতে যজ্ঞে অনধিকারী দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। অতএব, সূত্রকারের সিদ্ধান্তে রামানুজের সম্মতি দেওয়া চলে না ; রামানুজের জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়-বাদ ব্রহ্মসূত্রকারের অঙ্গীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়।[১]

১। রামানুজাচার্যের মতে যে অনেক সূত্রের অনুপপত্তি হয় তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেদান্তবিশারদ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বেদান্তদর্শনের ও অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকায় এবং তাঁহার বেদান্তপরিভাষার ভূমিকায় নানা যুক্তিতর্কের সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসু পাঠকবৃন্দকে উক্ত ভূমিকা পড়িতে অনুরোধ করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেদান্তের প্রাচীন আচার্যগণ ও তাঁহাদের দার্শনিক মত

আমরা ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় দিয়াছি। ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তদর্শনের মূল গ্রন্থ। এই মূলও অমূলক নহে। বেদব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে আত্রেয়, জৈমিনি, বাদরায়ণ, বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমি ও আশ্মরথ্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ইঁহাদের সূত্রাকারে গ্রথিত মতবাদের আংশিক পরিচয়ও দিয়াছেন। ইহা হইতে এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, ব্রহ্মসূত্ররচনার বহু পূর্বেই সূত্রাকারে বিভিন্ন বৈদান্তিক মত নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল এবং তাহার ফলে কতকগুলি সূত্রও রচিত হইয়াছিল। ঐ সূত্রগুলি অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন আকারে বিদ্যমান ছিল, পরে ব্রহ্মসূত্রকার ঐ সকল প্রাচীন সূত্রের আদর্শে উপনিষদের ভিত্তিতে এক পূর্ণাবয়ব সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাই বর্তমান ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন।

বেদান্তদর্শনে সূত্রকার কখনও স্বীয় মতের পোষকতায়, কখনও বা প্রতিপক্ষ মতের দোষ উদ্ভাবনে ঐ সকল প্রাচীন আচার্যমত উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব, তাঁহারা সকলে যে অদ্বৈতবাদী আচার্য নহেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসূত্ররচনার বহু পূর্বেই প্রাচীন বৈদান্তিক সমাজে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্তমতই গুরু-পরম্পরাক্রমে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। সেই জন্যই বেদব্যাস স্বীয় সূত্রে অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও ভেদাভেদবাদী আচার্যগণেরও নাম ও মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে ঐসকল মতবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।[১]

আচার্য আশ্মরথ্য—আশ্মরথ্য একজন অতি প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য। জৈমিনি তাঁহার পূর্ব-মীমাংসাদর্শনে ৬।৫।১৬ সূত্রে আচার্য আশ্মরথ্যের মত উদ্ধার করিয়া তৎপরবর্তী সূত্রে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা হইতেই তিনি যে প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মসূত্রে দুইবার তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের "বাক্যান্বয়াধিকরণে" আশ্মরথ্যের মতের

১। আমরা ঐ সকল সংক্ষিপ্ত মতের পরিচয়ে আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়াছি।

যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার ভামতী-টীকায় আশ্মরথ্যকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য বলিয়াই তাঁহার মতের পরিচয় দিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের সুপ্রসিদ্ধ মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত "বাক্যান্বয়াধিকরণে" তাহারই বিচার করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য কি জীবাত্মাকেই প্রিয়তম বলিয়াছেন, না, পরমাত্মাকে প্রিয়তম বলিয়াছেন—ইহাই এখানে বিচারের বিষয়। এই প্রসঙ্গে সূত্রকার নিজ সিদ্ধান্ত উপন্যাস করিবার পূর্বে আশ্মরথ্যের মত বিবৃত করিয়াছেন (প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গ-মাশ্মরথ্যঃ, ১।৪।২০)। আশ্মরথ্যের মতে বেদান্তের যে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা আছে অর্থাৎ এককে জানিলেই সকল বস্তু জানা যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ প্রতিজ্ঞা সার্থক করিতে হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদদৃষ্টি দূর করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যেও ঐক্যের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বলিয়াই উহাদের মধ্যে আংশিকভাবে ঐক্য উপদিষ্ট হইয়াছে। বহ্নির বিস্ফুলিঙ্গ যেমন বহ্নি হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অত্যন্ত অভিন্নও নহে, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মারই আংশিক বিকাশ,, উভয়ই চিৎস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ভিন্নও নহেন, আবার অত্যন্ত অভিন্নও নহেন।[১]

ঔড়ুলোমি—উক্ত প্রশ্নের মীমাংসায় আচার্য ঔড়ুলোমির মতও সূত্রকার উদ্ধার করিয়াছেন।[২] তাঁহার মত এই যে, যে পর্যন্ত জীবাত্মা সংসারের আবিলতার মধ্যে দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, সে পর্যন্ত পরমাত্মার সহিত তাহার ভেদবোধ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যখন জ্ঞানের অরুণালোকে অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হইবে, আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, তখন ঐ মুক্ত আত্মার পরমাত্মার সহিত কোনই ভেদ থাকিবে না। যতক্ষণ সংসারদশা ততক্ষণই ভেদ। মুক্তি-উন্মুখ আত্মার পরমাত্মার সহিত অভেদই বেদান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নীকে ঐরূপ অভেদেরই উপদেশ দিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে আচার্য ঔড়ুলোমি যে ভেদাভেদবাদী আচার্য তাহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়।

১। (ক) যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ, ততঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং যৎ প্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্ম-নোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্যো মন্যতে।—ব্রঃ সূঃ, শঃভাষ্য, ১।৪।২০।

(খ) যথা হি বহ্নেৰ্বিকারাব্যুচ্চরন্তো বিস্ফুলিঙ্গা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে তদ্রূপনিরূপণত্বাৎ, নাপি ততোঽত্যন্তমভিন্না বহ্নেরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ; তথা জীবাত্মানোঽপি ব্রহ্মবিকারা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে চিদ্রূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ—তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ ভেদো জীবাত্মনামভেদশ্চ।—ভামতী, ১।৪।২০।

২। উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ,—ব্রঃ সূঃ, ১।৪।২১

তাঁহার মতবাদ অনেকাংশে পাঞ্চরাত্র ও শৈব মতবাদেরই অনুরূপ।[১] আমরা প্রসঙ্গান্তরেও ব্রহ্মসূত্রে তাঁহার মতের পরিচয় পাই। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে—যাগযজ্ঞাদি কর্ম কি যজমান নিজেই করিবেন, না পুরোহিত করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে, যজমান যজ্ঞফল ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং যাগযজ্ঞাদি কর্ম যজমানেরই কর্তব্য, মীমাংসক আচার্য আত্রেয়ের এই সিদ্ধান্ত সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্বীয় মতের পরিপোষক হিসাবে আচার্য ঔড়ুলোমির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যজ্ঞাঙ্গ উপাসনাদি পুরোহিতেরই কর্তব্য, যজমানের নহে।[২] ইহাদ্বারা ঔড়ুলোমি যে বৈদান্তিক আচার্য, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এ বিষয়ে অন্য আরও একটি কারণ এই যে, ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্ত আত্মার স্বরূপবিচারপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রকার মীমাংসকাচার্য জৈমিনির যে মত উপন্যাস করিয়াছেন, আচার্য ঔড়ুলোমি তাহা খণ্ডন করিয়া নিজ বেদান্তমত প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈমিনির মতে মুক্ত আত্মা পাপলেশশূন্য, অনন্ত জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও শক্তির আধার। আচার্য ঔড়ুলোমির মত এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার মতে মুক্ত আত্মার কোনও গুণ বা ধর্ম থাকে না, তাহা চৈতন্যের রূপ প্রাপ্ত হয়। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, মুক্ত অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই সিদ্ধান্ত বাদরায়ণও স্বীকার করেন, তবে তিনি জৈমিনি ও ঔড়ুলোমির মতের সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা নিত্য, নির্গুণ, অসঙ্গ, চিন্ময় ও আনন্দঘন। ইহাই আত্মার প্রকৃত রূপ সন্দেহ নাই, তবে তাঁহার ঈশ্বর-রূপও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ঐরূপে তিনি জগতের কর্তা, শাসক ও পালক। তিনি ভূতপতি, তিনি গুণাধীশ। তাঁহার এই রূপ মায়িক, ইহা তাঁহার যথার্থ রূপ নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই ঈশ্বর-রূপ প্রত্যাখ্যেয় নহে। তাঁহার পারমার্থিক সচ্চিদানন্দ-রূপ ও ব্যাবহারিক ঈশ্বর-রূপ, এই রূপদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।[৩]

১। (ক) বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদি-সাধনানুষ্ঠানাৎ সংসম্পন্নস্য দেহাদিসংঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিতৌড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে।—ব্রঃ সূঃ, শংভাষ্য, ১।৪।২১

(খ) জীবো হি পরমাত্মনো'ত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপধানসম্পর্কাৎ সর্বদা কলুষঃ। তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্পন্নস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতাৎ উৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্। যথাহুঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—

আ মুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদো'স্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥—ভামতী, ১।৪।২১

২। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ।—বেঃ সূঃ, ৩।৪।৪৪
আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে।—বেঃ সূঃ, ৩।৪।৪৫
শ্রুতেশ্চ।—বেঃ সূঃ, ৩।৪।৪৬

৩। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ।—বেঃ সূঃ, ৪।৪।৫
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।—বেঃ সূঃ, ৪।৪।৬
এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।—বেঃ সূঃ, ৪।৪।৭

আত্রেয়—আচার্য ঔড়ুলোমি ব্রহ্মসূত্রে (ব্রঃ সূঃ, ৩।৪।৪৫) আচার্য আত্রেয়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনে বৈদান্তিক আচার্য কার্ষ্ণাজিনি ও বাদরির মত খণ্ডন করিবার জন্য আচার্য আত্রেয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা হইতে আত্রেয় মীমাংসক আচার্য ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়।

কাশকৃৎস্ন—আচার্য কাশকৃৎস্ন অদ্বৈতবাদী আচার্য ছিলেন। কোন কোন মনীষীর মতে ইনি পূর্ব-মীমাংসার সঙ্কর্ষণকাণ্ডের, মতান্তরে দেবতাকাণ্ডের রচয়িতা। বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে সূত্রকার নিজ মতের পোষকতায় আচার্য কাশকৃৎস্নের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশকৃৎস্নের মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভিন্ন তত্ত্ব নহে। আচার্য শঙ্কর উক্ত কাশকৃৎস্নের মতের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, এই পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। সুতরাং মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে অভেদের যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।[১]

কার্ষ্ণাজিনি—আচার্য কার্ষ্ণাজিনিও বৈদান্তিক আচার্য ছিলেন। জৈমিনি তাঁহার মীমাংসাদর্শনে কার্ষ্ণাজিনির মত পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (মীমাংসাসূত্র ৪।৩।১৭, ৪।৩।১৮, ৬।৭।৩৫, ৩৬ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মসূত্রকার তাঁহার স্বীয় অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য প্রমাণস্বরূপ আচার্য কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে (৫।১০।৭) কথিত হইয়াছে যে, যাঁহারা 'রমণীয়চরণ' অর্থাৎ উত্তম কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি কুলে জন্মলাভ করেন; আর যাহারা 'কপূয়চরণ' বা কুৎসিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা শূকরযোনি বা কুক্কুরযোনি প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে 'চরণ'-শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? 'চরণ'-শব্দে আচরণ, আচার, শীল বা চরিত্র বুঝায়। তাহা হইলে শ্রুতির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, সাধু বা অসাধু আচার বা চরিত্রই জীবের জন্মান্তরের কারণ। কর্মানুষ্ঠানের ফলে যে পাপপুণ্য, শুভাশুভ অদৃষ্ট সঞ্চিত হয় তাহাই শাস্ত্রে জন্মান্তরপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্য বেদব্যাস স্বীয় মতের পোষকতায় আচার্য কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার্য কার্ষ্ণাজিনির মতে ছান্দোগ্যশ্রুতির 'চরণ'-শব্দে (অনুশয় বা) শুভাশুভ অদৃষ্টকেই বুঝাইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'চরণ'-শব্দে চরিত্র, আচার বা শীলকেই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং ঐ প্রধান অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'অনুশয়' অর্থ গ্রহণ করিব কেন? আর, আচার বা চরিত্র কি নিষ্ফল? ইহার উত্তরে আচার্য কার্ষ্ণাজিনি বলেন যে, আচার বা চরিত্র নিষ্ফল নহে। সদাচারহীন বৈদিক যাগযজ্ঞ নিতান্তই নিষ্ফল, বৃথা আড়ম্বরমাত্র। আচারপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেই বেদোক্ত ক্রিয়া-কলাপ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এইরূপে আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য

১। অস্যৈব পরমাত্মনো'নেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্যো মন্যতে।—ব্রঃ সূঃ, শং-ভাষ্য, ১।৪।২২

সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" বলিয়া অসদাচারের নিন্দা করা হইয়াছে। সমস্ত পবিত্র বৈদিক অনুষ্ঠানই সদাচারসাপেক্ষ। সদাচার অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠানের পূর্ণতা সাধন করিয়া থাকে বলিয়া আচার বা চরিত্র নিষ্ফল নহে। আচারসাপেক্ষ অনুষ্ঠানই শুভাশুভ ফল উৎপাদন করিয়া, জীবের জন্মান্তরের কারণ হইয়া থাকে।[১] আচার্য কার্ষ্ণাজিনির মতে সূত্রকারেরও সম্মতি আছে। এই জন্য কার্ষ্ণাজিনির মত সমর্থন করিবার জন্য সূত্রকার পরক্ষণেই প্রাচীন অপর বৈদান্তিক আচার্য বাদরির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার্য বাদরি 'চরণ'-শব্দে শুভ ও অশুভ কর্মকে বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে 'চরণ' অনুষ্ঠান ও কর্ম, ইহারা তুল্যার্থক শব্দ।[২] আচার্য বাদরির মত ব্রহ্মসূত্রে অন্যান্য স্থলেও সূত্রকার স্বীয় মতের পোষকতায় উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বলা হইয়াছে যে, দেবযান-মার্গে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্যকিরণাদির সাহায্যে সূর্যলোক ও চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া যখন ঊর্ধ্বতম বিদ্যুল্লোকে গমন করেন, তখন ব্রহ্মলোক হইতে কোন জ্যোতির্ময় অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে নিয়া যায় এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায়।[৩] এখানে শ্রুতিতে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি সগুণ ব্রহ্ম, না, নির্গুণ পরমব্রহ্ম? মীমাংসক আচার্য জৈমিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মপন্থী সাধকেরা পরম-ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে ঐ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগের অমৃতত্ব-প্রাপ্তির কথা বহু স্থলে বলা হইয়াছে। সেই অমৃতত্ব-প্রাপ্তি পরমব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইলেই সম্ভব হইতে পারে।[৪] আচার্য জৈমিনির এই মত বৈদান্তিক আচার্যগণের সম্মত নহে,

আচার্য বাদরি

১। চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ।—বেঃ সূঃ, ৩।১।৯

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ।—বেঃ সূঃ, ৩।১।১০

কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায় লাক্ষণিকোঽনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে? অবশ্যঞ্চ শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা আনর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেন্নৈষ দোষঃ। কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ, ইষ্টাদিকর্মজাতং হি চরণাপেক্ষম্। ইষ্টাদৌ হি কর্মজাতে ফলমারভমাণে তদপেক্ষ এবাচারস্তত্রৈব কঞ্চিদতিশয়মারপ্স্যতে। তস্মাৎ কর্মৈব শীলোপলক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্যাপত্তৌ কারণমিতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্।—ব্রঃ সূঃ, শং-ভাষ্য, ৩।১।১০

২। সুকৃতদুষ্কৃত এবেতি তু বাদরিঃ।—বেঃ সূঃ, ৩।১।১১

বাদরিস্ত্বাচার্যঃ সুকৃতদুষ্কৃত এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে ইতি মন্যতে। চরণমনুষ্ঠানং, কর্মেত্যনর্থান্তরম্। তস্মাৎ রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকর্মাণঃ কপূয়চরণা নিন্দিতকর্মাণ ইতি নির্ণয়ঃ।—ব্রঃ সূঃ, শং-ভাষ্য, ৩।১।১১

৩। আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি, এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।—ছাঃ, ৫।১০।২

৪। পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ।—বেঃ সূঃ, ৪।৩।১২

স্মৃতেশ্চ।—বেঃ সূঃ, ৪।৩।১১; দর্শনাচ্চ।—বেঃ সূঃ, ৪।৩।১৩

জৈমিনিস্ত্বাচার্যঃ 'স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রাপয়তি ইতি মন্যতে। কুতঃ? মুখ্যত্বাৎ। পরং হি ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনং, গৌণমপরম্। মুখ্যগৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি।—ব্রঃ সূঃ, শং-ভাষ্য, ৪।৩।১২

ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই সূত্রকার প্রাচীন আচার্য বাদরির মত উদ্ধৃত করিয়া নিজমত প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য বাদরির মতে "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ, ৪।১৫।৬) বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতিতে দেবযানপন্থীদিগের যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, ঐ ব্রহ্ম নির্গুণ পরমব্রহ্ম নহে, উহা সগুণ ব্রহ্ম। দেবযানপন্থিগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সত্যলোকস্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি বা গতি আছে। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোনরূপ গমনাগমন নাই, কেন-না, তিনি নিজ আত্মায় ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান। তাঁহার কোনরূপ উৎক্রান্তি বা গমনাগমন অসম্ভব। শ্রুতি স্পষ্টবাক্যে ব্রহ্মদর্শীর দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ বা গমনাগমন নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং দেবযানপন্থী-জীবের যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা সগুণ ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে।[১]

সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর ইচ্ছাশক্তি অপ্রতিহত হইয়া থাকে এবং সে স্বীয় ইচ্ছানুরূপ ভোগ্য লাভ করে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভোগসাধন মনঃ, শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কি-না? এই আলোচনায় জৈমিনির মত খণ্ডনপ্রসঙ্গেও আচার্য বাদরির মত সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য বাদরির মতে বেদজ্ঞানী পুরুষের শরীর বা ইন্দ্রিয় থাকে না, তবে মনঃ থাকে। শ্রুতিতেও মনের সাহায্যে বেদজ্ঞানী পুরুষেরা তাঁহাদের সঙ্কল্প সাধন করিয়া থাকেন, এইরূপই উক্ত হইয়াছে, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির কোন উল্লেখ নাই। শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকিলে শ্রুতি অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন। আচার্য বাদরির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আচার্য জৈমিনি বলেন যে, ঐরূপ মুক্তপুরুষের মনের ন্যায় শরীর এবং ইন্দ্রিয়েরও বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, কারণ, শ্রুতিতে "তিনি এক হইলেন, তিন হইলেন, বহু হইলেন" বলিয়া একই পুরুষের বহু শরীরগ্রহণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বেদজ্ঞানী পুরুষের মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়।[২] আচার্য বাদরায়ণ এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বলিয়াছেন যে, মুক্তপুরুষের ইচ্ছাশক্তি যখন অপ্রতিহত, তখন তিনি সশরীরও হইতে পারেন, আবার অশরীরও হইতে পারেন।[৩]

১। (ক) কার্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ।—বেঃ সূঃ, ৪।৩।৭

তত্র কার্যমেব সগুণমপরং ব্রহ্ম নয়ত্যেনানমানবঃ পুরুষ ইতি বাদরিরাচার্যো মন্যতে। কুতঃ? অস্য গত্যুপপত্তেঃ। অস্য হি কার্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে, প্রদেশবত্ত্বাৎ; ন তু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্বা অবকল্পতে, সর্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৃণাম্।—ব্রঃ সূঃ, শংভাষ্য, ৪।৩।৭

(খ) তত্ত্বমসিবাক্যার্থসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ কিল জীবাত্মা অবিদ্যাকর্মবাসনাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদাৎ বস্তুতোঽনবচ্ছিন্নোঽবচ্ছিন্নমিব অভিন্নোঽপি লোকেভ্যো ভিন্নমিব [illegible] স্বরূপাদন্যান্ অপ্রাপ্তান্ অর্চিরাদীন্ লোকান্ গত্যা আপ্নোতীতি যুজ্যতে। অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারবতস্তু বিগলিত-নিখিলপ্রপঞ্চাবভাসবিভ্রমস্য ন গন্তব্যং ন গতির্ন গময়িতার ইতি কিং কেন গম্যতম্?—ভামতী, ৪।৩।৭

২। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্।—বেঃ সূঃ, ৪।৪।১০

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ।—বেঃ সূঃ, ৪।৪।১১

৩। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ।—বেঃ সূঃ, ৪।৪।১২

অনন্ত ভূমা ব্রহ্মের পরিমাণব্যাখ্যায়ও সূত্রকার আচার্য বাদরির মত স্বীয় মতের অনুকূলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক আচার্য ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। আমরা ব্রহ্মসূত্রে যখনই বাদরির মত আলোচনা করিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, তিনি মীমাংসক আচার্য জৈমিনির মত খণ্ডন করিতেছেন। আচার্য জৈমিনিও তাঁহার পূর্ব-মীমাংসার বহুস্থানেই প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য বাদরির মত পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য বাদরির মতে বৈদিক কার্যে সকলেরই অধিকার আছে। তিনি সর্বাধিকারের পক্ষপাতী। ইহা হইতে আচার্য বাদরির মতের মৌলিকতা প্রতীতি হইয়া থাকে। মীমাংসকদিগের মতে শূদ্রাদির বৈদিক যাগযজ্ঞে অধিকার নাই, সুতরাং জৈমিনি আচার্য বাদরির সর্বাধিকারবাদ তাঁহার দর্শনে পূর্বপক্ষরূপে উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

জৈমিনি ও বাদরায়ণ—আচার্য বাদরায়ণ বহুস্থলেই পূর্বপক্ষরূপে পূর্ব-মীমাংসাচার্য জৈমিনির মত উদ্ধার করিয়াছেন। বাদরায়ণ যেমন জৈমিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইরূপ আচার্য জৈমিনিও তাঁহার পূর্ব-মীমাংসায় বাদরায়ণের মত, কোনস্থলে পূর্বপক্ষরূপে, কোনস্থলে বা স্বীয় মতের পোষক প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন।[১] ইহাদ্বারা জৈমিনি ও বাদরায়ণ যে সমসাময়িক তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া থাকে। পুরাণকারের মতে জৈমিনি বেদব্যাসের শিষ্য, সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, জৈমিনি স্বীয় দর্শনে শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় গুরুর মত উদ্ধার করিবেন। মীমাংসা-ভাষ্যকার শবর স্বামী লিখিয়াছেন যে, সূত্রকার জৈমিনি যে বাদরায়ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা শুধু বাদরায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যেই উদ্ধৃত হইয়াছে, স্বীয় মতের সহিত তাঁহার ঐকমত্য প্রমাণ করিবার জন্য নহে।[২] বাদরায়ণাচার্য উত্তর-মীমাংসার আচার্য, সুতরাং তাঁহার পক্ষে পূর্ব-মীমাংসার মত আলোচনা করা একান্তই স্বাভাবিক।[৩] আচার্য

১। মীঃ-সূত্র, ১।১।৫, ৫।২।১৯, ৬।১।৮, ১০।৮।৪৪, ১১।১।৬৪ দ্রষ্টব্য।

২। বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্যেদং মতং কীর্ত্যতে বাদরায়ণং পূজয়িতুম্।

—মীমাংসা-শাবর-ভাষ্য, ১।১।৫

বাদরায়ণগ্রহণং কীর্ত্যর্থং নৈকীয়মতার্থম্।—শাবর-ভাষ্য, ১১।১।৬৪

৩। বাদরায়ণ ও ব্যাস অভিন্ন ব্যক্তি কি-না ইহা নিয়া সুধীসমাজে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়—"A Note on Bādarāyaṇa", *J. A. S.*, Bombay, Vol. XVI, 1883, p. 190. শঙ্করাচার্যের টীকাকার আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্যগণের মতে বাদরায়ণ ও বেদব্যাস অভিন্ন ব্যক্তি এবং ইহাই প্রাচীন ভারতের সাম্প্রদায়িক মত। বাদরায়ণ ও ব্যাস অভিন্ন হইলে বাদরায়ণ স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রে নিজের মতকে ইতি বাদরায়ণঃ, এইরূপ তৃতীয় ব্যক্তির মতের ন্যায় যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের লেখার ঐরূপ একটি ভঙ্গী ছিল, ইহা তখন অশোভন মনে হইত না। শিষ্যের পক্ষে গুরুর মত আলোচনা যেমন স্বাভাবিক, গুরুর পক্ষেও স্বীয় শিষ্যের মত ও যুক্তি আলোচনা করা দার্শনিক চিন্তাজগতে তেমনই স্বাভাবিক। বাদরায়ণ যে জৈমিনির মত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতেও অসঙ্গতির কিছুই নাই এবং ইহাদ্বারা বাদরায়ণকে ব্যাস হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করারও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা সাম্প্রদায়িক প্রসিদ্ধিকে মানিয়া ব্যাস ও বাদরায়ণ যে অভিন্ন, এই মতই গ্রহণ করিলাম।

বাদরায়ণ অনেক স্থলে সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই ঐ মত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্মসূত্রের আভ্যন্তরীণ প্রমাণবলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে যে, ব্রহ্মসূত্রের রচনাকালেও পরিপূর্ণ আকারের বিভিন্নমুখী দার্শনিক চিন্তা প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহারই সুদীর্ঘ আলোচনা ও প্রসারের ফলে দার্শনিক সূত্রসকল রচিত হইয়াছে। এই ত গেল সূত্রকার আচার্যদিগের কথা।

সূত্রযুগ ছাড়িয়া ভাষ্যকারের যুগে প্রবেশ করিলেও অনেক প্রাচীন ভাষ্যকারের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বোধায়ন, উপবর্ষ, দ্রমিড়াচার্য, গুহ, টঙ্ক, কপর্দী ও ভারুচি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই সকল ভাষ্যকাররচিত গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে দার্শনিক আচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন ভাষ্যকার-মতবাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মতবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ ও ভর্তৃহরি—ভর্তৃপ্রপঞ্চ একজন অতি প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য। তাঁহার 'ভর্তৃপ্রপঞ্চ-ভাষ্য' নামে বেদান্তের অতি বিস্তৃত ভাষ্য ছিল। আচার্য শঙ্কর তৎকৃত বৃহদারণ্যক-ভাষ্যের প্রারম্ভে স্বীয় ভাষ্যকে 'অল্পগ্রন্থা বৃত্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। টীকাকার আনন্দগিরি ভাষ্যকারের 'অল্পগ্রন্থা' এই বিশেষণটির সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ অতি বিস্তৃত বৃহদারণ্যক-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার তুলনায় শাঙ্কর-ভাষ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সেই জন্যই আচার্য শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যকে 'অল্পগ্রন্থা বৃত্তি' বলিয়াছেন। কালবশে আজ সে বিস্তৃত ভর্তৃপ্রপঞ্চ-ভাষ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের শাঙ্কর-ভাষ্য, আচার্য সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক ও উক্ত বার্ত্তিকের উপর আচার্য আনন্দ-জ্ঞানের 'শাস্ত্রপ্রকাশিকা' নামে যে টীকা আছে, তাহা হইতে ভর্তৃপ্রপঞ্চের দার্শনিক মতের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য আনন্দজ্ঞান তাঁহার টীকায় ভর্তৃপ্রপঞ্চের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে ভর্তৃপ্রপঞ্চকে ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক আচার্য বলিয়া মনে হয়। জীব ও জগৎ তাঁহার মতে ব্রহ্মের পরিণাম। সংসারদশায় ব্যাবহারিক জীবনে জীবও সত্য, জগৎও সত্য। ইহারা ব্রহ্মেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। ব্রহ্মই বিশেষ অবস্থায় জীব, অন্তর্যামী, অব্যক্ত, সূত্র, বিরাজ্, দেবতা, জাতি ও পিণ্ড এই আটরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। এই অষ্টবিধ ব্রহ্ম-পরিণামকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ এক একটি বিভাগ এক একটি রাশি, যেমন (ক) পরমাত্মা রাশি, (খ) জীব রাশি, (গ) মূর্তামূর্ত রাশি। এই পরমাত্মা রাশিই বিশ্বপ্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ। সমস্ত চরাচর জগৎ ইঁহার দ্বারাই আত্মবান্। জীব এই বিশ্বপ্রাণেরই আংশিক অভিব্যক্তি। হিরণ্যগর্ভই জগদাত্মা। ইহাই প্রথম আবিদ্যক অভিব্যক্তি বা ব্রহ্ম-পরিণাম। চরাচরে যাহা কিছু মূর্ত এবং অমূর্ত, সমস্তই হিরণ্যগর্ভের প্রাণ-শক্তির বিকাশ।[১] এই প্রাণশক্তিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সমস্ত চরাচর জগতে সতত বিদ্যমান

১। (ক) অবিদ্যাকৃতঃ হিরণ্যগর্ভ আত্মা সর্বসাধারণস্তেন আত্মনা সর্বসত্ত্বানি আত্মবন্তি। —সুরেশ্বর-বার্ত্তিক-টীঃ, পৃষ্ঠা, ৬৬১, আনন্দাশ্রম-সংস্করণ।

থাকিয়া নিজকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে পরিণত করেন। এই ব্রহ্ম-পরিণামে কখনও জড়াংশ প্রধানভাবে প্রতীত হয়, কখনও বা চেতনাংশ প্রধানভাবে প্রতিভাত হয়। জড়প্রধান ব্রহ্ম-পরিণামই মূর্তামূর্ত-রাশি, আর, চেতনপ্রধান ব্রহ্ম-পরিণাম জীবরাশি। পরমাত্মা অন্তর্যামী, সূত্র বা হিরণ্যগর্ভ বলিয়া পরিচিত।

জীব বিজ্ঞানময়, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা।[১] এই বিজ্ঞানাংশে ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সাম্য আছে। তবে, জীবের বিজ্ঞান সসীম ও পরিমিত, ব্রহ্মবিজ্ঞান অসীম ও অনন্ত। জীব পরমাত্মারই অংশ। স্বীয় প্রজ্ঞা, কর্ম ও কর্মফলানুসারে জীব দেহভোগ করিয়া থাকে। মূর্তামূর্ত জগৎ তাঁহার সেই ভোগের সাধন। যতদিন জীবের বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন তাঁহার বহির্মুখী প্রবৃত্তি এবং ভোগও থাকিবে। আসক্তি এবং অবিদ্যা এই দুই-ই জীবের জীবভাবের প্রতি কারণ। আসক্তি ও অবিদ্যা-বশতঃ জীব তাঁহার নিজ শিবরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম", এই ব্রহ্মবোধের পরিপন্থী অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে, জীব ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। জীবের জীবভাবের মূলে আসক্তি ও অবিদ্যা এই দুই বন্ধন-শৃঙ্খল রহিয়াছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আসক্তিক্ষয় হয়, পরে বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে জীব মুক্তির অধিকারী হয়। আচার্য ভর্তৃ-প্রপঞ্চের মতে মোক্ষ জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-সাধ্য। এইমতে মুক্তি দ্বিবিধ, (১) জীবন্মুক্তি ও (২) পরমমুক্তি। জাগতিক পদার্থে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইলে এবং জ্ঞান উদিত হইলে এই শরীরেই জীব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। তখন তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইতে পারে। তখন সে হয় জীবন্মুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মেতে লীন হয় না। শরীর-পাতের পর ব্রহ্মেতে লীন হইয়া পরমমুক্তি প্রাপ্ত হয়।[২] এই লয়ের অবস্থায় সমস্ত বিশেষ অবিশেষ হইয়া যায়। ইহা অদ্বৈততত্ত্ব, সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের অবসান। কি জীব, কি জগৎ, যখন উহা ব্রহ্মে লীন হয়, তখন কোনপ্রকার বিশেষ ভাব থাকে না।

(খ) স ইদং জগদাত্মত্বেনাভিসম্পন্নো ভূদবিদ্যয়া।—সুরেশ্বর-বার্তিক-টীঃ, পৃষ্ঠা, ৬৬৯।

(গ) যাবান্ বাহ্যবিকারো বিজ্ঞানাত্মপরিবেষ্টনো'ধ্যাত্ম, বাধিদৈবতং বা নামরূপবিভাগেন ব্যাকৃতঃ সর্বো'পি এষ মূর্তো বা ভবতু। সচচ ত্যচচ।—ঐ পৃষ্ঠা, ১০০৮।

১। (ক) বিজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম তৎপ্রকৃতিকো জীবো বিজ্ঞানময়ঃ।—সুরেশ্বর-বার্তিক-টীঃ, পৃষ্ঠা, ১৪৩৩, আনন্দাশ্রম-সংস্করণ।

(খ) স পরমাত্মৈকদেশঃ কিল কর্তা। ঐ পৃষ্ঠা, ১০১৩।

(গ) বুদ্ধিপ্রত্যয়স্য ঘটাদেশ্চ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন সংহ্বাৎ ক্রিয়ান্তরনির্বৃত্তৌ দ্রষ্টৈব।—ঐ পৃষ্ঠা, ১৬৫৩।

(ঘ) ভুজন্তেন কর্তৃত্বমাচষ্টে।---কস্য কর্তা? দৃষ্টেঃ।—ঐ পৃষ্ঠা, ১৬৬৬। দৃষ্টিরিতি ভাবঃ, ক্রিয়াসমাপ্ত্যর্থঃ, ফলাশ্রিতো নির্দিশ্যতে। কিং পুনঃ ফলং প্রকাশনম্।—ঐ পৃষ্ঠা, ১৬২৬-২৭।

২। দ্বিবিধো মোক্ষঃ, অস্মিন্নেব শরীরে সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মা মুক্ত ইত্যুচ্যতে, ন ব্রহ্মণি লীনঃ। তস্য শরীরপাতোত্তরকালং ব্রহ্মণি লয়ো দ্বিতীয়ো মোক্ষঃ। সুরেশ্বর-বার্তিক-টীঃ, পৃষ্ঠা, ১৩৭৫।

সমস্ত বিশেষ ভাব ব্রহ্মের সহিত অনন্য বা অভিন্ন হইয়া যায়।[১] এই অবিশেষাবস্থার নাম পরমাত্মাবস্থা বা পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থিতি। পরিদৃশ্যমান নানাত্বের মধ্যে ঐক্যের সূত্র ঐ পরমাত্মা, সুতরাং তাঁহাকে সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে। অবিশেষ অবস্থায় সমস্ত বস্তুর অদ্বৈতে পর্যবসান হয়। বিশেষাবস্থায় দ্বৈতভাব থাকে। এই দুই ভাবই যথার্থ। জীবও জড় ব্রহ্মেরই বিভাব, পরিণামে ব্রহ্মেতেই লীন হয়, লীন হইলেও উহা মিথ্যা নহে। এইমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি যথার্থ অনুভব উৎপন্ন করে বলিয়া প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। ঐ প্রমাণের সাহায্যে আমাদের যে নানাত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সত্য, আবার বৈদিক-সংহিতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতিতে যে একত্বের উপদেশ আছে তাহাও সত্য। দ্বৈতবাদ লৌকিক-প্রমাণ-গম্য, সুতরাং সত্য; অদ্বৈতবাদও বৈদিক-প্রমাণ-গম্য, সুতরাং সত্য। এই দৃষ্টিতে ভর্তৃপ্রপঞ্চের ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে।[২]

এই ভর্তৃপ্রপঞ্চ কে? তাঁহার জীবৎকাল কত? ভর্তৃপ্রপঞ্চই তাঁহার নাম, না, ভর্তৃ তাঁহার নাম, প্রপঞ্চ-ভাষ্য তাঁহার ভাষ্যের নাম? বাক্যপদীয়-রচয়িতা ভর্তৃহরি ও ভর্তৃপ্রপঞ্চ অভিন্ন ব্যক্তি কি-না? এ বিষয়ে সুধী সমাজে নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মতে ভর্তৃপ্রপঞ্চ যে ভেদাভেদবাদী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আচার্য ছিলেন, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাক্যপদীয়-রচয়িতা বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি শব্দ-ব্রহ্মবাদী অদ্বৈতাচার্য ছিলেন। তিনি ঔপনিষদ-সম্প্রদায়ের আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৩] তাঁহার গ্রন্থে তিনি শব্দব্রহ্মের বিবর্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন। যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোন কোন আচার্য তাঁহাকে পরিণামবাদী বলিয়াও বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেই মত তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ভর্তৃহরি বিবর্তবাদী বলিয়াই পরিচিত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভর্তৃপ্রপঞ্চ তাহা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

আচার্য সুন্দরপাণ্ড্য

শব্দ-ব্রহ্মবাদী অদ্বৈতাচার্য ভর্তৃহরি ব্যতীত সুন্দরপাণ্ড্য নামে একজন অতি প্রাচীন অদ্বৈত-বেদান্তাচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ, ১।১।৪) আত্মা জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানস্বরূপ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ববোধ মিথ্যা, "অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম",

---

১। বিশেষাণাং হি অবিশেষ একতা ভবতি যথা সমুদ্রে সমুদ্রোর্মীণাম্।—সুরেশ্বর-বার্ত্তিক-টীঃ, পৃষ্ঠা ৫৭২।

দ্বৈতবিষয়ে অন্যস্য অন্যেন আত্মনা অভিসম্পত্তিঃ। ইহ পুনরদ্বৈতে সমস্তভাবানামনন্যত্বাৎ সর্বমস্যৈবাত্মত্বেনাভিসম্পদ্যতে।—ঐ পৃষ্ঠা, ৬৭০।

যা তু অবিশেষাবস্থা পরমাত্মাবস্থৈব সা।—ঐ পৃষ্ঠা, ৭৬৯।

Brahman is the permanent unity underlying all diversities.

২। ইং ১৯২৪ সনে মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে অধ্যাপক হিরণ্য (Prof. M. Hiriyanna, M.A., Mysore) সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক-টীকা হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া ভর্তৃপ্রপঞ্চের দার্শনিক মত বিবৃত করিতে চেষ্টা করেন। অধ্যাপক হিরণ্যের উদ্ধৃত ভাষ্যাংশ উক্ত Conferenceএর Proceedingsএ সংগৃহীত হইয়াছে।

৩। ঔপনিষদ-সম্প্রদায় পরবর্তী কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। বৌদ্ধমতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতই এই সম্প্রদায়ের বিলোপের কারণ বলিয়া অনেক মনীষী মনে করেন।

এই ব্রহ্মবোধই সত্য। এইরূপ স্বীয় মত প্রমাণ করিবার জন্য ব্রহ্মবিদের গাথা বলিয়া যে গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সুন্দরপাণ্ড্যের উক্তি বলিয়া সূতসংহিতার টীকাকার মাধবাচার্য তদীয় টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

মাধবাচার্যের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সুন্দরপাণ্ড্য শ্লোকাকারে এক বার্ত্তিক-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করোক্ত গাথাত্রয় ঐ বার্ত্তিক হইতে উদ্ধৃত। শঙ্করাচার্য স্বীয় সিদ্ধান্তের সাধক প্রমাণ হিসাবে উহা উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে সুন্দরপাণ্ড্য যে প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

আচার্য বোধায়ন ও উপবর্ষ—আচার্য বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তৃত এক বৃত্তি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে আচার্যগণ সার-সঙ্কলনপূর্বক উক্ত বৃত্তি-গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করেন। আচার্য রামানুজ, বোধায়ন প্রভৃতি আচার্যের মত অনুবর্তন করিয়াই শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন।[২] সম্ভবতঃ, অতি বিস্তৃত বৃত্তি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধায়ন পরবর্তী ভাষ্যকারগণের নিকট বৃত্তিকার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন। আচার্য রামানুজ শ্রীভাষ্যে সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য বোধায়নের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য বোধায়ন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা, এই উভয় মীমাংসার উপর "কৃতকোটি" নামে এক অতি বিস্তৃত ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন আচার্য উপবর্ষ ঐ বিস্তৃত 'কৃতকোটি'-ভাষ্যকে সার-সঙ্কলনপূর্বক সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন[৩]। উপবর্ষও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ে বৃত্তিকার বলিয়াই পরিচিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বোধায়ন ও উপবর্ষ অভিন্ন ব্যক্তি। বোধায়ন উপবর্ষের গোত্র-পরিচায়ক

১। তথা চ গাথাং ব্রহ্মবিদ আহুঃ

গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ।
সদ্ব্রহ্মাহমিত্যেবং বোধে কার্যং কথং ভবেৎ॥
অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ।
অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জিতঃ॥
দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং আত্মনিশ্চয়াৎ॥ ব্রঃ সূঃ, শং-ভাষ্য, ১।১।৪

তথা চ সুন্দরপাণ্ড্য-বার্ত্তিকমপি—
দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণন্ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥

মাধবাচার্যকৃত সূতসংহিতা-টীকা, পৃষ্ঠা ২৭৯, আনন্দাশ্রম-সংস্করণ।

২। ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে। শ্রীভাষ্য-উপক্রমণিকা।

৩। বিংশত্যধ্যায়নিবন্ধস্য মীমাংসাশাস্ত্রস্য কৃতকোটি-নামধেয়ং ভাষ্যং বোধায়নেন কৃতম্। তদ্ গ্রন্থ-বাহুল্যভয়াদুপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তমুপবর্ষেণ কৃতম্। প্রপঞ্চহৃদয়, পৃষ্ঠা ৩৯, মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রি-সম্পাদিত।

নাম। বেঙ্কটনাথ তাঁহার তত্ত্বটীকায় বোধায়ন এবং উপবর্ষকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১] বেঙ্কটের উক্তিকে ভিত্তি করিয়া মাদ্রাজের মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী বোধায়ন এবং উপবর্ষকে এক ব্যক্তি বলিয়াই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২] আমরা বেঙ্কটনাথের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। আমাদের মতে উপবর্ষ এবং বোধায়ন যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা বোধায়ন-কৃত ভাষ্য উপবর্ষ-কর্তৃক সংক্ষিপ্ত হইয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। উপবর্ষ এবং বোধায়ন যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা আরও একটি কারণে আমাদের মনে হয়। আচার্য শঙ্কর নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী। তিনি শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যে বৃত্তিকারের মত নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। শাঙ্কর-ভাষ্যে 'অন্যে তু', 'অপরে তু', 'কেচিত্তু' বলিয়া বৃত্তিকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের মতে এই বৃত্তিকার বোধায়ন। উপবর্ষের মতকেও বৃত্তিকারের মত বলিয়া শবরস্বামী তাঁহার মীমাংসা-ভাষ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করও শবরস্বামীর এই মতানুসারে উপবর্ষকে বৃত্তিকার বলিয়া স্বীয় বেদান্ত-ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] কিন্তু তিনি স্বীয় ভাষ্যে আচার্য উপবর্ষের মত 'যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ' বলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্যের এই প্রকার উল্লেখ-ভঙ্গী হইতে বৃত্তিকার বোধায়ন ও উপবর্ষ যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাই বুঝা যায়। আচার্য উপবর্ষের মত কোন কোন স্থলে আচার্য শঙ্কর স্বীয় মতের পোষক প্রমাণ হিসাবেও উদ্ধার করিয়াছেন।[৪] কিন্তু, বোধায়নের মতকে আচার্য কোথায়ও এইরূপভাবে গ্রহণ করেন নাই। অতএব আমাদের মতে উপবর্ষ ও বোধায়ন এক ব্যক্তি নহেন, ভিন্ন ব্যক্তি। বেদান্ত-বৃত্তিকার বোধায়ন ও কল্পসূত্রকার বোধায়ন এক ব্যক্তি কি না, তাহাও বিচারসাপেক্ষ। কেবল নামের ঐক্য ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দ্রমিড়াচার্য—দ্রমিড়াচার্য বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন আচার্য। যামুনাচার্য তাঁহার সিদ্ধিত্রয়ে ভাষ্যকার বলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দ্রমিড়াচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যে এবং বেদার্থ-সংগ্রহেও দ্রমিড়াচার্যের নাম

১। বৃত্তিকারস্য বোধায়নস্যৈব হি উপবর্ষ ইতি স্যান্নাম।
বেঙ্কটনাথ-কৃত তত্ত্বটীকা, Conjeeveram Oriental Library Institution Series, No. 6.

২। See Proceedings of the Oriental Conference, Madras, 1924. Pp. 65-68.

৩। ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১৯, ১।১।২৩, ১।১।৩১, ১।২।২৩, ৩।৩।৫৩ সূত্রভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বৃত্তিকার উপবর্ষের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪। (ক) অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ১।৩।২৮।
(খ) অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। শংভাষ্য ৩।৩।৫৩।

বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।[১] বেঙ্কটনাথের তত্ত্বটীকায়ও দ্রমিড়াচার্যের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। দ্রমিড়াচার্যের যতটুকু বিবরণ জানিতে পারা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের এক অতি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। দ্রমিড়ের ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যের তুলনায় আচার্য শঙ্কর তাঁহার স্বীয় ভাষ্যকে অতি-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২] আচার্য শঙ্কর ছান্দোগ্য-ভাষ্যে স্থানবিশেষে স্বীয় মতের পোষক প্রমাণরূপেও দ্রমিড়াচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের (৩।৮-১০) মন্ত্রে সূর্যের উদয়াস্তের সময়-নিরূপণে পুরাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় আচার্য দ্রমিড়ের সমাধান গ্রহণ করিয়া শঙ্করাচার্য উক্ত শঙ্কার সমাধান করেন।[৩]

কাহারও কাহারও মতে আচার্য শঙ্কর যে দ্রমিড়াচার্যের মত অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনি দ্রমিড়াচার্য নহেন, দ্রবিড়াচার্য। তিনি রামানুজোক্ত দ্রমিড়াচার্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আমরা উক্ত মত অনুমোদন করি না। আমাদের মতে শঙ্করের দ্রমিড় ও রামানুজের দ্রমিড় একই ব্যক্তি। সর্বজ্ঞাত্মমুনি-কৃত সংক্ষেপশারীরকের তৃতীয়াধ্যায়ের ২১৭-২২১ শ্লোকের তাৎপর্য আলোচনা করিলে আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। সংক্ষেপশারীরকের উক্ত শ্লোকগুলিতে আচার্য শঙ্করের মতের সহিত বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী, টঙ্ক, ও টঙ্কবাক্য-ব্যাখ্যাতা ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।[৪] ঐ মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দ্রমিড়াচার্য সগুণ-ব্রহ্মবাদী আচার্য, নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের সহিত তুলনা করিয়া তত্ত্বনির্ধারণ করিবার জন্যই দ্রমিড়াচার্যের মত সংক্ষেপশারীরকে আলোচিত হইয়াছে। এই সগুণ-ব্রহ্মবাদী দ্রমিড়াচার্য যে রামানুজোক্ত দ্রমিড়াচার্য ব্যতীত অপর কেহ নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

১। যামুনাচার্যের সিদ্ধিত্রয় পৃষ্ঠা ৫-৬ দ্রষ্টব্য, চৌখাম্বা-সংস্করণ।
শ্রীভাষ্য Vol. I, 11, 12, 70; Vol. 11, 23, 75 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, মাদ্রাজ আনন্দপ্রেস-সংস্করণ। বেদার্থ-সংগ্রহ, ১৩৮, ১৪৮ পৃষ্ঠা, পণ্ডিত-সংস্করণ, বেনারস।

২। ওমিত্যেতদক্ষরমষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তস্যাঃ সংক্ষেপত ইহ জিজ্ঞাসুভ্যঃ ঋজুবিবরণমল্পগ্রন্থমিদমারভ্যতে। শাঙ্কর-ভাষ্য, উপক্রমণিকা ছান্দোগ্য উপঃ।
ঋজুবিবরণমিতি-ঋজুপাঠক্রমানুসারিবিবরণম্ অর্থস্ফুটীকরণং প্রকৃতোপনিষদঃ যস্মিন্ ভাষ্যে তত্তথেতি যাবৎ। অথ পাঠক্রমমাশ্রিত্যাপি দ্রামিড়ং ভাষ্যং প্রণীতং তৎ কিমনেন ইত্যাশঙ্ক্যাহঅল্পগ্রন্থমিতি। ছাঃ উপঃ আনন্দগিরিকৃতটীকা ১।১।১।

৩। অত্রোক্তঃ পরিহারঃ আচার্যৈঃ। ছাঃ, ৩।৮।৪, শাঙ্কর-ভাষ্য। যদ্যপি শ্রুতিবিরোধে স্মৃতিরপ্রমাণং তথাপি যথাকথঞ্চিদ্ বিরোধপরিহারং দ্রমিড়াচার্যোক্তমুপপাদয়তি। আনন্দগিরি।

৪। ভাষ্যকারো ব্রহ্মানন্দি-বাক্যব্যাখ্যাতা দ্রমিড়াচার্যঃ। বেদান্তদেশিককৃততত্ত্বটীকা, পৃষ্ঠা ১৩৮
অন্তর্গুণা ভগবতী পরদেবতেতি,
প্রত্যগ্গুণেতি ভগবানপি ভাষ্যকারঃ॥ সংক্ষেপশাঃ, শ্লোক ৩।২২১।
এই শ্লোকে ভাষ্যকার বলিয়া দ্রমিড়াচার্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

গুহদেব, টঙ্ক, ভারুচি, কপর্দী প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের দার্শনিক মতের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। রামানুজ-কৃত বেদার্থ-সংগ্রহ-পাঠে জানা যায় যে, ইঁহারা সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য ছিলেন।[১] আচার্য রামানুজ বেদার্থ-সংগ্রহে এবং শ্রীভাষ্যে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তদীয় বেদান্ত-চিন্তার ধারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, অদ্বৈতবাদ দার্শনিক মতবাদ হিসাবে গড়িয়া উঠিবার বহু পূর্বেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুগঠিত হইয়াছিল। আমরা এই মতের কোন সারবত্তা বুঝি না। আমাদের মতে, ভর্তৃহরি, সুন্দরপাণ্ড্য প্রভৃতি প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যগণের মতবাদের যে-টুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই অদ্বৈতবাদের প্রাচীনতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

১। ভগবদ্‌বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দি-ভারুচিপ্রভৃত্যবিগীতশিষ্টপরিগৃহীতপুরাতনবেদ-বেদান্তব্যাখ্যানসুব্যক্তার্থশ্রুতিনিকরনিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ। বেদার্থ-সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ১৪৮, কাশী-সংস্করণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আচার্য গৌড়পাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত

অদ্বৈতবাদ অতিপ্রাচীন হইলেও যে সকল অদ্বৈতবাদী আচার্যের লিখিত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে আচার্য গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডূক্যকারিকাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং অদ্বৈত বেদান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে হইলে আচার্য গৌড়পাদকেই প্রথম আচার্য বলিয়া গ্রহণ করা স্বাভাবিক। গৌড়পাদ আচার্য শঙ্করের গুরু গোবিন্দাচার্যের গুরু ছিলেন। এইজন্য শঙ্করাচার্য পরমগুরু বলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনাবিল শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রথমেই তিনি গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যের সমাপ্তি-শ্লোকে আচার্য গৌড়পাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, আচার্য গৌড়পাদ প্রাণিগণকে জন্ম-মৃত্যুরূপ হিংস্র জল-জন্তু সমাকুল ভীষণ সংসার-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া, তাঁহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে বেদবারিধি মন্থন করিয়া দেবগণেরও দুর্লভ বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞান সুধা আহরণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য পূজ্যগণেরও পূজনীয় সেই পরম গুরুকে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া নমস্কার করিতেছি।[১] আচার্য শঙ্করের এইরূপ উক্তি হইতে মনে হয় যে, তিনিও আচার্য গৌড়পাদকেই প্রাচীনতম অদ্বৈত আচার্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য গৌড়পাদও তাঁহার কারিকায় অন্য কোন প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যের নাম উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং গৌড়পাদকে অদ্বৈত বেদান্তের সর্বপ্রাচীন আচার্য বলিয়া মনে করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এই গৌড়পাদ কে? তিনি কখন ভারতের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেননা, সন্ন্যাসীর জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য আচার্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি গ্রন্থে আচার্য শঙ্করকে দ্রাবিড়দেশীয় ও আচার্য গৌড়পাদকে গৌড়দেশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] আচার্য শঙ্কর দ্রাবিড়দেশীয় ইহা ঐতিহাসিক সত্য, গৌড়পাদ

১। প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিত-জলনিধের্বেদনাম্নোঽন্তরস্থং
ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যনবরতজননগ্রাহঘোরে সমুদ্রে।
কারুণ্যাদুদ্ধধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতো-
র্যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি॥

মাঃ কাঃ ২৯৪ পৃঃ

মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত।

২। এবং গৌড়ৈর্দ্রাবিড়ৈর্নঃ পূজ্যৈরর্থঃ প্রভাষিতঃ।
অজ্ঞানমাত্রোপাধিঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ॥ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অঃ ৪।৪৪ শ্লোক।

গৌড়দেশীয় কি না, সে বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুরেশ্বর গৌড়পাদ নামের "গৌড়" শব্দ দেখিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না, তাহা বুঝা যায় না। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় গ্রন্থে দেখা যায় যে, আচার্য শঙ্করের সহিত আচার্য গৌড়পাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ের উক্তি কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ের উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া না মানিলেও, মাণ্ডূক্যকারিকার শাঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, শঙ্করাচার্য তাঁহার পরমগুরুর অতিমানুষ প্রতিভা ও অসামান্য পাণ্ডিত্যদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের সংযম, বিনয়, সারল্য ও পাণ্ডিত্য আচার্যের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।[১] শঙ্করাচার্যের উক্তি হইতে পরমগুরুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ও সান্নিধ্যলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। উভয়ের এই সান্নিধ্য মানিয়া লইলে শঙ্করের জীবৎকালের যে নির্ণয় আছে তাহা দ্বারা আচার্য গৌড়পাদের জীবৎকালেরও মোটামুটি নির্ণয় করা যায়। আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ (788 A. D.—820 A.D.) জীবিত ছিলেন। ইহা হইতে আচার্য গৌড়পাদের জীবৎকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গৌড়পাদ, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুবন্ধু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' ঐ সকল পূর্ববর্তী ধুরন্ধর দার্শনিকগণের প্রভাব অতিক্রম করা পরবর্তী অনেক দার্শনিকের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং আচার্য গৌড়পাদ বৌদ্ধ-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন কি না ইহাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য।[২]

আচার্য গৌড়পাদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাণ্ডূক্যকারিকাই প্রধান ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও ভাবের গভীরতায় মাণ্ডূক্যকারিকা পরবর্তী বৈদান্তিক আচার্যগণের হৃদয় জয় করিয়াছে। গৌড়পাদ-প্রণীত সাংখ্যকারিকার এক ভাষ্য প্রচলিত আছে। অনেকের মতে ঐ সাংখ্যকারিকার ভাষ্য-রচয়িতা গৌড়পাদ ও মাণ্ডূক্যকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদ এক ব্যক্তি নহেন। মাণ্ডূক্যকারিকার প্রসন্ন গম্ভীরভাবের কোন বিকাশই সাংখ্যকারিকা-ভাষ্যে দেখা যায় না। তারপর, অদ্বৈত-বাদী আচার্যের পক্ষে সাংখ্য-দর্শনের ভাষ্য রচনা করিতে যাওয়া সম্ভব কি না, তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ। উক্ত সাংখ্য-ভাষ্য প্রাচীন আচার্য গৌড়পাদের বিরচিত হইলে পরবর্তী প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণ গৌড়পাদের ভাষ্যোক্তি অবশ্যই উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতেন, সুতরাং সাংখ্য-ভাষ্যকার ও মাণ্ডূক্যকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না।

মহাভারতোক্ত উত্তর-গীতার উপর উত্তর-গীতা-ভাষ্য বলিয়া গৌড়পাদ-রচিত এক ভাষ্য প্রচলিত আছে। উক্ত ভাষ্যে অদ্বৈতবাদ অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায়

১। মাণ্ডূক্যকারিকার শাঙ্কর-ভাষ্য ২১ পৃষ্ঠা, আনন্দাশ্রম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

২। অনেক পণ্ডিতের মতে গৌড়পাদ কেবল বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এমন নহে, তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন এবং মাণ্ডূক্যকারিকায়, বিশেষতঃ ইহার চতুর্থ অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। এই মত কতদূর সত্য তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদের শেষে বিচার করিয়া দেখাইব।

বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাষ্য মাণ্ডূক্যকারিকার ন্যায় বিচারবহুল নহে, পরবর্তী আচার্যগণও ঐ ভাষ্যমত কোথাও উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না, সুতরাং উত্তর-গীতা-ভাষ্য মাণ্ডূক্যকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদের রচিত কি না, তাহা বলা কঠিন। আচার্য গৌড়পাদের মনীষা তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকায় পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার শ্লোকলহরীর মধ্য দিয়া অদ্বৈত বেদান্তের গুরুগম্ভীর ভাবলহরীও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি শ্রুতি ও যুক্তির সমবায়ে অদ্বৈতবাদ দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। মাণ্ডূক্যকারিকা মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভিত্তিতে রচিত। ইহা মাণ্ডূক্য উপনিষদেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ। এই ব্যাখ্যা আচার্য গৌড়পাদের স্বাধীন রচনা। এই রচনায় ছন্দের সূত্রে আচার্য বিক্ষিপ্ত বেদান্ত-চিন্তা-কুসুম-মালা গ্রথিত করিয়াছেন। এই জন্যই এই গ্রন্থ মাণ্ডূক্যকারিকা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মাণ্ডূক্যকারিকায় সর্বমোট ২১৫টি শ্লোক আছে। ঐ শ্লোকগুলি (১) আগম, (২) বৈতথ্য, (৩) অদ্বৈত ও (৪) অলাতশান্তি—এই চারি প্রকরণ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম প্রকরণে আচার্য মাণ্ডূক্য উপনিষদের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব (বৈতথ্য) আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে (অদ্বৈত প্রকরণে) জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ঐক্যের পথে দ্বৈত জগৎ পরিপন্থী। এই জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপদিষ্ট হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদকে "অলাতশান্তি" বলা হয়। অলাত শব্দের অর্থ উল্কা বা মশাল। মশালকে যদি ঘুরানো যায় তবে মশালের আগুনকে গোলাকার দেখা যায়। বাস্তবিক মশালের আকার কিন্তু গোল নহে, মশাল ঘুরিতে থাকে বলিয়াই মশালের ঐরূপ গোল মিথ্যা আকারের প্রতীতি হইয়া থাকে। মশাল যখন স্থির হয়, ঐ মিথ্যা আকারও তখন বিলুপ্ত হয়। জগতের এই রঙ্গমঞ্চে অনবরত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে মায়ার মশাল ঘুরিতেছে; ফলে, মায়া-কল্পিত মিথ্যা জগতের খেলা চলিতেছে। দ্বৈত জগতের মূলে কোন সত্যতা নাই, উহা মায়ার বিভ্রম মাত্র, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। মায়া মশালের শান্তিই আমাদের কাম্য। এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত গৌড়পাদ মাণ্ডূক্যকারিকার অলাতশান্তি প্রকরণে প্রতিপক্ষ মতের খণ্ডনপূর্বক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আগম প্রকরণে গৌড়পাদ তুরীয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন এবং ঐ দুর্জ্ঞেয় তুরীয় তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি একটি সহজবোধ্য রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

আচার্য্য গৌড়পাদের দার্শনিক-মত—গৌড়পাদের মতে তুরীয় আত্মার স্বরূপ

সমস্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ; এই অদ্বৈত রহস্য বুঝাইবার জন্য ওঁকার বা প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ওঁকারের যেমন অ, উ, ম, এবং নাদবিন্দু (ঁ) এই চারটি মাত্রা আছে, সেইরূপ ঈশান তুরীয় ব্রহ্মকেও শ্রুতি চতুষ্পাদ বা চতুষ্কল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্ব বা বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, ইহাই সর্বব্যাপী ব্রহ্মের পাদত্রয়, আর, এই পাদত্রয়ের অতীত ঈশান বা নির্বিশেষ ব্রহ্মই তুরীয়পাদ। প্রণবের দৃষ্টান্তে নাদবিন্দু ঐ

তুরীয়পাদ। নাদবিন্দু যেমন পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারিত বা ব্যক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মের তুরীয়পাদও অবাঙ্‌মনস-গোচর, ভাষার সাহায্যে বা মনে মনেও তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। কেবল নিষেধ মুখে 'নেতি নেতি' বলিয়া তুরীয় তত্ত্বের উপদেশ সম্ভব হয়। এই জন্যই শ্রুতি "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদি বলিয়া তুরীয় তত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য 'ন' এর বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ তুরীয় ঈশান তত্ত্ব বিশ্বও নহে, তৈজসও নহে, প্রজ্ঞ বা জ্ঞাতাও নহে, অপ্রজ্ঞ বা অজ্ঞাতাও নহে। উহা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্য, শান্ত, শিব, অদ্বিতীয়, আত্মা।[১] এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তুরীয় আত্মার উপদেশই যখন উপনিষদের রহস্য এবং ঐ তুরীয় আত্মা যখন বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ আত্মার অতীত তত্ত্ব, তখন শ্রুতি তুরীয় আত্মাকে বুঝাইবার জন্য বিশ্বাদি স্থূল সূক্ষ্ম পাদত্রয়ের উপদেশ করিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঐ তুরীয় আত্মতত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। আমাদের স্বভাবচঞ্চল মনঃ ঐ দুর্জ্ঞেয় আত্ম-বস্তুকে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। এইজন্যই আমরা আত্মাকে যে ভাবে সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ঐ ভাবে প্রথমতঃ স্থূল আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া, ক্রমে শ্রুতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম তুরীয় আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। আমরা আমাদের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাযই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করি। অবশ্য ঐ প্রত্যক্ষের কিছু তারতম্য আছে। জাগরিত অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎকে প্রত্যক্ষ করি এবং ঐ প্রত্যক্ষের অন্তরালবর্তী বিষয়দ্রষ্টা আত্মাকেও অনুভব করি। এই বিষয়দ্রষ্টা আত্মাই স্থূলভুক্ বিশ্ব আত্মা। স্বপ্ন অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয় হইতে বিরত হয়, তখন কেবল মনঃ ক্রিয়াশীল থাকে। মনঃ যাহা আমাদের কাছে উপস্থিত করে তাহাই আমরা তখন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এইজন্য স্বপ্নদৃক্ ঐ আত্মাকে বলা হইয়াছে 'প্রবিবিক্তভুক্', প্রবিবিক্ত শব্দের অর্থ স্থূল দৃশ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত, কেবল মানস-সঙ্কল্প-জাত; স্বপ্নাবস্থায় মনে যেরূপ সঙ্কল্প বা বাসনার উদয় হইবে, আত্মা তদনুরূপই বিষয় ভোগ করিবে। এই আত্মা শ্রুতির ভাষায় তৈজস আত্মা অর্থাৎ এই অবস্থায় আত্মা স্থূল শব্দাদি বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তেজোময় অন্তঃকরণকে দর্শন করে বলিয়া, তাহাকে তৈজস বলা হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মনঃও নিষ্ক্রিয় হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এখানে আত্মার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনরূপ বিষয় ভোগ্য থাকে না, একমাত্র নিদ্রার আনন্দই সে ভোগ করে। সেই জন্য সুষুপ্ত আত্মাকে আনন্দভুক্

আত্মার বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই রূপত্রয়ের স্বরূপ

১। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যমব্যবহার্য্য-মগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ। মাণ্ডুক্য উপ, ৭, তুলনা করুন নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিকা-কারিকা।

অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্। অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্॥
যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্॥ মাধ্যমিক বৃত্তি, ২০৪ পৃষ্ঠা।

প্রাজ্ঞ আত্মা বলা হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় এই প্রাজ্ঞ আত্মা সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়া যায়। আনন্দঘন প্রাজ্ঞ আত্মার তখন কোন দ্বৈত বস্তুর জ্ঞান থাকে না। তুরীয় আত্মারও কোন দ্বৈত জ্ঞান নাই। এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও তুরীয় উভয় আত্মাই তুল্য, পার্থক্য এই যে, সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ আত্মার তমঃ বা নিদ্রারূপ অবিদ্যা-বীজ বর্তমান থাকে, সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে উহাকে আবার মনঃ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া মায়ার চক্রে ঘুরিতে হয়।[১] তুরীয় আত্মা নিত্য প্রকাশ-স্বরূপ। তাঁহার কোনরূপ তমঃ বা অজ্ঞান নাই। আত্মার বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই পাদত্রয় অজ্ঞানকল্পিত, একমাত্র তুরীয় ঈশানই অজ্ঞানাতীত এবং নিত্য বোধ স্বরূপ। অনাদি মায়ার ক্রোড়ে সুপ্ত জীব এই তুরীয় নিত্য, জ্ঞানময়, আনন্দঘন আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারে না, কিন্তু যখন আচার্য ও গুরুর উপদেশে তাঁহার অজ্ঞান বিদূরিত হয়, বিবেকচক্ষু উন্মীলিত হয় তখনই সে আনন্দময় আত্মাকে উপলব্ধি করে।[২] অবিদ্যা-বশতঃই আত্মার বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি স্থূল, সূক্ষ্ম বিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যষ্টিরূপে যাহা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, সমষ্টিরূপে তাহাই বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, ঈশ্বর ও অন্তর্যামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ সমস্তেরই মূলে রহিয়াছে সেই অনাদি মায়া। কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি, সমস্ত বিভেদই মায়াকল্পিত ও মিথ্যা। আত্মার যে পাদত্রয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যেও বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই 'এক এব ত্রিধা স্থিতঃ', এক আত্মাই তিন অবস্থাতে অবস্থাত্রয়ের সাক্ষি-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন; যেই আমি জাগিয়া থাকি, সেই আমিই স্বপ্ন দেখি এবং সুষুপ্তির আনন্দ অনুভব করি। একই আমি ত্রিবিধ অবস্থার অন্তরালে অবস্থিত আছি। অবস্থাত্রয়ের মধ্যবর্তী হইয়াও আমি নির্মল, সঙ্গী হইয়াও অসঙ্গ, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগতের অন্তরে নিত্য বিরাজ-মান থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিন্ময় এবং আনন্দঘন।

আচার্য গৌড়পাদ আগম প্রকরণে উক্তরূপে অদ্বয় আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব-সিদ্ধির অনুকূল জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন।

গৌড়পাদের মতে জগতের মিথ্যাত্ব

তাঁহার মতে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুগুলি যেমন মিথ্যা, জাগরিত অবস্থায় যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সেইরূপ মিথ্যা। স্বপ্নে আমরা নানারূপ অদ্ভুত বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আমার দেহের মধ্যে একটা হাতী প্রবেশ করিল, আমার নিজের মাথাটাই দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। এইরূপ আরও কত কি অদ্ভুত দৃশ্য স্বপ্নাবস্থায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই নিজ স্বল্পপরিসর দেহের মধ্যে বিশালকায় হস্তীর প্রবেশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। স্বপ্নদৃশ্য বস্তুসমূহ যতক্ষণ স্বপ্ন চলিতে থাকে ততক্ষণই স্বপ্নদর্শীর চক্ষুর

১। মাণ্ডূক্যকারিকা। ১।৪—৫, ১৩—১৪ দ্রষ্টব্য।

২। অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা। মাঃ কাঃ ১।১৬

সম্মুখে ছবির মত বিরাজ করে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ সকল দৃশ্য বস্তুর কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনের খেয়ালেই ঐ সকল দৃশ্য বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং উহা প্রত্যক্ষের গোচর হয়। মানস কল্পনা-প্রসূত স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু যে অসত্য তাহাতে স্বপ্নদর্শীর পরবর্তী কালে কোনও সন্দেহ থাকে না। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুসমূহ যে কল্পিত ও মিথ্যা, তাহা শ্রুতিও স্পষ্টতঃ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে যে রথ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রথ, রথবাহী অশ্ব ও রথ চলিবার পথ, এই সমস্তই দেখা যায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা কিছুই নহে, সমস্তই মনের খেলা এবং অসত্য।[১] স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ বিধায় স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া, দৃশ্যত্বহেতুমূলে অনুমান প্রমাণের সাহায্যে জাগরিত অবস্থায় যে সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও মিথ্যাত্ব সাধন করা যাইতে পারে।[২] এই মিথ্যাত্বের মূলে দেখা যাইবে যে, দৃশ্য মাত্রই মিথ্যা। স্বপ্নের দৃশ্যও দৃশ্য, জাগরিত অবস্থার দৃশ্যও দৃশ্য, উভয়ের মধ্যেই দৃশ্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম বিদ্যমান। পার্থক্য এই যে, স্বপ্ন-দৃশ্য বস্তু স্বপ্নদর্শীর মানস-সৃষ্টি বলিয়া, তাঁহার মনোজগতেই ঐ সকল স্বপ্নদৃশ্য বস্তু বিরাজ করে, স্বপ্নদর্শীর মনের বাহিরে ঐ সকল বস্তুর কোনই অস্তিত্ব নাই এবং স্বপ্নদর্শীরই উহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, অপরের হয় না। জাগরিত অবস্থায় আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি তাহা কিন্তু এরূপ নহে, উহা আমাদের মানস-সৃষ্ট নহে, মনের বাহিরেই ঐ বিশাল বিচিত্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। আমি উহা যেমন দেখিতেছি এবং ভোগ করিতেছি অপরেও উহা সেইরূপ দেখিতেছে এবং ভোগের আনন্দ লাভ করিতেছে। এই অবস্থায়, জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুসমূহের স্বপ্নদৃশ্য বস্তু হইতে ভেদ যখন সুস্পষ্ট, তখন এই সকল জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুকে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বলা যায় কিরূপে? আর, জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব সাধনে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাসই বা করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জাগ্রদ্‌দৃশ্য এবং স্বপ্ন-দৃশ্য বস্তুর মধ্যে যে পূর্বোক্ত প্রকার বিভেদ আছে, তাহা আচার্য গৌড়পাদও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই জন্যই তিনি মনোময় বস্তুকে "চিত্তকালাঃ" (মাঃ কাঃ ২।১৪) বা চিত্ত সমকালীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ চিত্ত সমকালীন বস্তু যাহার চিত্তপটে

১। ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। বৃহদাঃ ৬।৩।১০
অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্॥ মাঃ কাঃ ২।৩

২। জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাদিতি হেতুঃ; স্বপ্নদৃশ্যভাববদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেঽপি দৃশ্যত্বমবিশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ। তস্মাজ্জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্। শং ভাষ্য, মাঃ কাঃ ২।৪।

জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি অদ্বৈত বেদান্তের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও "বিমতং (জগৎ) মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ" এইরূপে দৃশ্যত্বকেই মিথ্যাত্ব-সাধক হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ৩১ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সংস্করণ দ্রষ্টব্য। দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা এই হিসাবে স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্‌দৃশ্যকেও মিথ্যা বলিতে কোন অদ্বৈত বেদান্তীরই আপত্তি নাই।

অঙ্কিত থাকে, তাঁহারই শুধু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, অপরে উহা জানিতে পারে না। বাহ্য জাগতিক পদার্থগুলি কিন্তু সেরূপ নহে, উহা আমার যেমন প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, অপরেরও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সুতরাং ঐ সকল বস্তু কেবল চিত্তকালীন বা জ্ঞানকালীন নহে, উহার ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। ঐ জাগতিক বস্তুগুলি আচার্য গৌড়পাদের ভাষায় "দ্বয়কালাঃ" (মাঃ কাঃ ২।১৪)। অর্থাৎ ঐ সকল বস্তু জ্ঞানকাল এবং জ্ঞানের পরবর্তী কাল, এই উভয় কালে বিদ্যমান থাকে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যায় না, সুতরাং মনোজগৎ হইতে বহির্জগৎ যে স্বতন্ত্র, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, স্বপ্নসৃষ্টি যেমন অজ্ঞ জীবের মানস কল্পনা, অবিদ্যার বিলাস, পরিদৃশ্যমান বিশ্বসৃষ্টিও সেইরূপ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পরমেশ্বরের মায়ার বিলাস। এই মায়িক বিশ্বসৃষ্টিও পরমেশ্বরের অনাদি মনের বিচিত্র কল্পনা। কল্পনাই সৃষ্টির মূল। সেই মৌলিক কল্পনা অল্পজ্ঞ জীবের খণ্ড মনের অভিব্যক্তিই হউক, কি সর্বশক্তি পরমেশ্বরের অনাদি অখণ্ড মনের অভিব্যক্তিই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যাহা কল্পিত তাহাই মিথ্যা, সুতরাং এই হিসাবে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের ন্যায় জাগ্রদ্‌দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চকেই বা মিথ্যা বলিব না কেন? স্বপ্নসৃষ্টি জীবের নিজ মনের কল্পনা, সুতরাং জীব স্বপ্নসৃষ্টির অসত্যতা বুঝিতে পারে। বিশ্বসৃষ্টি অজ্ঞ জীবের মানস কল্পনা নহে, পরমেশ্বরের মানস কল্পনা। জীবের জীবত্বের মূলেও ঐ কল্পনাই বিরাজমান, সুতরাং মায়াকল্পিত জীব মায়িক সৃষ্টির অসত্যতা বুঝিবে কিরূপে? বিশ্বসৃষ্টির অসত্যতা বুঝিতে হইলে স্বীয় জীবভাবেরও অসত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। জীবভাব বিদ্যমান থাকিতে, জীবভাবের অসত্যতা বুঝা যায় না। সেইরূপ যে পর্যন্ত দ্বৈতবুদ্ধি বা ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্যন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও বুঝা যাইবে না। এইজন্য অজ্ঞ জীব বিশ্বকে সত্য বলিয়াই মনে করে। বস্তুতঃ পক্ষে ইহা সত্য নহে, মিথ্যা।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট দেহাভ্যন্তরে হস্তীর প্রবেশ প্রভৃতি স্বল্পপরিসর মানবদেহের মধ্যে অসম্ভব বিধায় উহা মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে তো ঐরূপ কথা বলা চলে না, তাহাতে তো কোন বাধবুদ্ধি নাই, সুতরাং জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুকে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বলিব কিরূপে? ক্ষুধার্ত আমি পান, আহার করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল, এই অবস্থায় কেমন করিয়া বলিব যে, যে সকল অন্ন ও পানীয় আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিয়াছে তাহা মিথ্যা? এই আপত্তির উত্তরে আচার্য গৌড়পাদ বলেন যে, স্বপ্নদৃশ্য বস্তু যেমন জাগরিত অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুসমূহও স্বপ্ন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জাগ্রদ্‌দৃশ্য ব্যাবহারিক বস্তু সম্বন্ধে কোন বাধ বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায় না, এমন কথা বলা চলে না। যে সকল অন্ন, পানীয়কে আমরা জাগরিত অবস্থায় সত্য বলিয়া মনে করি, তাহাই স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ আমি আকণ্ঠ পান-ভোজন করিয়াও যদি নিদ্রিত হই, তবুও স্বপ্নে হয় তো আমি নিজেকে উপবাসী, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর বলিয়া মনে করি, পক্ষান্তরে, স্বপ্নের মধ্যে প্রচুর আহার করিয়া যখন জাগরিত হই, তখন নিজেকে অভুক্ত বলিয়া বোধ করি। স্বপ্ন অবস্থার পান,

ভোজন জাগরিত অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা যেমন মিথ্যা, সেইরূপ জাগরিত অবস্থার পান, ভোজনও স্বপ্নাবস্থায় বাধিত হয় বলিয়া তাহাকেই বা মিথ্যা বলিতে বাধা কি?[১] মোট কথা, যাহা বাধিত হয় তাহাই মিথ্যা। কি স্বপ্নদৃশ্য, কি জাগ্রদ্‌-দৃশ্য, বস্তুমাত্রই কোন-না-কোন অবস্থায় বাধিত হয়, সুতরাং তাহা মিথ্যাই হইবে। দৃশ্য বস্তুমাত্রই উৎপত্তি-বিনাশশীল। উহা উৎপত্তির পূর্বেও ছিল না, অবসানেও থাকিবে না, সুতরাং আদিতে এবং অবসানে দৃশ্য বস্তু যে অসৎ তাহাতে কোনই বিবাদ নাই। আদিতে এবং অবসানে যে বস্তু নাই, সেই বস্তুর বর্তমান অভিব্যক্তি সত্য কি মিথ্যা, ইহাই বিচার্য। অসদ্‌ বস্তুর বর্তমানকালীন অভিব্যক্তি অসৎ-ই হইবে। মৃগতৃষ্ণিকা, রজ্জু-সর্প প্রভৃতি অসদ্‌বস্তু আদিতে এবং অবসানে যেমন অসৎ, উহাদের বর্তমান অকিঞ্চিৎকর অভিব্যক্তিও অসৎ। যাহা নাই, তাহা কোন কালেই নাই, উহাদের সাময়িক মিথ্যা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে মাত্র। জাগরিত অবস্থায় আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহা আদি এবং অন্তে অসদ্‌ বিধায় অসত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে।[২] আচার্য গৌড়পাদের ভাষায় পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বই শুক্তিতে রজত বিভ্রমের ন্যায়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, শূন্যে নগর কল্পনার ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র।[৩]

১। সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ।। মাঃ কাঃ ২।৭

আচার্য গৌড়পাদ জাগরিত অবস্থায় দৃশ্য বস্তুগুলির স্বপ্নাবস্থায় বাধ প্রদর্শন করিয়া স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর তুল্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার—বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯) এই সূত্রে স্বপ্ন ও জাগ্রদ্‌ দৃশ্য বস্তুর বৈসাদৃশ্য বা অতুল্যতাই স্পষ্টতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন।—ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্করও ইহাদের বৈসাদৃশ্যই যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বৈধর্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ। কিং পুনর্বৈধর্ম্যম্‌? বাধাবাধাবিতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য মিথ্যামযোপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি।- -............নচৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে। ব্রহ্মসূত্র শাঃ ভাষ্য ২।২।২৯ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত শাঙ্কর ভাষ্যের তাৎপর্য আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, আচার্য গৌড়পাদ যে জাগরিত অবস্থায় দৃশ্য বস্তুর স্বপ্ন অবস্থায় বাধ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা স্বপ্ন ও জাগ্রদ্‌ দৃশ্য বস্তুর তুল্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শঙ্করকৃত শারীরক মীমাংসা ভাষ্যের অনুমোদিত মত নহে।

২। আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ।। মাঃ কাঃ ২।৬

যাহা আদ্যন্তবান্‌ বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মিথ্যা, ইহাতে পরবর্তী বৈদান্তিকগণেরও সম্মতি আছে। এই জন্যই অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে দৃশ্যত্বের ন্যায় পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের সাধক হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৩১ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৩। স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ।। মাঃ কাঃ ২।৩১

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উল্লিখিত শ্লোকে আচার্য গৌড়পাদ যেরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চকে শূন্যে নগর কল্পনার ন্যায় অলীক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আচার্য শঙ্কর তদীয় ব্রহ্মসূত্রে ব্যাবহারিক জগৎকে সেইরূপ অলীক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই (ব্রঃ সূঃ ভাষ্য ২।২।২৯ দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে 'নাভাব উপলব্ধেঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮,) এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর, স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর তুলনায়

জগৎ বস্তুতঃ অলীক হইলেও সত্য স্বরূপ পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত সুতরাং সত্য বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মসত্তায় অনুপ্রাণিত জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ও নহে, অপৃথক্‌ও নহে—ন পৃথক্ নাপৃথক্ কিঞ্চিৎ। (মাঃ কাঃ ২।৩৪)। ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া দৃশ্য বস্তু অংশতঃ সত্যও বটে, বাধিত হয় বলিয়া মিথ্যাও বটে, ফলে আচার্য গৌড়পাদের মতেও বিশ্বপ্রপঞ্চ অনির্বাচ্যই হইয়া দাঁড়াইল।

এই অনির্বচনীয় সৃষ্টির ইন্দ্রজাল রচনা করে কে? এবং কিরূপেই বা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ বিরচিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌড়পাদ বলেন যে, নিত্য চিন্ময় পরমাত্মাই স্বীয় মায়াশক্তিবলে এই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া'। (মাঃ কাঃ ২।১২)। আত্মাই নিখিল জগতের কর্তা, শাসক এবং ভাসক। অনাদি মায়ার গর্ভেই এই দ্বৈত জগৎ লুক্কায়িত থাকে। মায়াধীশ পরমাত্মা মায়াকে তাঁহার সৃষ্টিলীলার সহচরী করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টি কোথায়ও জড়প্রধান কোথায়ও চেতনপ্রধান। বিশ্বপ্রপঞ্চ জড়প্রধান সৃষ্টি, জীব, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি সৃষ্টি চেতনপ্রধান সৃষ্টি। জড়সৃষ্টিতে অবিদ্যা বীজই প্রধান, চেতনসৃষ্টিতে চৈতন্যাংশ প্রধান। অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সৌরবিম্ব হইতে যেমন তদনুরূপ প্রতিবিম্ব জলের মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ চিন্ময় পরমপুরুষ হইতে পুরুষ-প্রতিবিম্ব চেতন জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব নিজকে কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, এইরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার সুখ-দুঃখবোধের মূলে এই জগৎপ্রপঞ্চই বিদ্যমান। জগতের মধ্যে যে সকল বস্তু তাঁহার অনুকূল, ঐ সকল বস্তু তাঁহার সুখ উৎপাদন করে, প্রতিকূল বস্তু দুঃখ উৎপাদন করে। জাগতিক বস্তু হইতে তাঁহার যেরূপ সুখ বা দুঃখের বোধ উৎপন্ন হয়, তদনুরূপ স্মৃতিই তাঁহার মনের মধ্যে জাগরূক থাকে। এইক্ষণে যাহা জ্ঞান, পরক্ষণেই তাহা স্মৃতি হইয়া দাঁড়ায়, ঐ স্মৃতি হইতে আবার

জীবের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

জাগরিত অবস্থার দৃষ্টবস্তুগুলিকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যেহেতু জাগরিত অবস্থায় দৃষ্টবস্তুসমূহ স্পষ্টতঃ উপলব্ধির বিষয় হয় সুতরাং উহা নাই এরূপ বলা চলে না—ন খলু অভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতি প্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চোপলভ্যমানস্যাভাবো ভবিতুমর্হতি।...ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহমুপলভে, ন সোঽস্তীতিব্রুবন্ কথমুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য ২।২।২৮। তারপর, স্বপ্নদর্শন ও জাগরিতদর্শন এই উভয়বিধ দর্শনের মধ্যে যে মৌলিক বিভেদ আছে, তাহাও আচার্য শঙ্কর উক্ত ভাষ্যে স্থানান্তরে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বপ্নদর্শন এক প্রকার স্মৃতি, আর, জাগরিত অবস্থায় যে বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তাহা অনুভব। অনুভব ও স্মৃতি দুই জাতীয় জ্ঞান, ইহাদের পার্থক্যও অতি স্পষ্ট। স্মৃতির বিষয় স্মরণকারীর সম্মুখে বিদ্যমান থাকে না, অবিদ্যমান বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, প্রত্যক্ষ কিন্তু সেরূপ নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াই সেই বিষয়ে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে। এইরূপে স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ এই দুই ভিন্নজাতীয় জ্ঞানের পার্থক্য যখন অতি স্পষ্ট, তখন জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট-বস্তুসমূহকে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় অলীক ও মিথ্যা বলা যায় কিরূপে?

যথাকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপে জীবের জ্ঞানচক্র নিয়ত আবর্তিত হইতে থাকে। জ্ঞেয় বস্তু মিথ্যা, জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকারিত জ্ঞানও মিথ্যা, জীবের জ্ঞাতৃত্ব এবং জীবত্বও মিথ্যা। জীবের জ্ঞানচক্রের অন্তরালে মিথ্যার চক্রই ঘুরিতেছে। যতক্ষণ জীবের অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা জীবভাব বর্তমান থাকিবে ততক্ষণ জীব যে বস্তুতঃ শিব-স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অখণ্ড, চিদ্‌ঘন, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, তাহা অজ্ঞ জীব বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের অরুণালোকে অজ্ঞানান্ধকার যখন বিদূরিত হয় তখন রজ্জু-জ্ঞান হইলে যেমন সর্প-বিভ্রম বিদূরিত হয়, সেইরূপ সমস্ত জীব ও জগৎ-বিভ্রম বিলুপ্ত হয়।[১] নিত্য ভাস্বর অদ্বয়জ্ঞানই পরম কল্যাণ নিদান (অদ্বয়তা শিবা), তাহাই পরমার্থ, তদ্ব্যতীত সমস্তই ব্যর্থ। ঐরূপ অদ্বয়জ্ঞানী জীবের উৎপত্তিও নাই, বিলয়ও নাই, মুক্তিও নাই, বন্ধও নাই, সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই। কারণ, চিদানন্দঘন আত্মা বা ব্রহ্মরূপই জীবের যথার্থ স্বরূপ।[২] আত্মা আকাশের ন্যায় ভূমা এবং অখণ্ড। অখণ্ড বিভু আকাশের যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ঔপাধিক ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মার দেহ ও অন্তঃকরণাদি উপাধিবশতঃ ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঘটরূপ উপাধি বিলীন হইলে, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় দেহ ও অন্তঃকরণ সমূলে বিলীন হইলে, জীবাত্মাও সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়।[৩] প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিখিল দেহে যদি একই আত্মা বিরাজ করে, তবে একজনের মনে সুখ বা দুঃখের উদয় হইলে সকল পুরুষেরই সুখ বা দুঃখ বোধ হয় না কেন? ইহার উত্তরে আচার্য বলেন যে, কোনও একটি ঘটাকাশ ধূলিময় বা ধূমাচ্ছন্ন হইলে যেমন অপরাপর ঘটাকাশ ধূলিময় বা ধূমাচ্ছন্ন হইয়া যায়

১। জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ॥ মাঃ কাঃ ২।১৬
অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥ মাঃ কাঃ ২।১৭
নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্তে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ॥ মাঃ কাঃ ২।১৮

২। ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ মাঃ কাঃ ২।৩২
(তুলনা করুন নাগার্জুন কৃত মাধ্যমিক কারিকা। ২০৪ পৃষ্ঠা)
অনিরোধ-মনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্।
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্।
যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্।

৩। আত্মাহ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচচ সংঘাতৈর্জাতাবেতন্নিদর্শনম্॥ মাঃ কাঃ ৩।৩।
ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি॥ মাঃ কাঃ ৩।৪।

না, সেইরূপ কোনও এক ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ বোধের উদয় হইলে, সকলেরই সে সুখ-দুঃখ বোধ হইতে পারে না ; অর্থাৎ আকাশ এক হইলেও যেমন প্রত্যেক ঘটরূপ উপাধি বিভিন্ন, সেইরূপ পরমাত্মা এক অখণ্ড হইলেও প্রত্যেক জীবের দেহ ও অন্তঃকরণরূপ উপাধি বিভিন্ন। এইজন্যই উল্লিখিত আপত্তি চলে না।[১] এই ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে, সেইরূপ জীবও পরমাত্মার বিকার বা অবয়ব নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন ধূলি-ধূসরিত আকাশকে মলিন বলিয়া মনে করে, সেইরূপ দেহাদিতে (উপহিত) অহং-অভিমানী আত্মায় দেহের ধর্ম স্থূলতা, কৃশতা প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ প্রভৃতি আরোপিত করিয়া অজ্ঞ জীব, আত্মাকে স্থূল, কৃশ, সুখ-দুঃখ সমাকুল মনে করে। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশে দেহাভিমানী আত্মাকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া ভ্রম করে। আত্মার বস্তুতঃ জন্মও হয় না, মৃত্যুও হয় না। আত্মা জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখের অতীত। জীবাত্মা পরমাত্মারই বিভাব প্রকারভেদ মাত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক, অভেদই যথার্থ তত্ত্ব।

জীব ও ব্রহ্মের ঘটাকাশ মহাকাশের মত সর্বথা ঐক্যই যদি বেদান্ত ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত হয়, তবে উপনিষদের সহিত বৈদিক কর্মকাণ্ড বা সংহিতাভাগের এবং বেদমূলক উপাসনা-শাস্ত্রসমূহের বিরোধ অপরিহার্য হইয়া পড়ে নাকি? অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞ এবং পরমেশ্বরের ধ্যান, পূজা, উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই ভেদজ্ঞানমূলক (দ্বৈত-সাপেক্ষ), নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা অভেদবাদে কর্ম ও উপাসনার স্থান কোথায়? ইহার উত্তরে আচার্য গৌড়পাদ বলেন যে, কর্ম ও উপাসনার ফলে যে দ্বৈতমূলক অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা প্রকৃত আত্মতত্ত্বজ্ঞান নহে, উহা গৌণ বা ব্যবহারিক আত্ম-জ্ঞান। অবশ্য এই আত্মজ্ঞানও নিরর্থক নহে। ইহা মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ—'উপায়ঃ সোঽবতারায়।—মাঃ কাঃ ৩।১৫। এই সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই ঐ সকল অনুন্নত অধিকারীরা অদ্বৈত বিজ্ঞান মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করিতে পারে। গৌড়পাদের মতে ভেদবাদের সহিত অভেদ-বাদের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই।[২] এই অবিরোধের ব্যাখ্যায় আচার্য গৌড়-পাদের যুক্তি প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। তিনি সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে দ্বৈত ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বিচার করিয়াছেন, বিরোধের দৃষ্টিতে করেন নাই। একত্ব ও নানাত্বের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বলেন যে, মায়াবশতঃ অদ্বয় আত্মা নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই মায়িক বিবিধ প্রকারে প্রকাশই অজ আত্মার জন্ম। সত্য, সনাতন আত্মার কোন বাস্তব জন্ম সম্ভব নহে। নিত্য সৎ আত্মার যেরূপ জন্ম সম্ভব নাই, অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতিরও সেইরূপ জন্ম সম্ভব নাই। সৎ আত্মার বরং মায়িক

১। যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ। মাঃ কাঃ ৩।৫
কার্য-রূপ-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে যত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ।। মাঃ কাঃ ৩।৬

২। মাণ্ডূক্যকারিকা ৩।১৪—১৮ কারিকা দ্রষ্টব্য।

জন্ম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু আকাশকুসুম প্রভৃতি অসদ্‌বস্তুর মায়িক বা তাত্ত্বিক কোনরূপ জন্মই সম্ভবপর নহে।[১] স্বপ্নাবস্থায় মায়াশক্তিবশতঃ মন স্পন্দিত হইয়া যেমন স্বপ্নদৃশ্য মিথ্যা দ্বৈতজাল রচনা করে, সেইরূপ জাগরিত অবস্থায়ও মায়াবশে মিথ্যাদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরচিত হইয়া থাকে। কি স্বপ্ন, কি জাগরণ, উভয়ক্ষেত্রেই দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়িক কল্পনামাত্র, উহা বাস্তব কিছু নহে। যতক্ষণ মনঃস্পন্দন বা মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ মিথ্যা পরিদৃশ্যমান এই দ্বৈতপ্রপঞ্চও থাকিবে। নিরোধ সমাধি বা বিবেক বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মনঃ (সঙ্কল্পাত্মিকা বৃত্তি বা মায়া) যখন বিলীন হইয়া যাইবে, তখন দ্বৈতপ্রপঞ্চও বিলুপ্ত হইবে (মনঃস্পন্দনরূপ কারণ বিলুপ্ত হওয়ায় তাহার কার্য দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চও চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে) এবং জ্ঞেয়াভিন্ন নিত্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইবে।[২] সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চই যদি অসত্য হয়, তবে এই আত্মজ্ঞান কাহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে?

ব্রহ্মবিজ্ঞান ও উহা লাভের উপায়

ইহার উত্তরে আচার্য বলিয়াছেন—'অজেনাজং বিবুধ্যতে'। (মাঃ কাঃ ৩।৩৩), নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যাইবে। নিত্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিজেই নিজকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু নহে। একনিত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানই জ্ঞাতাও বটে ও জ্ঞেয়ও বটে।[৩] মনঃ নিগৃহীত না হইলে এই অমৃত অভয় ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারা যায় না। মনঃ নিগৃহীত হইলেই দুঃখ ক্ষয় হয়, প্রবোধ ও শান্তির উদয় হয়। মনের নিগ্রহ শনৈঃ শনৈঃ করিতে হইবে। সাবধানতার সহিত "কুশাগ্রেকবিন্দুনা-যদ্বৎ উদধেঃ উৎসেকঃ"—পূর্ণ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত ক্রমশঃ মনের নিগ্রহ করিতে হইবে। কামে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। কাম ভোগে সুখ নাই, ইহাতে কেবল দুঃখ হইতে দুঃখান্তরই আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা স্মরণ করিয়া বৈরাগ্যবলে কামনার দুঃখ

১। (ক) মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ। মাঃ কাঃ ৩।১৯,
(খ) অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ। মাঃ কাঃ ৩।২৪,
(গ) সতো হি মা । জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ। মাঃ কাঃ ৩।২৭
(ঘ) অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে। মাঃ কাঃ ৩।২৮
উক্ত 'ঘ' চিহ্নিত কারিকার অনুরূপ নাগার্জুন কৃত মাধ্যমিক কারিকা B. T. S. P. 196
আকাশং শশশৃঙ্গঞ্চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ।
অসন্তশ্চাভিব্যজ্যন্তে তথা ভাবেষু কল্পনা॥

২। যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥ মাঃ কাঃ ৩।২৯।
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে। মাঃ কাঃ ৩।৩১।

৩। অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্মজ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে। মাঃ কাঃ ৩।৩৩

পাশ ছিন্ন করিতে হইবে। জগতে কোথায়ও সুখের আশা নাই, জগৎ দুঃখময়, এইরূপ ভাবনা করিয়া বিষয় ভোগ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, এবং নিখিল বিশ্বই ব্রহ্মময় এইরূপ ব্রহ্মভাবনা চিত্তে সুদৃঢ় করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবে। ফলে, ঐরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অসত্য জগদ্‌বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া বিশ্বময় এক অখণ্ড ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হইবে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য তিরোহিত হইবে, চিত্ত নিবাতপ্রদীপকল্প, শান্ত ও নিশ্চল হইবে। ঐরূপ নিশ্চল, নিষ্কম্প, বিষয়বিমুখ, নির্বিকল্প চিত্তে ব্রহ্মভাব স্ফূর্তিলাভ করে।[১] ইহাই নির্বাণ, ইহাই চরম আনন্দ, ইহাই পরম পুরুষার্থ—'স্বস্থং শান্তং সনির্বাণমকথ্যং সুখমুত্তমম্' (মাঃ কাঃ ৩।৪৭)।

এইরূপে তৃতীয় পরিচ্ছেদে অদ্বয় ব্রহ্ম বিজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আচার্য গৌড়পাদ তৎকৃত কারিকার চতুর্থ পরিচ্ছেদে সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি প্রতিপক্ষ দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া, তদীয় ব্রহ্মবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি দ্বৈতবাদী সাংখ্য ও ন্যায়-বৈশেষিক মতের অসারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ জিগীষার বশবর্তী হইয়া পরস্পর মত খণ্ডনের জন্য যে প্রয়াস করেন, তাহা-দ্বারাই অদ্বৈতবাদ যথার্থ দার্শনিকতত্ত্ব বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। সাংখ্য-দার্শনিকগণ সৎকার্যবাদী। তাঁহাদের মতে কার্যবর্গ উৎপত্তির পূর্বেই কারণশরীরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। অভিনব কার্যের উৎপত্তি হয় না, যে-কার্য সূক্ষ্ম বীজরূপে কারণের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহাই কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কুম্ভকার যে ঘট প্রস্তুত করে, তন্তুবায় যে বস্ত্র উৎপাদন করে, ঐ ঘট এবং বস্ত্র উৎপত্তির পূর্বেই উহাদের কারণ মাটি এবং সূত্রের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে বুঝিতে হইবে। কুম্ভকার এবং তন্তুবায়ের কার্যকুশলতায় মাটি ও সূত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম অদৃশ্যরূপে বিদ্যমান ঘট এবং বস্ত্র স্থূলরূপে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতি বস্তুর কোন কালেই উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। সদ্ বস্তুরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সাংখ্যোক্ত সৎকার্য-বাদের বিরুদ্ধে অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, যাহা সৎ তাহা চিরদিনই আছে ও থাকিবে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কি? আর, যদি উৎপত্তিই হইবে, তবে ঐ উৎপন্ন বস্তু আবার সৎ হইবে কিরূপে?[২] জায়মানং কথমজম্? উৎপন্ন বস্তু সৎ হইতে পারে না। উহা অসৎ, উৎপত্তির পূর্বে উহা ছিল না। কর্তা কুম্ভকার ও তন্তুবায়ের কর্মনৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের ফলে ঘট, বস্ত্র প্রভৃতি অভিনব কার্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সৎকার্যবাদী সাংখ্যেরা অসদ্‌বাদ খণ্ডন করেন, অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িক

সৎ কার্যবাদ, অসৎ কার্যবাদ প্রভৃতি প্রতিপক্ষ দার্শনিক মতের খণ্ডন ও স্বীয় অদ্বৈতপক্ষ স্থাপন।

১। মাঃ কাঃ ৩।৪১-৪৩, ৪৫-৪৭ দ্রষ্টব্য।

২। মাঃ কাঃ ৪।১১

এবং বৈশেষিকগণ আবার সদ্বাদ খণ্ডন করেন। এইরূপে উভয়েই যখন উভয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তখন সৎএর উৎপত্তিও প্রমাণিত হইতেছে না, অসৎএর উৎপত্তিও সিদ্ধ হইতেছে না। ফলে, কোন বস্তুই সৎও নহে, অসৎও নহে, অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়িতেছে।[১]

দ্বৈতবাদী আচার্যগণ যে কর্ম ও কর্মফলকে অনাদি বলিয়া, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত জগৎকে যে সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহাও বিচারসহ নহে। কারণ, ইহাতে 'পরস্পরাশ্রয়' দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কর্ম জীবের জন্মের কারণ, আবার জন্মই কর্মেরও কারণ। হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি হয় বটে, ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি তো দেখা যায় না। পুত্র হইতে পিতার জন্ম সম্ভব হয় কি? সুতরাং হেতুকে হেতু বলিতে হইলে এবং ফলকে ফল বলিতে হইলে, হেতু পূর্বভাবী এবং ফল পরভাবী, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্য। ফলোৎপত্তির পূর্বে হেতু বিদ্যমান থাকিয়াই, ভাবী ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। হেতু ও ফলের একই কালে (যুগপৎ) উৎপত্তি স্বীকার করিলেও কার্য-কারণ ভাবের উপপাদন সম্ভবপর হয় না। একই কালে উৎপন্ন গো-শৃঙ্গদ্বয় পরস্পর পরস্পরের কারণ নহে। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পুনরায় বীজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেই দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ, বীজ ও অঙ্কুর উভয়েরই উৎপত্তি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, উভয়ই সাদি, অনাদি নহে। অতএব অনাদি কার্য-কারণ ভাবের ব্যাখ্যায় বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তকে প্রকৃত দৃষ্টান্তই বলা চলে না।[২] বাস্তবিক পক্ষে কার্যের অনুৎপত্তি পক্ষই স্বীকার্য। কারণ, বস্তুকে সৎই বল, অসৎই বল, কিংবা সদসৎই বল, কোনরূপেই তাঁহার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। কার্য জগৎ ব্রহ্মেরই মায়িক অভিব্যক্তি, উহা মিথ্যা। যদি বল যে, বিষয়ের ভেদবশতঃই তো জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের প্রত্যক্ষই বিষয় সত্তায় প্রমাণ। বিষয় মিথ্যা বলিয়া বৈদান্তিক বিষয়কে উড়াইয়া দেন কিরূপে? ইহার উত্তরে আচার্য বলেন যে, জ্ঞানের ভেদ নিবন্ধন বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কেননা, স্বপ্ন-সময়ে তো বিষয় বিদ্যমান থাকে না, সেখানে জ্ঞানের ভেদ হয় কিরূপে? তারপর, রজ্জুতে যে সর্পের প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে তো সর্পের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সর্প-জ্ঞান উৎপন্ন হয় কেন? স্বপ্নে বিচিত্র বিবিধ বিষয়ের প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থের অসত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। বাহ্য পদার্থ যে অসত্য, এই অংশে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত আচার্য গৌড়পাদেরও অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যে প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন, বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদের মতে বিজ্ঞানের

১। ন ভূতং জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তো'দ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে।। মাঃ কাঃ ৪।৪

২। মাঃ কাঃ ৪।১৪-১৭, ২০,
মাঃ কাঃ শং ভাষ্য, ৪।২০ দ্রষ্টব্য।

ঐরূপ ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিনাশের কল্পনা নিতান্তই অলীক। বিজ্ঞান অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব এবং অপরিচ্ছিন্ন। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ আবার বিজ্ঞানবাদীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বিজ্ঞানবাদীর ক্ষণিক বিজ্ঞানের অস্তিত্বও বিলোপ করিয়া, মহাশূন্যতাই সমর্থন করেন। শূন্যবাদীর এই সর্বশূন্যতাবাদ কোন আস্তিক দার্শনিকেরই সমর্থন লাভ করে নাই। শূন্য হইতে স্থূল ভাব-জগতের উৎপত্তি হইবে কিরূপে? দার্শনিক রাজ্যে মহাশূন্যতা নিতান্তই যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়া, সকল ভারতীয় দার্শনিকই এই শূন্যবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদ বলেন যে, আমার কোন দ্বৈতবাদী আচার্যের সহিতই বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই—'বিবদামো ন তৈঃ সার্ধমবিবাদং নিবোধত' (মাঃ কাঃ ৪।৫)। আমরা ব্যাবহারিক জীবনে সমস্ত বস্তুরই মায়িক উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করি। আবার পরমার্থ সত্য আত্মা বা ব্রহ্মরূপে সমস্ত বস্তুই অজ, সুতরাং সেইরূপে কাহারও উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না। এই অজ অবিনাশী জ্যোতির্ময় আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু। অনাদি অজ্ঞানবশতঃ এই আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকগণের নানারূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায়। কেহ বলেন (১) আত্মা আছে, কেহ বলেন (২) নাই, কেহ বলেন (৩) আছেও বটে নাইও বটে, কেহ বলেন (৪) কিছুই নাই।[১] ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ (অস্তিভাব) ন্যায়-বৈশেষিকের সম্মত। তাঁহাদের মতে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ একটি আত্মা আছে। সেই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞাতা, সুখ-দুঃখের অনুভবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আত্মা, মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই আত্মায় (বিষয়) জ্ঞানের উদয় হয়, আবার পরক্ষণে ঐ জ্ঞানের বিনাশ হয়। জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি আত্মার গুণ বা ধর্ম, আত্মা ধর্মী, বস্তুতঃ জড়স্বভাব এবং পরিণামী। দ্বিতীয় পক্ষ (নাস্তিভাব) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্মত। এই মতে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই আত্মা। আত্মা বা বুদ্ধি-বিজ্ঞান ক্ষণিক, সুতরাং উহার আর কোন পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। উহা একরূপ ও অপরিবর্তনশীল। জৈন দার্শনিকগণের মতে আত্মা 'অস্তি নাস্তি'-স্বরূপ বা সদসৎস্বভাব। তাঁহাদের মতে সমস্ত বস্তুই অস্তি-নাস্তি এই উভয়াত্মক; বস্তু আছেও বটে, নাইও বটে। কারণ, আমরা যে বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তাহাতে বস্তুর সমস্তটুকু কখনও আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, বস্তুর কতক অংশই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। যে অংশটুকু প্রতিভাত হয় তাহা দ্বারা বস্তুর সত্তা বা

গৌড়পাদের মতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধ

১। অস্তি$_1$ নাস্ত্যস্তি$_2$ নাস্তীতি$_3$ নাস্তি নাস্তীতি$_4$ বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ॥ মাঃ কাঃ ৪।৮৩

উল্লিখিত শ্লোকে অস্তি-নাস্তি ইত্যাদি প্রশ্নে আত্মার অস্তিত্ব-নাস্তিত্বই বিচার করা হইয়াছে বলিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা শঙ্করাচার্যের অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছি।

অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আর, যে অংশ প্রকাশিত হয় না, তাহা দ্বারা বস্তুকে নাস্তিস্বভাবও বলা যায়। কোন প্রমাণই বস্তুর একান্ত বা পূর্ণরূপ প্রকাশ করে না। আত্মবস্তু সম্বন্ধেও এই নিয়মই প্রযোজ্য। আত্মা জ্ঞেয়ও বটে, অজ্ঞেয়ও বটে, অস্তিও বটে, নাস্তিও বটে। শূন্যবাদী বৌদ্ধের মতে শূন্য বা নিঃস্বভাবতাই বস্তুর শেষ পরিণাম, শূন্যই একমাত্র সারবস্তু। আত্মা বলিয়া স্থায়ী কোন সত্য পদার্থ নাই। অতএব আত্মাকে এই মতে অভাবাত্মকই বলিতে হয়। এইজন্য আত্মাকে "নাস্তি নাস্তি" বা সর্বথা শূন্য বলা হইয়াছে। এই মতচতুষ্টয়েই দেখা যায় যে, বাদিগণ আত্মার প্রকৃত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবটি মিথ্যাদৃষ্টির আবরণে আবৃত করিয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুকূল স্ববুদ্ধি কল্পিত ভ্রান্ত আত্মবাদই প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন এই যে চার প্রকার কোটি বা পক্ষ বিবৃত করা হইল, যাহারা এই মতবাদের উপর অত্যন্ত আগ্রহশীল তাঁহাদের নিকট আত্মা সর্বদা আবৃত থাকিবে। যে-তত্ত্বজ্ঞ মনীষী এই স্বপ্রকাশ আত্মাকে উক্ত 'অস্তি' 'নাস্তি' প্রভৃতি বিতর্ক কল্পনার বাহিরে বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত আত্মদর্শী।[১] ইহাই ব্রহ্মণ্যপদ। এই পদে পৌঁছিলে অলাতচক্রের মিথ্যা বিভ্রমের ন্যায় জীবের অনাদি মিথ্যা সংসার বিভ্রমের নিবৃত্তি হয়। এই তত্ত্বই মাণ্ডূক্য কারিকার "অলাত শান্তি" প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

গৌড়পাদের বেদান্ত-মত ও বৌদ্ধমত

অলাত শান্তি এই কথাটি বৌদ্ধ পরিভাষা, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেই এই পারিভাষিক শব্দটির ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[২] গৌড়পদের মাণ্ডূক্য কারিকার গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকা ও লঙ্কাবতার সূত্রের সিদ্ধান্তের অনেক সাম্য আছে, তাহা আমরা স্থানে স্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষতঃ মাণ্ডূক্য কারিকার 'অলাত শান্তি' প্রকরণের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কথাই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের অনুকূল, সুতরাং আচার্য গৌড়পাদ কি তদীয় কারিকায় বৌদ্ধমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, না, বেদান্তমত বিবৃত করিয়াছেন, এই প্রশ্ন মনে হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য কারিকায় বৌদ্ধমতবাদই বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ বলিতে চাহেন, তাঁহাদের মাণ্ডূক্য কারিকার চতুর্থ অধ্যায় বা অলাত শান্তি প্রকরণই প্রধানতঃ উপজীব্য ; সুতরাং আমরা ঐ প্রকরণের উক্তির সারমর্ম আলোচনা করিয়া উল্লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। অলাত শান্তি প্রকরণের প্রথম শ্লোকে

১। কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্ । মাঃ কাঃ ৪।৮৪

২। The very name Alatasanti is absolutely Buddhistic. Compare Nagarjuna's Karika, B. T. S., P. 206, where he quotes a verse from the Sataka. A History of Indian Philosophy—Das Gupta. vol. I, P. 427 foot note.

বলা হইয়াছে যে, যিনি আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা গগনোপম ধর্মসমূহকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয় হইতে অভিন্ন, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে আমি বন্দনা করি।[১] এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দ্বিপদশ্রেষ্ঠ কে? বুদ্ধদেব কি? কারণ, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-গ্রন্থে দ্বিপদোত্তম, পুরুষোত্তম, নরোত্তম প্রভৃতি শব্দে বুদ্ধকেই বুঝাইয়া থাকে এবং সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ বহু শব্দ তাঁহার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বৌদ্ধদিগের মতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারও এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং এই শব্দে বুদ্ধকেই বুঝায়। এখানে বিচার্য এই যে, এই 'দ্বিপদাং বরম্' এ শব্দটি যৌগিক না পারিভাষিক? এই শব্দটি যে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বা পুরুষশ্রেষ্ঠ, এইরূপ যোগার্থবশতঃই বুদ্ধদেবের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধগণেরও কোন সন্দেহ নাই। এখন কথা এই যে, শব্দটি যদি যৌগিক হইল, তবে ইহা অন্য কাহারও বিশেষণরূপেই বা প্রযুক্ত হইতে পারিবে না কেন? মহাভারতে কখনও ভীষ্মদেবকে, কখনও ধৃতরাষ্ট্র বা যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে 'দ্বিপদাংবর' বলা হইয়াছে, সুতরাং 'দ্বিপদাংবর' শব্দ দেখিয়াই ইহা বুদ্ধেরই নমস্কার, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। আচার্য শঙ্কর 'দ্বিপদাং বরং, প্রধানং পুরুষোত্তমম্' এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে বুঝাইয়াছেন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের জ্ঞান যেমন আকাশের ন্যায় অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী নারায়ণের জ্ঞানও যে সেইরূপ অসীম, অনন্ত ও আকাশকল্প হইবে, ইহাতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, উক্ত কারিকায় জ্ঞানকে যে 'জ্ঞেয়াভিন্ন' বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতই সূচিত হইতেছে না? তাঁহাদের মতেই তো জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন—'সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ' ইহা তো বিজ্ঞানবাদেরই সিদ্ধান্ত, সুতরাং জ্ঞান-জ্ঞেয়ের অভেদোক্তি কি বিজ্ঞানবাদেরই অনুকূল যুক্তি নহে? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞেয় জ্ঞানেরই আকার বিশেষ, জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বলিয়া কিছুই নাই, জ্ঞেয় মিথ্যা, ইহা বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্ত বটে, কিন্তু চরম বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। পুরুষোত্তম সর্বজ্ঞ বুদ্ধের শূন্যবাদই চরম সিদ্ধান্ত, তবে যাঁহারা জ্ঞেয়কে শূন্য বলিয়া বুঝিলেও জ্ঞানকে শূন্য বলিয়া বুঝিতে ভয় পান, সেইরূপ অধিকারীর জন্যই এই বিজ্ঞানবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। শূন্যবাদী তাঁহার দর্শনে বিজ্ঞানবাদকে অসৎ ও অনির্বাচ্য বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারা যায় না, সুতরাং জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞেয় যেমন অসৎ, সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানকে আকার দিয়া থাকে, বিষয়শূন্য জ্ঞানকে জানা যায় না, অতএব নির্বিষয় জ্ঞানও জ্ঞেয়ের ন্যায় অসৎ ও অনির্বাচ্য। জ্ঞেয় মিথ্যা, সুতরাং জ্ঞেয়াভিন্ন জ্ঞানও মিথ্যা, শূন্যতাই একমাত্র তত্ত্ব, ইহাই শূন্যবাদীর সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে শূন্যবাদীর এই আক্ষেপের কোন সদুত্তর আমরা বিজ্ঞানবাদীর নিকট শুনিতে পাই না।

১। জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্। মাঃ কাঃ ৪।১

বস্তুতঃ ইহার উত্তর দিয়াছেন বৈদান্তিক। বেদান্তের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অভেদ নহে, ভেদও নহে। এই সম্বন্ধ অনির্বচনীয়। জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞানের যে অভেদ প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে, উহা কাল্পনিক ও মায়িক। কল্পিত অভেদের দ্বারা একের ধর্ম অন্যে সংক্রমিত হয় না। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ যদি যথার্থ হয় (যাহা বিজ্ঞানবাদী স্বীকার করিয়াছেন) তবেই জ্ঞেয়ের ধর্ম (অনির্বাচ্যত্ব বা মিথ্যাত্ব) জ্ঞানে সঞ্চারিত হইয়া, জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। বিজ্ঞানবাদী জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পারমার্থিক অভেদ স্বীকার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এইজন্যই শূন্যবাদীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। বেদান্তী জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বা কাল্পনিক বলিয়া উক্ত আক্ষেপের সমাধান করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জ্ঞানকে জ্ঞেয়াভিন্ন বলিলে কোন অনুপপত্তি নাই। অতএব জ্ঞেয়াভিন্ন কথা দ্বারা বৌদ্ধমতই সূচিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না।

তারপর, উক্ত শ্লোকে বস্তু অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা নিছক বৌদ্ধ প্রয়োগ। বৌদ্ধ সাহিত্যেই ধর্ম শব্দ বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] গৌড়-পাদোক্ত ধর্ম শব্দও বস্তু অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর ধর্ম শব্দের এই অর্থই বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং ইহা হইতে গৌড়পাদ যে তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধমতই প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা এই যুক্তিরও কোন সারবত্তা বুঝিতে পারি না। মানিয়াই লইলাম যে, ধর্ম শব্দের বস্তু অর্থে প্রয়োগ বৌদ্ধগণের পরিভাষা। কিন্তু এই পরিভাষা অন্য কেহ গ্রহণ করিলে তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেন, ইহা কিরূপে বলা যায়? ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নব্য ন্যায়ের অভ্যুদয়ের পর বেদান্তী, মীমাংসক, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক প্রভৃতি সকলেই নব্য-ন্যায়ের পরিভাষা স্ব স্ব গ্রন্থে বস্তুবিচারের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কথা তো বলা যায় না। তাহার কারণ, সিদ্ধান্তের ভেদ। যদি সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকে, তবেই দুইজন দার্শনিককে একমতাবলম্বী বলা যাইতে পারে। এখন যদি গৌড়পাদ কারিকার সিদ্ধান্তের সহিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অভেদ দেখাইতে পারা যায়, তবেই গৌড়পাদের কারিকা বৌদ্ধসিদ্ধান্ত প্রতিপাদক, একথা বলা যাইতে পারে। নতুবা কেবল শব্দের বা পরিভাষার সাম্য দেখিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য দেখাইয়াছেন যে, চতুর্থ প্রকরণে দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিক বা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। যাঁহার মত খণ্ডন করা হইবে, তাঁহার পরিভাষা অবলম্বনে সেই মত খণ্ডন করাই সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। ধর্ম শব্দ আত্মা অর্থে এবং জ্ঞেয় বস্তু অর্থে, এই দুই অর্থেই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আচার্য গৌড়পাদও ঐ দুই অর্থেই তাঁহার কারিকায়

১। The use of the word *dharma* in the sense of appearance or en tity is peculiarly Buddhistic. A Hist. I. Ph.—Das Gupta. vol. I, P. 427 foot note.

বহু স্থানে ধর্ম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।[১] আচার্য গৌড়পাদ ও আচার্য শঙ্করের এই ব্যবহারে কোন অসঙ্গতি নাই। আর এক কথা, জ্ঞান আকাশকল্প, জ্ঞেয় গগনোপম, এইরূপ উপমা কি কেবল বৌদ্ধ-দার্শনিকগণেরই নিজস্ব? অন্য কোন দার্শনিক এইরূপ উপমা দিতে পারেন না কি? যে-মতেই হউক না কেন, জ্ঞান নিরাবরণ হইলে, তাহা আকাশের মতই অনন্ত ও অসীম হইবে। আর, জ্ঞেয় বস্তু যদি জ্ঞান হইতে অভিন্ন হয়, তাহাও আকাশের ন্যায় ভূমা, সর্বব্যাপী ও অপরিচ্ছিন্ন হইবে। এই অবস্থায় বেদান্তীর ব্রহ্মজ্ঞানকে আকাশের উপমা দিয়া ব্যাখ্যা করিলে তাহাতে দোষের কথা কি আছে?

আমরা গৌড়পাদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম কারিকার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। এই আলোচনায় উক্ত কারিকার অর্থ বেদান্তসিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। চৈতন্যই একমাত্র তত্ত্ব, ইহা আকাশের ন্যায় ভূমা ও অখণ্ড, ইহা তো বেদান্তেরই সিদ্ধান্ত। সেই অজ, নিত্য চৈতন্যের ভেদ মায়িক—'মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন' (মাঃ কাঃ ৩।১৯)। এই বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তই আচার্য গৌড়পাদ সমর্থন করিয়াছেন। বৈতথ্য প্রকরণের ১২শ কারিকায় 'ইতি বেদান্ত নিশ্চয়ঃ,' ২।৩১শ কারিকায় 'বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ,' ২।৩৫শ কারিকায় 'বেদপারগৈঃ,' ২।৩৬শ কারিকায় 'অদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্'—এই সকল উক্তি দ্বারা আচার্য গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত যে বেদান্তেরই সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নহে, তাহা বার বার নানা ভাষায় আচার্য গৌড়পাদ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গৌড়পাদকে যাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে চাহেন, তাঁহারা মাণ্ডুক্য কারিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় যে বেদান্তসিদ্ধান্তেরই পরিপোষক, তাহা অবশ্য অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মূল আপত্তি চতুর্থ অধ্যায় লইয়া। চতুর্থ অধ্যায় তাঁহাদের মতে একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান এবং উহা বৌদ্ধ প্রস্থান। তাঁহাদের যুক্তির মর্ম এই যে, চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা যে বেদান্তেরই নির্ণয়, এমন কোন কথা নাই, বরং 'বুদ্ধৈঃ প্রকীর্তিতম্' (৪।৮৮), 'বুদ্ধেন ভাষিতম্' (৪।৯৯), 'বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা' (৪।১৯) বলিয়া বুদ্ধের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই প্রকরণের প্রথমে একটি নমস্কার শ্লোক দেখা যায়। ঐ শ্লোকটিতে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনুকূল অনেক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে চতুর্থ প্রকরণকে স্বতন্ত্র বৌদ্ধপ্রকরণ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত নহে কি? চতুর্থ প্রকরণ পূর্বোক্ত প্রকরণ-ত্রয়ের সহিত সংযুক্ত একই গ্রন্থ হইলে গ্রন্থের মধ্যে আবার আচার্য নমস্কার করিতে যাইবেন কেন?

আমরা এই আপত্তির উত্তরে প্রথম শ্লোকের বিস্তৃত বিচার করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ প্রথম শ্লোকোক্ত সিদ্ধান্ত বেদান্তমতের বিরোধী নহে। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা

১। ধর্মকে যেখানে 'অজ' বলা হইয়াছে সেখানে আত্মা অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, আবার যেখানে ধর্মকে বিনশ্বর, উৎপত্তি-বিনাশশীল বলা হইয়াছে, সেখানে জাগতিক বস্তু অর্থে ধর্ম শব্দ কারিকায় প্রযুক্ত হইয়াছে। গৌড়পাদ কারিকা, ৪।১০, ৪।৪১, ৪।৫৪, ৪।৫৮, ৪।৮১, ৪।৯১, ৪।৯৮, ৪।৯৯ দ্রষ্টব্য।

করিব যে, মাণ্ডূক্য কারিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ের উক্তিও তাহারই অবিকল নকল। ইহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যখন বেদান্ত মতকেই সমর্থন করে, তখন চতুর্থ অধ্যায়ের সিদ্ধান্তও অবশ্য বেদান্তমতেরই পরিপোষক হইবে। চতুর্থ প্রকরণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের অনেক কারিকা অংশতঃ বা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই চতুর্থ প্রকরণ যে পূর্ব প্রকরণ-ত্রয়ের অনুবৃত্তি এবং সমগ্র প্রকরণ-চতুষ্টয়ই যে এক অখণ্ড গ্রন্থ তাহারই পরিচায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা নিম্নলিখিত কারিকাগুলির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চতুর্থ প্রকরণের প্রথম কারিকার 'জ্ঞেয়াভিন্ন' পদ, তৃতীয় প্রকরণের ৩৩শ কারিকার 'জ্ঞেয়া-ভিন্ন' পদেরই আবৃত্তি। ৪।২ কারিকার 'অস্পর্শযোগো বৈ নাম' ইত্যাদি, ৩।৩৯শ কারিকার 'অস্পর্শযোগো বৈ নাম' ইত্যাদির শব্দতঃ এবং অর্থতঃ আবৃত্তি। ৪।৬ কারিকা ৩।২০শ কারিকার সহিত অর্থতঃ এবং প্রায়শঃ শব্দতঃ অভিন্ন। ৪।৭-৮ কারিকা, ৩।২১-২২শ কারিকার পুনরাবৃত্তি মাত্র। ৪।৩১-৩২ কারিকাদ্বয়, ২।৬-৭ কারিকাদ্বয়ের অবিকল আবৃত্তি। ৪।৩৩ কারিকা, ২।১ কারিকার অর্থতঃ আবৃত্তি। ৪।—৩৪ কারিকা, ২।২ কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের সহিত একরূপ এবং প্রথমার্ধের সহিত তন্যার্থক। ৪।৭১ কারিকা, ৩।৪৮ কারিকার পুনরাবৃত্তি। ৪।৮১ কারিকা 'অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ং। সকৃদ্ বিভাতো' হ্যেবৈষ ধর্মো ধাতুস্বভাবতঃ॥ ৩।৩৬ কারিকা 'অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্। সকৃদ্ বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন॥ এবং ১-১৬ কারিকা 'অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজম-নিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা'॥ এই তিনটি কারিকার শব্দ ও অর্থগত সাদৃশ্য প্রণিধানযোগ্য। তারপর এই প্রকরণ-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তগত ঐক্যও নিঃসন্দিগ্ধ। চতুর্থ অধ্যায়ের তিন হইতে ২৩শ কারিকা, তৃতীয় অধ্যায়োক্ত অজাতিবাদ অর্থাৎ জীবজগতের কিছুরই উৎপত্তি হয় না—'স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে' (মাঃ কাঃ ৪।২২)। এই মতই সমর্থন করিতেছে। ইহা পুনরুক্তি হইলেও সার্থক পুনরুক্তি, অতএব দোষাবহ নহে। এখানে যাঁহারা উৎপত্তির বাস্তবতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত নিরাস করাই চতুর্থ অধ্যায়ের পুনরুক্তির তাৎপর্য। চতুর্থ প্রকরণের ২৪-২৭শ কারিকা, বৈতথ্য প্রকরণোক্ত বিষয়ের মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপে অজাতিবাদ বা উৎপত্তির অবাস্তবতা এবং বিষয়রহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্বরূপ নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়া চতুর্থ প্রকরণ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেছে। চতুর্থ প্রকরণের সহিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের কোন বিরোধ নাই, প্রকরণ-চতুষ্টয় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া একই সত্য প্রচার করিতেছে।[১]

১। গ্রন্থের প্রারম্ভে, অন্তে ও মধ্যে নমস্কার করার প্রাচীন রীতি প্রচলিত আছে। এই অবস্থায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের আদিতে একটি নমস্কার শ্লোক আছে বলিয়াই চতুর্থ পরিচ্ছেদটিকে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদ-ত্রয় হইতে বিযুক্ত, স্বতন্ত্র একটি প্রস্থান ধরিতে হইবে, এমন কথা বলা যায় না।

চতুর্থ প্রকরণে অনেকবার বুদ্ধ শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার তাৎপর্য আমাদের এই মনে হয় যে, বৌদ্ধপ্রদর্শিত অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা সর্বশূন্যতাবাদ (নাস্তিকতাবাদ) প্রভৃতির সহিত বেদান্ত সিদ্ধান্তের যে বিরোধ নাই—এই অবিরোধই আচার্য বৌদ্ধসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি বুদ্ধকে 'বুদ্ধৈঃ' এই বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা তত্ত্বদ্রষ্টা বলিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তবে বৌদ্ধসিদ্ধান্ত যে চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, তাহা বৌদ্ধপ্রদর্শিত পরিভাষা গ্রহণ করিয়াই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ গ্রহণ করিলেও, বৈদান্তিকের দৃষ্টিতেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, শূন্যবাদীর দৃষ্টিতে নহে। সতের মায়িক জন্ম সম্ভব, অসতের মায়িক জন্মও সম্ভব নহে (৩-২৭-২৮ কাঃ), এই বলিয়া অসদ্‌বাদী বা শূন্যবাদীর মত খণ্ডন করিয়া আচার্য গৌড়পাদ বেদান্তসিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করিয়াছেন। গৌড়পাদ বলেন যে, নিখিল পদার্থই অবিদ্যাবশে জন্মলাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন বস্তুই শাশ্বত বা নিত্য নহে, তবে সমস্তই ব্রহ্মময়, এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হইলে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে সমস্ত বস্তুকেই অজ বলা যায় (মাঃ কাঃ ৪।৫৭)। অজ অবিনাশী অদ্বয় চৈতন্যই সত্য, তদ্‌ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। এই অদ্বয় নিত্য চৈতন্যে যাহাদের চিত্ত নিশ্চলভাবে স্থিতিলাভ করে, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধ বা তত্ত্বদর্শী (মাঃ কাঃ ৪।৮০)। গৌড়পাদের এই উক্তি বেদান্তবিরুদ্ধ মত প্রতিপাদন করে না। অদ্বয় নিত্য চৈতন্যে চিত্তের ঐরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থানকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ 'ব্রাহ্মণ্যংপদমদ্বয়ম্' (মাঃ কাঃ ৪।৮৫) লাভ বলিয়া গৌড়পাদ বিবৃত করিয়াছেন। গৌড়পাদের এই ব্যাখ্যা কি বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মী স্থিতির কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে না? আচার্য গৌড়পাদের মতে যদিও বুদ্ধদেব স্পষ্ট ভাষায় বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতবাদের উপদেশ করেন নাই, তথাপি তত্ত্বদ্রষ্টা বুদ্ধের বাণী বুঝিতে হইলে উপনিষদের ভিত্তিতেই তাহা বিচার করিতে হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বুদ্ধদেবের উপদেশের যথার্থ তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহার বিকৃত রূপই গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার মতের সহিত বেদান্তমতের কোন বিরোধ নাই। 'অবিবাদং নিবোধত' ইহাই আচার্যের উপদেশ।

পরবর্তী কালে ধর্মকীর্তি, বসুবন্ধু প্রভৃতি আচার্যগণ যে বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন, তাহার সহিত গৌড়পাদের মতের আংশিক সাম্য প্রতিভাত হইলেও, বাস্তবিক উক্ত বৌদ্ধমতের সহিত গৌড়পাদ-প্রদর্শিত দার্শনিক মতের কোন সাম্য নাই। অজ, পরমার্থ সৎ, নিরাবরণ, নিত্য বিজ্ঞান, গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় বার বার নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেখানে ধর্মকীর্তি, বসুবন্ধু প্রভৃতির মতের সাম্য কোথায়? আংশিক মতসাম্য দেখিয়াই যদি গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিতে হয়, তবে আচার্য গৌড়পাদ-প্রচারিত বেদান্তবাদের সহিত সামঞ্জস্য আছে বলিয়া, ধর্মকীর্তি ও বসুবন্ধুর মতবাদকেই বা বেদান্তমতের অনুরূপ বলি না কেন? খৃষ্টীয় একাদশ শতকে অদ্বয়বজ্র নামক জনৈক বৌদ্ধ দার্শনিক তাঁহার তত্ত্বরত্নাবলী গ্রন্থে ধর্মকীর্তি ও বসুবন্ধুর বিরুদ্ধে আমাদের অনুরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া

যায়।[১] স্থূল কথা এই যে, বেদান্তমত ও বৌদ্ধমতের কোন কোন অংশে সাম্য থাকিলেও নিত্য, পরমার্থ সৎ, বিজ্ঞান স্বীকার করা ও না করা লইয়াই বেদান্ত ও বৌদ্ধবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আচার্য গৌড়পাদ তদীয় কারিকায় নিত্য পরমার্থ সৎ চৈতন্য স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। সুতরাং আচার্য গৌড়পাদ যে বৌদ্ধাচার্য ছিলেন না, বৈদান্তিক আচার্য ছিলেন এবং তৎকৃত মাণ্ডূক্য কারিকায় বেদান্তবাদই প্রচার করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

১। পরমার্থসন্নিত্যসাকারবিজ্ঞানসমাধৌ ভগবতঃ সংস্থিতুবেদান্তবাদিমতানুপ্রবেশঃ।.....এবং নিরাকারবাদিনা'পি নিত্য-নিরাভাস-নিষ্প্রপঞ্চ-স্বসংবেদনবিজ্ঞানভাবনায়াং ভাস্করমতস্থিতবেদান্ত-বাদিমতানুপ্রবেশপ্রসঙ্গঃ।

অদ্বয়বজ্রকৃত-তত্ত্বরত্নাবলী ১৯ পৃষ্ঠা, গাইকোয়র ওরিয়েণ্টাল সংস্কৃত সিরিজ নং ৪০ দ্রষ্টব্য।

আচার্য গৌড়পাদ কি বৈদান্তিক ছিলেন, না বৌদ্ধ ছিলেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া, আমি আমার বন্ধু ও ভূতপূর্ব সহকর্মী সুপণ্ডিত ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম.এ. পী. এইচ্. ডী. কর্তৃক 'উদ্বোধনে' লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ

শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈতবেদান্ত

আমরা আচার্য গৌড়পাদের দার্শনিক মতের পরিচয় দিয়াছি। আচার্য গৌড়পাদের পর শঙ্করাচার্যের পূর্বে আর কোনও গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদ কোন বেদান্তগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না, সুতরাং আচার্য গৌড়পাদের পর আচার্য শঙ্করের নামই উল্লেখযোগ্য। আচার্য গৌড়পাদ প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য হইলেও, ভারতে শঙ্করাচার্যই অদ্বৈতবেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তারাজ্যে শঙ্কর অবিসংবাদী সম্রাট্। অদ্বৈতবেদান্ত বলিলে শঙ্করাচার্যকে বুঝায় এবং শঙ্করাচার্য বলিলে অদ্বৈত-বেদান্তকে বুঝায়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য রচনার পর অদ্বৈত-চিন্তাপ্রবাহ বিশ্ব-মানবের হৃদয়-রাজ্য প্লাবিত করিয়া, সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে সুতরাং শঙ্করাচার্যই বেদান্ত-ভাব-গঙ্গার যথার্থ ভগীরথ। আচার্যের জীবন স্বল্পপরিসর। তিনি মাত্র ৩২ বৎসর-কাল জীবিত ছিলেন। এই স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে তিনি যে অপূর্ব মনীষা ও অদ্ভুত কর্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। আচার্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে (788 A. D.)[১] দক্ষিণ ভারতে কেরল দেশে নম্বুরী ব্রাহ্মণ বংশে বৈশাখী শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম বিশিষ্টা। অতি অল্প বয়সেই আচার্য নানা বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং মাত্র অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পবিত্র নর্মদা তীরে আচার্য গোবিন্দপাদের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ৮ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত গুরুপাদের নিকট দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। তারপর গুরুর আদেশে জনকোলাহল-বর্জিত পুণ্যক্ষেত্র বদরিধামে গমন করিয়া ১২ হইতে

শঙ্করাচার্যের জীবনকথা

১। There is some dispute about the date of Sankara, but accepting the date proposed by Bhāṇḍarkar, Pāṭhak and Deussen, we may consider him to be of 788 A.D.—Das Gupta—A History of Indian Philo. Vol. I. P. 423. Telang wishes to put Sankara's date somewhere in the 8th century, and Venkateswara would have him in 805 A.D.—897 A.D., as he did not believe that Sankara could have lived only for 32 years. J. R. A. S. 1916, Ibid. P. 423 f.n.

১৬, এই চার বৎসর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-ভাষ্যাদি রচনায় অতিবাহিত করেন এবং পদ্মপাদ আচার্য প্রভৃতি উপযুক্ত শিষ্যগণকে ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেশ দেন। পরে, ষোড়শবর্ষে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তিনি দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া, প্রতিপক্ষগণকে বাদযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ধর্মের গ্লানি বিদূরিত করেন। প্রথমেই তিনি বৈদিক কর্মবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রয়াগে মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্টের নিকট বিচারার্থী হইয়া উপস্থিত হন এবং দেখিতে পান যে, কুমারিলভট্ট গুরুদ্রোহের অপরাধে[১] তুষানল প্রায়শ্চিত্ত বরণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনান্তকাল উপস্থিত। কুমারিলভট্ট মগধের পণ্ডিতশিরোমণি মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্যকে বিচার করিতে উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে অনুরোধ করেন। তদনুরোধে শঙ্করাচার্য কুমারিলভট্টকে তাঁহার জীবনান্তকালে তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করাইয়া মগধের অন্তঃপাতী মাহিষ্মতী নগরে গমন করেন এবং মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। মীমাংসকাচার্য মণ্ডন ও অদ্বৈতবেদান্তাচার্য শঙ্করের এই বাদযুদ্ধে মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থের কার্য করেন। ইহা তদানীন্তন রমণীসমাজের অপূর্ব বিদ্যাবত্তার নিদর্শন।[২] এই বিচারে মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইয়া আচার্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বরাচার্য বলিয়া পরিচিত হন। মণ্ডনমিশ্র মগধের পণ্ডিতসমাজের শিরোভূষণ ছিলেন। মণ্ডনকে পরাজয় করার ফলে আচার্যের মগধ-বিজয় সাধিত হইল। তৎপর তিনি দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে বহির্গত হন এবং মহারাষ্ট্রে শৈব এবং কাপালিকগণকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের অবৈদিক কদাচার সকল বিদূরিত করেন। আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া আচার্য তুঙ্গভদ্রার তীরে সারদাদেবীর মন্দির স্থাপন করতঃ তথায় সরস্বতীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার সহিত একটি মঠ স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমান শৃঙ্গেরী মঠ। আচার্য শঙ্কর সুরেশ্বরাচার্যকে এই মঠের মঠাধীশ নিযুক্ত করেন। ইহার পর, আচার্য পুরীধামে গমন করিয়া তথায় গোবর্ধনমঠ স্থাপন করেন এবং প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদাচার্যকে মঠাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপর আচার্য উত্তর ভারতের দিকে

১। বর্ণিত আছে যে, কুমারিলভট্ট ছদ্মবেশে নালন্দায় বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে বৌদ্ধদিগের মত অসার ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, তিনি বৌদ্ধগণকে বাদযুদ্ধে আহ্বান করেন। বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপালের সহিত তাঁহার বিচার হয়। বিচারে এরূপ পণ ছিল যে, যে ব্যক্তি বিচারে পরাজিত হইবেন, তিনি স্বীয় মত পরিত্যাগ পূর্বক বিজয়ীর মত গ্রহণ করিবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন। ধর্মপাল বিচারে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ধর্মপাল বৌদ্ধশাস্ত্রে কুমারিলভট্টের গুরু ছিলেন। ধর্মপাল প্রাণত্যাগ করিলে, কুমারিলভট্টের চৈতন্যোদয় হয়। তিনি গুরুদ্রোহী বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন এবং গুরুদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন।

২। অনেকে মনে করেন, উভয়ভারতী মণ্ডনপত্নীর নাম ছিল। আমাদের মনে হয় বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডে অসাধারণ বিদ্যাবত্তা উপলব্ধি করিয়া, মণ্ডনপত্নীকে উভয়ভারতী এইরূপ উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডে ভারতী সদৃশ বিদ্যা ছিল বলিয়াই, তিনি কর্মকাণ্ডে ও মীমাংসা-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র ও জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদের অদ্বৈত ভাষ্যকার শঙ্করের বাদযুদ্ধে মধ্যস্থপদে বৃত হইয়াছিলেন।

যাত্রা করেন এবং উজ্জয়িনীতে ভৈরবগণের ভীষণ সাধনপদ্ধতি নিবারণপূর্বক ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য দ্বারকায় সারদামঠ স্থাপন করেন। সারদামঠে আচার্য কর্তৃক হস্তামলকাচার্য মঠাধীশ নিযুক্ত হন। উত্তর ভারত হইতে আচার্য পূর্ব ভারতে গমন করেন এবং কামরূপে শাক্ত-সম্প্রদায়ের দুর্নীতি সংশোধন করেন। আসাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আচার্য বদরিধামে জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন এবং স্বীয় শিষ্য তোটকাচার্যকে মঠাধ্যক্ষপদে বরণ করেন। শঙ্করাচার্য তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী এই দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাদিগকে উল্লিখিত মঠচতুষ্টয়ের অধীনে স্থাপন করেন। তাঁহার কার্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোথায়ও কোন দেবতার উপাসনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সকল সম্প্রদায়েরই দোষ বিদূরিত করিয়া উপাসনাপদ্ধতিকে নির্মল ও নিষ্কলুষ করিয়াছেন। আচার্য-সংস্থাপিত মঠচতুষ্টয় ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া আচার্যের অদ্ভুত সংগঠনী শক্তির সাক্ষিরূপে আজও কালের বক্ষে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বদরিধামের মন্দির-প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত হইলে আচার্য কেদারে গমন করেন এবং তথায় মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ভারতগগনের উজ্জ্বল ভাস্কর অস্তমিত হন; শিবাবতার শঙ্কর নরলীলা সমাপ্ত করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হন। কিন্তু আচার্য শঙ্করের প্রভাব আজও ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার দার্শনিক অবদান সমস্ত বিশ্বের সম্পত্তি হইয়া চিন্তা-জগতে নূতন পথের নির্দেশ করিতেছে।

অদ্বৈতগুরু শঙ্করাচার্য তদীয় অদ্বৈতবেদান্ত সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ রূপ দান করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, এই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য[১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য, সনৎসুজাতীয়-ভাষ্য, হস্তামলক-ভাষ্য, ললিতাত্রিশতী-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বিবেকচূড়ামণি, উপদেশসাহস্রী, অপরোক্ষানুভূতি, সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ, বাক্যসুধা, দৃক্দৃশ্যবিবেক, পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া

শঙ্কর গ্রন্থমালা

১। উক্ত দশখানি উপনিষদ্ ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যও শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া অনেক মনীষী মনে করেন। পুনা আনন্দাশ্রম সংস্করণে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-ভাষ্য শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেস হইতে শঙ্করাচার্যের যে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য সন্নিবেশিত হয় নাই। শঙ্করকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে অনেক স্থলে শ্বেতাশ্বতরের উক্তি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌কে যে আচার্য প্রামাণিক উপনিষদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। সমস্ত প্রামাণিক উপনিষদের উপরই আচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপরও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর আনন্দগিরির কোন টীকা পাওয়া যায় না।

প্রপঞ্চসারতন্ত্র, আত্মবোধ, একশ্লোকী, দশশ্লোকী, মনীষাপঞ্চক, আত্মজ্ঞানোপদেশ আত্মানাত্মবিবেক, আনন্দলহরী প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থাবলীই আচার্য শঙ্করের রচিত কি-না, তাহা বলা কঠিন। কেননা, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যতীত শঙ্কর নামে অপর একজন লেখকেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অখ্যাতনামা লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য খ্যাতনামা লেখকের নামে তাহা চালাইতে চেষ্টা করিতেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, উপনিষদ্-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যগ্রন্থ যে আচার্যের রচিত তাহাতে কেহই কোন সন্দেহ করেন না। ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি ও যুক্তিলহরী আলোচনা করিলে ঐ সকল ভাষ্যগ্রন্থ শঙ্করাচার্যের বিরচিত বলিয়াই নিঃসন্দেহে মনে হয়। শঙ্করাচার্য-রচিত গ্রন্থাবলীর উপর পরবর্তী কালে আনন্দজ্ঞান অতিপ্রাঞ্জল টীকা প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থের আশয় বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। আনন্দজ্ঞান যে সকল গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ যে শঙ্করাচার্যের রচিত তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আনন্দজ্ঞান ব্যতীত শঙ্করানন্দ, বালগোপাল যতীন্দ্র, নারায়ণেন্দ্রসরস্বতী, রাঘবানন্দ, বালকৃষ্ণ দাস, জ্ঞানামৃত যতি, বিশ্বেশ্বরতীর্থ, শুদ্ধানন্দ, পূর্ণানন্দতীর্থ, স্বয়ম্প্রকাশ যতি, মধুসূদন সরস্বতী, রামানন্দতীর্থ প্রভৃতি মনীষিগণ বিভিন্ন শঙ্কর-গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করিয়াছেন।[১] শঙ্করকৃত গীতা-ভাষ্যের উপর

১। শঙ্করের দশখানি উপনিষদ্-ভাষ্যের উপরই আনন্দজ্ঞানের টীকা আছে, তদ্‌ব্যতীত শঙ্করানন্দ-কৃত দীপিকা নামে টীকা পাওয়া যায়। কেন-উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা ব্যতীত, কেনোপনিষদ্-ভাষ্য-বিবরণ নামে টীকা ও শঙ্করানন্দের দীপিকা টীকা বর্তমান। কঠ-ভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞান ও বালগোপাল যতীন্দ্রের টীকা পাওয়া যায়। প্রশ্নোপনিষদ্-ভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা, নারায়ণেন্দ্রসরস্বতীর টীকা ও শঙ্করানন্দের দীপিকা নামে টীকা আছে। মুণ্ডক-ভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা ও অভিনব নারায়ণেন্দ্রসরস্বতীর টীকা পাওয়া যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা, মথুরানাথ শুক্লের টীকা, রাঘবানন্দের মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ভাষ্যার্থ-সংগ্রহনামে টীকা ও শঙ্করানন্দের দীপিকা টীকা পাওয়া যায়। ঐতরেয় উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি, অভিনব নারায়ণেন্দ্রসরস্বতী, নৃসিংহ আচার্য, বালকৃষ্ণ দাস, জ্ঞানামৃত যতি ও বিশ্বেশ্বর তীর্থের রচিত টীকা ও বিদ্যারণ্যের দীপিকা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-ভাষ্যের উপরে আনন্দজ্ঞানের টীকা ব্যতীত সুরেশ্বরাচার্যের তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য-বার্ত্তিক নামে শ্লোকে লিখিত এক বার্ত্তিক পাওয়া যায়, ঐ বার্ত্তিকের উপরও আনন্দজ্ঞানের নাতিবিস্তৃত টীকা আছে। এতদ্‌ব্যতীত উক্ত ভাষ্যের উপর বিদ্যারণ্য ও শঙ্করানন্দের দীপিকা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা, বিদ্যারণ্যের দীপিকা টীকা, ও ভাষ্যটিপ্পন নামে এক সংক্ষিপ্ত টীকা পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা আছে এবং বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিক নামে সুরেশ্বরাচার্যের প্রায় ১২ হাজার শ্লোকে লিখিত এক বিশাল বার্ত্তিক পাওয়া যায়। শ্লোকাকারে লিখিত ঐ বার্ত্তিক ঠিক ভাষ্যের টীকার মত নহে, উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থেও শাঙ্কর-ভাষ্যের তাৎপর্যই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐ বিপুলায়তন বার্ত্তিকের উপরও আনন্দজ্ঞানের অনতিবিস্তৃত টীকা ও বিদ্যারণ্যের বৃহদারণ্যবার্ত্তিকসার নামে টীকা পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য-রচিত অপরোক্ষানুভবের উপর শঙ্করানন্দ ও বিদ্যারণ্য স্বামীর অনুভব-দীপিকা নামক টীকা পাওয়া যায় এবং বালগোপাল ও চণ্ডেশ্বরের রচিত টীকা আছে বলিয়া জানা

রামানন্দের ভগবদ্গীতা-ভাষ্য-ব্যাখ্যা, আনন্দজ্ঞানের গীতা-ভাষ্য-বিবেচন নামে টীকা আছে। তদ্ব্যতীত শঙ্করানন্দের টীকা, ধনপতিসূরির ভাষ্যোৎকর্ষ-দীপিকা, বেঙ্কটনাথের টীকা, চিদ্ঘনানন্দের গূঢ়ার্থদীপিকা, রঘুনাথপ্রসাদের গীতামৃত-তরঙ্গিণী, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠসূরিকৃত গীতার্থপ্রকাশ প্রভৃতি টীকার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল টীকাই শাঙ্কর-ভাষ্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতাগূঢ়ার্থ-দীপিকা ও শ্রীধরস্বামিকৃত গীতাসুবোধিনীও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতি উপাদেয় টীকা।[১] এই টীকাদ্বয় স্থলবিশেষে আচার্যের মতের বিরোধী হইলেও ইহাতে আচার্যের রচিত ভাষ্যের প্রভাব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মনীষিগণ-কর্তৃক ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যাত হওয়ায় গীতা-ভাষ্যের চমৎকারিতা ও উপাদেয়তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। শঙ্কর-গ্রন্থাবলীর মধ্যে যুক্তির দৃঢ়তায়, ভাবের গভীরতায় এবং চিন্তার সাবলীলগতিতে ব্রহ্মসূত্রের শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্য যে অতি উচ্চস্থান

যায়। শঙ্করাচার্যের গৌড়পাদ-ভাষ্য বা মাণ্ডুক্য কারিকা-ভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকা আছে, তদ্ব্যতীত শুদ্ধানন্দের এক টীকা আছে বলিয়া জানা যায়। আচার্যের আত্মজ্ঞানোপদেশের উপর আনন্দজ্ঞানের এবং পূর্ণানন্দতীর্থের টীকা পাওয়া যায়। একশ্লোকের উপর স্বয়ম্প্রকাশ যতির তত্ত্বদীপন নামে টীকা আছে। দশশ্লোকী বা চিদানন্দ দশশ্লোকীর উপর মধুসূদন সরস্বতীর সিদ্ধান্তবিন্দুনামে এক টীকা আছে। উক্ত সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর নারায়ণ যতির লঘুটীকা, পুরুষোত্তম সরস্বতীর সিদ্ধান্তবিন্দু-সন্দীপন নামক টীকা, পূর্ণানন্দ সরস্বতীর তত্ত্ববিবেক নামক টীকা, গৌড় ব্রহ্মানন্দীর সিদ্ধান্তবিন্দুন্যায়-রত্নাবলী টীকা এবং রত্নাবলীর উপর কৃষ্ণকান্তের সিদ্ধান্ত-ন্যায়প্রদীপিকা নামে টীকা আছে। শতশ্লোকীর উপর আনন্দগিরির টীকা আছে। উপদেশ-সাহস্রী গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। উপদেশ-সাহস্রীর উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা ও রামতীর্থ স্বামীর পাদযোজনিকা নামক টীকা আছে। আত্মবোধের উপর বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের দীপিকা ও মধুসূদন সরস্বতী, রামানন্দতীর্থ প্রভৃতির টীকা পাওয়া যায়। আত্মানাত্মবিবেকের উপর পদ্মপাদ, পূর্ণানন্দতীর্থ, স্বয়ম্প্রকাশ যতি ও সায়ণাচার্যের রচিত টীকা আছে বলিয়া জানা যায়। বিবেক-চূড়ামণির কোন টীকা পাওয়া যায় না। ভাষা ও ভাবমাধুর্যে বিবেক-চূড়ামণি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। শঙ্করের আনন্দলহরীর উপর অপ্যয়দীক্ষিতের টীকা, কৃষ্ণ আচার্যের মঞ্জুভাষিণী, কেশবভট্টের টীকা, কৈবল্যাশ্রমের সৌভাগ্যবর্ধিনী, গঙ্গাহরির তত্ত্বদীপিকা, গোপীকান্ত সার্বভৌমের আনন্দলহরী টীকা, ব্রহ্মানন্দের ভাবার্থদীপিকা প্রভৃতি প্রায় পঁচিশখানি টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্যের পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়ার উপরও অনেক টীকা, টীকার টীকা প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সুরেশ্বরাচার্যের পঞ্চীকরণ-বার্ত্তিক, অভিনব-নারায়ণেন্দ্রসরস্বতীর বার্ত্তিক-টীকা পঞ্চীকরণবার্ত্তিকাভরণ, পঞ্চীকরণভাব-প্রকাশিকা, পঞ্চীকরণ-টীকা, তত্ত্বচন্দ্রিকা, পঞ্চীকরণতাৎপর্যচন্দ্রিকা এবং আনন্দজ্ঞান ও স্বয়ম্প্রকাশ যতির পঞ্চীকরণবিবরণ প্রভৃতি টীকা রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য-রচিত গ্রন্থমালাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে রাশি রাশি গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।

১। আচার্য মধুসূদন ও শ্রীধরস্বামী তাঁহাদের ব্যাখ্যায় অনেকস্থলে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আচার্য ধনপতিসূরি তদীয় ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় ঐ সকল স্থলে মধুসূদন ও শ্রীধরের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার উপাদেয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গীতা, নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১২ খৃঃ দ্রষ্টব্য।

অধিকার করিয়াছে, এ বিষয়ে সুধীগণের কোন মতদ্বৈধ নাই। পরবর্তী কালে ঐ শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়াও বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদাচার্যের পঞ্চপাদিকার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চপাদিকা শাঙ্কর-ভাষ্যের অপূর্ব বিশ্লেষণ। ইহা ভাষ্যের যথার্থ আলোক। ঐ আলোকসম্পাতে ভাষ্যের গূঢ় রহস্য জিজ্ঞাসুর নিকট উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে (A. D. 1200) প্রকাশাত্ম যতি পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর পঞ্চপাদিকা-বিবরণ নামে অতি উপাদেয় টীকা রচনা করেন।[১] খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে আনন্দগিরির শিষ্য অখণ্ডানন্দ প্রকাশাত্ম যতির পঞ্চপাদিকা বিবরণের উপর তত্ত্বদীপন নামে টীকা রচনা করেন। প্রায় ঐরূপ সময়েই বিষ্ণু ভট্টোপাধ্যায় পঞ্চপাদিকা বিবরণের উপর ঋজুবিবরণ নামে এক টীকা রচনা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে আচার্য নৃসিংহাশ্রম পঞ্চপাদিকা বিবরণের ভাবপ্রকাশিকা নামে টীকা প্রণয়ন করেন। পঞ্চপাদিকা বিবরণের ছায়া অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্য ভাগে বিদ্যারণ্য (1350 A. D.) বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ নামে পঞ্চপাদিকার উপর এক নিবন্ধ রচনা করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে পণ্ডিত রামানন্দ সরস্বতী বিবরণের উপর বিবরণোপন্যাস নামে অপর একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। বিবরণোপন্যাস ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ এই গ্রন্থদ্বয় ঠিক টীকা নহে। টীকা না হইলেও বিবরণপ্রস্থানের বেদান্তমত এই দুইখানি গ্রন্থে যেরূপ বিশদভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে বিবরণ-মতের পরিচয়প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য। পঞ্চপাদিকায় ও বিবরণে চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যামাত্রই পাওয়া যায়। উহা ভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ টীকা নহে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে (A. D. 1200) প্রকটার্থ-বিবরণের রচয়িতা[২] প্রকটার্থ-বিবরণ নামে সম্পূর্ণ শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যের উপর বিবরণমতানুসারী এক অতি উপাদেয় পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশাত্ম যতির পঞ্চপাদিকা-বিবরণকে গূঢ়ার্থ বিবরণ বলা হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় প্রকটার্থ-বিবরণের রচনা-ভঙ্গী সরল ও সহজবোধ্য বলিয়াই এই গ্রন্থকে 'প্রকটার্থ বিবরণ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে বলিয়া অনেক মনীষী মনে করেন। বস্তুতঃ প্রকটার্থ-বিবরণ বিবরণপ্রস্থানের অমূল্য সম্পদ্। শাঙ্কর-ভাষ্যের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে অদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ রচনা করেন। ব্রহ্মবিদ্যাভরণও অতি উপাদেয় টীকা। ইহাকে শাঙ্কর-ভাষ্যের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী বুঝিতে হইলে, ব্রহ্মবিদ্যাভরণের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে

১। বিবরণব্যতীত, পঞ্চপাদিকার উপর অমলানন্দকৃত পঞ্চপাদিকাদর্পণ নামে টীকা ও বেদান্ত-পরিভাষাপ্রণেতা ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের পঞ্চপাদিকা টীকা রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

২। প্রকটার্থ-বিবরণের রচয়িতার কোন নাম জানা যায় না। প্রকটার্থকার বলিয়াই তিনি পরিচিত।

শঙ্করানন্দ ব্রহ্মসূত্রদীপিকা রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রদীপিকায় শঙ্করানন্দ অতি সরল ও সরস ভাষায় শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আনন্দজ্ঞান ন্যায়নির্ণয় নামে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের এক অতি সরস ও সহজবোধ্য টীকা রচনা করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষভাগে গোবিন্দানন্দ ভাষ্যরত্নপ্রভা নামে শারীরক-ভাষ্যের অতি অপূর্ব টীকা রচনা করেন। ভাষ্যরত্নপ্রভা বিবরণের ছায়া অবলম্বনে রচিত উপাদেয় টীকা। ঐ শতকের মধ্যভাগে অপ্যয়দীক্ষিত ন্যায়রক্ষামণি নামে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যানুসারী এক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শারীরক-ভাষ্যের ভামতী টীকাও অতি প্রসিদ্ধ টীকা। পঞ্চপাদিকাবিবরণ হইতে যেমন বিবরণ-প্রস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী টীকা হইতে ভামতীপ্রস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। খৃষ্টীয় নবম শতকে বাচস্পতিমিশ্র ভামতী টীকা রচনা করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে অমলানন্দ ভামতীর উপর বেদান্ত-কল্পতরু নামে টীকা প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে অপ্যয়দীক্ষিত অমলানন্দের বেদান্ত-কল্পতরুর উপর বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল নামে এক অতি বিস্তৃত বিচারবহুল টীকা প্রণয়ন করিয়া, ভামতী-মতের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। কল্পতরুর উপর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কোণ্ডভট্টের পুত্র শ্রীমৎলক্ষ্মীনৃসিংহ আভোগ নামে এক টীকা রচনা করেন। লক্ষ্মীনৃসিংহ তদীয় টীকা রচনায় অনেক স্থলে অপ্যয়দীক্ষিতের বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমলের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত ভামতীতিলক, ভামতীবিলাস, ভামতীব্যাখ্যা প্রভৃতি ভামতীর বিবিধ টীকার নাম শুনা যায়। ইহা হইতে ভামতী-মত যে অদ্বৈতবেদান্তে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভামতী-মত ও বিবরণমতের পার্থক্য অনেকস্থলে অতি স্পষ্ট। এই উভয় মতের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে (A.D. 1220) চিৎসুখাচার্য শাঙ্কর-ভাষ্যের উপর ভাষ্য-ভাবপ্রকাশিকা নামে এক টীকা রচনা করেন। নারায়ণ সরস্বতী শারীরক-ভাষ্যের উপর এক বিস্তৃত বার্তিক প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যের উপর ব্রহ্মানন্দ যতির ব্রহ্মসূত্রভাষ্যার্থ-সংগ্রহ, বেঙ্কটের ব্রহ্মসূত্রার্থ-দীপিকা, অন্নম্ভট্টের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, জ্ঞানোত্তমের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যা, ধর্মভট্টের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, রামানন্দ সরস্বতীর ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, সদাশিবেন্দ্রের ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা, সুব্রহ্মণ্যের শারীরক-মীমাংসাসূত্র-সিদ্ধান্তকৌমুদী, অনুভবানন্দের শারীরক-ন্যায়মণিমালা, প্রকাশাত্মনের শারীরক-মীমাংসান্যায়সংগ্রহ প্রভৃতি অনেক টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। মোট কথা, এক ব্রহ্মসূত্রশারীরক-ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়াই রাশি রাশি গ্রন্থমালার সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। শারীরক-ভাষ্যের টীকা, টীকার টীকা, তস্য টীকা এইরূপে শারীরকের ভিত্তিতে বেদান্তচিন্তার যে অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধীমাত্রেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাচস্পতিমিশ্র, পদ্মপাদাচার্য, প্রকাশাত্মযতি, সর্বজ্ঞাত্মমুনি, সুরেশ্বরাচার্য প্রভৃতি ধুরন্ধর দার্শনিকগণ কেবল শঙ্করের টীকাকার হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এমন নহে। তাঁহাদের গ্রন্থে বহু মৌলিক চিন্তার সমাবেশ আছে। তাঁহারা অদ্বৈত চিন্তায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। আমরা ক্রমে তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ যাঁহার দার্শনিক মতের বিশ্লেষণে

অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থরাজি বিরচিত হইয়াছে, সেই অদ্বৈতগুরু শঙ্করাচার্যের বেদান্ত মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত—আত্মার অস্তিত্ব সর্ববাদিসিদ্ধ

আত্ম-মীমাংসা বা ব্রহ্ম-মীমাংসাই শঙ্কর-দর্শনের প্রাণ। আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ নাই। আত্মাই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্বও সর্ববাদি-সিদ্ধ। 'সর্বস্য আত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ' (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১।১)। এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তদ্‌ব্যতীত সমস্তই অসত্য। তুমি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পার, কিন্তু তুমি নিজে আছ কি না? তোমার আত্মা আছে কি না? এইরূপ সন্দেহ কখনও তোমার মনের মধ্যে উদয় হইয়াছে কি? আত্মাকে "আমি" বা অহংরূপে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। আত্মার সম্বন্ধে লোকের প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে বলিয়াই, আমি আছি কি না? কিংবা আমি নাই, কোন স্থিরমস্তিক ব্যক্তিরই আত্মার সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ বা ভ্রান্ত বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায় না। তারপর, জাগতিক অপরাপর বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে লোকে যে প্রশ্ন করিয়া থাকে, তাহা দ্বারায়ও প্রশ্নকারীর আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। কারণ, যে প্রশ্ন করে, সেই আত্মা, আত্মা না থাকিলে প্রশ্ন করে কে?[১] আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এইরূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই অজ্ঞান। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মর্মকথা। আত্মা-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই সকল জিজ্ঞাসার সার বলিয়া বেদান্তে তাহাই সর্বপ্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছে—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১)। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার সম্বন্ধে সকলেরই যখন প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, তখন সে বিষয়ে আর জিজ্ঞাসার উদয় হইবে কেন? সন্দেহ থাকিলেই সন্দেহ নিরাসের জন্য জিজ্ঞাসার উদয় হয়, আত্মার সম্বন্ধে তো কাহারও কোন সন্দেহ নাই, সুতরাং তাহার আবার জিজ্ঞাসা কি? ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কথাটাই এরূপ ক্ষেত্রে অর্থহীন নহে কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, "অহম্" বা 'আমি' এইরূপে আমরা সকলেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করি সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ প্রত্যক্ষে আত্মার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পায় কি? "অহম্" বলিয়া লোকে যে প্রত্যক্ষ করে, সেখানে বিচার করিলে দেখা যায় যে, দেহী তাঁহার শরীরের মধ্যে বিরাজমান শরীরাভিমানী চৈতন্যকেই "অহম্" বলিয়া উপলব্ধি করে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত চৈতন্যের সঙ্গে জড় শরীরের যে মৌলিক

১। (ক) আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ য এব নিরাকর্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ১।১।৪

(খ) আত্মত্বাচ্চ আত্মনো নিরাকরণশঙ্কানুপপত্তিঃ। নহি আত্মা আগন্তুকঃ কস্যচিৎ, স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ। নহ্যাত্মাত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি।----আত্মা তু প্রমাণাদি-ব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।৩।৭

বিভেদ আছে, তাহাও সে ভুলিয়া যায়। শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলিয়া ভ্রম করে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপেই সাধারণতঃ লোকের "আমিত্বের" প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মা কি কখনও স্থূল বা কৃশ হয়? অন্ধ ও বধির হয়? স্থূল বা কৃশ হয় শরীর, অন্ধ বা বধির হয় ইন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয় ও শরীরের ধর্ম লোকে ভ্রমবশতঃ আত্মায় আরোপ করিয়া থাকে। ফলে, আত্মার যথার্থ সচ্চিদানন্দরূপটি সাধারণের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না, আত্মার কল্পিত ভ্রান্তরূপই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অনাদিকাল হইতেই এইরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাসই এই ভ্রান্ত দৃষ্টির মূল। অধ্যাস কাহাকে বলে? যে বস্তু বাস্তবিক যাহা নহে, সেইরূপে ঐ বস্তুকে জানার নামই অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান।

অধ্যাস

'অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ' (ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাষ্য)। রজ্জু বাস্তবিক সর্প নহে, রজ্জুকে সর্পরূপে জানার নামই রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস। এইরূপ আত্মা বাস্তবিক স্থূল বা কৃশ নহে, আত্মাকে স্থূল বা কৃশরূপে বোঝাই আত্মাতে দেহধর্মের অধ্যাস। আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ আত্মজ্ঞান আত্মায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-ধর্মের অধ্যাসবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলোক উপস্থিত হইলে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ যথার্থ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, জীবের ঐরূপ (অধ্যাস) অজ্ঞান বা মিথ্যা বুদ্ধি বিদূরিত হয়। জীব শাশ্বতশান্তি লাভ করে। 'অবিদ্যাধ্বান্তং বিদ্যাপ্রদীপেন বিধূয় আত্মৈব কেবলো নির্বৃতঃ সুখী ভবতি' (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ২।৩।৪০)। অনাদিকাল-সঞ্চিত মিথ্যাজ্ঞানের ফলে অসঙ্গ চৈতন্যময় নির্বিশেষ আত্মায় নানা কল্পিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ঐ কল্পিত সম্বন্ধ দ্বারা আত্মার যথার্থ রূপটি আবৃত হইয়া পড়ে। ইহাই অজ্ঞানের কার্য বা অধ্যাসের ফল। আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। যাহা প্রকাশ্য, তাহা প্রকাশক নহে, যেমন আলোকপ্রকাশ্য ঘট, আলোক নহে। অতএব আত্মা কখনও জড় হইতে পারে না, বা জড়ের সাহিত তাহার কোন যথার্থ সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। আত্মা চৈতন্যময়। আত্মা ব্যতীত সমস্তই অনাত্মা এবং জড়। 'অহম্' শব্দে স্বপ্রকাশ চিদানন্দঘন আত্মাকে বুঝায়, 'ইদম্' শব্দে অনাত্মা বা জড়বস্তুকে বুঝায়। আত্মা ও অনাত্মা, অহং এবং ইদম্, আলোক-অন্ধকারের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ। ইহাদের (চৈতন্য ও জড়বস্তুর) অভেদ কখনও সম্ভব নহে। অধ্যাস বা অবিদ্যার ফলে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে কল্পিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় এবং "অহমিদম্", "মমেদম্" 'আমি ইহা' 'আমার ইহা' এইরূপ ভ্রান্তবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বেদান্তের পরিভাষায় ইহাই 'চিদচিদ্‌গ্রন্থি'। এই চিদচিদ্‌গ্রন্থি-রহস্য আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাস-ভাষ্যে প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। আচার্য বলেন যে, চিদানন্দস্বভাব আত্মা অপরিবর্তনীয়, সুতরাং সত্য, আর জড়-স্বভাব দৃশ্যবস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা। এই সত্য ও মিথ্যার অধ্যাস বা মিলনের ফলেই জীবের সংসারজীবন চলিতেছে এবং উহা সত্য স্বাভাবিক বলিয়া মনে

হইতেছে।[১] বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের মূলেও পূর্বোক্ত অধ্যাস বা অবিদ্যার খেলাই বিরাজ করিতেছে। প্রথমতঃ আমরা যাহাকে প্রমাণ বলি, সেই প্রমাণকেই বিচার করিয়া দেখা যাউক। যদিও ব্যাবহারিক প্রমা-জ্ঞানকে আমরা যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই মনে করি, তথাপি শঙ্করাচার্য বলেন যে, উহা সত্য নহে, মিথ্যা। প্রমাতা বলিলে আমরা দেহেন্দ্রিয়ধারী কোন জ্ঞাতৃ পুরুষকে বুঝিয়া থাকি। আত্মা যখন সচ্চিদানন্দরূপ, অসঙ্গ ও নির্বিশেষ, তখন জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে প্রমাতা বা জ্ঞাতারূপে বোঝাও যথার্থ আত্মজ্ঞান নহে। ইহাও 'অহং স্থূল', 'অহং কৃশ' ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায়ই মিথ্যা জ্ঞান। আত্মার জ্ঞাতৃত্বই যদি মিথ্যা হয়, তবে ঐ মিথ্যা জ্ঞাতৃত্বকে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ব্যবহার চলিতেছে, তাহাও মিথ্যাই হইবে।[২] আমি জ্ঞাতা এই বুদ্ধি যেমন মিথ্যা, আমিই কর্তা, আমি যাজ্ঞিক, আমি যজমান এইরূপ অভিমানও তদনুরূপ মিথ্যা। "চিদানন্দরূপঃ শিবো'হম্" এই বুদ্ধিই একমাত্র সত্য। শঙ্কর বলেন যে, জীবনের গতিপথে মানুষের ব্যবহার পশুর ব্যবহারেরই অনুরূপ। 'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ,' (অধ্যাস শং ভাষ্য) পশুদিগের ব্যবহারের মূলে কোন বিবেক বুদ্ধির বিকাশ নাই, তাহা সম্পূর্ণই অজ্ঞানের খেলা। প্রবৃত্তির তাড়নায় উহারা ধাবিত হয়। যাহা সুখকর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাহা দুঃখদায়ক বলিয়া বোঝে, তাহা হইতে বিরত হয়। মানুষও যতই বুদ্ধিমান্ এবং বিদ্বান্ হউক না কেন, সংসার-জীবনে তাঁহার ব্যবহারেরও মূলসূত্র এই একই দেখা যায়। ভাল বুঝিলে তাহার পিছনে দৌড়ায়, অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিলে তাহার কাছেও যায় না। ইহা হইতে মানুষের ব্যবহারের মূলেও যে পশুসুলভ অজ্ঞানই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।[৩] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অজ্ঞানকে লোকে অজ্ঞান বলিয়া বোঝে না,—সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে। ব্যাবহারিক জগতে সর্বত্রই অজ্ঞানের খেলা চলিতেছে। সর্বপ্রকার অনর্থের মূল এই অজ্ঞানের সমূলে নিবৃত্তি এবং বিশ্বময় এক অদ্বিতীয় আত্মা বা পরব্রহ্মের উপলব্ধিই বেদান্তের লক্ষ্য।[৪]

১। সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি জায়তে নৈসর্গিকো লোকব্যবহারঃ। ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাষ্য।

২। কথং পুনরবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। উচ্যতে, দেহেন্দ্রিয়াদিষু অহমভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ----তস্মাদবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। অধ্যাস শং ভাষ্য, ৪১-৪২ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

৩। যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্তন্তে অনুকূলে চ প্রবর্তন্তে।---সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধো'বিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ তৎসামান্যদর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে। ব্রহ্মসূত্র শং অধ্যাস-ভাষ্য।

৪। এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকো'ধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্বলোক-প্রত্যক্ষঃ। অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাষ্য।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং বেদাদিশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই যদি মিথ্যা হয়, তবে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মকে জানিবার উপায় কি? ব্রহ্মকে যে 'শাস্ত্রযোনি' বলা হইয়াছে, এবং শঙ্করাচার্য স্বীয় ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানে যে শাস্ত্র ও অনুভবকে প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,[১] তাহারই বা তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বলেন যে, যাহা অবাধিত, তাহা সত্য, যাহা বাধিত হয়, তাহা মিথ্যা, ইহাই সত্য ও মিথ্যার একমাত্র মাপকাঠি। শাস্ত্র ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মানুভূতি উদিত হইলে শাস্ত্র, গুরু, শিষ্য, শ্রবণ, মনন, উপাসনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, সমস্তই বিলুপ্ত হয়। তখন বিশ্বময় এক অদ্বয় ব্রহ্মই বিরাজ করে। ব্রহ্মজ্ঞান-উদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্র, গুরূপদেশ, বিচার ও ভাবনার সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আত্মতত্ত্ব-সম্পর্কে দেহাত্মবাদী চার্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তী পর্যন্ত দার্শনিকগণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-মীমাংসা প্রয়োজন। সেই মীমাংসা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিসাপেক্ষ। এইজন্যই তর্কের এবং শাস্ত্রের অবতারণা। শাস্ত্র শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদীয় সিদ্ধান্তে মিথ্যা হইলেও শাস্ত্রজন্য-জ্ঞান মিথ্যা নহে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধও বেদাদিশাস্ত্রগম্য এবং সত্য। ঐ নিত্য আত্মবোধ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্র বাধিত হয় সুতরাং শাস্ত্র মিথ্যা; আত্মজ্ঞান বাধিত হয় না, অতএব আত্মজ্ঞান সত্য।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র জড়; আত্মার প্রকাশেই শাস্ত্রের প্রকাশ। শাস্ত্র স্বপ্রকাশ আত্মবস্তুকে প্রকাশ করে না, কেবল আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া আত্মার সম্বন্ধে আমাদের যে অজ্ঞান আছে, তাহার নিবৃত্তি করে এবং পরোক্ষভাবে আত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির সাহায্য করে। আত্মা দৃশ্য নহে, দৃশ্য বস্তুকেই ইদংরূপে 'ইহা এইরূপ' এইভাবে নির্বচন করা চলে, নির্বিশেষ পরমাত্মাকে কোনভাবেই নির্বচন করা চলে না। পরমাত্মা অসীম, অপরিমেয়, এইজন্য ইহাকে

ব্রহ্ম

'ব্রহ্ম' বলা হইয়া থাকে। বৃহ্ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বড় বা ব্যাপক, অতএব যাহা বৃহত্তম, মহত্তম, যাহা সীমারহিত, নিরতিশয় ভূমা তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সর্বদোষরহিত সুতরাং নিত্যশুদ্ধ, জড়ের বিপরীত বলিয়াই নিত্যবুদ্ধ এবং অসীম বলিয়াই নিত্যমুক্ত।[২] বেদান্তশাস্ত্র এই নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পরব্রহ্মকে সকলের আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাবের কথা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে, একটি তাঁহার সগুণভাব, অপরটি তাঁহার নির্গুণভাব। সগুণ ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান। ইহা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে,

---

১। প্রত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ১।১।১

২। অস্তি তাবদ্ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং, সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতম্। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ১।১।১

তাঁহার নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, সচ্চিদানন্দরূপই প্রকৃত রূপ। আচার্য শঙ্কর 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) এই সূত্রে জগদ্‌যোনি ব্রহ্মের সগুণরূপ বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মের ইহা তটস্থ লক্ষণ। আনন্দরূপতাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের সগুণভাব ঔপাধিক। মায়ারূপ উপাধিবশতঃই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ হইয়া থাকেন। তখন তিনি হন ঈশ্বর বা মহেশ্বর। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্ব নহে। যিনি স্বতঃ নির্গুণ, তিনিই মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ হন। এই সগুণভাব তাঁহার লীলা মাত্র। লীলাময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পরমেশ্বরই প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ মায়িক দেহ ধারণ করিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন 'স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্' (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১।২০), দেহধারীর ন্যায় প্রতিভাত হন (দেহবানিব লক্ষ্যতে)। ত্রিগুণময়ী জগজ্জননী মায়াকে বশীভূত করিয়া জগতের সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য জগতের বক্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।[১] তিনি মায়াধীশ, তাঁহার উপর মায়ার কোন প্রভাব নাই। তিনি মায়ার সাক্ষী মাত্র। এইজন্য ব্রহ্মের এই সগুণ লীলা দ্বারা তাঁহার নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবের কোন বিচ্যুতি হয় না। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ভেদ অবিদ্যা-কল্পিত ও মিথ্যা।[২] জীব ও জগৎ সমস্তই ব্রহ্মের মায়িক বিলাস।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব

জীব ব্রহ্মেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। সূর্য যেমন বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মও সেইরূপ বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। এই প্রতিবিম্বই জীব।[৩] বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব বস্তুতঃ অভিন্ন। এই মত অদ্বৈতবেদান্তে "প্রতিবিম্ববাদ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত সুতরাং জীবভাব ও জীবের সংসারলীলা প্রভৃতি সমস্তই অজ্ঞানেরই বিলাস।[৪] পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাবও যেমন মায়িক, জীবভাবও সেইরূপই মায়িক। পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও

জীবভাব ও ঈশ্বরভাব

১। স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজো'ব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো'পি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে। গীতা, শং ভাষ্য, উপক্রমণিকা—

অজো'পি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরো'পি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা, ৬।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চ ন পরমার্থতঃ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।১৪

৩। আভাস এব চ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০

আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্য আত্মনো জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।৩।৫০

৪। আভাসস্য অবিদ্যাকৃতত্বাত্তদাশ্রয়স্য সংসারস্য অবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।৩।৫০

সর্বশক্তি, জীব অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব তাঁহার নিয়ম্য। মায়া ঈশ্বরের বশ, জীব মায়ার বশ। ঈশ্বরের উপাধি সমষ্টি মায়া, জীবের উপাধি ব্যষ্টি অবিদ্যা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি উপাধির বিলয় হইলে, কি জীব, কি ঈশ্বর, সমস্তই অখণ্ড-অনন্ত-ভূমা ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যাইবে। কোন কোন অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে; জীব অখণ্ড ব্রহ্মের সখণ্ড অভিব্যক্তি। তাঁহাদের মতে জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। অনন্ত, অখণ্ড মহাব্যোম যেমন ঘটাদি অবচ্ছেদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া ঘটাকাশ বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, জীব-সংজ্ঞা লাভ করে। ঘটাকাশ মহাকাশের সখণ্ড বা আংশিক অভিব্যক্তি, জীবও সেইরূপ পরমাত্মার আংশিক বিকাশ। ইহাই "অবচ্ছেদ-বাদের" সংক্ষিপ্ত মর্ম। অবচ্ছেদবাদের সমর্থক আচার্যগণ বলেন যে, 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে জীব পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা করায়, এই অংশবাদ বা অবচ্ছেদবাদ সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। প্রতিবিম্ববাদ (জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এই মত) সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে। জীবকে ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করায়, জীব ব্রহ্মাংশ, এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টবাক্যেই জীবকে ব্রহ্মাংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (গীতা ১৫।৭)। এই অংশবাদে পরমাত্মা এক অখণ্ড হইলেও, অন্তঃকরণরূপ উপাধিপরিচ্ছেদ বিভিন্ন বলিয়া, 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ, সো'ন্বেষ্টব্যঃ, সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' এই সকল শ্রুতিতে জ্ঞাতা জীব ও জ্ঞেয় পরমাত্মার যে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয়। কেন না, অংশ ও অংশীর, স্ফুলিঙ্গ ও বহ্নির ভেদ অতি সুস্পষ্ট। প্রতিবিম্ববাদের সমর্থকগণ উক্ত যুক্তির কোন সারবত্তা আছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন যে, অন্তঃকরণের ভেদবশতঃ যেমন অন্তঃকরণপরিচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, সেইরূপ বিভিন্ন অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত জীবেরই বা অন্তঃকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধা কোথায়? অন্তঃকরণপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য যেমন মহাচৈতন্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সেইরূপ অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বা মহাচৈতন্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না কেন? বস্তুতঃ চৈতন্য নিরংশ, তাঁহার অংশ কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে—'অংশ ইব অংশঃ, নহি নিরবয়স্য মুখ্যো'ংশঃ সম্ভবতি' (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ২।৩।৪৩)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অবচ্ছেদবাদীরা অবচ্ছেদবাদের অনুকূলে যে সূত্র এবং যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, সেই সূত্রের সহিত প্রতিবিম্ববাদেরও কোন বিরোধ হইতেছে না। প্রতিবিম্ববাদ স্পষ্টতঃ 'আভাস এবচ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০) এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। সূত্রে 'এব' শব্দের প্রয়োগ থাকায়, প্রতিবিম্ববাদই ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৩) ইত্যাদি সূত্রে জীবকে অংশরূপে বর্ণনা করিয়া, "অবচ্ছেদবাদ" সূত্রকার আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অবচ্ছেদবাদীর এই যুক্তি তর্কমুখে

অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ। প্রতিবিম্ববাদই সূত্রকারের অভিপ্রেত।

স্বীকার করিলেও 'আভাস এব চ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০) এই পরসূত্রে আভাস বা প্রতিবিম্ববাদ ব্যাখ্যা করায় এবং 'এব' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা আভাসবাদের দৃঢ়তা সূচিত হওয়ায়, এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, ব্রহ্মসূত্রকার তদীয় সূত্রে "অবচ্ছেদবাদ" পূর্বপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিয়া, উপসংহারে "আভাসবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ"ই সূত্রসিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য গোবিন্দানন্দ তাঁহার ভাষ্যরত্ন-প্রভা নামক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের টীকায় এইরূপেই উভয়বাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন।[১]

জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ইহা সাব্যস্ত হইল। এখন বিচার্য এই যে, এই প্রতিবিম্ব পড়িবে কোথায়? কোন কোন বেদান্তী বলেন যে, স্বচ্ছ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণই দর্পণ, ঐ দর্পণে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বই জীব। কেহ বা অবিদ্যাকেই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বের আধার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এই মতে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বই জীব। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যে অবিদ্যামূলক ইহা অবশ্য স্বীকার্য। আচার্য শঙ্করও ভাষ্যে আভাসকে অবিদ্যাকৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'আভাসস্য অবিদ্যাকৃতত্বাত্তদাশ্রয়স্য সংসারস্য অবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি' (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।৩।৫০)। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে—অবিদ্যা নিজেই অবিদ্যামূলক প্রতিবিম্বের আধার হইবে, না, অন্তঃকরণ আধার হইবে? জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের স্থূল বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল থাকে না। একমাত্র অজ্ঞান-উপাধিই তখন জীবের বর্তমান থাকে। অজ্ঞান-প্রতিবিম্ব জীব তখন অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে বিরাজ করে।

জীবের তিনটি অবস্থা। এই তিনটি অবস্থায় জীবের তিনটি বিভিন্ন উপাধির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ অজ্ঞান-সাক্ষী জীব "প্রাজ্ঞ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং সুষুপ্তিকালীন দিব্য আনন্দ ভোগ করে বলিয়া তখন সে হয় আনন্দময়। সুষুপ্তি-অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব যখন স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পেঁছায়, তখন জীবের অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয়, (অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব) জীব তখন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তঃকরণস্থ সুখ, দুঃখ ভোগ করে এবং ঐ সময় আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা এইরূপে তাহার বিবিধ অভিমানের উদয় হইতে দেখা যায়। জাগরিত অবস্থায় অন্তঃকরণ-সম্বলিত স্থূলদেহে আমি দেহী, আমি শরীরী, আমি স্থূল, আমি কৃশ, এইরূপে জীবের অভিমান হইয়া থাকে, সুতরাং সেই অবস্থায় স্থূল শরীরকেই জীবের উপাধি বলিতে হয় এবং অন্তঃকরণ-সংযুক্ত স্থূলদেহেই জীব তখন প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, একই জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় তিনটি বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে। সুষুপ্তি-অবস্থার উপাধি অবিদ্যা, স্বপ্নাবস্থার উপাধি

১। অংশেত্যাদ্যসূত্রে জীবস্য অংশত্বং ঘটাকাশস্যেব উপাধ্যবচ্ছেদবুদ্ধ্যা উক্তং, সম্প্রতি এবকারেণ অবচ্ছেদপক্ষারুচিং সূচয়ন্ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং প্রতিবিম্বপক্ষমুপন্যস্যতি ভগবান্ সূত্রকারঃ আভাস এব চেতি। ভাষ্যরত্ন-প্রভা, ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০

অন্তঃকরণ, জাগরিত-অবস্থার উপাধি স্থূল দেহ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাধিভেদে জীবের ভেদ যখন অবশ্য স্বীকার্য, তখন একই জীবের বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উপাধি (অবিদ্যা, অন্তঃকরণ ও স্থূল-শরীর) অঙ্গীকার করায়, একই শরীরে তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির জীব অবস্থান করিতেছে, এইরূপে অবস্থাভেদে জীবভেদের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে না কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত ত্রিবিধ উপাধি পরস্পর অসংযুক্ত ও পৃথক্ হইলে, জীবভেদের আপত্তি আসে বটে, আমাদের মতে ঐ উপাধি তিনটি পরস্পর পৃথক্ বা বিযুক্ত নহে, উহারা অপৃথক্ এবং অবিযুক্ত। সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থায় জীব পূর্ব অবস্থার উপাধিটি পরিত্যাগ না করিয়াই পরবর্তী অবস্থার অপর একটি উপাধির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। সুষুপ্তি-অবস্থার অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত থাকিয়াই জীব স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত হয়; এবং অবিদ্যা ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বয় যুক্ত হইয়াই জীব জাগরিত-অবস্থায় স্থূল শরীরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জীবভেদের প্রশ্ন আসে না। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীব যখন জাগরিত-অবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন সে স্থূলদেহের অভিমান পরিত্যাগ করে, স্বপ্ন-অবস্থা হইতে যখন সুষুপ্তির আনন্দে মগ্ন হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের অভিমানও পরিত্যক্ত হয় এবং অবিদ্যা-প্রতিবিম্বরূপেই জীব অবস্থান করে। অবিদ্যা-উপাধি সকল অবস্থায়ই জীবের বিদ্যমান আছে। অবিদ্যাই জীব ও ব্রহ্মের একমাত্র ভেদক, সুতরাং অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্ব জীব এই সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব, এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। জীব অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রতিবিম্ব হইলেও অবিদ্যার পরিণাম অন্তঃকরণই জীবভাবের প্রধান অভিব্যক্তি-স্থান, ইহা নিঃসন্দেহ। সূর্যকিরণ সর্বত্র প্রসারিত হইলেও দর্পণে যেমন তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্ত-দর্পণে চিৎপ্রতিবিম্ব জীবের অত্যধিক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে বলিয়াই অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বকে জীব বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অজ্ঞান-প্রতিবিম্ব জীব, এই মত প্রত্যাখ্যাত হয় না এবং এই উভয় মতের মধ্যে কোন বিরোধও দেখা যায় না।

আমরা জীবের স্বরূপ আলোচনা করিলাম। এখন জগতের স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে। আচার্য শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মেরই বিভাব। ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরিণামে ব্রহ্মেতেই তাহার লয় হইয়া থাকে। জগৎ দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন এবং কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মিথ্যা, সুতরাং সসীম, পরিচ্ছিন্ন জগৎও মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, ইহার অর্থ কি?

জগৎ ও তাহার মিথ্যাত্ব

শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ মায়াময়। মায়াময় হইলেও জগৎ তাঁহার মতে মৃগতৃষ্ণিকার মত অলীক নহে। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাবহারিক জগতের সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আচার্য শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতবাদ নিরাস-প্রসঙ্গে জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার

করিয়াছেন।[১] যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন ক্রিয়াশীল আছে এবং ইন্দ্রিয়-সকল তাহাদের স্ব স্ব বিষয় দর্শন করিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত (লৌকিক) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের জ্ঞেয় জগৎপ্রপঞ্চ আছে বুঝিতে হইবে। আত্মবিচারের ফলে মনের বিলয় সাধিত হইলেই দ্বৈতজগতের নিবৃত্তি হইবে। "মনসোহ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে (মাঃ কাঃ ৩।৩১) এবং তখনই জগৎ মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবে। এই জগৎ ব্রহ্ম-কার্য। অদ্বৈতবেদান্তের মতে কার্য কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নহে। ইহার তাৎপর্য এই যে, কারণের সত্তা-নিবন্ধনই কার্যের সত্তা। কারণের যেরূপ স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, কার্যের সেইরূপ কোন স্বাধীন সত্তা নাই। কার্যের স্বাধীন সত্তা বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বেদান্তদর্শনে নিষিদ্ধ হইয়াছে—ভোগ্যভোক্তৃপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্, (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ২।১।১৪) এবং এই দৃষ্টিতেই কার্যবর্গ মিথ্যা বলিয়া বেদান্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জগৎ-সত্যতাবাদী নৈয়ায়িকগণ যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা ও কার্য ঘট, এই দুই-এরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, অদ্বৈতবেদান্তীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের মতে মৃত্তিকার সত্তা দ্বারাই ঘটসত্তা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। মাটিকে বাদ দিয়া ঘটের কোন অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং ঘট স্বতন্ত্র সদ্‌বস্তু নহে। মৃত্তিকার উহা বিকৃত রূপ। মাটিকে জানিলেই ঘটকেও জানা যায়। মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটের যে একটি স্বতন্ত্র নাম ও রূপ আছে, তাহা দ্বারা ঘটের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। উহা মাটির বিভিন্ন অবস্থার পরিচায়কমাত্র। কারণ হইতে কার্যের স্বতন্ত্র সত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জগৎকারণ ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কার্য-জগতের কোন স্বাধীন সত্তা নাই। ইহাই আচার্য শঙ্করের মতে জগতের মিথ্যাত্বের রহস্য।[২]

এই প্রসঙ্গে ইহাও আলোচ্য যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেমন করিয়া কার্যবর্গরূপে, জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন? পরমেশ্বরের যে সিসৃক্ষাবৃত্তি বা জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, সেই সৃজনী-বৃত্তিবশতঃ এক আত্মা বা ব্রহ্ম বহু নামে বহু রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। "একো'হং বহু স্যাম্" এক আমি, বহু হইব, ঈশ্বরের এইরূপ সৃজনী-বৃত্তিই মায়া। এই মায়া পরমেশ্বরেরই শক্তি। ইহাই সংসারপ্রপঞ্চের বীজ। ইহাই বিশ্বজননী প্রকৃতি। অবিদ্যা-রূপ এই বীজশক্তি প্রলয়কালে অব্যক্তভাবে পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে।

ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব?

১। প্রাক্ চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যানৃতব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।১।১৪

উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যো'র্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চোপলভ্যমানস্যৈবাভাবো ভবিতুমর্হতি। যথাহি কশ্চিদ্ ভুঞ্জানো ভুজিক্রিয়াসাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়মনুভূয়মানায়ামেবং ব্রূয়ান্নাহং ভুঞ্জে ন বা তৃপ্যামীতি, তদ্বদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহমুপলভে ন চ সো'স্তীতি ব্রুবন্ কথমুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।২।২৮

২। নহি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্বা অস্তি। ছাঃ ভাষ্য, ৬।১।২

সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতংস্বতস্তু অনৃতমেব সতো'ন্যত্বে অনৃতত্বম্। ছাঃ ভাষ্য, ৬।১।২

জগৎপ্রপঞ্চ মায়ার গর্ভে বিলীন থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই প্রকৃতি সৃজনীশক্তিরূপে যখন আত্মপ্রকাশ লাভ করে, তখন পরমেশ্বর মায়ার উদরে বিলীন জগৎ আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। মায়াশক্তিমান্ ব্রহ্মই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হন।[১]

মায়াধীশ পরমেশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ। ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায়ই মায়ার বিকাশ হইয়া থাকে এবং এই মায়ার সহায়তায় তিনি চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। নির্বিশেষ পরব্রহ্ম মায়ার এবং মায়িক নাম-রূপ-প্রপঞ্চের একমাত্র অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এক ব্রহ্মই বহু হইয়াছেন, বহু নামে বহু রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহার এই ভাতি বা প্রকাশের দ্বারা তিনি কিছুমাত্র রূপান্তরিত বা বিকৃত হন নাই, সম্পূর্ণ অবিকারী ভাবেই অজ্ঞানলীলার ভিত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্ম-ভিত্তি সদা বিদ্যমান আছে বলিয়াই মায়ার এরূপ বিচিত্র খেলা চলিতেছে এবং মায়িক জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই অবিকারী কূটস্থ ব্রহ্মই জড় জগতের অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ। এই অপরিণামী উপাদানকারণকে আশ্রয় করিয়া অনির্বচনীয় অবিদ্যা বিবিধ অনির্বচনীয় নামরূপে পরিণত হইতেছে, সুতরাং অবিদ্যা জড়জগতের পরিণামী উপাদান।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ

ব্রহ্ম কেবল জগতের নিমিত্তকারণই নহেন। তিনি নিমিত্তকারণও বটেন, উপাদানকারণও বটেন। ইহাই সূত্রকার এবং ভাষ্যকার স্পষ্টবাক্যে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩)। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।৪।২৩)। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতিকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তে এক ব্রহ্মকে জানিলেই বিশ্বের তাবৎ বস্তু জানা যায় বলিয়া (এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা) যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মকে উপাদানকারণরূপে গ্রহণ করিলেই সম্ভবপর হয়, নতুবা হয় না। কেননা, এক উপাদানকে জানিলেই উপাদানের বিবিধ বিকারকে জানা যায়। কারণ, বিকারগুলি উপাদানেরই অবস্থান্তরমাত্র। তারপর, ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (মুঃ ২।২।১১), আত্মৈবেদং সর্বম্ (ছাঃ ৭।২৫।২), ঐতদাত্ম্যমিদম্ সর্বম্ (ছাঃ ৬।৮।৭) এই সকল শ্রুতিতে বিশ্বের নিখিল বস্তুকেই যে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও ব্রহ্মের উপাদানকারণতাই সমর্থিত হইয়া থাকে।

১। সর্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য আত্মভূত ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চবীজভূতে সর্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।১৪

অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপ-প্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। তদেতদব্যক্তং ক্বচিদাকাশশব্দনির্দিষ্টং ক্বচিন্মায়েতি সূচিতম্, অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ১।৪।৩

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতিমূলে (তৈত্তি: ৩।১) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) এই সূত্রে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও 'যতঃ' এই পঞ্চমী বিভক্তি 'জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ' (পাঃ সূঃ ১।৪।৩০) এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারায় বিহিত হওয়ায়, 'যতঃ' শব্দে (শ্রুতিস্থ 'যৎ', শব্দে) প্রকৃতি বা উপাদানকেই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মকে যে জগদ্‌যোনি বলা হইয়াছে তাহা দ্বারাও ব্রহ্ম উপাদানকারণ এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। অবশ্যই তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় তত্তেজোঽসৃজত (ছাঃ ৬।২।৩), স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজত (ঐতঃ ১।১।১) এই সকল শ্রুতিবাক্যে জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর প্রথমতঃ দেখিলেন, পরে সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ যে পরমেশ্বরের বীক্ষণ অর্থাৎ দর্শনপূর্বক সৃষ্টি করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা পরমেশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ ইহা মনে আসাই স্বাভাবিক। কারণ দেখা যায় যে, যিনি কাজ করেন, সেই কর্তাই প্রথমতঃ দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজটি করেন। ঐ কর্তা কার্যের নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ নহেন। জগৎসৃষ্টির ব্যাপারেও প্রথমতঃ এইরূপ বীক্ষণ বা দর্শনের কথা আছে বলিয়া জগৎকর্তা পরমেশ্বরও কুম্ভকার প্রভৃতির ন্যায় নিমিত্তকারণই হইয়া দাঁড়ান। নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন এইরূপই দেখা যায়। মাটি ঘটের উপাদানকারণ, কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। এইরূপে নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণের ভেদ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তখন একই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়বিধ কারণ বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বেদান্তী বলেন যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটাদি সৃষ্টিতে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদানকারণ বিভিন্ন হইলেও বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে যখন এক বৈ আর দ্বিতীয় কিছু ছিল না, তখন সেই এককেই বিশ্বসৃষ্টির উপাদানও বলিতে হইবে, নিমিত্তও বলিতে হইবে। এই দৃষ্টিতেই বেদান্তে ব্রহ্মকে নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ বলা হইয়া থাকে।

জগৎপ্রসবিনী মায়ার প্রভাবে পরমাত্মা নামরূপাদির বিকাশ করিয়া ঐ নাম ও রূপের অন্তরালে নিজকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, অসীম তিনি নামরূপের সীমার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনিই একমাত্র আলোক, তাঁহার প্রকাশের দ্বারায়ই নাম, রূপের প্রকাশ হইতেছে। তিনি নাম, রূপের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বিরাজ করিতেছেন। জীবের বিভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছে না। জীবের দৃষ্টিতে কেবল নামরূপাত্মক জগৎই ধরা পড়িতেছে এবং জগতের মধ্য দিয়া যাহার প্রকাশ হইতেছে, সেই জগদাত্মার স্বরূপটি যথাযথভাবে দেখা যাইতেছে না, বরং তাঁহার বিকৃত রূপই দেখা যাইতেছে। ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য। ভ্রমজননী এই অবিদ্যা জীবের বুদ্ধির ও দৃষ্টির তিরস্করণী। ইহাই মায়ার আবরণশক্তি। জগজ্জননী অবিদ্যা বা মায়া ইহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহাই জগদ্‌বীজ, নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের জননী। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বিচিত্র নামরূপাত্মক জগতের বিকাশ, মায়ার বিক্ষেপশক্তির কার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগৎ শঙ্করবেদান্তের মতে জীবের বিজ্ঞানমাত্র বা মানসকল্পনাপ্রসূতই নহে। ব্যাবহারিক জীবনে পরমেশ্বর-সৃষ্ট জগতের

মায়া ও অবিদ্যা

সত্যতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জগতের অন্তরালে উহার আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনিই সূত্র, সেই পরমাত্ম-সূত্রে নিখিল বিশ্ব গ্রথিত আছে। নিত্য চিন্ময় অধিষ্ঠানের বুকে নাম-রূপাদি বিকার আসিতেছে, যাইতেছে, ভাসিতেছে, পড়িতেছে। অধিষ্ঠানটি কিন্তু অবিকারী, তাঁহার কোন বিকার নাই। তাঁহার সহিত নামরূপাত্মক বিকারকে আমরা অভিন্ন করিয়া নিয়াছি, মিশাইয়া ফেলিয়াছি। ফলে, নামরূপের অন্তরালে যে নামরূপের অতীত অরূপ, অবিকারী পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম প্রতিভাত হইতেছেন না, নামরূপই প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই অধ্যাস বা অবিদ্যা। এই অধ্যাসের ফলে নামরূপাত্মক বিকারগুলি আমাদের দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে—নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী (বৃহদাঃ ভাঃ ৩।৫।১) এবং এই বিকারগুলি স্বতন্ত্র বস্তুরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। এই ভাতি এবং এইরূপ দৃষ্টি প্রকৃত দৃষ্টি নহে, ইহা কুদৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে যখন জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হয়, মিথ্যা দৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন আর এই অধ্যাস থাকে না। নামরূপাত্মক জগতের অন্তরালে ব্রহ্মচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জগৎ তখন স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয় না, পরব্রহ্মের মায়িক অভিব্যক্তি-রূপেই, ব্রহ্মের "আত্মভূত" বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। জগদ্দৃষ্টির পরিবর্তে সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরই উদয় হয়। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, এই জ্ঞান ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান। এই মায়া ও অবিদ্যাকে বলা হইয়াছে "ঈশ্বরের আত্মভূত" অর্থাৎ ইহা পরমেশ্বরেরই শক্তি-স্বরূপ। মায়া ও অবিদ্যা শঙ্করের মতে বস্তুতঃ অভিন্ন। মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী।

অবিদ্যা ভাবস্বরূপ ও অনির্বচনীয়

সুতরাং অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে শঙ্করবেদান্তের মতে বিদ্যা বা জ্ঞানের অভাবস্বরূপ বলা চলে না। ইহা ভাবস্বরূপ (Positive) ও বস্তুভূত। অবিদ্যাই জগৎ-সংসারের মূল কারণ, জগতের বীজশক্তি, সুতরাং ইহাকে অসৎ বলা যায় কিরূপে? অবিদ্যাকে যেমন অসৎ বা অভাবস্বরূপ বলা যায় না, সেইরূপ সদ্‌বস্তু বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। কেননা, যাহা সৎ তাহা চিরদিনই আছে এবং থাকিবে, তাহার কখনও বিনাশ হয় না, হইতে পারে না। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে, সুতরাং অবিদ্যা সদ্‌বস্তু নহে। অবিদ্যার প্রতীতিকালে উহা সত্য বলিয়াই মনে হয়, সুতরাং উহা অংশতঃ সৎ বটে, আবার বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া উহা অংশতঃ অসৎও বটে। যাহা সৎও বটে, অসৎও বটে, তাহাকে অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় 'অনির্বাচ্য' বলা হইয়া থাকে। অনির্বাচ্য অর্থ, ইহাকে সদ্রূপে বা অসদ্রূপে কোনরূপেই নির্বাচন করা চলে না। অবিদ্যা বেদান্তের মতে সদ্রূপও নহে, অসদ্রূপও নহে, সদসদ্রূপও নহে। এই জন্যই অবিদ্যা 'অনির্বচনীয়' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবিদ্যা যেমন অনির্বচনীয়, অবিদ্যাকার্য নামরূপাত্মক জগৎও সেইরূপ অনির্বচনীয়, অবিদ্যামূলে যে অধ্যাস বা মিথ্যাদৃষ্টির উদয় হয় তাহাও অনির্বচনীয়। মিথ্যাদৃষ্টিকে শঙ্করবেদান্তে "অনির্বাচ্যখ্যাতি" নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। যাহা অনির্বচনীয় তাহাই মিথ্যা। মায়াও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, একমাত্র অদ্বয় পরব্রহ্মই সত্য। আমাদের

বুদ্ধির দোষে, ইন্দ্রিয়দোষেই ঐ সকল ভ্রান্ত দৃষ্টির উদয় হয়। কামলা রোগে সমস্ত বস্তুই হলুদবর্ণ দেখায়। উহা চক্ষুরই রোগ, চক্ষুর দোষেই কামলা রোগী সম্মুখস্থ বস্তু হলুদবর্ণ দেখে। কামলা যেরূপ চক্ষুর দোষ, অবিদ্যাও সেইরূপ বুদ্ধির দোষ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দোষেই দৃষ্ট বস্তুকে প্রকৃতভাবে গ্রহণ না করিয়া, লোকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দোষ আমাদের বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়েরই সহজাত। অবিদ্যাকে আত্মার ধর্ম বা গুণ মনে করা অত্যন্ত ভুল। কেননা, আত্মার ধর্ম হইলে আত্মার উচ্ছেদ ব্যতীত, অবিদ্যার উচ্ছেদ কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। যে-বস্তুর যেইটি স্বাভাবিক ধর্ম, সেই বস্তুর উচ্ছেদ সাধন না করিয়া, সেই ধর্মের উচ্ছেদ করা যায় না।[১] অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়ের দোষ, ইহাই যদি সাব্যস্ত হয়, তবে বুঝা যায় যে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি অবিদ্যাবশতঃই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। যাহা দেখে, তাহা বস্তুর বিকৃত রূপ বা মিথ্যারূপ। ঐ মিথ্যারূপ যতক্ষণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের খেলা আছে, ততক্ষণই সত্য বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দৃষ্টি দুই প্রকার, লৌকিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি। লৌকিক দৃষ্টি দৃশ্যবস্তুর বাহ্যরূপকে লইয়াই উৎপন্ন হয়। এই দৃষ্টি স্থূল ও অনিত্য। পরমার্থ দৃষ্টি কিন্তু এরূপ নহে। পরমার্থ দৃষ্টি দৃশ্যবস্তুর অন্তরবিহারী নিত্য কারণবস্তুকে (ব্রহ্মবস্তুকে) লইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্বত্র ব্রহ্ম-সত্তারই এই দৃষ্টিতে স্ফুরণ হয়। জ্ঞানচক্ষুতে এই দৃষ্টির বিকাশ। আর্ষবিজ্ঞানে ইহার পরিণতি। এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেই বস্তুজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; বস্তুপরিচ্ছিন্ন সসীম জ্ঞান অসীমের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। যে-পর্যন্ত অজ্ঞানের আবরণ থাকে, সেই পর্যন্ত এই পরিপূর্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না। অজ্ঞানের আবরণ বিলীন হইলেই ঐ নিত্য জ্ঞানের উদয় হয়। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন সুস্থির হয়। অনিত্য দৃষ্টির মধ্য দিয়া নিত্যের সন্ধানই প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এই সন্ধানেই ব্যস্ত। যে-পর্যন্ত মায়ামুগ্ধ জীবের দৃষ্টিবিভ্রম অপনীত না হইবে, সেই পর্যন্ত নিত্য আত্মদর্শনের উদয় হইবে না। সর্বত্র ব্রহ্মভাবনা দৃঢ় হইলেই দৃষ্টিবিভ্রম বা মিথ্যাদৃষ্টি অপনীত হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উদিত হইবে। তখন জীব ও জগৎদৃষ্টি থাকিবে না। সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। ইহাই বেদান্তসেবার চরম ফল। এই ফল লাভ হইলেই জীবন ও জগৎ মধুময় হয়। এই ফলে কর্মের কোন অপেক্ষা নাই। কর্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই ফললাভে সহায়তা করে না। নিষ্কাম কর্ম চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়তা করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠার ফলেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদয় হয়।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞান

১। এবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্মোঽবিদ্যা, ন, করণে চক্ষুষি তৈমিরিকত্বাদিদোষোপলব্ধেঃ। ------ যথাকরণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনাৎ ---- সর্বত্রৈব অগ্রহণ-বিপরীতগ্রহণ-সংশয়াদি-প্রত্যয়াস্তন্নিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিদ্ ভবিতুমর্হন্তি, ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য। গীতা শং ভাষ্য, ১৩।২

দশম পরিচ্ছেদ

পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির বেদান্তমত

আচার্য শঙ্করের পর শঙ্করোক্ত অদ্বৈতবাদকে যাঁহারা পরিপূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আচার্য পদ্মপাদ, মণ্ডনমিশ্র, সুরেশ্বরাচার্য, সুরেশ্বরাচার্যের শিষ্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি এবং বাচস্পতিমিশ্র এই কয়জনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই প্রায় একই সময়ে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতককে অদ্বৈতবাদের 'স্বর্ণযুগ' বলা যাইতে পারে। এই সকল ধুরন্ধর দার্শনিকগণের প্রতিভার অমল জ্যোতিতে শঙ্করবেদান্তের তমসাচ্ছন্ন পথ সুগম হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তের পূর্ণরূপ দান করিলেও মায়া, অবিদ্যার স্বরূপ, জীব, জগতের স্বভাব, ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে শঙ্করের সিদ্ধান্তেও নানারূপ সন্দেহের অবকাশ লক্ষিত হয়। কারণ, শঙ্করের লিখিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে ঐ সকল বিষয়ে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা সব সময় অতিশয় পরিষ্কার ও সন্দেহের অতীত নহে। এইজন্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে শঙ্করবেদান্তের অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ বিষয়ের সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ সদুত্তর প্রদান করিয়া অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তাসৌধকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের মৌলিক চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী যুগে রাশি রাশি গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে। অতএব অদ্বৈতবেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে হইলে, এই সকল যুগপ্রবর্তক দার্শনিকগণের মতবাদ সর্বপ্রথমেই আলোচ্য। উল্লিখিত বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে আচার্য পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতেই গ্রন্থরচনার প্রেরণাও লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর মত শিষ্যের গ্রন্থে যে সমধিক প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইজন্য প্রথমতঃ পদ্মপাদাচার্য-কৃত পঞ্চপাদিকায় শঙ্কর-বেদান্তমত যেভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। পদ্মপাদ শঙ্করাচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য। ইহার অপর নাম সনন্দন। দাক্ষিণাত্যের চোলদেশে সনন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। গুরুর প্রতি সনন্দনের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। একদিন নদীর অপর পার হইতে গুরুদেব তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি গুরুর নাম স্মরণ করিয়া নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হন, তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে এক একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, এইজন্যই উহাকে পদ্মপাদ বলা হইয়া থাকে। পদ্মপাদ গোবর্ধনমঠের মঠাধীশ ছিলেন। গুরুর আদেশে পদ্মপাদ শঙ্কররচিত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ঐ ব্যাখ্যাই পঞ্চপাদিকা। পঞ্চপাদিকা

পদ্মপাদের পরিচয়

নাম শুনিয়া ইহাতে পাঁচটি পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে, এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে যে আকারে ইহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চপাদিকায় ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চার সূত্রের ব্যাখ্যামাত্র পাওয়া যায়। মাধবাচার্য-কৃত শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়-গ্রন্থে দেখা যায় যে, পঞ্চপাদিকায় একটি শেষ অংশ ছিল, ঐ অংশটির নাম ছিল বৃত্তি।[১] এই বৃত্তির এখন আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পঞ্চপাদিকা সম্বন্ধে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদ্মপাদ গুরুর আদেশে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং লিখিত পঞ্চপাদিকা টীকাখানি রামেশ্বরে তাঁহার মাতুলালয়ে রাখিয়া যান। পদ্মপাদের মাতুল প্রভাকর-মতাবলম্বী মীমাংসক ছিলেন। প্রভাকরের মত পদ্মপাদের টীকায় প্রগাঢ় যুক্তিতর্কের সহিত খণ্ডিত হইয়াছিল। এই টীকা প্রকাশিত হইলে প্রভাকর-মীমাংসার জ্যোতিঃ ম্লান হইবে আশঙ্কা করিয়া, পদ্মপাদের মাতুল গৃহদাহব্যপদেশে টীকাখানি বিনষ্ট করেন। পদ্মপাদ তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া মাতুলালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানিতে পারেন যে, তাঁহার রচিত টীকাখানি বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি পুনরায় গ্রন্থ লিখিবার অভিমত প্রকাশ করিলে, তাঁহার মাতুল বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে পাগল করিয়া দেন। পাগল পদ্মপাদ শঙ্করাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলে, শঙ্কর তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। পদ্মপাদ গ্রন্থখানি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে, আচার্য বলিলেন যে, তুমি তোমার গ্রন্থখানির ব্রহ্মসূত্র-চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা পর্যন্ত লিখিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলে, তাহা সকলই অবিকল আমার মনে আছে। তুমি আমার নিকট হইতে উহা লিখিয়া লও। গুরুর আদেশে পদ্মপাদ তাহা লিখিয়া লইলেন।[২] ইহাই বর্তমান পঞ্চপাদিকা। ধন্য আচার্যের স্মৃতিশক্তি।

পঞ্চপাদিকা

পঞ্চপাদিকা শঙ্কর-বেদান্তের অতি উপাদেয় নিবন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পদ্মপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যোক্তির তাৎপর্য যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব। পঞ্চপাদিকা ভাষ্যের যথার্থ আলোক। ঐ আলোক-বর্তিকা প্রতিভার স্নেহনিষেকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছেন প্রকাশাত্মযতি।[৩] প্রকাশাত্মযতির পঞ্চপাদিকা-বিবরণ পঞ্চপাদিকার

১। যৎ পূর্বভাগঃ কিল পঞ্চপাদিকা তচ্ছেষগা বৃত্তিরিতি প্রথীয়সী। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় ৭০-৭১ শ্লোক।

২। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় ১৬৭-১৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন যে পদ্মপাদের যে টীকাখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহার নাম ছিল বেদান্তডিণ্ডিম, ঐ বেদান্তডিণ্ডিম নামক টীকারই চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা বর্তমান পঞ্চপাদিকা।

৩। প্রকাশাত্মযতির কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীর জীবনের পরিচয় পাওয়া অতি কঠিন। তিনি অনন্যানুভবের শিষ্য বলিয়া বিবরণের প্রারম্ভে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন —অর্থতো'পি ন নাম্নৈব যো'নন্যানুভবো গুরুঃ। প্রকাশাত্মযতি বিদ্যারণ্যের পূর্ববর্তী। বিবরণের ব্যাখ্যানশৈলী অনুসরণ করিয়াই বিদ্যারণ্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ রচনা করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য ন্যায়মকরন্দ রচনা করেন। ন্যায়মকরন্দে বিবরণমত উদ্ধৃত হইয়াছে, (ন্যায়মকরন্দ ১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সুতরাং প্রকাশাত্মযতির জীবৎকাল খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতক বলা যাইতে পারে।

অতি প্রাঞ্জল এবং মনোরম টীকা। বিবরণের সাহায্য ব্যতীত পদ্মপাদের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অতি কঠিন। এইজন্যই পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের বেদান্তমত একযোগে আলোচনা করা যাইতেছে। পঞ্চপাদিকায় যাহা বীজরূপে বর্তমান, বিবরণে তাহাই বিশালকায় মহীরুহে পরিণত হইয়া, দার্শনিকগণের বিস্ময়-বিমুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং প্রকাশাত্মযতির দান অতুলনীয়। তাঁহার মতবাদের স্বাতন্ত্র্যও অতি স্পষ্ট। তাঁহার বেদান্ত-ভাবপ্রবাহ "বিবরণ প্রস্থান" নামে স্বতন্ত্র প্রস্থানে পরিণতি লাভ করিয়াছে। পঞ্চপাদিকা নয়টি বর্ণকে বিভক্ত। বর্ণক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। পঞ্চপাদিকার দার্শনিক তত্ত্ব নয়টি বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং এক একটি ব্যাখ্যা এক একটি বর্ণক নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম বর্ণকে অধ্যাসের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ণকে ধর্মজিজ্ঞাসা বা কর্মজিজ্ঞাসা ব্যতীতই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয় বর্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ বর্ণকে আত্মার স্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় আত্মবাদ বিরোধী মত-নিরাসপূর্বক সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ণকে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করার চেষ্টা হইয়াছে। ষষ্ঠ বর্ণকে ব্রহ্ম হইতে বেদাদিশাস্ত্রের উদ্ভব বর্ণিত ও সমর্থিত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম বর্ণকে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করাই যে অধ্যাত্ম শব্দের তাৎপর্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানে শাস্ত্রই প্রমাণ, এই মত সমর্থিত হইয়াছে। নবম বর্ণকে বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চপাদিকা ও পঞ্চপাদিকা-বিবরণের দার্শনিক মত।

অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ অধ্যাসের কথাই মনে আসে। অধ্যাসই সমস্ত মিথ্যা ব্যবহারের মূল। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অনাদি অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সত্য চৈতন্যময় আত্মা ও মিথ্যা জড়বস্তুর পরস্পর মিলনের ফলে জীবের "অহমিদম্" "মমইদম্" এইরূপ মিথ্যা আত্মাভিমানের উদয় হইতে দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, লোকে আমিত্বের এই মিথ্যা অভিমানকে সত্য এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে, অজ্ঞানমূলক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। বেদান্তশাস্ত্র সর্বপ্রকার অনর্থের মূল এই অজ্ঞানকে বিদূরিত করিয়া এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করে, সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদান্তশাস্ত্র-সেবা একান্ত আবশ্যক।[১] ভাষ্যকারের ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পদ্মপাদ বলিলেন —ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায় যে, এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবিজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রের

অধ্যাসের সূচনা

১। সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি জায়তে নৈসর্গিকো লোকব্যবহারঃ। অধ্যাস শং ভাষ্য, ১৬-১৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।
অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। অধ্যাস শং ভাষ্য, ৪৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

বিষয় এবং অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক বৃথা আত্মাভিমান এবং ঐ অভিমানের ফলে আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা বলিয়া লোকে যে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে, ঐরূপ মিথ্যা প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। এখন কথা এই যে, জ্ঞান কেবল অজ্ঞানকেই নিবৃত্তি করিতে পারে। ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। আত্মাকে কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া লোকে যে প্রত্যক্ষ করে, এই প্রত্যক্ষজ্ঞান সত্য নহে, মিথ্যা, যথার্থ জ্ঞান নহে, অজ্ঞান, ইহা প্রমাণিত হইলেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় আত্মবিজ্ঞান, ঐ মিথ্যা জ্ঞানকে নিবৃত্ত করিতে পারে এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান সুস্থির হয়। এইজন্যই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভে সর্বাগ্রে অধ্যাস বা অবিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, গুণাতীত আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বোধ যে অনাদি অজ্ঞানেরই খেলা, তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য যে সত্য চৈতন্য ও মিথ্যা জড়বস্তুর মিলনের কথা বলিলেন (সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য) ইহা তো অসম্ভব কথা। চৈতন্য ও জড় আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর বিরোধী, ইহাদের মিলন হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে জড় ও চৈতন্যের মিলন অসম্ভবই বটে, কিন্তু মানুষ মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ (মিথ্যা'জ্ঞাননিমিত্তঃ) এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া লইয়াছে। জড় ও চৈতন্যকে মিলিত করিয়া চৈতন্যের ধর্ম জড়ের এবং জড়ের ধর্মকে চৈতন্যের মনে করিয়া, স্মরণাতীত কাল হইতে জড় ও চৈতন্যের কল্পিত বিকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় অধ্যাস। এই অধ্যাসকে ভাষ্যকার মিথ্যা অজ্ঞানমূলক (চিদচিদ্‌গ্রন্থি) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্তির ব্যাখ্যায় আচার্য পদ্মপাদ বলিয়াছেন যে, এখানে মিথ্যা শব্দের অর্থ অনির্বচনীয়, আর অজ্ঞান শব্দের অর্থ জড় অবিদ্যাশক্তি। ফলে, অনির্বচনীয় অবিদ্যাশক্তিই অধ্যাসের উপাদান ইহাই বুঝা গেল।[১] অধ্যাস অজ্ঞানমূলক হইলেও ইহাকে নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ইহাই অধ্যাসের বৈচিত্র্য। চৈতন্যময় আত্মা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ হইলেও, অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইয়া থাকেন। এইজন্যই আত্মার স্বাভাবিক স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দরূপটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না। তাঁহার আধ্যাসিক "অহং" "মম", "আমি আমার" এইরূপ অভিমান-কলুষিত বিকৃত রূপই প্রতিভাত হয়[২] এবং তাহা সত্য বলিয়াও মনে হয়। আত্মার অহংবোধ, মমত্ববোধ যদি সত্য হয়, তবে যে সকল বিষয়বস্তুতে মমত্ববোধের উদয় হইবে, তাহাও সত্যই হইবে; পক্ষান্তরে, ঐ মমত্ববোধ যদি মিথ্যা হয়, তবে উহার

১। মিথ্যাচ তদজ্ঞানঞ্চ মিথ্যা'জ্ঞানম্। মিথ্যেতি অনির্বচনীয়তা উচ্যতে, অজ্ঞানমিতি জড়াত্মিকা অবিদ্যাশক্তিঃ। তন্নিমিত্তস্তদুপাদান ইত্যর্থঃ। পঞ্চপাদিকা, ৪ পৃঃ।

২। প্রত্যগাত্মনি তু চিতিস্বভাবত্বাৎ স্বয়ম্প্রকাশমানে ব্রহ্মস্বরূপানবভাসস্য অনন্যনিমিত্তত্বাৎ তদ্‌গত-নিসর্গসিদ্ধাবিদ্যাশক্তিপ্রতিবন্ধাদেব তস্য অনবভাসঃ। অতঃ সা প্রত্যক্‌চিতিঃ ব্রহ্মস্বরূপাবভাসং প্রতি-বধ্নাতি অহঙ্কারাদ্যতদ্রূপপ্রতিভাসনিমিত্তঞ্চ ভবতি। পঞ্চপাদিকা, ৫ পৃঃ।

বিষয়ও মিথ্যা হইবে। কারণ, স্বপ্নরাজ্যের রাজা যেমন মিথ্যা, সেইরূপ তাঁহার সমস্ত রাজোপকরণও মিথ্যা। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন রাজাও থাকে না, রাজোপ-করণও থাকে না, সেইরূপ জীবের যে অনাদি মোহনিদ্রা চলিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে সে যে নিজকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা বলিয়া বুঝিতেছে এই বোধও থাকিবে না, তাঁহার ভোগ্য জগৎও থাকিবে না। সমস্ত এই বিশ্বনাটকের অভিনয়ই ইন্দ্রজালের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে-পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইবে, সে-পর্যন্তই এই অধ্যাস বা অবিদ্যার খেলা চলিবে।

অধ্যাসের লক্ষণ

অধ্যাস কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, পূর্বের দেখা কোন বস্তুর অন্য কোন বস্তুতে যে ভাতি বা প্রকাশ তাহাই অধ্যাস—'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' (ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাষ্য)। এই অধ্যাস পদ্মপাদাচার্যের মতে স্মৃতি নহে, তবে "স্মৃতির মত" (স্মৃতিরূপঃ) অর্থাৎ স্মৃতি যেমন সংস্কারজন্য, মিথ্যা জ্ঞানও সেইরূপ পূর্বসংস্কারজন্য, বিশেষ এই যে, স্মৃতির যাহা বিষয় অর্থাৎ যে বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা স্মরণ কর্তার সম্মুখে উপস্থিত থাকে না, কিন্তু ভ্রমের বিষয় রজতাদি বস্তু ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এইজন্যই ভ্রমজ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি নহে। আচার্য পদ্মপাদের মতে কোনরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত ভ্রম হইতে পারে না। রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ে সাপের ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই অনাদি অনির্বচনীয় অবিদ্যাবিভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। অনাদি-বিভ্রমবশতঃ এক ব্রহ্ম নানারূপে, জীব ও জগৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।[১] ব্রহ্ম প্রত্যক্ষগোচর নহে, স্থূলও নহে, এইরূপ অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম আবিদ্যক ভ্রমের অধিষ্ঠান হইবেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যে-সকল বস্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও স্থূল তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই যে ভ্রমজ্ঞানের উদয় হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। আকাশ তো প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, স্থূলও নহে, অথচ আকাশ মলিন, আকাশ নীল, নীল আকাশের তল, আকাশকে অবলম্বন করিয়াও এইরূপ কত প্রকার ভ্রান্তবোধের উদয় হইতে দেখা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে-সকল বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সাবয়ব তাহাদের কতক অংশ প্রত্যক্ষ হইল, কতক অংশ প্রত্যক্ষ হইল না, এইরূপ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির দোষে এক বস্তু অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ব্রহ্ম চিন্ময়, নিরবয়ব, নির্লেপ, স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ। এইরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা বুদ্ধির উদয় হইতে পারে কিরূপে? ইহার উত্তরে পদ্মপাদ বলেন যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অজ্ঞ লোকেরা অনাদি অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দময় এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, অবিদ্যাই ব্রহ্মের তিরস্করণী। এই তিরস্করণী ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটি অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিপথ হইতে ঢাকিয়া রাখে এবং তাহার পরিবর্তে অজ্ঞ জনের কর্ম, অদৃষ্ট ও সংস্কারের অনুরূপ বিবিধ অবিদ্যাকল্পিত বিচিত্র ব্রহ্মচিত্র উহাদিগকে আঁকিয়া দেখায়। অজ্ঞানীরা অবিদ্যা-আবৃত ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না, অজ্ঞানচিত্রিত চিত্রসমূহই প্রত্যক্ষ করে এবং

১। পঞ্চপাদিকা, ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা।

উহাদিগকে সত্য বলিয়া মনে করে। ইহাই অবিদ্যাবিভ্রম বা অধ্যাস বলিয়া বেদান্তে উক্ত হইয়াছে। অবিদ্যা স্বভাবতঃ জড়। ব্রহ্মের তিরস্করণী এই অবিদ্যা জড়স্বভাবা হইলেও, চিন্ময়, স্বপ্রকাশ, সর্বভাসক ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া অবিদ্যায় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ শক্তিদ্বয়ের বিকাশ হইয়া থাকে এবং অবিদ্যায় ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাও ঐ শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট আত্মাই অদ্বৈতবেদান্তের মতে জীব, কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া পরিচিত। পরিস্পন্দশক্তি বা প্রাণশক্তি ক্রিয়াশক্তিরই এক বিশেষ অভিব্যক্তি। পরমাত্মাই বিশ্বপ্রাণ, ব্যষ্টিপ্রাণ বিশ্বপ্রাণেরই অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। জ্ঞানশক্তির বিকাশের ফলে অন্তঃকরণ ও তাহার বিভাব মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে এবং অন্তঃকরণের বিভাব অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি আত্মগত হইয়া প্রকাশিত হয়। ফলে, আত্মার মিথ্যা কর্তৃত্বের উদয় হয়।[১] শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিকের রক্ততা বুদ্ধির ন্যায় আত্মার এই কর্তৃত্ববোধ মিথ্যা ও অজ্ঞানকল্পিত, সুতরাং নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের জীবভাবও মিথ্যা, অবিদ্যা-কলুষিত বলিয়া জানিবে।

অবিদ্যায় চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই জীব। 'ননু কোঽয়ং জীবো নাম ব্রহ্মৈব অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত ইতি বদামঃ' (বিবরণ, ২৬৪ পৃঃ)। স্বয়ংজ্যোতিঃ চিদাত্মা বা পরমেশ্বরের বিম্ব, জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন।[২] এইরূপ প্রতিবিম্ববাদই প্রকাশাত্মযতির অভিপ্রেত। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতিবিম্ব, এইরূপ প্রতিবিম্ববাদ শঙ্করাচার্যের অনুমোদিত বলিয়া প্রকাশাত্মযতি মনে করেন না। তিনি বলেন যে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অজ্ঞানই একমাত্র ভেদক-উপাধি বিদ্যমান। অনাদি অজ্ঞান ব্যতীত জীব ও ঈশ্বরের অন্য কোন ভেদক নাই। এইজন্য অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। অজ্ঞানই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উপযুক্ত একমাত্র দর্পণ বা উপাধি। একই উপাধিতে একরূপ প্রতিবিম্বই পড়িবে, দুইরূপ প্রতিবিম্ব পড়া সম্ভব নহে। ঈশ্বর ও জীব, এই দ্বিবিধ প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলে, দুই প্রকার প্রতিবিম্বের জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি কল্পনা করা আবশ্যক হয়, অথচ এক অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপাধি নাই। অতএব ঈশ্বর ও জীব এই দুইটি প্রতিবিম্ব নহে। ঈশ্বর বিম্ব, জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব, এইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত। এইরূপ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ও জীবের ঈশ্বর-বশ্যতা যুক্তিযুক্ত হয়। দর্পণস্থ মুখাদিই প্রতিবিম্ব, মুখের ছায়া প্রতিবিম্ব নহে, মুখ হইতে তাহা পৃথক্ বস্তুও নহে। বুদ্ধি-দর্পণে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাও চৈতন্য হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পরস্পর ভিন্ন হইলে তাহা প্রতিবিম্বই হইতে পারে না। এক বস্তু অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব হয় কি? প্রতিবিম্ব বিম্বের

জীব

১। পঞ্চপাদিকা, ২০ পৃষ্ঠা।

২। পঞ্চপাদিকা, ২১, ২২ পৃষ্ঠা।

ঔপাধিক অভিব্যক্তি। প্রতিবিম্ব বিম্বের ন্যায়ই সত্য, ভেদ মিথ্যা। জীবও ব্রহ্মের ঔপাধিক অভিব্যক্তি এবং বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, (জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ)। প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রতিবিম্ব তো অচেতন, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে দর্পণে আমার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বের তো কোন জ্ঞানোদয় হয় না। চৈতন্য-প্রতিবিম্ব জীবও যখন প্রতিবিম্ব, তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দর্পণে আমার জড় দেহই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে সুতরাং জড় দেহের জ্ঞানোদয় হইবে কিরূপে? জীব চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সুতরাং চেতন। চেতন জীবের তত্ত্বজ্ঞান হইতে বাধা কি?[১] জীবের স্বরূপের অজ্ঞানই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের প্রধান অন্তরায়। এই অজ্ঞান শঙ্করের ভাষায়, অনাদি, অনন্ত, নৈসর্গিক এবং সর্বলোক-প্রত্যক্ষ—'এবময়মনাদিরনন্তোনৈসর্গিকো'ধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-প্রবর্তকঃ সর্বলোক-প্রত্যক্ষঃ' (ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাষ্য)। এই সর্বলোক-প্রত্যক্ষ অজ্ঞান শঙ্করাচার্যের মানস-কল্পনাই নহে, ইহারও একটা বাস্তবতা আছে। এই অনাদি অজ্ঞানবশতঃই জীবের মিথ্যা কর্তৃত্বাভিমানের, ভোগলিপ্সার সৃষ্টি হইয়াছে। মিথ্যা অভিমান নিবৃত্ত হইলেই, জীব নিজকে অকর্তা ও সচ্চিদানন্দ-স্বভাব বলিয়া বুঝিতে পারে। জীব নিজকে সর্বদা কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহার এই প্রত্যক্ষকে মিথ্যা বলিব কিরূপে? ব্রহ্মসূত্রকারও সূত্রে জীবকে 'কর্তা' বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন—'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩)। সূত্রকারের নির্দেশের তাৎপর্য এই যে, জীবকে শাস্ত্রে অনেক কর্তব্যসাধন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মা কর্তা হইলেই তাঁহার সম্বন্ধে কর্তব্যের উপদেশ চলিতে পারে, কর্তা না হইলে তাঁহাকে কর্তব্যের উপদেশ দেওয়া চলে কি? জীবাত্মা কর্তা বলিয়া তিনি ভোক্তাও বটেন। কেননা, দেখা যায়, যে কার্য করে, সেই কৃত কার্যের ফলাফল ভোগ করে। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে আত্মা বস্তুতঃ নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, নির্লেপ-নিরভিমান এবং কূটস্থ। এইরূপ আত্মার কর্তৃত্ব কোনমতেই স্বাভাবিক হইতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে, আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-কল্পিত এবং মিথ্যা। জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলে স্বভাবের উচ্ছেদ অসম্ভব বিধায় মুক্তি অবস্থায়ও ঐ কর্তৃত্বের বিলোপ হইতে পারে না, ফলে মুক্তি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।[২] আত্মাকে অকর্তা ও অসঙ্গ বলিয়া উপনিষদে যে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে তাহাও অর্থহীন হইয়া পড়ে। তারপর, কর্তৃত্ব থাকিলেই ক্রিয়া আছে, ক্রিয়া থাকিলে দুঃখও আছে; দুঃখী জীব নিরাবিল ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইবে কিরূপে?

জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব যেমন মিথ্যা, জীব-ভোগ্য এই নামরূপাত্মক জগৎও তেমন মিথ্যা। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই এই মায়াময় জগতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। ব্রহ্মের

১। পঞ্চপাদিকা, ২৩ পৃষ্ঠা। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা।

২। ন স্বাভাবিকং কর্তৃত্বমাত্মনঃ সম্ভবতি; অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। কর্তৃত্বস্বভাবত্বে আত্মনো ন কর্তৃত্বানির্মোক্ষঃ সম্ভবতি অগ্নেরিবৌষ্ণ্যাৎ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।৩।৪০।

নিত্য সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। জগৎ কিন্তু বাস্তবিক সৎ নহে। কেননা, জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়, জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবোধের দ্বারা জগতের বোধ বাধিত হয়। যাহা বাধিত হয়, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সত্য না হইলেও জাগতিক বস্তুগুলি আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের বিবিধ প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, ব্যাবহারিকভাবে জগৎকে সত্য বলিতেই হইবে, আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বলা চলিবে না। জগৎ অদ্বৈতবেদান্তীর মতে সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা অনির্বচনীয়। নামরূপাত্মক জগৎকে শঙ্করাচার্য অনির্বচনীয় বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে নামরূপে' (অধ্যাস শং ভাষ্য)। যাহা অনির্বচনীয় তাহা মিথ্যা। মিথ্যা শব্দের অনির্বচনীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া শঙ্করাচার্যের অনির্বাচ্যবাদকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য পদ্মপাদ মিথ্যাত্বের এইরূপ একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, যাহা সতেরও বিলক্ষণ এবং অসতেরও বিলক্ষণ বা বিসদৃশ তাহাই মিথ্যা (সদসদ্‌বিলক্ষণত্বম্ মিথ্যাত্বম্)। পদ্মপাদের উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশাত্মযতি তদীয় পঞ্চপাদিকা-বিবরণে মিথ্যাত্বের আরও নূতন দুইটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে জগদ্‌বিভ্রম বাধিত হয়। কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান সত্য ও জগদ্‌বিভ্রম মিথ্যা। যাহা জ্ঞানবাধ্য তাহাই মিথ্যা (জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বং)। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় আশ্রয়ে বা অধিকরণে যাহার অভাববোধের উদয় হইবে, তাহা সত্য বস্তু হইবে না, মিথ্যাই হইবে। শুক্তি-রজত মিথ্যা, কেননা, রজতের আশ্রয় শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞানের উদয় হইলে, রজতজ্ঞানের আশ্রয়েই রজতের অভাববোধের উদয় হইয়া থাকে। মিথ্যা দর্শনকালে মিথ্যা বস্তুর অভাববোধের উদয় হয় না বটে, কিন্তু সত্যদৃষ্টি উৎপন্ন হইলে স্বীয় আশ্রয়েই বস্তুর অভাববোধের উদয় হইতে দেখা যায়। মিথ্যা দৃষ্টি সাময়িক, সুতরাং ঐ মিথ্যা বস্তুর দর্শনও সাময়িক। সাময়িকভাবে দর্শন থাকিলেও বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে স্বীয় অধিষ্ঠানে মিথ্যা বস্তুর সত্তাও থাকে না, দর্শনও থাকে না, সত্তার অভাবই থাকে। যে-বস্তুর অভাব হয়, সেই বস্তুই হয় অভাবের প্রতিযোগী। স্বীয় আশ্রয়ে ত্রৈকালিক অভাবের (নিষেধের) যাহা প্রতিযোগী, তাহাই মিথ্যা।[১] ব্রহ্মই জগতের উপাধি বা অধিষ্ঠান, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে জগৎ উপহিত বা কল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-উপাধিতে জগৎ বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালে বস্তুতঃ বিদ্যমান থাকে না। কেবল যতক্ষণ মায়া বা অজ্ঞানের খেলা আছে, ততক্ষণই মায়াময় জগতের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মের এই

জগতের স্বরূপ

জগতের মিথ্যাত্ব

১। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ৩৪ পৃঃ।

জগদ্‌বিভাব তিরোহিত হয় ; তখন ব্রহ্ম-উপাধিতেই (জগতের আশ্রয়ে) জগৎ ত্রৈকালিক নিষেধের বা অভাবের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এই প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগী জগতে আছে, সুতরাং জগতে মিথ্যাত্বও আছে বুঝিতে হইবে।[১] বিকারমাত্রই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কল্পিত। যাহা কল্পিত তাহাই মিথ্যা। একের কল্পিত নানারূপ সত্য হইবে কিরূপে? একই চন্দ্রে কল্পিত দ্বিচন্দ্র দর্শন সত্য হয় কি? এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে বলিয়া বিভিন্ন কার্যবর্গ সত্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে মাত্র।[২] বস্তুতঃ কার্যবর্গ সত্য নহে, মিথ্যা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তের মতে জগৎ মিথ্যা হইলেও শুক্তি-রজতের ন্যায় প্রাতিভাসিক নহে, জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। শঙ্কর তদীয় ভাষ্যে স্পষ্ট বাক্যেই জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজত হইতে জাগতিক বস্তুর আপেক্ষিক সত্যতাও স্বীকার করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।২।২৮-২৯)। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের তাৎপর্য এই যে, অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের স্বরূপজ্ঞান উদিত হইলে যে জ্ঞান তিরোহিত হয়, ঐ জ্ঞান অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বলিয়া জানিবে। মিথ্যাত্বের এই মূল নীতি প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজত এবং ব্যাবহারিক জগদ্‌বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই তুল্যরূপে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জগতের মিথ্যাত্বসাধনে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত অচল নহে।

জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ।

জগৎ যে শঙ্করবেদান্তের মতে কেবল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মানস-কল্পনাই নহে, পরিদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চেরও যে একটা আপেক্ষিক বাস্তবতা আছে, ইহা দেখা গেল। এই জগতের মূলে ব্রহ্মই বিদ্যমান। ব্রহ্মই জাগতিক বাস্তবতার মূল। ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই জগৎসত্তা অনুপ্রাণিত হইতেছে, ফলে, মিথ্যা জগৎও সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। জগৎ ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেতেই অবস্থিত এবং পরিণামেও ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান। জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতিই ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া সূত্রে এবং ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নহে, তটস্থ লক্ষণ বা উপলক্ষণ মাত্র। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,' ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। জগৎ অবিশুদ্ধ, ব্রহ্ম বিশুদ্ধ, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সধর্মক, ব্রহ্ম নির্ধর্মক ; অশুদ্ধ, মিথ্যা, সধর্মক জগৎ ও তাহার উৎপত্তি প্রভৃতির সহিত সত্য, শান্ত, বিশুদ্ধ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোনরূপ যথার্থ যোগ থাকিতে পারে না। সুতরাং জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-নিদান প্রভৃতিকে ব্রহ্মের স্বরূপ

১। দেশকালতদুপাধিঘটানামন্তর্থে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিপন্নোপাধৌ প্রত্যক্ষেণৈব বাধাৎ মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। এবং সর্বভাব প্রত্যয়গোচরে ব্রহ্মণি স্বরূপোপাধাবস্ত্যথে কালাদ্যুপাধিভিঃ সহাভাব-প্রত্যক্ষেণ বাধানিশ্চয়েবেতি সিদ্ধম্। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ২০৭ পৃঃ।

২। সর্বে বিকারাঃ স্বানুস্যূত একস্মিন্ বস্তুনি পরিকল্পিতাঃ প্রত্যেকমেকস্বভাবানুবিদ্ধত্বেসতি বিভক্তত্বাৎ চন্দ্রভেদবৎ। পঃ বিবরণ, ২০৭ পৃঃ।

লক্ষণও বলা যায় না, উপলক্ষণ বা পরিচায়ক মাত্রই বলিতে হয়।[১] জগৎ কর্তা ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্মের মায়িক অভিব্যক্তি। মায়া-সম্বলিত ব্রহ্মই জগতের কারণ—'তস্মাদ-নির্বাচনীয়-মায়াশক্তিবিশিষ্টং কারণং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্' (বিবরণ, ২১২ পৃঃ)। মায়াময় ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম) বা পরমেশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, আর নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ। সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে; সুতরাং এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তও বটেন উপাদানও বটেন। একই ব্রহ্মের এই উভয়বিধ কারণতাই (অভিন্ননিমিত্তো-পাদনতা) অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপাদান হইবেন কিরূপে? উপাদানকারণ কার্যে অনুস্যূত হইয়া থাকে। ফলে, বিকারী বা পরিণামী কারণেরই উপাদানকারণতা সম্ভব হয়। অবিকারী নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপাদান-কারণ হইতে পারেন না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবেদান্তের মতে উপাদানকারণ দুই প্রকার—(১) পরিণামী উপাদান ও (২) অপরিণামী উপাদান। অপরিণামী ব্রহ্ম পরিণামী উপাদান হইতে পারেন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মবিবর্ত জগতের ব্রহ্ম অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বিধায়, ব্রহ্মকে অপরিণামী উপাদানকারণ বলায় কোন বাধা নাই। এই অপরিণামী উপাদানকারণই বিবর্তকারণ বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তে পরিচিত। এইরূপ পরিণামী ও অপরিণামী এই উভয়বিধ উপাদানকারণের লক্ষণ কি? আত্মা বা নিজকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সকল কার্যের যাহা হেতু, তাহাই উপাদানকারণ।[২] দণ্ড ঘটের উপাদানকারণ নহে, নিমিত্তকারণ, মাটি উপাদানকারণ। কেননা, ঘট মাটিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, দণ্ডকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় না; দণ্ড আত্মাশ্রিত (দণ্ডাশ্রিত) কার্যের কারণ নহে, মৃত্তিকাশ্রিত কার্যের কারণ, সুতরাং দণ্ডকে উপাদানকারণ বলা যায় না। মাটি আত্মাশ্রিত মৃত্তিকাশ্রিত কার্যেরই কারণ, সুতরাং মাটি উপাদানকারণ। এইরূপ আত্মা বা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া যে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে অধিষ্ঠান ব্রহ্ম আত্মাশ্রিত কার্যেরই হেতু হইয়া থাকেন। সুতরাং ঐ অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে উপাদানকারণ বলিতে কোন আপত্তি নাই। তারপর, অনির্বচনীয় অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া (অবিদ্যা-পরিণাম বশতঃ) যে অনির্বচনীয় জড়প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে অবিদ্যা যে উপাদান হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল অবিদ্যা-পরিণাম জড় কার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মই ঐ সকল জড় কার্যের আশ্রয় হন, সুতরাং অবিদ্যাকে পরিণামী উপাদান এবং ব্রহ্মকে অপরিণামী উপাদান বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। আলোচিত লক্ষণটি জড়প্রপঞ্চের অপরিণামী উপাদান ব্রহ্ম ও পরিণামী উপাদান মায়া এই উভয় স্থলেই প্রযোজ্য।

১। তস্মাৎ ব্রহ্মপরে বাক্যে জন্মাদিধর্মজাতস্য উপলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শাভাবাৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতং পরমানন্দং ব্রহ্মেতি জন্মাদিসূত্রেণ ব্রহ্মস্বরূপমলক্ষিতমিতি সিদ্ধম্। পঞ্চপাদিকা, ৮১ পৃঃ।

২। আত্মনি কার্যজনিহেতুত্বস্য উপাদানলক্ষণত্বাৎ তস্য চ পরিণাম্যপরিণাম্যুভয়সাধারণত্বাৎ অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৫৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিবর্তিত হইয়া থাকে, সেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মই বিশ্বের বিবর্তকারণ। স্বীয় ব্রহ্মরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মিথ্যা অনেকরূপে (জীবও জগৎরূপে) অবভাস বা প্রকাশকে বিবর্ত বলা হইয়া থাকে। এই জগতের বিবর্তকারণ ব্রহ্ম মায়া-সম্বলিত হইয়া সর্বজ্ঞ পরমেশ্বররূপেই জগৎ উৎপাদন করিয়া থাকেন; সুতরাং জগৎকর্তা ব্রহ্মের মায়াযোগ অবশ্য স্বীকার্য। এই মায়াযোগ তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। (১) দুই গাছি সূতা পরস্পর জড়িত হইয়া যেমন দড়ি পাকায়, সেইরূপ মায়া ও ব্রহ্ম দুই-ই দড়ির মত বিজড়িত হইয়া থাকেন এবং মায়াবিজড়িত (মায়াবিশিষ্ট) ব্রহ্মই জগৎ উৎপাদন করেন। (২) মায়া ব্রহ্মের শক্তি। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যও মায়াকে ব্রহ্মের শক্তিরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মায়াশক্তিমান্ ব্রহ্মই জগতের কারণ। পক্ষান্তরে, (৩) মায়া জগতের উপাদান। এই জগদুপাদান মায়ার আশ্রয় ব্রহ্মই জগৎকারণ। অনির্বচনীয় অবিদ্যার স্বভাব জড়জগতে অনুগত হইয়া থাকে। এইজন্যই অবিদ্যাকে পরিণামী উপাদান বলা হয়। জগৎকর্তৃত্বের মিথ্যা অভিমান এবং সিসৃক্ষা (সৃষ্টির ইচ্ছা) প্রভৃতি অবিদ্যারই পরিণাম। এই সকল অবিদ্যা-পরিণামের যিনি আশ্রয় হন, সেই জগৎকর্তা মায়াময় ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ। ব্রহ্মের মায়াযোগ যথার্থ নহে—কল্পিত, সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্মের মায়াসংযোগ যেরূপেই ব্যাখ্যা করনা কেন, তাহা দ্বারা কোন মতেই পরব্রহ্মের বিশুদ্ধতার কোন হানি হয় না। প্রথমকল্পে মায়া মায়াময় ব্রহ্মের উপলক্ষণ বা উপাধি। এই উপাধি দ্বারা মায়াতীত, নিরুপাধি, পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপের কোন বিচ্যুতি হওয়া সম্ভবপর নহে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-কল্পে মায়া ব্রহ্মের বশ, ব্রহ্ম মায়ার বশ নহেন, সুতরাং স্বীয় বশ্য মায়ার আশ্রয় বা উপাধিরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও ব্রহ্ম শুদ্ধরূপেই বিরাজ করেন। মায়া ব্রহ্মের স্বরূপকে কলুষিত করিতে পারে না।[1] ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য তদীয় ভাষ্যে, (ব্রঃ সূঃ ভাষ্য, ১।৪।২৩), (এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা ও বিবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে) শ্রুতি ও যুক্তিমূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয়বিধ কারণ তাহা

অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ এবং ব্রহ্মের মায়াযোগ।

১। যদবষ্টব্ধো বিশ্বো বিবর্ততে প্রপঞ্চস্তদেব মূলকারণং ব্রহ্ম, (পঞ্চপাদিকা, ৭৮ পৃঃ), একস্য তত্ত্বাদপ্রচ্যুতস্য পূর্ববিপরীতাসত্যানেকরূপাবভাসো বিবর্তঃ। বিবরণ, ২১২ পৃঃ।

যদবষ্টব্ধো বিশ্বো বিবর্ততে ত্রৈবিধ্যমত্র সম্ভবতি রজ্জ্বাঃ সংযুক্তসূত্রদ্বয়বৎ মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণমিতি বা, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢামিতিশ্রুতের্মায়াশক্তিমৎ কারণমিতি বা। জগদুপাদানমায়াশ্রয়তয়া ব্রহ্মকারণমিতি বা। (পঃ বিবরণ, ২১২ পৃঃ)।

তত্র বিশিষ্টপক্ষে তথৈব ব্রহ্মত্বেনোপলক্ষিতস্য জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপলক্ষণেন মায়ানিষ্কর্ষাৎ লক্ষণদ্বয়েন বিশুদ্ধব্রহ্মসিদ্ধিঃ। উত্তরয়োস্তু মায়ায়া ব্রহ্মপরতন্ত্রত্বাৎ তৎকার্যমপি ব্রহ্মতন্ত্রং ভবতি------ততশ্চ উৎপাদ্যমানকার্যস্য যদাশ্রয়োপাধিজ্ঞানানন্দলক্ষণং তদ্ ব্রহ্মেতি শুদ্ধব্রহ্মলাভ ইতি। বিবরণ, ২১২ পৃঃ।

প্রমাণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি।[১] ভাষ্যকারের শ্রুতি-মূলক ঐ সিদ্ধান্ত যে অনুমান প্রভৃতির সাহায্যেও প্রমাণ করা যাইতে পারে, তাহা প্রকাশাত্মযতি পঞ্চপাদিকা-বিবরণে অনুমান প্রমাণের শৈলী ও প্রয়োগবাক্য (syllogistic form) উপন্যাস করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকাশাত্মযতির অনুমানের মর্ম এই যে, মহাভূতগুলি বিকার হইলেও তাহাদিগকে সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতে কোন সত্যবস্তু যে উহাদের প্রকৃতি বা উপাদান হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা হয়। সৃষ্টির উষায় এক অদ্বিতীয়, নিত্য-সত্য-ব্রহ্মবস্তুই বিদ্যমান ছিল, অপর কিছুই ছিল না, সুতরাং মহাভূতের উপাদান ঐ সত্যবস্তু যে ব্রহ্মই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তারপর, সেই নিত্য, পরম সৎ ব্রহ্ম যেমন উপাদান, তেমন তিনি জগতের স্রষ্টা বলিয়া নিমিত্তও বটেন। সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টাই তাঁহার কামলীলাবশে দেখিয়া, বুঝিয়া (বীক্ষণ পূর্বক) জগতের সৃষ্টি করেন। এইরূপে তিনি নিমিত্তকারণ এবং কার্যজগতের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হিসাবে তিনি উপাদান-কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বীয় সুখ, দুঃখবোধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "অহং সুখী" এইরূপে আত্মায় যে সুখবোধের উদয় হইয়া থাকে, তাহাতে আত্মাই উপাদান-কারণও বটে নিমিত্তকারণও বটে। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে উভয় প্রকার কারণ বলায় অসামঞ্জস্য কিছুই নাই।[২] ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান হইলেও সৃষ্টি যে মায়ার খেলা, অবিদ্যারই বিলাস, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

মায়া ও অবিদ্যা

মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন তত্ত্ব নহে। মায়া অবিদ্যারই নামান্তর। আচার্য শঙ্করভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ভাঃ ১।৪।১), মায়াশক্তিকে "অবিদ্যাত্মিকা" বলিয়া মায়া ও অবিদ্যার অভেদই উপপাদন করিয়াছেন। মায়া ও অবিদ্যা বস্তুতঃ এক হইলেও ব্যবহারে দেখা যায় যে, ব্রহ্মের তিরস্করণী (আবরণশক্তিপ্রধানা) মায়াকে অবিদ্যা, আর, বিশ্ব-জননী (বিক্ষেপশক্তিপ্রধানা) মায়াকে মায়া বলা হইয়া থাকে।[৩]

১। পূর্ব পরিচ্ছেদের "ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ" নামক পার্শ্বসূচির উপপাদন ২১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। (ক) মহাভূতানি সদ্‌বস্তুপ্রকৃতিকানি সৎস্বভাবানুরক্তত্বে সতি বিবিধ বিকারত্বাৎ মৃদনুস্যূত-ঘটাদিবৎ। বিবরণ, ২০৫ পৃঃ।

(খ) ইদং জগৎ অভিন্ননিমিত্তোপাদানং ভবিতুমর্হতি প্রেক্ষাপূর্বকজনিতকার্যত্বাৎ আত্মগত-সুখদুঃখরাগদ্বেষাদিবৎ। বিবরণ, ২৯ পৃঃ।

তস্যাদনুমানেনৈব প্রসিদ্ধমেকস্যোভয়কারণত্বং লক্ষণত্বেন নির্দিশ্যতে। বিবরণ, ২০৩ পৃঃ।

মধুসূদন সরস্বতী প্রসিদ্ধ অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে ব্রহ্মের উপাদান ও নিমিত্ত, এই উভয়বিধ কারণতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিবরণের উল্লিখিত (ক) চিহ্নিত অনুমানটির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রুত্যনু-গৃহীতানুমানমপ্যত্র বিবরণোক্তমধ্যবসেয়ম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৭৪ পৃঃ, বোম্বে সং।

৩। ভাষ্যকারেণ অবিদ্যাত্মিকা মায়াশক্তিরিতি নির্দেশাৎ, টীকাকারেণ চাবিদ্যামায়া মিথ্যাপ্রত্যয় ইত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাল্লক্ষণৈক্যাদ্‌বৃদ্ধব্যবহারে চৈকত্বাবগমাৎ একাস্মিন্নপি বস্তুনি বিক্ষেপপ্রাধান্যেন মায়া আচ্ছাদনপ্রাধান্যেন অবিদ্যেতি ব্যবহারভেদঃ। বিবরণ, ৩২ পৃঃ।

আচার্য অবিদ্যাকে "পরমেশ্বরাশ্রয়া" বলিয়া ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মই যে অবিদ্যার আশ্রয়, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। ব্রহ্মের তিরস্করণী অবিদ্যা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, ফলে জীবের ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান বিবিধ আকারে প্রসার লাভ করে।

ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়

অজ্ঞানের আশ্রয়ও ব্রহ্ম, বিষয়ও ব্রহ্ম। স্বয়ম্প্রকাশ, জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্ঞানময় আত্মা (স্ববিরোধী) অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইবেন কিরূপে? জ্ঞান তো অজ্ঞানের বিরোধীই বটে। এই অবস্থায় জ্ঞানে অর্থাৎ জ্ঞানময় ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মে যে ব্রহ্মের স্বরূপের আচ্ছাদক অবিদ্যা আছে এবং তাহার ফলেই যে জীবের নিকট ব্রহ্মের যথাথ স্বরূপটি প্রকাশিত হয় নাই, ব্রহ্মের বিকৃত রূপেরই বিকাশ হইয়াছে, ইহা তো কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। 'বিদ্যত এবাত্রাপি অগ্রহণাবিদ্যাত্মকো দোষঃ প্রকাশস্য আচ্ছাদকঃ' (পঞ্চপাদিকা, ১৪ পৃঃ)। যদি বল যে, অজ্ঞান জ্ঞানময় ব্রহ্মের বিরোধী, সুতরাং ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মই জড় অবিদ্যার প্রকাশক। চিন্ময় ব্রহ্মে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মের আলোকে আলোকিত হইয়াই অজ্ঞান আত্মপ্রকাশ লাভ করে। যে যাহাকে প্রকাশ করে, সে তাহার বিরোধী হয় কি? আর, বিরোধী হইলে প্রকাশক হইতে পারে কি? তারপর, অবিদ্যাকে যে ব্রহ্মের তিরস্করণী বা আচ্ছাদক বলা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যায় যে, অবিদ্যা ব্রহ্মের বিরোধী হইলে অবিদ্যা কোনমতেই ব্রহ্মের আচ্ছাদক হইতে পারে না। অতএব বলিতেই হইবে যে, অবিদ্যার ভাসক বা প্রকাশক সাক্ষীচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মাতিরস্করণী অবিদ্যার স্বতঃ কোন বিরোধ নাই। 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ" এইরূপ বৃত্তিজ্ঞান উদয় হইলে অজ্ঞান তিরোহিত হয়; সুতরাং ঐরূপ বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। ব্রহ্মকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া মানিয়া নিতেও কোন বাধা নাই।[১]

অবিদ্যা ভাবরূপ

ব্রহ্মাতিরস্করণী অবিদ্যা "তমঃস্বভাবা" বলিয়া ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তমঃ আলোকের অভাব নহে। উহা ভাব পদার্থ। আচার্য পদ্মপাদ বলেন যে, অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত গৃহে কোন বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না। উজ্জ্বল আলোকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত গৃহে কিছু অন্ধকারও বিদ্যমান আছে। অন্ধকার আলোকের অভাব হইলে আলোক বিদ্যমান থাকা কালে তাহার অভাব থাকিতে পারিত না। অন্ধকার ভাব পদার্থ বলিয়াই আলোক বর্তমানেও তাহার অল্প মাত্রায় অস্তিত্ব অনুভূত হয়।[২] মায়াকে তমঃস্বরূপ বলায় উহাও ভাববস্তুই হইয়া

১। নাপি স্বাশ্রয়চিৎপ্রকাশনেন বিরুধ্যতে অজ্ঞানং স্বাবভাসকেন সংবেদনেন চিৎপ্রকাশেন অজ্ঞানস্য অবিরুদ্ধত্বাৎ। সাক্ষিচৈতন্যস্য চ অজ্ঞানাবভাসকত্বাদতো ন চিদাশ্রয়ত্ববিরোধঃ। বিবরণ, ৪৩ পৃঃ।

২। দৃশ্যতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি অস্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ স্পষ্টম্। তেন জ্ঞায়তে মন্দ-প্রদীপে বেশ্মনি তমসো'পি ঈষদনুবৃত্তিরিতি। পঞ্চপাদিকা, ৩ পৃঃ।

দাঁড়াইল। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে, জ্ঞানের আবরক একপ্রকার ভাববস্তু, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিতে বাধা কি? জীবের ব্রহ্ম বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং ব্রহ্মই যে অজ্ঞানের বিষয় হইবে, ইহাতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।

ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ

অবিদ্যা যে ভাবরূপ তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশাত্মযতি বলেন যে, আমি অজ্ঞ, "অহমজ্ঞঃ" আমি আমাকে বা অন্য কাহাকেও জানিতে পারি নাই, "অহং মামন্যঞ্চ ন জানামি" এইরূপে প্রত্যেকেরই ভাবরূপ অজ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। অনুমান, শ্রুতি, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যেও ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমার অজ্ঞতা আমার জ্ঞানের অভাব নহে। কেননা, অভাবের কখনও প্রত্যক্ষ হয় না।

ভাবরূপ অবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এখানে অজ্ঞতা সুখাদির ন্যায় স্পষ্টতঃ আমার প্রত্যক্ষ হইতেছে, সুতরাং ইহাকে অভাবরূপ বলা যায় কিরূপে? যদি অভাবও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবুও এই অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলা চলিবে না। কারণ দেখা যায় যে, অজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালেও জ্ঞান বিদ্যমানই আছে, নতুবা অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় কিসের দ্বারা। অজ্ঞান যদি জ্ঞানের অভাব হয়, তবে জ্ঞান থাকা কালে জ্ঞানাভাবের উদয়ও হইতে পারে না, তাহার প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। ঘট বিদ্যমান থাকা কালে ঘটাভাবের জ্ঞানোদয় হয় কি? দ্বিতীয়তঃ, "ময়ি-জ্ঞানং নাস্তি" আমাতে জ্ঞান নাই, এইরূপে জ্ঞানের অভাব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ অনুভব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এখানে আমিত্বের জ্ঞান হইয়া পরে আমাতে জ্ঞানের অভাববোধের উদয় হইয়াছে। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবরূপ হইলে আমিত্বের জ্ঞান থাকা কালে, সেখানে জ্ঞানের অভাববোধের উদয় হইবে কিরূপে? তারপর তুমি যে কথা বলিয়াছ, যে শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই "ত্বদুক্তমর্থং শাস্ত্রার্থং বা ন জানামি।" এইরূপে কোন নির্দিষ্ট বিষয় শূন্য অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞান ভাবরূপ হইলেই ঐরূপ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়, অভাবরূপ হইলে হয় না। কেননা, অভাবকে জানিতে হইলে যে বস্তুর অভাব হয় (অভাবের প্রতিযোগী) এবং যেখানে সেই অভাবের প্রতীতি হয় (অভাবের অনুযোগী) তাহার জ্ঞান পূর্বে থাকা আবশ্যক হয়, নতুবা অভাবজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। বিষয় ও আশ্রয় শূন্য অভাবের প্রতীতি অসম্ভব কথা। অজ্ঞান ভাবরূপ হইলে বিষয়শূন্য (বিষয়ব্যাবৃত্ত) ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুভব অসম্ভব হয় না।[১] এইজন্য অজ্ঞানভাবরূপ এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য—'অজ্ঞানপ্রত্যক্ষং ভাবরূপমেবাজ্ঞানং গময়তীতি সিদ্ধম্' (বিবরণ, ১২ পৃঃ)।

১। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ১২ পৃঃ।

ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমান প্রমাণ।

অনুমান প্রমাণের সাহায্যেও যে অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, তাহা প্রকাশাত্মযতি তদীয় বিবরণে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রকাশাত্মযতির প্রদর্শিত অনুমানের সারমর্ম এই যে, অন্ধকারের মধ্যে আলোকরেখার যখন প্রথম স্ফুরণ হয় এবং ঐ আলোক যেখানে গৃহমধ্যস্থ (অন্ধকারের আবরণে আবৃত) অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে, সেখানে ঐ অপ্রকাশিত বস্তুর আচ্ছাদক, আলোকবিনাশ্য, আলোকের প্রাগভাবের অতিরিক্ত, একটি ভাব-বস্তুকে অর্থাৎ অন্ধকারকে বিনাশ করিয়াই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই দৃষ্টান্তে বলা যায় যে, প্রমাণের সাহায্যে যেখানে জ্ঞানালোকের প্রথম বিস্ফুরণ হয় এবং ঐ জ্ঞানালোক যে স্থলে প্রকাশিত বস্তুকে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করে, সে স্থলে ঐ প্রকাশ্য বস্তুর আচ্ছাদক, জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, একটি ভাববস্তুকে (ভাবরূপ অজ্ঞানকে) বিনাশ করিয়াই উদয় হইয়া থাকে।[১] অনাদি অনির্বচনীয় অবিদ্যা-শক্তিই অধ্যাসের উপাদান, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই অবিদ্যাশক্তিবশতঃই বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মার যথার্থ স্বরূপ তিরোহিত হইয়া "আমি" "আমার", 'অহংকার, 'মমকার' প্রভৃতি আমিত্বের বিকৃত মিথ্যা রূপের উদয় হইয়া থাকে।

অর্থাপত্তি ও শ্রুতি প্রমাণ।

অবিদ্যা-উপাদান মিথ্যা, সুতরাং ঐ অবিদ্যা-কার্য অধ্যাসও মিথ্যা। অভাববস্তু কাহারও উপাদান হয় না, হইতে পারে না, সুতরাং অধ্যাসের উপাদান অবিদ্যাকে ভাবরূপই বুঝিতে হইবে। অবিদ্যা ব্রহ্মের তিরস্করণী। অবিদ্যাশক্তি-প্রভাবেই স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্ম তিরোহিত হইয়া থাকেন। এই তিরস্করণী অবিদ্যা ভাবরূপ না হইয়া অভাবরূপ হইলে সে কোন মতেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারিত না। কেননা, অভাব কোন বস্তুর আবরক হয় না; "অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মাচ্ছাদক অজ্ঞানের ভাবরূপতাই প্রমাণ করিয়া দেয়। এই ভাবরূপ অবিদ্যাই মায়া, প্রকৃতি, অব্যাকৃত, অব্যক্ত, তমঃ, কারণ, লয়, শক্তি, মহা-সুপ্তি, নিদ্রা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে উক্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা স্বভাবতঃ জড় হইলেও চিন্ময় ব্রহ্মে অবস্থান করার ফলে উহাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়, ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ঐ শক্তিদ্বয়-সম্বলিত চৈতন্যই জীব, জ্ঞাতা বা

পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ মতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ।

প্রমাতা বলিয়া পরিচিত। প্রমাতা যখন জ্ঞেয় বিষয়কে দর্শন করে, (তখন জ্ঞান ক্রিয়ার কর্তা) জ্ঞাতা এবং (জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম) জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় "জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়সম্বন্ধঃ।" জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি জ্ঞাতার চিত্তের যে প্রবণতা

১। অনুমানমপি বিবাদগোচরাপন্নং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত স্ববিষয়াবরণস্বনিবর্ত্য-স্বদেশগতবস্তুন্তরপূর্বকং ভবিতুমর্হতি অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাদন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপশিখাবদিতি; ততশ্চ জ্ঞানেন স্বসমানাশ্রয়বিষয়ং ভাবরূপমজ্ঞানং সিদ্ধং। বিবরণ, ১৩ পৃঃ।

জন্মে, তাহার ফলে জ্ঞাতার অন্তঃকরণের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয় এবং বিষয়-সংযোগে জ্ঞাতার অন্তঃকরণের এক পরিবর্তিতরূপ (বিষয়ের আকারে আকারপ্রাপ্ত রূপ) প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ চৈতন্যের উপাধি বা অবচ্ছেদক এবং চৈতন্যের আলোকে আলোকিত। বিষয়-সংযুক্ত (বিষয়ের আকারে আকার প্রাপ্ত) অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়, তখন অন্তঃকরণ-সংযুক্ত বিষয়টিও উদ্‌ভাসিত হইয়া জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। এইরূপ বিষয়াভিব্যক্তিই জ্ঞাতার বিষয়-প্রত্যক্ষ। বিষয়বশে পরিবর্তিত অন্তঃকরণের সহিত প্রমাতার যে সম্বন্ধ তাহার মধ্যে কোন ব্যবধানের আবরণ নাই, তাহা সাক্ষাৎ, এই জন্যই প্রমাতার এই বিষয়ানুভবকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে।[১] অন্তঃকরণের সাহায্যে জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তুর সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়সম্বন্ধঃ) ঐ সম্বন্ধের স্বরূপটি কি, পদ্মপাদ তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। প্রকাশাত্মযতি উহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় বিষয় উপস্থিত হইলেই জ্ঞাতার অন্তঃকরণের একপ্রকার পরিণাম হয়। ঐ পরিণামের ফলে অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে দীর্ঘ আলোকরেখার আকারে ধাবিত হইয়া বিষয় যেখানে থাকে, সেখানে গমন করে এবং বিষয়ের আকার গ্রহণ করিয়া বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত অগ্নির অভেদ হওয়ায় অগ্নিকেই যেমন ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত বিষয় অভিন্ন হইলে অন্তঃকরণকেই বিষয়ের আকারধারী ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বলিয়া বোধ হয়। অন্তঃকরণ চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হওয়ায় অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন জ্ঞেয়-বিষয়ও চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হয়। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মতে বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ। চৈতন্যই একমাত্র সাক্ষাৎ অপরোক্ষ তত্ত্ব। চৈতন্য কখনও পরোক্ষ হয় না, ইহা সর্বদা প্রত্যক্ষ। এইরূপ চৈতন্যের সহিত অন্তঃকরণ দ্বারা জড় বিষয়ও যখন অভেদ সম্বন্ধে অন্বিত হয়, তখন চৈতন্যের প্রকাশের দ্বারা জড়বস্তুও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই বিষয়-প্রত্যক্ষের মূল রহস্য।[২] 'অব্যবধানেন সংবিদুপাধিতা'পরোক্ষতা বিষয়স্য' (বিবরণ, ৫০ পৃঃ)। অন্তঃকরণ ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন। যেই জ্ঞাতার অন্তঃকরণ যেই বিষয়াকারে পরিণতি লাভ করে, সেই জ্ঞাতার নিকটই সেই বিষয়টি প্রকাশিত হয়,

---

১। পঞ্চপাদিকা, ২৪ পৃঃ।

২। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ৭০ পৃঃ।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তৎকৃত বেদান্তপরিভাষায় বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের সেই আলোচনা দেখিলে প্রকাশাত্মযতির চিন্তা যে তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।

অপরের নিকট হয় না।[১] চৈতন্য সর্বব্যাপী স্বয়ম্প্রকাশ হইলেও অন্তঃকরণই জ্ঞানের দ্বার ; অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত যে বিষয়চৈতন্যের অভেদ হইবে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে ; সুতরাং সব সময়ে সকলের সকল বস্তু প্রত্যক্ষ হইবার কোন আপত্তি আসে না। বেদান্তের পরিভাষায় অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা, অন্তঃকরণবৃত্তি অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ, আর বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমেয় বলিয়া পরিচিত। প্রমাণের সাহায্যে প্রমাতার নিকট বিষয়ের প্রকাশই প্রমাণফল।[২] প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণমূলেই জীবের বিষয়দর্শন ও ব্যাবহারিক জীবন চলিতেছে। বস্তুতঃ জীবের জীবত্বই মিথ্যা ; সুতরাং তাঁহার বিষয়দর্শন ও ব্যাবহারিক জীবন সমস্তই মায়ার খেলা। জীব কর্তাও নহে, ভোক্তাও নহে, জ্ঞাতাও নহে ; সে ব্রহ্মই বটে। অনাদি অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা বলিয়া অভিমান করিতেছে, সংসারের সুখে দুঃখে কত হাসিতেছে, কান্দিতেছে। জীবের জীবভাবের মূল অনাদি-অবিদ্যা যখন তিরোহিত হইবে, তখন জীববিন্দু ব্রহ্মসিন্ধুতে মিশিয়া যাইবে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনরূপ ভেদই থাকিবে না। জীব ও ব্রহ্মের ভেদবুদ্ধিই মিথ্যা বুদ্ধি। এই মিথ্যা বুদ্ধির বিলোপ এবং তাহার ফলে সর্বপ্রকার অজ্ঞানমূলক অনর্থের নিবৃত্তি ও জীব-ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকারই বেদান্তের কাম্য। ইহাই "আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে", এই কথাদ্বারা ভাষ্যকার আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের বিদ্যার প্রতিপত্তি শব্দের অর্থই ব্রহ্মবিদ্যার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার। নতুবা, তুল্যার্থক বিদ্যা ও প্রতিপত্তি শব্দের প্রয়োগের অন্য কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

অনাদি-অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে কি ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে ? অনাদি-পদার্থের নিবৃত্তি হয় কি ? ইহার উত্তরে প্রকাশাত্মযতি বলেন যে, অনাদি প্রাগভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, বৌদ্ধদার্শনিকদিগের মতে তত্ত্বানুশীলনের ফলে অনাদি-বাসনা-প্রবাহের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। নৈয়ায়িকদিগের মতেও অনাদি মিথ্যা-জ্ঞান-প্রবাহের নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যদর্শনেও অনাদি অবিবেকের নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং অনাদি-পদার্থের নিবৃত্তি হয় না, এমন কথা বলা চলে না। যদি বল যে, অবিদ্যা ভাবরূপ, অভাবরূপ নহে ; অনাদি-ভাবপদার্থের নিবৃত্তি হইতে তো দেখা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবেদান্তের মতে অবিদ্যা বস্তুতঃ ভাবপদার্থ নহে। উহা অনির্বচনীয় তত্ত্ব, ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে। এই অবস্থায় অবিদ্যাকে ভাববস্তু বলিয়া অনিবৃত্তির আপত্তি করা চলে না। তারপর, অনাদি (ভাব) বস্তুর নিবৃত্তি হয় না, ইহা একটি সাধারণ (ব্যাপ্তি) জ্ঞান। জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে, ইহা একটি বিশেষ (ব্যাপ্তি) জ্ঞান। বিশেষজ্ঞান

১। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ৭১ পৃঃ।

২। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ৭০-৭৩ পৃঃ।

সামান্যজ্ঞান অপেক্ষায় প্রবল। সামান্যজ্ঞান দ্বারা বিশেষজ্ঞানের বাধ হইবে না, বিশেষজ্ঞান দ্বারাই সামান্যজ্ঞানের বাধ হইবে। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে এবং জীব ও ব্রহ্ম সর্বপ্রকারে অভিন্ন হইয়া যাইবে।

অনাদি-অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব

ভেদাভেদবাদীর মতে জীব হইতে ব্রহ্ম ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, এইমত শঙ্করাচার্য তদীয় ভাষ্যে পরস্পরবিরোধী বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ভাষ্যকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকাশাত্মযতিও ভেদাভেদবাদ পরস্পরবিরোধী বলিয়া খণ্ডন করিয়া অভেদবাদই সমর্থন করিয়াছেন।[১] তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদই হইয়া যাইবে। জীব প্রতিবিম্ব ঈশ্বর বিম্ব। বিম্ব ঈশ্বর, প্রতিবিম্ব জীবের মধ্যে কোনই ভেদ নাই, ভেদ অজ্ঞানের কল্পনা ও মিথ্যা। তত্ত্বজ্ঞান কাহার? বিম্বের না, প্রতিবিম্বের? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশাত্মযতি বলেন যে, যাঁহার ভ্রান্তি তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞান। ভ্রান্তি অজ্ঞানের ফল। অজ্ঞতাই জীবভাবের নিমিত্ত, সুতরাং জীবেরই তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ত্ব বুঝিতে হইবে, বিম্বভূত ঈশ্বরের নহে। 'ন বিম্বকৃতং তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্ কিন্তু ভ্রান্তত্বকৃতম্ তদপ্যজ্ঞত্বকৃতম্ তদপি জীবনিমিত্তমিতিভাবঃ' (বিবরণ, ৬৫ পৃঃ)। এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জীবের অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হইয়া জীব যে বস্তুতঃ আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ, এই সত্য প্রতিভাত হইবে; জীব ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিবে। ইহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান। অবিদ্যাবশে যে ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ অবিদ্যা-বিভ্রমের নিবৃত্তি করিতে পারে। "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি"—প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য শ্রবণ ও মননের ফলে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানেরই উদয় হইয়া থাকে। বেদ, উপনিষদ বা বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রই অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞানে একমাত্র প্রমাণ। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" প্রভৃতি শ্রুতি স্পষ্টতঃই পরম পুরুষ, পরব্রহ্মের স্বরূপ যে উপনিষদ হইতে জানা যায়, তাহা বলিয়া দিতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, শাস্ত্র শব্দ প্রমাণ এবং পরোক্ষ প্রমাণ। পরোক্ষ শব্দপ্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইবে কিরূপে? পরোক্ষ-প্রমাণজন্য জ্ঞান পরোক্ষই হইবে। ইহার উত্তরে প্রকাশাত্মযতি বলেন যে, প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। বিষয় যে প্রত্যক্ষ হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব, যাহা স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রমাণ এবং সর্বদা প্রত্যক্ষ। জ্ঞান কখনও উদিত হইলে অপ্রত্যক্ষ থাকে না, থাকিতে পারে না।

অবিদ্যার নিবৃত্তি ও আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তিই জীবের মুক্তি।

শব্দ প্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই উদয় হয় এবং তাহার ফলে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হয় এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

১। বিবরণ, ৯৬ পৃঃ।

শ্রুতিও জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই একমাত্র সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন "সাক্ষাদপরোক্ষং ব্রহ্ম"। এই স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বদা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অভেদ সম্বন্ধে যে বিষয় অন্বিত হইবে, জ্ঞানের প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে। জ্ঞেয় বস্তু যখন অব্যবধানে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) জ্ঞাতার প্রতীতির বিষয় হয়, তখনই তাহা হয় প্রত্যক্ষ। বিষয়ের এই প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্যই হউক, কি পরোক্ষ প্রমাণজন্যই হউক, প্রমাণের প্রত্যক্ষতায় বা অপ্রত্যক্ষতায় জ্ঞানের বিশেষ কিছু আসে যায় না। দেখিতে হইবে যে, ঐ জ্ঞানোদয়ে জ্ঞেয় বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে কি-না। যদি পরোক্ষ প্রমাণমূলেও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার প্রতীতির বিষয় হয়, তবে ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইবে। কেননা, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষবিষয়ের জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান, এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশাত্মযতি স্বীকার করেন না। তিনি প্রমাণের স্বভাব অনুসারে (প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতা দ্বারা) প্রমাণজন্য জ্ঞানের স্বভাব (প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতা) নির্ধারণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে জ্ঞেয় বিষয়টি প্রত্যক্ষ, কি অপ্রত্যক্ষ, ইহা দেখিয়াই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। কোন পরোক্ষ প্রমাণবলেও বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইলে, সেই জ্ঞান প্রকাশাত্মযতির মতে প্রত্যক্ষই হইবে, পরোক্ষ হইবে না।[১] "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য শ্রবণের ফলে যে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, তাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্মবিজ্ঞান, পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। শব্দজন্য ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে, বাধা কি ?[২] 'শব্দাদেবাপরোক্ষনিশ্চয়নিমিত্তং ভবতীতি গম্যতে' (বিবরণ. ১০৩ পৃঃ)। এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলে জীবের প্রত্যক্ষ অবিদ্যাবিভ্রম নিবৃত্তি হইয়া জীব নিত্য আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

১। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ১০৩ পৃঃ।

২। বিবরণ, ১০৩-৪ পৃঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্য

সুরেশ্বরাচার্যের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল মণ্ডনমিশ্র। বিদ্যারণ্যকৃত শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ে (শঙ্করদিগ্‌বিজয় vii—113 to 117) দেখা যায় যে, মণ্ডনমিশ্র উম্বেক এবং বিশ্বরূপ নামেও পরিচিত ছিলেন। বিদ্যারণ্য তৎকৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহে (৯২ পৃঃ,) সুরেশ্বরাচার্য-রচিত বার্তিকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা হইতে সুরেশ্বরের অপর নাম যে বিশ্বরূপ ছিল, তাহা জানা যায়।[১] আমরা পূর্বেই (শঙ্করাচার্যের জীবনী আলোচনাপ্রসঙ্গে ২০০ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছি যে, মীমাংসক-শিরোমণি মণ্ডনমিশ্র অদ্বৈতগুরু শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া আচার্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বরাচার্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরাচার্য খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান্ ছিলেন এবং পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা, এই উভয়বিধ মীমাংসা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।[২] তিনি স্বীয় মনীষাবলে বেদান্ত ও মীমাংসায় যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তির দৃঢ়তায়, চিন্তার গভীরতায়, বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির নৈপুণ্যে সুধীজনের উপভোগ্য হইয়াছে।

মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্যের রচিত গ্রন্থাবলী।

মণ্ডনমিশ্র মীমাংসাদর্শনে মীমাংসানুক্রমণিকা, ভাবনাবিবেক ও বিধিবিবেক, এই তিনখানি গ্রন্থ, ভর্তৃহরি ও অপরাপর বৈয়াকরণ আচার্যগণের অঙ্গীকৃত স্ফোটবাদের সমর্থনে স্ফোটসিদ্ধি গ্রন্থ, ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনায় বিভ্রমবিবেক ও অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসিদ্ধি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। মণ্ডনমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য নাম গ্রহণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধি,

---

১। বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ, ৯২ পৃঃ, বিজয়নগর সং, বৃহদারণ্যক-বার্তিক Part II, P. 640, verse 1031 quoted under the name of Viśvarūpācārya. Also see পরাশরমাধবীয়স্মৃতি Bombay Sanskrit and Prakrit Series, vol I, Part I, P. 57, বৃহদারণ্যক-বার্তিক Part I, verse 97.

২। বিদ্যারণ্যকৃত শঙ্করদিগ্‌বিজয় নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, মণ্ডনমিশ্র মীমাংসক-শিরোমণি কুমারিলভট্টের নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কুমারিলভট্ট মণ্ডনমিশ্রের প্রতিভায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আচার্য শঙ্কর যখন কর্মমীমাংসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কুমারিলভট্টের নিকট বিচারার্থ গমন করেন, তখন কুমারিলভট্ট তাঁহাকে মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। ইহা হইতে মণ্ডনমিশ্র যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বৃহদারণ্যক-বার্তিক, তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্‌ভাষ্য-বার্তিক, পঞ্চীকরণ-বার্তিক প্রভৃতি বার্তিকগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।[১] মণ্ডনের মীমাংসাগ্রন্থ তিনখানির মধ্যে বিধিবিবেক আয়তনে বৃহৎ এবং বিচারবহুল। এই গ্রন্থে বিধির (Vedic Injunction) স্বরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। ইহার উপর বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়কণিকা নামে টীকা আছে। ব্রহ্মসিদ্ধির উপর বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বসমীক্ষা টীকা রচনা করেন। ন্যায়কণিকায় বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

তত্ত্বসমীক্ষা ব্রহ্মসিদ্ধির প্রাচীন এবং প্রামাণিক টীকা। পরবর্তী বহু গ্রন্থে ব্রহ্মসিদ্ধি ও তত্ত্বসমীক্ষার নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] তত্ত্বসমীক্ষা ব্যতীত ব্রহ্মসিদ্ধির উপর নিত্যবোধঘনাচার্যের টীকা, আনন্দপূর্ণের ভাবশুদ্ধি নামক টীকা, চিৎসুখাচার্যের অভিপ্রায়প্রকাশিকা টীকা ও আচার্য শঙ্খপাণির ব্রহ্মসিদ্ধি টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্খপাণির টীকাসহ ব্রহ্মসিদ্ধি মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীর সম্পাদনায় মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে বিগত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী ব্রহ্মসিদ্ধির ভূমিকায় ভাবশুদ্ধি ও অভিপ্রায়প্রকাশিকা টীকার হস্তলিখিত আদর্শের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতিকৃত তত্ত্বসমীক্ষার কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই।[৪]

১। সুরেশ্বরের বার্তিকের উপর আনন্দজ্ঞানের সরল ও সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। বৃহদারণ্যক-বার্তিকের উপর বিদ্যারণ্যের বার্তিকসার নামে টীকা ও পঞ্চীকরণ-বার্তিকের উপর পঞ্চীকরণ-বার্তিকাভরণ প্রভৃতি টীকার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা আমরা পূর্বেই ২০৪ ও ২০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি।

২। (ক) তদেতৎ ব্রহ্মসিদ্ধৌকৃতপ্রমাণং সুগমমিতি নেহ প্রপঞ্চিতম্। ন্যায়কণিকা, ৮০ পৃষ্ঠা, কাশী সংস্করণ।

(খ) সর্বং চৈতৎব্রহ্মসিদ্ধৌ কৃতপ্রমাণামনায়াসমধিগমনীয়মিতিনেহ অস্মাভিরুপপাদিতম্। ন্যায়কণিকা, ২৮১ পৃঃ।

৩। বাচস্পতিমিশ্র ভামতীর সমাপ্তি শ্লোকে তত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। অমলানন্দ তদীয় বেদান্তকল্পতরুতে ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা তত্ত্বসমীক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (বেদান্ত কল্পতরু, নির্ণয় সাগর সং, ১০২১ পৃঃ), আনন্দবোধভট্টারকাচার্য তৎকৃত প্রমাণমালায় (চৌখাম্বা সং, ১০ পৃঃ) ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য তত্ত্বপ্রদীপিকায় (নির্ণয় সাগর সং, ১৪০ পৃঃ) ব্রহ্মসিদ্ধির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহে (নির্ণয় সাগর সং, ২২৪ পৃঃ) ও অপ্যয়দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে (কুম্ভকোণ সং, ৪৩৪ পৃঃ) ব্রহ্মসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। Inspite of my best efforts, I have not till now been able to acquire anywhere a manuscript of Vācaspatimiśra's Tattva-samīkhṣā, which is the oldest commentary of Brahmasiddhi hitherto known. Among the Commentaries on the Brahmasiddhi, which are described above as available in the Government Oriental Manuscripts Library, the manuscripts of the Abhiprāyaprakāśikā and the Bhāvaśuddhi were found to have many gaps, and so, they have not been included in this edition, though they were frequently consulted. Preface of the Brahmasiddhi, P. XVIII.

সুরেশ্বরাচার্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ।[১] বিদ্যারণ্য, অপ্যয়দীক্ষিত, সদানন্দ প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতেই এই গ্রন্থের প্রামাণ্য সুস্থির হয়। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। গদ্যে বিচার করিয়া শ্লোকদ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা চার অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে অধ্যাস বা অবিদ্যার স্বরূপ, অবিদ্যাই সর্ববিধ দুঃখের কারণ, অবিদ্যার নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। যথার্থ আত্মবোধের উদয় হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। আত্মজ্ঞানই অজ্ঞাননিবৃত্তির একমাত্র সাধন, কর্ম ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধন নহে। ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মা ও অনাত্মার বিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উপর জ্ঞানোত্তমমিশ্রের চন্দ্রিকা-টীকা ও চিৎসুখাচার্যের ভাবতত্ত্বপ্রকাশিকা নামে টীকা আছে। জ্ঞানোত্তম-মিশ্র চিৎসুখের পূর্ববর্তী সুতরাং তাঁহার চন্দ্রিকাই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির প্রাচীন টীকা। এই টীকাদ্বয় ব্যতীত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উপর জ্ঞানামৃতের বিদ্যাসুরভি, অখিলাত্মনের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-বিবরণ ও রামদত্তের সারার্থ নামক টীকাও রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

সুরেশ্বরাচার্য নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে শঙ্করবেদান্ত-মত সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধিতে তাহা করেন নাই। ব্রহ্মসিদ্ধির দার্শনিক মত নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধির দার্শনিক মতের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রহ্মসিদ্ধির অনেক সিদ্ধান্তই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির বা শঙ্করবেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুরূপ নহে। ইহা হইতে কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, ভিন্ন ব্যক্তি। মণ্ডনমিশ্র যে ব্রহ্মসিদ্ধি রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রীধরাচার্য তৎকৃত ন্যায়কন্দলী টীকায় (ন্যায়কন্দলী, ২১৮ পৃঃ এবং চিৎসুখাচার্য তদীয় তত্ত্বপ্রদীপিকায় (তত্ত্ব প্রঃ, ১৪০ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য ব্রহ্মসিদ্ধি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কোথাও জানা যায় না। তিনি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি এবং বৃহদারণ্যক-বার্তিক প্রভৃতির রচয়িতা বলিয়াই জানা যায়। মণ্ডনের রচিত এবং সুরেশ্বরের রচিত গ্রন্থাবলীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যখন ভিন্নরূপ, তখন ঐ ব্যক্তিদ্বয় বিভিন্ন কি-না, এইরূপ প্রশ্ন মনে আসা একান্তই স্বাভাবিক।

মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্য এক ব্যক্তি কি-না ?

বিগত ইং ১৯২৩ সনে অধ্যাপক হিরণ্ণ (Hiriyanna of Mysore) তাঁহার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে

১। সুরেশ্বরকৃত ইষ্টসিদ্ধি বা স্বারাজ্যসিদ্ধির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অমলানন্দ বেদান্ত কল্পতরুতে ইষ্টসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, (বেদান্ত কল্পতরু, ৫১১ পৃঃ, বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ্ দ্রষ্টব্য)। বেদান্তসারের টীকাকার রামতীর্থ তাঁহার বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীতে ইষ্টসিদ্ধির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, বেদান্তসার, ১৮৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

এ বিষয়ে সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১] তিনি উভয়ের দার্শনিক মতের পার্থক্যের কথাই প্রধানতঃ তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। সুরেশ্বর শৃঙ্গেরীমঠের মঠাধীশ ছিলেন। শৃঙ্গেরীমঠের মঠাধ্যক্ষগণের বিবরণ তত্রত্য গুরুবংশ-কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুবংশ-কাব্যে মণ্ডনমিশ্র এবং সুরেশ্বরাচার্য বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। অধ্যাপক হিরণ্য গুরুবংশ-কাব্যের উক্তিকে অন্যতম প্রধান প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে মণ্ডন এবং সুরেশ্বর এক ব্যক্তি নহেন, ভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধ্যাপক হিরণ্যের মত অনুবর্তন করিয়া মাদ্রাজের মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীও তাঁহার সম্পাদিত ব্রহ্মসিদ্ধির ভূমিকায় মণ্ডন ও সুরেশ্বর এক ব্যক্তি নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই অনুমোদন করিয়াছেন।[২] আমরা এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, আমাদের দেশে মণ্ডনমিশ্র শঙ্করাচার্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বরাচার্য বলিয়া পরিচিত হন, এই মতই সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যারণ্য তাঁহার শঙ্করদিগ্বিজয়ে ঐ সাম্প্রদায়িক মতের অনুবর্তন করিয়া মণ্ডন ও সুরেশ্বরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন—(শঙ্করদিগ্বিজয় x4)। অধ্যাপক জেকবি (Col. G. A. Jacob.) তাঁহার সম্পাদিত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির ভূমিকায় (দ্বিতীয় সংস্করণ) এ দেশের সাম্প্রদায়িক মতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। অধ্যাপক হিরণ্য ব্রহ্মসিদ্ধির এবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের মতে মণ্ডনমিশ্র একাধারে অসাধারণ বৈদান্তিক এবং মীমাংসক আচার্য ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে তিনি ব্রহ্মসিদ্ধি রচনা করিয়াছিলেন। এই রচনায় শঙ্কর-বেদান্তের কোন প্রভাব নাই। ইহা তাঁহার স্বাধীন রচনা। শঙ্করের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিল, প্রতিপক্ষ বৈদান্তিকের প্রতি প্রতিপক্ষ বৈদান্তিকের দৃষ্টি। এই অবস্থায় তাঁহার

১। অধ্যাপক হিরণ্যকর্তৃক লিখিত Journal Royal Asiatic Society প্রবন্ধ April 1923, and January 1924 দ্রষ্টব্য।

২। A careful study of Maṇḍanamiśra's Brahmasiddhi in comparison with his other known works, all of which are now available in print, and with the known works of Sureśvara and Saṁkara........ and a careful consideration of the references to Maṇḍana contained in certain important works of Mīmāṁsā, Nyāya, Dvaita-Vedānta and other systems have made it possible to assemble here several data of overwhelming cumulative weight, which would be quite sufficient to kill the common belief in the Maṇḍana-Sureśvara equation, and to exhibit Maṇḍana and Sureśvara as two different individuals, maintaining strikingly divergent views within the purview of Advaitism.

Introduction of the Brahmasiddhi, edited by M. M. Kuppuswāmi Śāstri, P. XXVI.

গ্রন্থ যে শঙ্করের প্রভাবমুক্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। চিন্তার স্বৈরগতিতে, তর্কের আলোকচ্ছটায় ব্রহ্মসিদ্ধি বেদান্তচিন্তায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ব্রহ্মসিদ্ধি শঙ্করের পূর্ববর্তী বেদান্তমতের (Pre-Saṁkara Vedānta) গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ শঙ্করের পূর্ব-বেদান্তের (Pre-Saṁkara Vedānta) শেষ গ্রন্থ। শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর মণ্ডনমিশ্র নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বার্তিক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহার গুরু শঙ্করাচার্যের মত যে সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর কোন কোন অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মণ্ডন স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া গুরুর মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই এবং এই জন্য মণ্ডন ও সুরেশ্বরকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবার অনুকূলে কোন দৃঢ় যুক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না। দার্শনিক তাঁহার পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফলে স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া থাকেন, দার্শনিকের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।[১] মণ্ডন-সুরেশ্বরের মত পরিবর্তন করিবার যে সঙ্গত কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তারপর, গুরুবংশ-কাব্যে মণ্ডন এবং সুরেশ্বরকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অতএব তাঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তও নিঃসন্দেহ নহে। গুরুবংশ-কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ৪৪ হইতে ৬০ শ্লোকে গৃহস্থ বিশ্বরূপ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বরাচার্য হইয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। গুরুবংশ-কাব্যের ঐ সর্গের ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্যের বিশ্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে মণ্ডনমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, বিশ্বরূপ ও মণ্ডনমিশ্র ভিন্ন ব্যক্তি। গুরুবংশ-কাব্য আলোচনা করিলে উহাতে মণ্ডন নামে দুই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন মণ্ডন গৃহী ছিলেন। তিনিও শঙ্করের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গৃহস্থ ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অপর মণ্ডন গৃহস্থাশ্রমে বিশ্বরূপ নামে পরিচিত ছিলেন, এবং পরবর্তী জীবনে শঙ্করের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বরাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গুরুবংশ-কাব্যের উল্লিখিত আলোচনা

১। Even more far-reaching doctrinal differences are clearly discernible in the works of one and the same author. An undoubted master of Advaita as the Saṁkarabhagavatpadācārya condemns the sphoṭavāda in unmistakable terms in his Brahma-sūtra-Bhāṣya whilst he has accepted the same in what in presumably his earlier work, in his Bhāṣya on the Māṇḍukyopaniṣad, when he says abhidhānābhidheya-yorekatvepi abhidhānaprādhānyena nirdeśaḥ kṛtah, etc. P. 91 of Vol. V of Saṁkara's works, Śrī Vāṇi Vilās Edition. Compare also Saṁkaras Bhāṣya on the Kenopaniṣad on 1-4 and Ānandagiris commentary thereon.

Foreword on the Brahmasiddhi P. VI, edited by Kuppuswāmi Sāstrī.

আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। চিদ্‌বিলাস-রচিত শঙ্কর-বিজয়-বিলাস নামক শঙ্কর-জীবনীর অষ্টাদশ অধ্যায়ে মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বরাচার্য যে অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে শঙ্করবিজয়-বিলাসের সেই শ্লোককয়টি উদ্ধৃত করিয়া এখানেই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

"ততো মণ্ডনমিশ্রো'সৌ সমুত্থায়াতিভক্তিতঃ।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কৃত্য সহস্রশঃ॥
* * * *
দদৌ মণ্ডনমিশ্রায় সন্ন্যাসং জিতরেতসে।
সুরজ্যেষ্ঠাংশজাতত্বাজ্ জ্ঞাত্বা তদ্দেশিকোত্তমঃ।
সুরেশ্বরাচার্য ইতি মুদাভিখ্যামদাত্তদা॥[১]"

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি শঙ্করের পূর্ববর্তী বেদান্তের (Pre-Śaṁkara Vedānta) শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মণ্ডনের বেদান্ত-চিন্তা শঙ্করমতের অনুগমন করে নাই। উহা প্রাচীন খাতে, উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির পথে প্রবাহিত হইয়া বিচিত্র চিন্তালহরীর সৃষ্টি করিয়াছে। মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি (১) ব্রহ্মকাণ্ড, (২) তর্ককাণ্ড, (৩) নিয়োগকাণ্ড এবং (৪) সিদ্ধিকাণ্ড এই চার কাণ্ড বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডই পদ্যে ও গদ্যে লিখিত। পদ্যের মর্ম গদ্যে বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডে নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার পূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তর্ককাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তুর অস্তিত্বই প্রতিপাদন করে, দ্বৈত বস্তুর বা ভেদের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ গম্য নহে,—"ভেদো ন প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে" শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষের বিরোধে শ্রুতি প্রমাণই প্রবলতর, এই মত সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে স্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় নিয়োগকাণ্ডে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ চিদানন্দঘন ব্রহ্ম বেদান্তের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মকাণ্ড বেদ ও ক্রিয়াবোধক বিধির কোন অবকাশ নাই, ইহাই সুদীর্ঘ আলোচনাদ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সিদ্ধিকাণ্ডে সংক্ষেপে মুক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মসিদ্ধির আরম্ভে পরব্রহ্মের নমস্কারশ্লোকেই মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন :—

মণ্ডনের বেদান্ত মত

ব্রহ্মের স্বরূপ

আনন্দমেকমমৃতমজং বিজ্ঞানমক্ষরম্।
অসর্বং সর্বমভয়ং নমস্যামঃ প্রজাপতিম্॥ ব্রহ্মসিদ্ধি, ১ পৃঃ।

[১] See Śaṁkaravijaya-vilāsa, ch 18. Adyar Library manuscript.
উক্ত প্রস্তাবের উদ্ধৃত শ্লোক ও অপরাপর অনেক তথ্য ব্রহ্মসিদ্ধির সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিকর্তৃক লিখিত Foreword হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নমস্কারের প্রথম কথায়ই ব্রহ্মকে "আনন্দম্" বা আনন্দময় বলা হইয়াছে। নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মকে যে "আনন্দম্" বলা হইয়াছে ইহার অর্থ কি? ব্রহ্ম "আনন্দম্" বা আনন্দময় হইলে নির্বিশেষ হইবেন কিরূপে? ইহার উত্তরে কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, আনন্দ বলিলে দুঃখের অভাব বুঝায়, কোন ভাবরূপ (positive) ধর্মকে বুঝায় না। দুঃখের অভাবই আনন্দ, দুঃখের অভাব আনন্দ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, আনন্দস্বরূপই বটে। বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে কোনরূপ দুঃখ-সংস্পর্শ নাই, ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে।[১] মণ্ডনমিশ্রের মতে ব্রহ্মানন্দ ভাবরূপ, অভাবরূপ নহে। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে সাংসারিক আনন্দকে ব্রহ্মানন্দের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ বা অভিব্যক্তিরূপে বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।[২] জাগতিক আনন্দকে লোকে ভাবরূপে, চিত্তের হ্লাদিনী বৃত্তির বিকাশ বলিয়াই উপলব্ধি করে, সুতরাং ব্রহ্মানন্দও ভাবরূপই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদে আত্মাকে "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ", "প্রেয়ো বিত্তাৎ" এইরূপে পরপ্রেম-নিদান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় আত্ম-প্রেমকে ভাববস্তু-রূপেই উপনিষদে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রেমই আনন্দ সুতরাং আনন্দও ভাবরূপই বটে। আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, আনন্দ ব্রহ্মের গুণ বা ধর্ম নহে, সুতরাং আনন্দকে ভাবরূপে গ্রহণ করায়ও ব্রহ্মের সগুণ বা সবিশেষ হইবার প্রশ্ন উঠে না। স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, আনন্দের সমুদ্র, ইহাই "বিজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম" এই ব্রহ্মস্বরূপ-বোধক শ্রুতির তাৎপর্য। শ্রুতি প্রতিপাদিত আনন্দ ও বিজ্ঞান ভিন্ন তত্ত্ব নহে; বিজ্ঞানই আনন্দ, আনন্দ বিজ্ঞান, এই উভয়ই বস্তুতঃ অভিন্ন—'বিজ্ঞানমেবানন্দঃ আনন্দ এব বিজ্ঞানমিতি' (শঙ্খপাণি-টীকা, ১৯ পৃঃ)। উভয় শব্দেই ব্রহ্মকে বুঝায়,—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই শব্দদ্বয়ের প্রতিপাদ্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় শব্দের এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইলে তুল্যার্থক এই দুইটি শব্দ পর্যায়শব্দই হইয়া দাঁড়ায় এবং তুল্যার্থক দুইটি শব্দ প্রয়োগ করার কোনই অর্থ হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের একটি লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দেশ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন বস্তুর লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বস্তুর নিজের যাহা স্বভাব তাহা যেমন দেখাইতে হয়, সেইরূপ অপরাপর বস্তু হইতে ঐ বস্তুর বৈসাদৃশ্যও উল্লেখ করিতে হয়। ব্রহ্মলক্ষণে বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা চিন্ময় ব্রহ্ম জড় বস্তু হইতে বিসদৃশ, এই বৈসাদৃশ্য এবং আনন্দ শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, দুঃখস্বরূপ নহে, এইরূপে আনন্দময় ব্রহ্মে জাগতিক সুখ দুঃখের বৈধর্ম্য বা অসদ্‌ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতির বিজ্ঞানম্ ও আনন্দম্, এই পদদ্বয় বিভিন্ন প্রকার তাৎপর্যের সূচনা করে বলিয়া পর্যায়শব্দও নহে, নিরর্থকও নহে।[৩] বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ব্রহ্ম, অজ, অক্ষর,

---

১। বিজ্ঞানাত্মনো ব্রহ্মণো দুঃখাভাবোপাধিরেব আনন্দশব্দঃ। - - - তস্মাদ্দুঃখোপরম এব আনন্দস্য ব্রহ্মণ্যর্থ ইতি। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪-৫ পৃঃ।

২। বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২-৩৩

৩। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৫ পৃঃ।

এক, অদ্বিতীয়, অমৃত, অভয়তত্ত্ব, এইরূপে মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মণ্ডনমিশ্র অদ্বয়ব্রহ্মবাদী হইলেও শঙ্করোক্ত অদ্বয়ব্রহ্মবাদ ও মণ্ডনের ব্রহ্মবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। মণ্ডনমিশ্র তাঁহার গ্রন্থে শব্দব্রহ্মবাদী উপনিষৎ সম্প্রদায়ের আচার্য ভর্তৃহরির মতের অনুবর্তন করিয়াছেন এবং ভর্তৃহরির স্বীকৃত স্ফোটবাদ[১] এবং শব্দাদ্বৈতবাদ বা শব্দব্রহ্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন। স্ফোটবাদের সমর্থনে স্ফোটসিদ্ধি নামে একখানা গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণদিগের মতে শব্দ চার প্রকার (১) পরা, (২) পশ্যন্তী, (৩) মধ্যমা এবং (৪) বৈখরী। "পরা" বাক্ স্থির বিন্দুরূপে মূলাধারে অবস্থান করে। "পশ্যন্তী" দেহমধ্যস্থ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া মূলাধার হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত গমন করিয়া তথায় অবস্থান করে। পরা এবং পশ্যন্তী, এই দ্বিবিধ বাক্ই ব্রহ্মরূপ সরস্বতী। ইহা অব্যক্তনাদ, অনাহতধ্বনি বা শব্দব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত। ইহা আমাদের অবাঙ্মনসগোচর,

মণ্ডনমিশ্রের শব্দব্রহ্মবাদ ও শঙ্করাচার্যের অদ্বয়ব্রহ্মবাদ।

১। স্ফোট কাহাকে বলে? শব্দ শুনিয়া যে অর্থ বোধের উদয় হয়, সেখানে কেহ কেহ বলেন যে, শব্দ যে সকল বর্ণসমষ্টিদ্বারা গঠিত হইয়াছে, এই বর্ণসমষ্টিই শব্দের অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বর্ণ হইতে অর্থবোধ হয় না, বর্ণসকল উচ্চারণ করামাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়, উহাদের সমষ্টি অসম্ভব, সুতরাং বর্ণকে কোন মতেই অর্থের বাচক বলা চলে না। ঐ বর্ণময় শব্দের অন্তরালে স্ফোট নামে এক প্রকার নিত্য শব্দ আছে, ঐ স্ফোটরূপ নিত্য শব্দই অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থকে প্রস্ফুটিত করে বলিয়াই উহাকে "স্ফোট" বলা হইয়া থাকে। স্ফোট নিত্য, অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই শব্দের প্রকৃত রূপ। বর্ণ, পদ, বাক্য প্রভৃতি ঐ অখণ্ড স্ফোটরূপ অক্ষরব্রহ্মের সখণ্ড, মিথ্যা অভিব্যক্তি। সমস্ত বাঙ্ময় জগৎই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত। শব্দের এই বাঙ্ময় বিবর্তরূপ মিথ্যা, নিত্য ব্রহ্মরূপই সত্য। স্ফোটবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। এই স্ফোটবাদ ষড়্দর্শনের মধ্যে পাতঞ্জলদর্শন ব্যতীত অপর কোন দর্শনেই স্বীকার করা হয় নাই। স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিকগণের আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, যাহারা বর্ণের অতিরিক্ত, শব্দার্থের প্রকাশক নিত্য 'স্ফোট' স্বীকার করেন, তাঁহারা বর্ণকেই স্ফোটের ব্যঞ্জক বা প্রকাশ বলিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন এই যে, এক একটি বর্ণই স্ফোটের প্রকাশক হইবে, না, সমুদয় বর্ণগুলি মিলিতভাবে স্ফোটের প্রকাশক হইবে? যদি স্ফোটবাদী বলেন যে, এক একটি বর্ণই স্ফোটের প্রকাশক হইবে, তবে 'গ্' বলামাত্রই গরু বোঝা উচিত, কিন্তু তাহা তো বুঝা যায় না; সুতরাং গ্, ঔ, স্ এই তিনটি বর্ণ মিলিতভাবেই 'গৌঃ' এই পদস্ফোটের ব্যঞ্জক, এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ণসকল উচ্চারিত হইবার পরক্ষণেই ধ্বংস হইয়া যায়, বর্ণের সমষ্টি বা মিলন অসম্ভব ইহা স্ফোটবাদীই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি বর্ণের সমষ্টিকে কোন মতেই স্ফোটের প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, ফলে তাঁহার মতে স্ফোটের প্রকাশ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তারপর, যদি বর্ণের সমষ্টি বা মিলন সম্ভবপরই হয়, তবে সেই বর্ণসমষ্টিকে স্ফোটের ব্যঞ্জক না বলিয়া সোজাসুজি অর্থের ব্যঞ্জক বলিতেই বা বাধা কি? অর্থবোধের জন্য মধ্যবর্তী "স্ফোট" নামক স্বতন্ত্র পদার্থ মানার কোনই হেতু নাই। বর্ণকে স্ফোটের এবং স্ফোটকে অর্থের ব্যঞ্জক বলিলে গৌরব স্বীকার করিতে হয়, বর্ণকে অর্থের ব্যঞ্জক বলিয়া মানিলে অনেক লাঘব হয় সুতরাং স্ফোটবাদ স্বীকার্য নহে।

ঋষির জ্ঞাননেত্রে, যোগীর যোগদৃষ্টিতে শব্দব্রহ্মের এই অব্যক্ত সূক্ষ্মরূপ ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে বাক্ আমাদের হৃদয় দেশে অবস্থান করে তাহার নাম "মধ্যমা"; কান বন্ধ করিলে দেহের মধ্যে যে শব্দ শুনা যায়, তাহাই "মধ্যমা" বাক্ বলিয়া অভিহিত হয়। বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বাক্য উচ্চারিত হইয়া আমাদের শ্রুতি-গোচর হয় ইহাকে "বৈখরী" বাক্ বলা হইয়া থাকে। বিখর শব্দে ইন্দ্রিয় বা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংঘাতকে বুঝায়। এইজন্য দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের ফলে উৎপন্ন কণ্ঠদেশে অবস্থিত বাক্যের নাম "বৈখরী"।[১] মধ্যমা বাক্ হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাদের হৃদয়স্থ ভাবপ্রকাশে সহায়তা করে সুতরাং বৈয়াকরণগণ এই মধ্যমা বাক্‌কে আখ্যা দিয়াছেন "স্ফোট"। এই স্ফোটরূপ শব্দই নিত্য ব্রহ্মবোধক শব্দ। ইহা স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞান-স্বরূপ। অর্থকে প্রস্ফুটিত করে বলিয়াই ইহাকে স্ফোট বলা হয়—'স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি স্ফোটঃ, নিষ্কর্ষেতু ধ্বন্বেব স্ফোটঃ'। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ের প্রারম্ভেই স্ফোটরূপ শব্দব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, শব্দের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা অনাদি নিধন ব্রহ্মবস্তু। শব্দব্রহ্মের কোনরূপ ক্ষয়-ব্যয় নাই, এইজন্যই তাহাকে "অক্ষর" বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য ঐ শব্দব্রহ্মের বিবিধপ্রকার বিবর্তরূপের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে নিখিল বাঙ্ময় জগতের অভিব্যক্তি হয়।[২] শব্দব্রহ্মের বিবর্ত সমগ্র বাঙ্ময় জগৎই কার্য ও অনিত্য। বর্ণ, পদ, বাক্য প্রভৃতি কার্যশব্দেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। ঐ কার্য বা অনিত্য শব্দের মধ্য দিয়া নিত্য শব্দব্রহ্মের ভাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। বিবর্তবাদী বৈদান্তিকের অখণ্ড জ্ঞান যেমন ঘটাদি জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়া সসীম, সখণ্ড হইয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিত্য শব্দব্রহ্ম ও অনিত্য বর্ণ, পদ, বাক্য প্রভৃতির আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়া পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন

১। পরাবাঙ্মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা।। বাক্যপদীয়, ১।১১৪,
যস্যাঃ শ্রোত্রবিষয়ত্বেন প্রতিনিয়তং শ্রুতিরূপং সা বৈখরী।
বিখর ইতি দেহেন্দ্রিয়সংঘাত উচ্যতে, তত্র ভবা বৈখরীত্যুক্তম্।
স্থানেষু বিকৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী বাক্ প্রযোক্তৄণাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধনা।।
যা পুনরন্তঃ সংকল্প্যমানক্রমবতী শ্রোত্রগ্রাহ্যবর্ণরূপা অভিব্যক্তিরহিতা বাক্ মধ্যমা তদুক্তম্—
কেবলং বুদ্ধ্যুপাদানা ক্রমরূপানুবর্তিনী।
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ততে।।
যাতু গ্রাহ্যভেদক্রমাদিরহিতা স্বপ্রকাশসংবিদ্‌রূপা সা বাক্ পশ্যন্তীত্যুচ্যতে।
অবিভাগাত্তু পশ্যন্তী সর্বতঃ সংস্থিতক্রমা।
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।।
ন্যায়মঞ্জরী, ৪৭৩-৭৪ পৃঃ।

২। অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততে'র্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।। বাক্যপদীয়, প্রারম্ভশ্লোক।

রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা শব্দব্রহ্মের সোপাধিকরূপ, সুতরাং মিথ্যা। স্ফোটরূপ নিত্য, চিন্ময় ও অখণ্ড শব্দব্রহ্মই সত্য।[১]

এই শব্দব্রহ্মই মণ্ডনের উপাস্য। ব্রহ্মসিদ্ধির প্রথম শ্লোকের "অক্ষরম্" এই পদটির মণ্ডনোক্ত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মণ্ডন যে তাঁহার গ্রন্থে শব্দব্রহ্মবাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। 'ওমিতি ব্রহ্ম, ওমিতীদং সর্বম্' (তৈত্তিঃ ১-৮।১), 'ওঁকার এবেদং সর্বং' (ছাঃ ২।২৩।৩), 'ওঁকার এব সর্বা বাক্, পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ'। প্রশ্ন ৫।২, এই সকল শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্র প্রণব বা ওঁকারই যে সমস্ত বাঙ্ময় জগতের আদি প্রস্রবণ, ওঁকারই ব্রহ্ম, এই শব্দব্রহ্মবাদ অতি স্পষ্টভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।[২] শব্দব্রহ্মবাদীর মতে প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে বেদবাণীর বিকাশ হইয়াছে এবং বেদ হইতে ক্রমে সমস্ত বাঙ্ময় জগতের অভ্যুদয় হইয়াছে। প্রণবের দুইটি রূপ আছে, একটি তাহার পর বা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরূপ, অপরটি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দরূপ।[৩] ঐ স্থূল শব্দরূপকে বাদ দিয়া ওঁকারের পরব্রহ্মরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। সেই উপলব্ধিই যথার্থ উপলব্ধি এবং সর্বপ্রকার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। শঙ্করাচার্য তদীয় অদ্বৈতবেদান্তে শব্দব্রহ্মবাদ সমর্থন করেন নাই। তিনি ভর্তৃহরির অঙ্গীকৃত স্ফোটবাদ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ১।৩।২৮) দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র শঙ্করের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর, সুরেশ্বরাচার্য নামে পরিচিত হইয়া যে সকল গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোথায়ও তিনি স্ফোটবাদ বা শব্দাদ্বৈত-বাদ অনুমোদন করেন নাই। শঙ্কর-সম্মত ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য তৎকৃত তৈত্তিরীয়ভাষ্য-বার্তিকে—'ওমিতি ব্রহ্ম, ওমিতিদং সর্বম্' (তৈঃ ১।৮।১), এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় ওঁকারকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে উপাসনা করিবে, এইরূপ প্রতীক-উপাসনারই উপদেশ করিয়াছেন।[৪] শব্দব্রহ্মবাদের নামগন্ধও করেন নাই। বিমুক্তাত্ম-ভগবান্ তদীয় ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থে সুরেশ্বরাচার্যের মতানুবর্তন করিয়া

১। ভেদানুকারো জ্ঞানস্য বাচশ্চোপপ্লবো ধ্রুবঃ।
ক্রমোপসৃষ্টরূপায়া জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যপাশ্রয়ম্॥ বাক্যপদীয়, ১।৮৭

যথা অভিন্নমপি জ্ঞানং নানা জ্ঞেয়রূপোপগ্রাহিত্বাৎ ভেদরূপতয়া প্রত্যবভাসতে ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি। তথা সংহৃতসর্ববীজো'য়মান্তরঃ শব্দাত্মা ব্যঞ্জকধ্বনিভেদক্রমানুসারেণ আবির্ভাবকালে নানেব প্রত্যব-ভাসতে। এবঞ্চ ব্রহ্মাখ্যং শব্দতত্ত্বমবাঙ্মনসগোচরমন্যদীয়রূপভেদোপগ্রহেণ অন্যথা অন্যথা প্রতীয়ত ইতি। বাক্যপদীয় গ্রন্থের হেলারাজ-কৃত টীকা, ১।৮৭

২। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৬—১৭ পৃঃ।

৩। পরঃ পরতরং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানন্দাদিলক্ষণম্।
প্রকর্ষেণ নবং যস্মাৎ পরং ব্রহ্ম স্বভাবতঃ॥
অপরঃ প্রণবঃ সাক্ষাৎ শব্দরূপঃ সুনির্মলঃ।
প্রকর্ষেণ নবত্বস্য হেতুত্বাৎ প্রণবঃ স্মৃতঃ॥ সূতসংহিতা, অঃ ৫।২, ৩

৪। তৈত্তিরীয়ভাষ্য-বার্তিক, ৩১—৩২ পৃঃ, ৩৭—৪২ শ্লোক।

বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ, শব্দাদ্বৈতবাদ বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদ নহে, উহা ঘটাদ্বৈতবাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদের এক বিকৃত রূপ।[১]

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবিদ্যাবশে নানা জীব, জগৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। একের বহুরূপে ভাতির প্রতি অবিদ্যাই কারণ। এই অবিদ্যা কিরূপ? অদ্বৈত-বেদান্তী অবিদ্যাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে পারেন না। কেননা, অবিদ্যা ব্রহ্মরূপ হইলে সত্য সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ অবিদ্যা সত্যই হইত, তাহার নিবৃত্তি হইতে পারিত না; আবার, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব নাই বলিয়া তত্ত্বান্তরও বলা যায় না। অবিদ্যাকে আকাশকুসুমের মত অলীকও বলা চলে না, কেননা, অবিদ্যা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক হইলে ব্যাবহারিক জীবনে অবিদ্যার কার্য জীব, জগৎ সত্য বলিয়া মনে হইত না। 'অত্যন্তাসত্ত্বে খপুষ্পসদৃশী ন ব্যবহারাঙ্গম্' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ৯ পৃঃ)। ইহাকে, ব্রহ্মের ন্যায় অত্যন্ত সৎও বলা চলে না। এইজন্যই অবিদ্যাকে "অনির্বচনীয়" বলা হইয়া থাকে। মায়া, অজ্ঞান, প্রভৃতি অবিদ্যারই নামান্তর।[২] অবিদ্যার ফলে বস্তুর প্রকৃত রূপটি গৃহীত হয় না, প্রকৃত রূপের পরিবর্তে (অবিদ্যাকল্পিত) একটি মিথ্যারূপেই ভাতি হইয়া থাকে।

অনির্বচনীয় দ্বিবিধ অবিদ্যার স্বরূপ।

অবিদ্যার এই দুই প্রকার কার্য দেখা যায় বলিয়া মণ্ডনমিশ্র তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে দুই প্রকার অবিদ্যা অঙ্গীকার করিয়াছেন, একটি অগ্রহণ (non-apprehension), অপরটি অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাগ্রহণ (mis-apprehension)— 'তস্মাদগ্রহণবিপর্যয়গ্রহণে দ্বে অবিদ্যে কার্য-কারণ-ভাবেনাবস্থিতে' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৪৯ পৃঃ)। এই দ্বিবিধ অবিদ্যাই অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি বলিয়া পরিচিত—'দ্বিপ্রকারেয়মবিদ্যা, প্রকাশস্যাচ্ছাদিকা বিক্ষেপিকা চ' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৪৯ পৃঃ)। বাচস্পতিমিশ্র ভামতীর প্রথম শ্লোকেও ঐরূপ দুই প্রকার অবিদ্যার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডনের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মসিদ্ধির বেদান্তমত বাচস্পতির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সেইজন্যই বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ভামতী টীকায় শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ব্রহ্মসিদ্ধির অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। তস্মাদাত্মাদ্বৈতমেব সিধ্যতি, ন শব্দাদ্বৈতং ঘটাদ্বৈতং বা।
ইষ্টসিদ্ধি (Gaekwad Oriental Series LXV, p. 176).

২। নাবিদ্যা ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ, নার্থান্তরম্, নাত্যন্তমসতী, নাপি সতী; এবমেবেয়মবিদ্যা মায়া মিথ্যাবভাস ইত্যুচ্যতে। - - - - তস্মাদনির্বচনীয়া। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৯ পৃঃ, ও শঙ্খপাণি-টীকা ৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য তদীয় ন্যায়মকরন্দে নানাবিধ যুক্তিতর্কের উপন্যাস করিয়া অবিদ্যার অনির্বচনীয় স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আনন্দবোধের যুক্তিলহরী আলোচনা করিলে তাহাতে মণ্ডনমিশ্রের যুক্তির প্রভাব স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো
বিবর্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজো'বনয়ঃ। ভামতীর প্রারম্ভ শ্লোক।

সুরেশ্বরাচার্য উক্ত দুই প্রকার অবিদ্যা স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-বার্তিকে মণ্ডন-সম্মত দুই প্রকার অবিদ্যা (অবিদ্যাদ্বয়বাদ) খণ্ডন করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন।[১]

অবিদ্যা কাহার? অর্থাৎ অবিদ্যার আশ্রয় কে? এই প্রশ্নের উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানময় ব্রহ্ম কোন মতেই অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। জীবেরই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যার আশ্রয়—'কস্য অবিদ্যা জীবানামিতি ব্রূমঃ' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ)। জীবের ব্রহ্ম বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং ব্রহ্মই জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিষয় বলিয়া জানিবে।

অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়।

'অথ ব্রহ্মণো নাবিদ্যা কিন্তু জীবানাং ব্রহ্ম বিষয়া' (শঙ্খপাণি-টীকা, ২৯ পৃঃ)। জীবের জীবভাবের মূলই তো অজ্ঞান। অজ্ঞানকল্পিত জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? ইহাতে তো পরস্পরাশ্রয় দোষ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। জীব স্বীয় জীবভাবের জন্য অজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং অজ্ঞান স্বীয় আশ্রয়ের জন্য জীবকে অপেক্ষা করে। জীবভাব অজ্ঞানের অধীন, পক্ষান্তরে অজ্ঞান জীবের অধীন—'কল্পনাধীনোহি জীববিভাগঃ জীবাশ্রয়া কল্পনেতি' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ)। ইহার উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, অদ্বৈতবেদান্তের মতে অবিদ্যা ও জীব উভয়ই অনাদি এবং পরস্পর আশ্রিত। ইহাদের এই সম্বন্ধ বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধের ন্যায় অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে সুতরাং ইহাদের পরস্পর আশ্রয়তাদোষের মধ্যে গণ্য নহে।[২] দ্বিতীয়তঃ, অবিদ্যা যখন অনির্বচনীয়, অবস্তু এবং সর্ববিধ দোষের আকর, তখন দোষ কলুষিত অবিদ্যায় কোন দোষ উদ্ভাবন করিলে অনির্বচনীয় অবিদ্যার তাহাতে কিছুই আসে যায় না।[৩] আচার্য সুরেশ্বরের মতে অজ্ঞানকল্পিত জীব কোনমতেই অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে।[৪]

১। সুরেশ্বরকৃত-বৃহদারণ্যক-বার্তিক, Part II, ১০৬৫ পৃঃ, ১৯৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। অনাদিত্বাদুভয়োরবিদ্যাজীবয়োর্বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিবনেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রক্লৃপ্তিমাবহতীতি। ব্রহ্ম-সিদ্ধি, ১০ পৃঃ ও শঙ্খপাণি-কৃত টীকা ৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। নহি মায়ায়াং কাচিদনুপপত্তিঃ; অনুপপদ্যমানার্থৈব মায়া; উপপদ্যমানার্থত্বে যথার্থ ভাবান্ন মায়া স্যাৎ। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ।

৪। এবং তাবন্ন আত্মনো'জ্ঞানিত্বং নাপি তদ্‌বিষয়মজ্ঞানম্। পারিশেষ্যাদাত্মন এবাস্ত্বজ্ঞানং তস্য অজ্ঞো'স্মীত্যনুভবদর্শনাৎ। কিং বিষয়ং পুনস্তাদাত্মনো'জ্ঞানম্। আত্মবিষয়মিতি ব্রূমঃ। নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি, ১০৭-১০৮ পৃঃ। বৃহদাঃ বার্তিক, Part I, ৫৫-৫৮ পৃঃ, ১৭৫-১৮২ শ্লোক; ও Part II, ৬৭৫-৬৭৭ পৃঃ, ১২১৫-১২২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মণ্ডনোক্ত অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বসিদ্ধান্ত বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ভামতী টীকায় সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। বিবরণমতে ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয়ও বটে বিষয়ও বটে, ইহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে, ১৭৯ পৃষ্ঠায় দেখিয়া আসিয়াছি। সুরেশ্বরাচার্য তাঁহার বৃহদারণ্যক-বার্তিক ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে বিবরণের সিদ্ধান্তই অনুমোদন করিয়াছেন। মণ্ডনের ব্রহ্মসিদ্ধি যেমন ভামতীপ্রস্থানের চিন্তাধারার

জীব কে ? ব্রহ্মই জীব। অনাদি-অবিদ্যা (কল্পনা) জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছে, ফলে জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও সে তাঁহার ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারিতেছে না। ইহাই অগ্রহণ (non-apprehension) নামক অজ্ঞানের ফল। এই অগ্রহণের পরে আসে অন্যথাগ্রহণ (mis-apprehension)। অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাবুদ্ধিবশতঃ ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বিত জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন, শোকদুঃখাকুল মনে করিয়া সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। বিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে আত্মার সম্বন্ধে "অগ্রহণ" ও "অন্যথাগ্রহণ" এই দ্বিবিধ অবিদ্যা সমূলে বিদূরিত হয় এবং জীব স্বীয় ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। অবিদ্যাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উপযুক্ত একমাত্র দর্পণ। ঐ দর্পণে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহারই নাম জীব। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। ভেদ মিথ্যা। এই মিথ্যা ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি হইলেই জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।[১]

মণ্ডনের মতে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব।

আচার্য সুরেশ্বরের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। মুখের ছায়া মুখ হইতে বিভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা আভাস জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ছায়া সত্য নহে, মিথ্যা, অতএব প্রতিবিম্বও সত্য নহে, মিথ্যা। সমষ্টি মায়ার আভাস ঈশ্বর, ব্যষ্টি অবিদ্যার আভাস জীব। ঈশ্বরের উপাধি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, সুতরাং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি; জীবের উপাধি মলিন সত্ত্বগুণ, অতএব জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি। এই মতে জীবভাবের (জৈব-আভাসের) মিথ্যাত্বনিবন্ধন জীবভাবের বাধ-সাধন না করিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ সাধন করার উপায় নাই। জীবভাবকে বাধিত করিয়া চৈতন্যাংশে অভেদ সাধন করা হয় বলিয়া এইরূপ অভেদকে বাধমূলক অভেদ "বাধ-সামানাধিকরণ্য" বলা হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্ব সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ভেদ মিথ্যা। এইজন্য মিথ্যা ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি করিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপপাদন করা যায়। জীবভাবের বাধ-সাধন করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না।

সুরেশ্বরাচার্যের আভাসবাদ।

উৎস, সুরেশ্বরের বার্তিক এবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতিও সেইরূপ বিবরণপ্রস্থানের চিন্তাপ্রবাহের মূল। আমাদের মতে মণ্ডন ও সুরেশ্বর ভিন্ন ব্যক্তি নহেন, এক ব্যক্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একজন মনীষীর বেদান্ত-চিন্তাই তাঁহার জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মণ্ডন-সুরেশ্বরের ঋণ পরবর্তী কোন অদ্বৈতবেদান্তীই অস্বীকার করিতে পারেন না।

১। পরমার্থেন অভিন্না অপি ব্রহ্মণো জীবাঃ কল্পনয়া মিথ্যাবুদ্ধ্যা বিম্বপ্রতিবিম্বচচন্দ্রবচ্চ ততো ভিদ্যন্তে; এবঞ্চ ভেদমাত্রমত্র কাল্পনিকম্। শঙ্খপাণি-টীকা, ৩২ পৃঃ।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জীবভাব যেমন মিথ্যা, জীবের বিষয়দর্শনও সেইরূপ মিথ্যা। নিখিল বিশ্ব দৃশ্য, জীব তাহার দ্রষ্টা। দ্রষ্টা জীব ও দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির সাহায্যে এক কল্পিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় এবং তাহারই ফলে জীব বিষয় দর্শন করে। এখন প্রশ্ন এই যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ-দর্শনের মূলে কোন সত্যতা আছে কি? বিশ্বপ্রপঞ্চ যদি সত্য হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তের এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বিজ্ঞান কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়; যদি মিথ্যা হয়, তবে এই মিথ্যা দৃশ্যজাল কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন যে, সমস্ত দ্বৈতজালই অজ্ঞানের বিলাস, আবিদ্যক কল্পনামাত্র, নানাত্বের মূলে কোনই সত্যতা নাই। এক অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্যই অবিদ্যাবশে নানা জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। রজ্জু-সর্প ও তাহার জ্ঞান যেমন একই অজ্ঞানবশতঃ উৎপন্ন হয়, জীব, জগৎ ও তাহার জ্ঞানও সেইরূপ এক অনাদি অজ্ঞানের ফলেই উদিত হইয়া থাকে। এই মতে সমস্ত দৃশ্য বস্তুই প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া কিছুই নাই। আমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞেয় বিষয় প্রতিভাস হইয়া থাকে বলিয়াই বিষয় আছে, এইরূপ আমাদের ভ্রম হইয়া থাকে। যে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞানে ভাসে না, তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই। আমাদের জ্ঞানে ভাসে বলিয়াই বিষয়ের (প্রাতিভাসিক) অস্তিত্ব বুঝা যায়। সমস্ত বস্তুই সাক্ষি-ভাস্য। মণ্ডনমিশ্রের মতে জীবের মিথ্যা বিষয়দর্শনই মিথ্যা বিষয় সৃষ্টির মূল। জাগরিতজ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানেরই তুল্য। স্বপ্ন-সময়ে যেমন অজ্ঞানবশতঃ আমরা আমাদের মানস-কল্পিত মিথ্যা স্বপ্ন-বিষয়সকল দর্শন করি, জাগরিত অবস্থায়ও সেইরূপ অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বিষয়দর্শনের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মের জীবভাব মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। জীব যদি মিথ্যা হয়, তবে তাঁহার বিষয় দর্শন, বিষয় ভোগ প্রভৃতিও মিথ্যাই হইবে এবং যে পর্যন্ত জীবের মিথ্যা বিষয়দর্শন থাকিবে, সেই পর্যন্ত দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চও থাকিবে। দ্রষ্টা জীব না থাকিলে তাঁহার দর্শনও থাকিবে না, দৃশ্য বিশ্বও থাকিবে না। জীবের দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টির মূল। এইরূপে ''দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ''ই মণ্ডনমিশ্র তৎকৃত ব্রহ্মসিদ্ধিতে উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অহং-অভিমানী দ্রষ্টা জীবই একমাত্র সক্রিয় এবং প্রাণবান্, তদ্ব্যতীত দৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জগৎই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় নির্জীব ও অসার। এক-দ্রষ্টা জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই। এইজন্য এই মত ''একজীববাদ'' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে প্রকাশানন্দ তৎকৃত বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে উক্ত ''দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'' বিচারপূর্বক উপপাদন করিয়াছেন। অমলানন্দস্বামী তাঁহার বেদান্তকল্পতরুতে জগৎপ্রপঞ্চের দৃষ্টিসময়ে সৃষ্টি স্বীকার করিয়া ''দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই'' অনুমোদন করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র ও ভামতী টীকায় নিখিল বিশ্বই অবিদ্যার বিলাস, প্রতি জীবে (জীবগত) অবিদ্যা বিভিন্ন এবং ঐ বিভিন্ন জীবগত অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত বিশ্বই জীব প্রত্যক্ষ করিতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া মণ্ডনোক্ত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের প্রতিই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন এই যে, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে চাক্ষুষ জ্ঞান এবং

জগতের স্বরূপ ও মণ্ডনমিশ্রের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ।

জ্ঞেয় বিষয় প্রভৃতি বিভ্রমমাত্রই হইয়া দাঁড়ায়, ফলে বেদোক্ত যাগযজ্ঞ, উপাসনা এবং উপাসনালভ্য স্বর্গ প্রভৃতি মিথ্যাই হইয়া পড়ে এবং মিথ্যা বিষয় প্রতিপাদন করে বলিয়া বেদও অপ্রমাণ হয়। এইজন্য চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্যগণ "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" সমর্থন করেন নাই, তাহার স্থলে তাঁহারা "সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ" অঙ্গীকার করিয়াছেন। সৃষ্টিদৃষ্টিবাদে পরমেশ্বর সৃষ্ট জগৎ জীবের দৃষ্টিবিভ্রমমাত্রই নহে। ইহার ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আত্মাই সৃষ্টির জাল রচনা করেন। নিরুপাধি, নির্বিশেষ আত্মা বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারে না সুতরাং সগুণ (অবিদ্যোপাধি) মায়াময় পরমেশ্বরই আপেক্ষিক সত্য জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবের দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টির মূল, এইরূপ "দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ" কোনমতেই অঙ্গীকার করা যায় না। ইহাই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদীর আপত্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম।

মণ্ডনমিশ্রের মতে জগৎ যে জীবের মিথ্যা দৃষ্টিবিভ্রম, তাহা আলোচনা করা গেল। এখন মণ্ডনের মতে ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা বিচার করা যাইতেছে।

ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ

মণ্ডনমিশ্র শুক্তিতে মিথ্যা রজতদৃষ্টির ব্যাখ্যায় শঙ্করসম্মত "অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদ" অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শুক্তিতে রজতের অবভাস "অনির্বাচ্যখ্যাতি" নহে, ইহা বিপরীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতি। এখানে দেখা যায় যে, (অগ্রহণ রূপ) অবিদ্যা-বশতঃ শুক্তি শুক্তিরূপে গৃহীত হয় নাই, "ইদং"রূপেই (সম্মুখস্থিত কোনও একটি বস্তু, এইরূপেই) উহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়াছে, "ইদং"রূপে শুক্তির এই প্রত্যক্ষজ্ঞান মিথ্যা নহে, সত্য। তারপর, শুক্তির সাদৃশ্যবশতঃ "রজতম্" এইরূপ রজতের স্মৃতিজ্ঞানের উদয় হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। "ইদম্"এর প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং রজতের স্মৃতিজ্ঞান, স্বীয় স্বীয় বিষয়ে সত্য হইলেও ভ্রান্তদর্শী (ইদম্-এর) প্রত্যক্ষ এবং (রজতের) স্মৃতি এই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে ভেদ দেখিতে পায় না। দুইটি জ্ঞানকে একটি অভিন্নজ্ঞান বলিয়াই মনে করে। এইরূপ মনে করাই ভুল। জ্ঞানদ্বয়ের "অখ্যাতি" বা অবিবেকই এই ভ্রমের মূল। ভ্রমবশতঃ স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় রজতকে ভ্রান্তদর্শী প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করে সুতরাং রজতের এই খ্যাতি বা প্রকাশকে "বিপরীতখ্যাতি" বলিয়াই মনে করা যায়। নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে ইহাকে "অন্যথাখ্যাতি"ও বলা যায়। কেননা, এখানে স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় রজত প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া যে অন্যপ্রকারে খ্যাতি বা প্রকাশ লাভ করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। মণ্ডনমিশ্র তদীয় বিভ্রম-বিবেকে এবং ব্রহ্মসিদ্ধিতে উল্লিখিত যুক্তিমূলে (ভট্ট-সম্মত) "বিপরীতখ্যাতি" বা (নৈয়ায়িক-সম্মত) অন্যথাখ্যাতিবাদই সমধিক যুক্তিসহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে উল্লিখিত "খ্যাতি" ব্যাখ্যার সহিত শঙ্করসম্মত অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদেরও কোন বিরোধ নাই। কেননা, ভ্রমস্থলে অনির্বাচ্য রজতের খ্যাতি স্বীকার করিলেও অনির্বাচ্য মিথ্যা রজত, সত্য রজতের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া, তাহা যে বিপরীত বা অন্যথারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, ইহা অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদী কিরূপে অস্বীকার করিবেন? মিথ্যা রজতের অবভাসের মূলে যে অনির্বচনীয় অবিদ্যা আছে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য। এখন এই রজতাবভাসকেও যদি অনির্বচনীয় বলা হয়, তবে

কার্য ও কারণ একরূপই হইয়া দাঁড়ায়। কার্য ও কারণ তুল্যরূপ হইলে সেখানে কার্য-কারণ-ব্যবস্থাই অচল হইয়া পড়ে, সুতরাং বিপরীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতিই স্বীকার্য।[১] বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা, তত্ত্বসমীক্ষায় মণ্ডনোক্ত ভ্রমবাদের ব্যাখ্যায় বিপরীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতিবাদের যৌক্তিকতা অপূর্ব মনীষার সহিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতে কোন কোন সুধী মনে করেন যে, বাচস্পতি ভামতী টীকায় শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যায় অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদ অঙ্গীকার করিলেও অন্তরে তিনি অন্যথাখ্যাতিবাদের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভামতীর টীকাকার অমলানন্দস্বামী তৎকৃত কল্পতরু টীকায় বাচস্পতির বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ স্বীকার করেন নাই।[২] মণ্ডনের সিদ্ধান্ত বিপরীতখ্যাতিবাদের অনুকূলে হইলেও সুরেশ্বরাচার্য তদীয় গ্রন্থে কোথায়ও বিপরীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতিবাদ আদর করেন নাই। তিনি ইহা খণ্ডন করিয়া অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদই বিবিধ যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।[৩]

জীব, জগৎ প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবিদ্যাবিভ্রমের নিবৃত্তি এবং এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই বেদান্তজিজ্ঞাসার লক্ষ্য। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যার্থ আলোচনার ফলে অদ্বৈতব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উদিত হইয়া থাকে। ঐ সাক্ষাৎকার মণ্ডনের মতে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। কেননা, শব্দ পরোক্ষপ্রমাণ সুতরাং শব্দজন্য জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানই হইবে। নিরন্তর ধ্যান এবং উপাসনা প্রভৃতির ফলে ঐ পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ক্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। বাচস্পতিমিশ্র ভামতী টীকায় উল্লিখিত মণ্ডন-সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন। মণ্ডন ও বাচস্পতির মতে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সূত্রকারেরও অনুমোদিত।[৪] বাচস্পতির মতের বিবরণে অমলানন্দস্বামী বলিয়াছেন যে, বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানই শাস্ত্রার্থের ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি দ্বারা সুদৃঢ় হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ করে।[৫] সুরেশ্বরাচার্য তদীয় নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি এবং

মণ্ডনমিশ্র ও শব্দাপরোক্ষবাদ

১। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩৬—১৫০ পৃঃ।
মণ্ডনকৃত বিভ্রমবিবেক ৪৬, ৫৭, ৬২ কারিকা।

২। স্বরূপেণ মরীচ্যম্ভো মৃষা বাচস্পতের্মতম্।
অন্যথাখ্যাতিরিষ্টাস্যেত্যন্যথা জগৃহুর্জনাঃ।। কল্পতরু, ২৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

৩। সুরেশ্বরকৃত বৃহদারণ্যক-বার্তিক, Part II, ৪৮৪ পৃঃ, ২৮৫-২৮৮ কাঃ; এবং ৫২৪ পৃঃ, ৪৫৩ কারিকা দ্রষ্টব্য।
বিভিন্ন খ্যাতিবাদের স্বরূপ আমরা পরে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইব।

৪। অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪। এই ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান যে ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতির ফলে উদিত হয়, তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের পরই উদিত হয় না, এই মণ্ডন ও বাচস্পতিমিশ্রের মতই সমর্থন করিয়াছেন।

৫। অপি সংরাধনে সূত্রাচ্ছাস্ত্রার্থধ্যানজা প্রমা।
শাস্ত্রদৃষ্টির্মতা তাস্ত বেত্তি বাচস্পতিঃ স্বয়ম্।। কল্পতরু, ২১৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

বার্তিকে মণ্ডন ও বাচস্পতির উক্ত মত সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়া, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে যে অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উদিত হয়, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১] শব্দ পরোক্ষপ্রমাণ সুতরাং ঐ পরোক্ষ শব্দপ্রমাণের মূলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, সেই জ্ঞান পরোক্ষই হইবে, এই মত সুরেশ্বর তদীয় বৃহদারণ্যক-বার্তিকে এবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "দশমস্ত্বমসি" প্রভৃতি স্থলে শব্দ হইতেও প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হইতে কোন বাধা নাই।[২] জ্ঞানের বিষয় যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্যই হউক, কি পরোক্ষ (শব্দাদি) প্রমাণজন্যই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আসল কথা, বিষয়টির প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি-না, ইহাই দেখিতে হইবে। বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইলেই ঐ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিব। ঐ জ্ঞান যদি শব্দ শুনিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে শব্দপ্রমাণকে ঐরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের করণ বা সাধন বলিতে আপত্তি কি?[৩] সুরেশ্বরের এই "শব্দাপরোক্ষবাদ" বিবরণপন্থী অদ্বৈতবেদান্তিগণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে অবিদ্যার সমূলে উচ্ছেদ হয় এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন সুস্থির হয়। জীব "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'আমি ব্রহ্ম', এইরূপে নিজের ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহাই বেদান্ত-সেবার চরম ফল। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে অপর কোন তত্ত্ব নাই। অনাদি অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। একের এই

মুক্তির স্বরূপ এবং সাধন

১। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, তৃতীয় অঃ ৬৭-৭০ কারিকা ও ১২৩-১২৬ কারিকা দ্রষ্টব্য। বৃহদাঃ বার্তিক, Part I, ২২৫-২৩৩ পৃঃ, ৮১৮-৮৪৯ কারিকা, Part III, ১৮৫২-১৮৭৮ পৃঃ, ৭৯৬-৯৬১ কারিকা।

২। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে যে, কোন এক স্থানে দশটি লোক একত্র যাইতেছিল এবং তাঁহাদের গন্তব্যপথে একটি নদী পার হইতে হইয়াছিল। নদী পার হইয়া তাঁহারা নদীর পরপারে গিয়া সকলেই তীরে উঠিয়াছে কি-না, গণিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিই গণনা করিতেছে, সেই নিজকে দশজনের মধ্যে গণিতেছে না, ফলে উহারা সংখ্যায় নয়জন হইতেছে। তখন একজন নদীতে পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া উহারা মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিল। ঘটনাক্রমে সেই সময় সেই স্থানে কোন একটি বুদ্ধিমান্ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, সে ইহাদের নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার সম্মুখে আবার গণ দেখি? উহারা যখন পুনরায় গণিতে লাগিল, তখন এক, দুই, তিন করিয়া উপস্থিত নয়জন গণার পরই ঐ বুদ্ধিমান্ লোকটি বলিলেন, এখন তোমার নিজকে গণনা কর, তুমিই দশম ব্যক্তি, "দশমস্ত্বমসি"। এই কথা শুনার পর যিনি গণিতেছিলেন, তিনি নিজকে দশম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইল। এখানে নিজকে দশম বলিয়া জানা ঐ ব্যক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান, এবং ঐ প্রত্যক্ষজ্ঞান উপস্থিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির "দশমস্ত্বমসি" এই শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং শব্দজন্য জ্ঞানও যে প্রত্যক্ষ হয়, ইহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

৩। বৃহদারণ্যক-বার্তিক, Part I, ৬৪-৬৫ পৃঃ, ২০৬-২১৬ কারিকা, Part III, ১৮৫২-১৮৫৪ পৃঃ ৭৯৯-৮০৩ শ্লোক এবং ৮১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি তৃতীয় অধ্যায়, ৬৪-৭১ শ্লোক, ১৪৮-১৫১ পৃঃ, Bombay Sanskrit Series.

বিবিধ প্রকারে ভাতি অবিদ্যার কার্য। আমরা মণ্ডনের মতে দ্বিবিধ অবিদ্যার পরিচয় পাইয়াছি। একটি অগ্রহণ, অপরটি অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাগ্রহণ। অগ্রহণরূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জীবের দৃষ্টিতে তিরোহিত হয় এবং অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাগ্রহণের ফলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শোকদুঃখে আকুল, সংসারী জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জ্ঞানের অরুণালোকে যখন অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়, তখন ব্রহ্মবিষয়ে "অগ্রহণ" ও "অন্যথাগ্রহণ" সমূলে নিবৃত্তি হইয়া যায়; সর্বত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মদর্শনের উদয় হয় এবং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদক অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় জীব অবিদ্যা-বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়।[১] ইহাই জীবের মুক্তি। এই মুক্তির সাধন কি? শঙ্কর-বেদান্তের মতে জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির সাধন। 'তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থঃ নিশ্চিতো গীতাসু সর্বোপনিষৎসুচ' (গীতা, শং-ভাষ্য-উপক্রমণিকা, ৩য় অঃ)। জীবের সংসার-বন্ধন মিথ্যা, অজ্ঞানমূলক। জ্ঞানই অজ্ঞানকে বিনাশ করিতে পারে; জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছু দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হয় না। আলোক যেমন অন্ধকারকে বিনাশ করিয়াই উৎপন্ন হয়, চিদালোকও সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করিয়াই উদিত হয়। জ্ঞানোদয়ে কর্ম নিরস্ত হয়; কর্ম বাধ্য, জ্ঞান কর্মের বাধক; সুতরাং নিত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে কর্ম কোনমতেই সাধন হইতে পারে না।[২] জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ কি? কর্ম যদি জীবের মুক্তিদানে সমর্থ না হয়, তবে শাস্ত্রে যে যজ্ঞ, দান, সেবা প্রভৃতি জীবের অবশ্য কর্তব্য কর্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রবিধি কি অর্থহীন? কর্ম কি বৃথা পণ্ডশ্রমমাত্র? এই আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলেন যে, নিষ্কাম কর্ম চিত্তের শুচিতা সম্পাদন করে বলিয়া কর্ম নিরর্থক নহে। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হয়। চিত্তশুদ্ধির ফলে সংসারে বৈরাগ্যোদয় হয়, সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা (মুমুক্ষা) প্রভৃতির উদয় হয়। নির্মল নিষ্কলুষ চিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয়।[৩] আচার্য সুরেশ্বর তদীয় নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপেই জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন—

> শুধ্যমানস্তু তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিতকর্মভিঃ।
> বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ ব্যনক্ত্যর্থং সুনির্মলম্।। নৈঃ-সিদ্ধি ১।৪৭

১। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৩৫ পৃঃ।

২। কর্মাজ্ঞানসমুত্থত্বান্নালং মোহাপনুত্তয়ে।
সম্যগ্‌জ্ঞানং বিরোধ্যস্য তামিস্রস্যাংশুমানিব।। নৈঃ-সিদ্ধি, ১।৩৫
অজ্ঞানহানমাত্রত্বান্মুক্তেঃ কর্ম ন সাধনম্।
কর্মাপমার্ষ্টি নাজ্ঞানং তমসীবোত্থিতং তমঃ।। নৈঃ-সিদ্ধি, ১।২৪

৩। অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থান-প্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ; শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।—গীতা শং-ভাষ্য, উপক্রমণিকা, ১ম অধ্যায়।

কর্ম এই মতে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে, গৌণসাধন "আরাদুপকারক"। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বেদের সমগ্র কর্মবাদই বিধি এবং নিষেধমূলে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তিস্রোতঃ প্রতিরোধ করিয়া আত্মদর্শনের জন্য চিত্তকে সমাহিত করিবার পথ নির্দেশ করে। এই মতে সকাম যাগযজ্ঞ প্রভৃতিও দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের সহায় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, সকাম কর্ম আত্মদর্শনে সহায় হয় না—'অনবাপ্তকামঃ কামোপহতমনাঃ ন পরমাত্ম-দর্শনযোগ্যঃ' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ২৭ পৃঃ)। নিষ্কাম কর্মই কামনার স্রোতঃ প্রতিরোধ করতঃ আত্মদর্শনের সহায় হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে মানুষ দেবঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ, এই ত্রিবিধ ঋণের দায় হইতে যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, অতিথিসেবা প্রভৃতি কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠানের ফলে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মদর্শনে অধিকারী হইয়া থাকে। গৃহীর অবশ্যকর্তব্য পঞ্চমহাযজ্ঞ (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ) ও অন্যান্য বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ এবং বৈদিক সংস্কার প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বারা এই মানবদেহ পরমাত্ম-দর্শনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 'মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ' (মনু ২।২৮)। পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন—'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন' (বৃহদাঃ ৪।৪।২২)। উক্ত বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানে যাগ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম যে সাধন হয়, তাহা স্পষ্টতঃই স্বীকার করা হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস—'সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৬), এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞাদি সকল কর্মেরই যে অপেক্ষা আছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যজ্ঞাদি কর্মসহকারে যে ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অনাদি-অবিদ্যার সমূলে উচ্ছেদসাধন করিয়া মুক্তি বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। মণ্ডনের মতে আমরা দেখিয়াছি "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য শ্রবণের ফলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। ঐ পরোক্ষজ্ঞান মনন, নিদিধ্যাসন বা নিরন্তর ভাবনাবশতঃ অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ করে। পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ অবিদ্যাবিভ্রমের নিবৃত্তি করিতে পারে না। এইজন্য "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যজন্য জ্ঞানের অপরোক্ষতা অবশ্য স্বীকার্য। ঐ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির যেরূপ উপযোগিতা আছে, বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিরও সেইরূপ সহযোগিতা আছে। কেননা, যিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তের একাগ্রতা এবং শুচিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনিই ভাবনা বা নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণত করিতে সমর্থ হন। ইহাই মণ্ডনের মতে বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতির মর্ম। উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে যজ্ঞেন, দানেন, তপস প্রভৃতি স্থলে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা যে করণে তৃতীয়া, তাহা কোন মনীষীই অস্বীকার করিতে পারেন না। ফলে, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতিও যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন,

তাহা বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রুতিতে "বিবিদিষন্তি" এইরূপ একটি ইচ্ছা অর্থে সন্ প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ আছে। "যজ্ঞাদির দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করিবে" এইরূপেই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপাদনের জন্যই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয়, না, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয়, ইহা বিচার্য। শঙ্করপন্থী বেদান্তিগণের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপাদনেই যজ্ঞাদি সাধন বলিয়া জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞাদি সাধন নহে। মণ্ডনমিশ্রের মতে যজ্ঞাদি ব্রহ্মজ্ঞানেরই সাধন। মণ্ডন বলেন যে, "বিবিদিষন্তি" এই পদটির তাৎপর্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সন্ প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা, জ্ঞান এখানে ইচ্ছার বিষয়। ইচ্ছা এবং ইচ্ছার বিষয় এই দুই-এর মধ্যে আপেক্ষিক প্রাধান্য বিচার করিলে ইচ্ছার বিষয় যে জ্ঞান, তাহাই ইচ্ছা অপেক্ষায় প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে; লোকে ইচ্ছা অপেক্ষায় ইচ্ছার বিষয়কেই প্রধান বলিয়া থাকে। ধাতুর যেইটি প্রধান অর্থ তাহার সহিতই কারকের অন্বয় হইয়া থাকে, সুতরাং বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানেই যজ্ঞাদিতে সাধন বলিতে হইবে। প্রমাণের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও মিথ্যা আবিদ্যক ব্যবহারের অনুবৃত্তি হইতে দেখা যায়। কারণ, আবিদ্যক ব্যবহারসকল অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং সুদৃঢ়মূল, সুতরাং একমাত্র "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল অনাদি ব্যবহারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। উহাদের নিবৃত্তির জন্য মনন, নিদিধ্যাসন বা ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির সহযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। কর্মমাত্রই দ্বৈত সাপেক্ষ এবং আবিদ্যক। আবিদ্যক কর্ম অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের ও অবিদ্যা সংস্কারের উচ্ছেদক হইবে কিরূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, এক জাতীয় বিষ আছে, উহা অপর জাতীয় বিষকে প্রশমিত করিয়া নিজেও যেমন শান্ত হয়, এক জাতীয় পুষ্পরেণু পঙ্কিল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের আবিলতা বিদূরিত করিয়া নিজেও যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আবিদ্যক কর্ম অনাদি অবিদ্যা-সংস্কারসমূহকে বিনষ্ট করিয়া নিজেও বিনষ্ট হইয়া যায়।[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে, যজ্ঞাদি যদি মণ্ডনের মতে ব্রহ্মজ্ঞানেরই

১। যজ্ঞেন দানেন ইত্যাদিশ্রবণাৎ কর্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে বিদ্যায়ামভ্যাসনভ্যায়ামপি, ব্রহ্মসিদ্ধি, ৩৭ পৃঃ।

নিশ্চিতে'পি প্রমাণাৎ তত্ত্বে সর্বত্র মিথ্যাবভাসা নিবর্তন্তে, হেতুবিশেষাদনুবর্তন্তে'পি ; যথা দ্বিচন্দ্র-দিগ্‌বিপর্যাসাদয় 'আপ্তবচননিশ্চিতদিক্‌চন্দ্রতত্ত্বানাম্ ; তথা নির্বিচিকিৎসাদাম্নায়াদবগতাত্মতত্ত্বস্য অনাদিমিথ্যাদর্শনাভ্যাসোপচিতবলবৎসংস্কারসামর্থ্যান্মিথ্যাবভাসানুবৃত্তিঃ ; তন্নিবৃত্তয়ে'স্ত্যন্যদপেক্ষ্যম্ ; তচ্চ তত্ত্বদর্শনাভ্যাসো লোকসিদ্ধঃ ; যজ্ঞাদয়শ্চ শব্দপ্রমাণকাঃ ; অভ্যাসোহি সংস্কারং দ্রঢয়ন্ পূর্বসংস্কারং প্রতিবধ্য স্বকার্যং সন্তনোতি ; যজ্ঞাদয়শ্চ কেনাপ্যদৃষ্টেন প্রকারেণ, ব্রহ্মসিদ্ধি, ৩৫ পৃষ্ঠা।

কেন পুনরুপায়েন অবিদ্যা নিবর্ততে? শ্রবণ-মনন-ধ্যানাভ্যাসৈঃ ব্রহ্মচর্যাদিভিশ্চ সাধনভেদৈঃ শাস্ত্রোক্তৈঃ। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১২ পৃঃ।

যথা রজঃসম্পর্ককলুষিতমুদকং দ্রব্যবিশেষচূর্ণরজঃপ্রক্ষিপ্তং রজো'ন্তরাণি সংহরৎ স্বয়মপি সংহ্রিয়মাণং স্বচ্ছাং স্বরূপাবস্থামুপনয়তি, এবমেব শ্রবণাদিভির্ভেদদর্শনে প্রবিলীয়মানে বিশেষাভাবাদপগতে চ ভেদে, স্বচ্ছে পরিশুদ্ধে স্বরূপে জীবো'বতিষ্ঠতে। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১২ পৃঃ।

সাধন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে মণ্ডনমিশ্র জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলা যায় কি? কোন কোন মনীষী মণ্ডনমিশ্রকে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী বলিয়াও অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১] আমরা অবশ্য ঐরূপ অভিমত সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। কারণ, এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়ের অর্থ কি? পক্ষিকুল যে আকাশপথে উড়িয়া বেড়ায়, সেখানে যেমন পাখীর দুইখানি ডানাই সমানভাবে উড়িয়া বেড়াইবার কারণ হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম যখন তুল্যরূপে মুক্তির প্রতি কারণ হইবে, তখনই জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অঙ্গীকার করা যাইতে পারে।

কথং ভেদেনৈব ভেদঃ প্রতিসংহ্রিয়তে? ভেদপ্রতিপক্ষত্বাৎ, যথা রজসা রজ ইত্যুক্তম্। ব্যক্তমেব ভেদাতীতব্রহ্মণি শ্রবণ-মনন-ধ্যানাভ্যাসানাং ভেদদর্শনপ্রতিপক্ষত্বমবিদ্যানুবন্ধে'পি; যথা পয়ঃ পয়োন্তরয়তি স্বয়ঞ্চ জীর্যতি, যথাচ বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ঞ্চ শাম্যতি। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃঃ।

জ্ঞান ও কর্মের সম্পর্ক বিষয়ে উপরে মণ্ডনমিশ্রের যে মত বর্ণিত হইল, এই মণ্ডনের মতই বাচস্পতিমিশ্র তদীয় ভামতী টীকায় জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধবিচারে পূর্বপক্ষ হিসাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনায় বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধির ভাষাও কোন কোন স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসু পাঠককে ব্রহ্মসিদ্ধি ও ভামতীর নিম্নলিখিত স্থলগুলি তুলনা করিতে অনুরোধ করি। ভামতীর (নির্ণয়সাগর সংস্করণ) ৫৮ পৃষ্ঠার ৭-১৪ পংক্তি এবং ব্রহ্মসিদ্ধি, ৩৫ পৃঃ, ২৩-৩৫ পংক্তি; ১২ পৃঃ, ১৭, ১৮ এবং ২৫ পংক্তি ও ১৩ পৃঃ প্রথম পংক্তি তুলনীয়।

১। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত ব্রহ্মসিদ্ধির ভূমিকায় মণ্ডনমিশ্রকে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

(*a*) In the Brahmakāṇḍa of the Brahmasiddhi, Maṇḍana summarises and criticises Saṁkara's view about the antithesis between karma and jñāna, rejects this view and gives his own verdict in favour of a certain type of jñāna-karma-samuccaya. Brahmasiddhi, Introduction, p. xlvi.

(*b*) That the Naiṣkarmyasiddhi was deliberately designed by Sureśvara, acting at the instance of his great master Saṁkara, to be a clear and effective counterblast to Maṇḍana's attitude towards jñāna-karma-samuccaya. Ibid, p. xlvii.

(*c*) In this connection Maṇḍana clearly advocates his own view regarding jñāna-karma-samuccaya, which consists not merely in the combination of repeated contemplation (abhyāsa)—a special form of mental activity—with the indirect knowledge of the One Absolute Reality derived from the Upaniṣadic śabda, but also in the association of that contemplative discipline of the prescribed yajñas and such other rites. Ibid, p. xxxiv.

(*d*) It may be safely said that both Saṁkara and Sureśvara are definitely against a type of jñāna-karma-samuccaya which Maṇḍana advocates. Ibid. p. xxxv.

ইহার নাম "সমসমুচ্চয়"। এইরূপ সমুচ্চয় ব্যতীত আর একপ্রকার সমুচ্চয় আছে, তাহাকে বলে "ক্রমসমুচ্চয়"। ক্রমসমুচ্চয়ে জ্ঞান ও কর্ম তুল্যরূপে কারণ না হইয়া একটি প্রধান, অপরটি অপ্রধান ; একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ কারণ হইলেও সমুচ্চয় হইতে বাধা নাই। এই মতানুসারে বিচার করিলেও জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয়ে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞান প্রধান হইবে, কর্ম অপ্রধান হইবে, না, কর্ম্ম প্রধান হইবে, জ্ঞান অপ্রধান হইবে? মণ্ডনমিশ্র তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধিতে,—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ঈশা—১১

এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃই কর্মকে জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন —'বিদ্যাবিদ্যে দ্বে অপ্যুপায়োপেয়ভাবাৎ সহিতে ; নাবিদ্যামন্তরেণ বিদ্যোদয়ো'স্তি' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩ পৃঃ)। বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও কর্ম, এই দুইটির একটি উপায় বা সাধন, অপরটি উপেয় বা সাধ্য। কর্ম জ্ঞানের সাধন, জ্ঞান কর্মসাধ্য, এইরূপ মণ্ডনের সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে, তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমসমুচ্চয় স্বীকার করেন না, ক্রমসমুচ্চয়ই অঙ্গীকার করেন। কর্ম জ্ঞানের সহায়, জ্ঞান মুক্তির সাধন। কর্ম চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করে, নির্মল নিষ্কলুষ চিত্তে জ্ঞানের অরুণরেখা ফুটিয়া উঠে। প্রথম কর্ম, পরে জ্ঞান, এইরূপ ক্রমসমুচ্চয়ে কোন অদ্বৈতবেদান্তীরই আপত্তি নাই। এমন কি, শঙ্করাচার্যও এইরূপ ক্রমসমুচ্চয় অঙ্গীকার করেন। যদি বল যে, কর্মই প্রধান, জ্ঞান কর্মের অঙ্গ, বা গৌণভাবে মুক্তির কারণ হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই স্বীকার্য নহে। কারণ, জ্ঞান কর্মস্রোতঃ রোধ করে, সে কর্মের অঙ্গ হইবে কিরূপে? কর্মের ফল অনিত্য, জ্ঞানের ফল নিত্য মুক্তি। এইরূপ বিরুদ্ধফল কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব। আলোচিত বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে যজ্ঞ, দান প্রভৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল যে সাক্ষাৎ সাধন, তাহা কে বলিল? বরং শ্রুতিতে "বিদন্তি" না বলিয়া "বিবিদিষন্তি" এইরূপ সন্ প্রত্যয়ান্ত পদ প্রয়োগ করায়, যজ্ঞাদি যে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, জ্ঞানের ইচ্ছারই সাধন, এই রহস্যই প্রকাশ পাইতেছে। বন্ধ মিথ্যা। মিথ্যা অপ্রমাণ বন্ধ প্রমাণের সাহায্যেই নিবৃত্তি হইবে। যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্মকে মিথ্যা অবিদ্যা-বন্ধনের নিবৃত্তির সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া স্বীকার করিলে, কর্মকেও অন্যতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কর্ম যে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির ন্যায় একটি প্রমাণ, ইহা তো কোন দার্শনিকই স্বীকার করেন না। অদ্বৈতবেদান্তের মতে বন্ধ যদি সত্য হইত, তবে সত্য বন্ধকে জ্ঞান কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিত না, কর্মই নিবৃত্ত করিতে পারিত। মুক্তিতে জ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করা অপরিহার্য হইত এবং সেই ক্ষেত্রে এই বেদান্তবাদ ভাস্করাচার্য-প্রদর্শিত বেদান্তমতেরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইত। ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক আচার্য ভাস্করের মতে বন্ধ সত্য। সত্য ঘট যেমন মুগুরের প্রহারে বিধ্বস্ত হয়, সেইরূপ সত্য বন্ধও জ্ঞান এবং কর্ম, এই উভয় কারণ বশতঃই বিধ্বস্ত হয়—'—অত্রহি জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়ান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্যাভিমতা'

(ভাস্কর-ভাষ্য)। তারপর, কর্ম জ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির প্রতি কারণ হইলে মুক্তির পূর্ব পর্যন্তই যাগযজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্যতা বুঝা যায়। ফলে, সন্ন্যাসাশ্রম বা কর্মসন্ন্যাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সন্ন্যাসাশ্রম যে কথার কথা নহে, ঐ আশ্রমের যে অস্তিত্ব আছে এবং ব্রহ্মচারী তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরই যে কর্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিতে পারেন, তাহা মণ্ডনমিশ্র স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসিদ্ধিতে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] মুক্তিতে জ্ঞান ও কর্মের তুল্যরূপে সমুচ্চয় (সমসমুচ্চয়) কোনমতেই মণ্ডনের অভিপ্রেত বলা যায় না। যজ্ঞাদি কর্ম, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে সহায়কমাত্র, মুক্তির উহারা গৌণসাধন। ঐ সকল সাধনবলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণত হয়।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

অদ্বৈতবেদান্তের মতে মুক্তি দুইপ্রকার, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। এই দ্বিবিধ মুক্তির মধ্যে শঙ্করের মতে জ্ঞানের কোন তারতম্য নাই। তবে, জীবন্মুক্তের প্রারব্ধের ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত জীবন্মুক্তকে এই শরীরে অবস্থান করিতে হয়, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহমুক্তি হয় না। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'র্জুন' (গীতা, ৪।৩৮)। এই গীতাবাক্যের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য "সর্বকর্মাণি" শব্দে প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত অপরাপর কর্ম বুঝিয়াছেন। অনাদিকালসঞ্চিত কর্মসমূহ, যাহা এখন পর্যন্ত ফল দান করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইবে, সেই সকল কর্মই জ্ঞানাগ্নি ভস্ম করে।[২] জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ঐ সকল কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া, উহা আর ফল প্রসব করিতে পারে না। কিন্তু যে সকল কর্ম ইহজীবনে ফলপ্রসূ হইয়া বর্তমান শরীর ও জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ঐ সকল প্রারব্ধ কর্মকে জ্ঞান বিনাশ করে না, ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধের ক্ষয় করিতে হয়।[৩] তবে জ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ ও তোমার আমার ভোগের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞানীর কোন অভিমান নাই। ভোগের লালসাও নাই। জ্ঞানী "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ," এইরূপে সংসারের রঙ্গমঞ্চে লোকশিক্ষা ও ধর্মরক্ষার জন্য কর্ম শেষ হওয়া পর্যন্ত বিচরণ করেন ; এবং বর্তমান ভোগদেহ বিনষ্ট হইলে পরব্রহ্মেই

১। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৩৬ পৃঃ।

২। যেন কর্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যানি অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তানি সর্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।—গীতা শং-ভাষ্য, ৪।৩৮

৩। অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ। ব্রঃ সূঃ, ৪।১।১৫
ভোগেনত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে। ব্রঃ সূঃ, ৪।১।১৯

অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে ন তু আরব্ধকার্যে সামিভুক্তফলে। ইতরেতু আরব্ধকার্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ব্রঃ সূঃ শং-ভাষ্য, ৪।১।১৫, ৪।১।১৯

সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া "বিদেহকৈবল্য" লাভ করেন। সনৎকুমার, অপান্তরতমাঃ, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই ভারতের বুকে বিচরণ করিয়া ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা প্রারব্ধ কর্মেরও বিনাশ স্বীকার করিলে জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞানোদয়ের পরই কোনরূপ কর্মবন্ধন না থাকায়, তাঁহার দেহ বিনষ্ট হইয়া যাইত। জীবন্মুক্ত আত্মদর্শী আচার্যের নিকট হইতে আত্মোপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ কাহারই ঘটিত না, ফলে, "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতি নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইত।

মণ্ডনমিশ্র আচার্য শঙ্করের উল্লিখিত জীবন্মুক্তির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মণ্ডনের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে সঞ্চিত, প্রারব্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার কর্মের বন্ধনই বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'র্জুন' (গীঃ ৪।৩৮)। এই গীতার শ্লোকে—সর্ব শব্দের অর্থের সঙ্কোচ করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। জ্ঞানোদয় হইলেই জ্ঞানীর ভোগদেহ বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানী পুরুষ বিদেহকৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায় না, কিছুকালের জন্য দেহ এবং দেহের ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, এই সকল ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণভাবে উদিত হয় নাই, হইতে চলিয়াছে মাত্র। অনাদিকাল-সঞ্চিত অনন্ত অবিদ্যা-সংস্কার তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। জ্ঞানোদয়ের পরও জ্ঞান পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ঐ অবিদ্যা-সংস্কার-চক্রের বিভ্রম প্রারব্ধরূপে চলিতে থাকে।[১] এই অবস্থায় ঐ জ্ঞানী পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হইয়া থাকে। 'সাচেয়মবস্থা জীবন্মুক্তিরিতি গীয়তে' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩২ পৃঃ)। উহা বস্তুতঃ সিদ্ধাবস্থা নহে, উন্নততর সাধকের অবস্থা। সিদ্ধাবস্থায় পেঁাছিলে সদ্য মুক্তিই হইয়া যায়। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ সাধকের যে বর্ণনা দেখা যায়, শঙ্করের মতে তাহা মুক্ত পুরুষেরই বর্ণনা, মণ্ডনের মতে উহা মুক্ত পুরুষের বর্ণনা নহে, উন্নততর সাধকজীবনের বর্ণনা।[২] এইরূপ সাধককে জীবন্মুক্ত বলিতেও কোন আপত্তি নাই, এই হিসাবেই মণ্ডনমিশ্র জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর-সম্মত জীবন্মুক্তি মণ্ডনমিশ্র অঙ্গীকার করেন নাই। সুরেশ্বর তদীয় নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি ও বার্তিকে শঙ্করমত পূণভাবে অনুসরণ করিয়া জীবন্মুক্তি উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[৩]

১। সর্বকর্মক্ষয়ে'পি ভুজ্যমানবিপাকসংস্কারানুবৃত্তিনিবন্ধনা শরীরস্থিতিঃ কুলালব্যাপারবিগম ইব চক্রভ্রান্তিঃ।—ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩১ পৃষ্ঠা।

২। স্থিতপ্রজ্ঞস্তান্ন বিগলিতনিখিলাবিদ্যঃ সিদ্ধঃ কিন্তু সাধক এব অবস্থাবিশেষং প্রাপ্তঃ (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩০ পৃঃ)। অমলানন্দস্বামী বেদান্তকল্পতরুতে (৯৫৮-৫৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর-সংস্করণ) মণ্ডন-মতের উল্লেখ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক বলিতে যে জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষকেই বুঝায়, এই শঙ্করমত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষ্যে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দেশো জীবন্মুক্তিসাধক উক্তঃ; তত্র স্থিতপ্রজ্ঞঃ সাধকো ন সাক্ষাৎকারবানিতি মণ্ডনমিশ্রৈরুক্তং দূষণমুদ্ধরতি—স্থিতপ্রজ্ঞশ্চেতি (কল্পতরু, ৯৫৮-৫৯ পৃঃ)।

৩। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ১৯৬-২০২ পৃষ্ঠা; বৃহদাঃ বার্তিক Part II, ৭৩৫-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মুক্তিতে অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হয় এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। অবিদ্যা-নিবৃত্তি শঙ্করের মতে ব্রহ্মস্বরূপই বটে, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। অভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা অধিকরণস্বরূপ (ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ)। অভাব অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অবিদ্যার নিবৃত্তি ও ব্রহ্ম, এই দুইটি পদার্থ চরম মুক্তি অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকায়, দ্বৈতবাদই আসিয়া পড়ে; অদ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। আচার্য মণ্ডনের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্তই বটে। অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত হইলেও মণ্ডনের মতে অদ্বৈতবাদের কোন বাধা নাই। কেননা, অদ্বৈতবাদ বলিতে এখানে মণ্ডনমিশ্র ভাবাদ্বৈতবাদই বুঝিয়াছেন। ভাবপদার্থ বা সৎপদার্থ মণ্ডনের মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয়টি নাই; অভাবপদার্থ দ্বিতীয় থাকিলেও তাহাতে অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হয় না। 'দ্বিবিধা ধর্মা ভাবরূপা অভাবরূপাশ্চেতি; তত্রাভাব-রূপা নাদ্বৈতং বিঘ্নন্তি' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪ পৃঃ)। অবশ্যই মণ্ডনমিশ্র তৎকৃত ব্রহ্মসিদ্ধিতে কোথায়ও তাঁহার মতবাদকে "ভাবাদ্বৈতবাদ" বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেন নাই; তবে, তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে আনন্দময় ব্রহ্মের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে তিনি যে ভাবাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাঁহার মতে আনন্দময়, রসময় ব্রহ্মে দুঃখের অভাব আছে; আনন্দ শব্দে ব্রহ্মে দুঃখের অভাবেরই সূচনা করে। 'দুঃখাভাবোপাধিরেবানন্দশব্দঃ, তস্মাদ্দুঃখো-পরম এব আনন্দশব্দস্য ব্রহ্মণ্যর্থ ইতি' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪।৫ পৃষ্ঠা)। "অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্" প্রভৃতি শ্রুতিতে "ন"-এর বহুল প্রয়োগদ্বারা ব্রহ্মের যে স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেখানেও ব্রহ্ম স্থূল নহে, অণু নহে, এইরূপে স্থূলত্বের, অণুত্বের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নেতি, নেতি রূপে অভাবমুখেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে ভাবমুখে (positively) জানিতে পারা যায় না; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিবার জন্য "অভাব" পদার্থ বোধ একান্ত আবশ্যক। যেখানে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান আছে, সেখানে ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পাশাপাশি বিশ্ব-প্রপঞ্চের অভাব এবং অবিদ্যার ধ্বংস, এই দুইও আছে। ইহা না থাকিলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদয়ই হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের পাশাপাশি অভাবের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করায়, মণ্ডনমিশ্রের অদ্বৈতবাদ "ভাবাদ্বৈতবাদ" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মণ্ডনমিশ্র অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়া নিলেও অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে তিনি তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধির প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপ বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'বিদ্যৈব চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ' (ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মকাণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)। এইরূপ বর্ণনার তাৎপর্য এই মনে হয় যে, যে মুহূর্তে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়, সেই মুহূর্তেই অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হয় বলিয়া, অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যা হইতে অতিরিক্ত হইলেও, অতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ মণ্ডনের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি যে স্বতন্ত্র এবং বিদ্যার উদয়েও যে স্বতন্ত্র-ভাবেই অবস্থান করিবে, তাহা মণ্ডনমিশ্র অস্বীকার করেন না। মণ্ডনমিশ্রের

শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ ও মণ্ডনের ভাবাদ্বৈতবাদ।

"ভাবাদ্বৈতবাদ" সুরেশ্বরাচার্য বৃহদারণ্যক-বার্তিকে দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিয়া অবিদ্যা-নিবৃত্তি এবং প্রপঞ্চের অভাব যে ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত অপর কিছুই নহে, তাহা নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে দ্বৈতবেদান্তীর সহিত বাদযুদ্ধে মণ্ডনোক্ত ভাবাদ্বৈতবাদের যৌক্তিকতা অঙ্গীকার করিলেও ইহা যে প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১]

মণ্ডনমিশ্রের ভাবাদ্বৈতবাদ যে চিন্তার দৃঢ়তায়, যুক্তির সাবলীল গতিতে শঙ্করপন্থী ধুরন্ধর অদ্বৈতাচার্যগণের মনেও আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ।

দার্শনিক চিন্তায় মণ্ডনমিশ্রের স্থান।

ব্রহ্মসিদ্ধিতে মণ্ডনের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য সর্বত্রই পরিস্ফুট। তাঁহার বেদান্তমত উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্বীয় মতের সমর্থনে কোথায়ও শঙ্করভাষ্যের পংক্তি উদ্ধৃত করেন নাই। কারণ, তিনি শঙ্করকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদান্তিক হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি স্বাধীনভাবে অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনা করিয়াছেন, এবং স্থানবিশেষে উপনিষৎ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় শঙ্করমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মণ্ডনের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে এতই গভীর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে যে, বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাবান্ দার্শনিক শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াও মণ্ডনের চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত স্থানে স্থানে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

মণ্ডনমিশ্র তাঁহার সময়ে বেদান্ত এবং মীমাংসায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি ভট্ট-মীমাংসার প্রবীণ আচার্যগণ মণ্ডনের মীমাংসা-মতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বেদান্তমতও এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, শালিকনাথমিশ্র তাঁহার প্রকরণপঞ্চিকায়, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত জয়ন্তভট্ট তৎকৃত ন্যায়মঞ্জরীতে এবং প্রবীণ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোকগ্রন্থে অদ্বৈতবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে মণ্ডনোক্ত অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতেই শঙ্কর ও তাঁহার পরবর্তী যুগে মণ্ডনমিশ্রের বেদান্তবাদ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সুধী পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।[২] সুরেশ্বর, বিমুক্তাত্মন্, সর্বজ্ঞাত্মমুনি, আনন্দ-বোধ প্রভৃতি শঙ্করপন্থী বৈদান্তিকগণও যে স্থলে মণ্ডনের সিদ্ধান্ত শঙ্করের সিদ্ধান্তের

১। বস্তুতস্ত অবিদ্যানিবৃত্তেঃ পঞ্চমপ্রকারত্বং ভাবাদ্বৈতঞ্চাভ্যুপগমপরাহতম্।—অদ্বৈতসিদ্ধি, ৪৬৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

২। প্রকরণপঞ্চিকা, ২৮ পৃষ্ঠা (চৌখাম্বা সংস্করণ) দেখুন এবং ব্রহ্মসিদ্ধির নিয়োগকাণ্ডের ৩৯ এবং ৪০ শ্লোক তুলনা করুন; প্রকরণপঞ্চিকা, ১৫৪ পৃঃ সহিত ব্রহ্মসিদ্ধির নিয়োগকাণ্ডের ১০৬ শ্লোক তুলনা করুন; প্রকরণপঞ্চিকা, ১৫৫ পৃঃ সহিত ব্রহ্মসিদ্ধির তর্ককাণ্ডের ২ শ্লোকের তুলনা করুন, ১৫৯ পৃঃ সহিত ব্রহ্মসিদ্ধির ৭ পৃঃ, ১৭৮ পৃঃ সহিত ব্রহ্মসিদ্ধির তৃঃ অঃ ১০৪ শ্লোক তুলনা করুন। ন্যায়মঞ্জরী, ৬৭ পৃঃ, ৪৮ পৃঃ ২০-২৭ পংক্তি; ৪৯ পৃঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি এবং ৫২৬-৫২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বিরোধী হয় নাই, সেই সকল স্থলে নিজেদের সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণহিসাবে মণ্ডনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি পঞ্চপাদিকা-বিবরণের রচয়িতা প্রকাশাত্মযতিও তাঁহার বিবরণে যেখানে মণ্ডনের সিদ্ধান্ত শঙ্করমতের অবিরোধী হইয়াছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন। মণ্ডন-প্রস্থান এবং শঙ্কর-প্রস্থান, এই দুই প্রস্থানই অদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই উভয় প্রস্থানের সিদ্ধান্তভেদ অবশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। মণ্ডন-প্রস্থান-প্রবাহ শঙ্কর-সেবিত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন মুখে ধাবিত হইয়াছিল। সুরেশ্বরের শিষ্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি মণ্ডনের মতবাদ সম্পর্কে যথার্থই বলিয়াছিলেন যে :—

জীবন্মুক্তিগতো যদাহ ভগবান্ সৎসম্প্রদায়প্রভু-
র্জীবাজ্ঞানবচস্তদীদৃগুচিতং পূর্বাপরালোচনাৎ।
অন্যত্রাপি চ তথা বহুশ্রুতবচঃ পূর্বপরালোচনা-
ন্নেতব্যং পরিহৃত্য মণ্ডনবচস্তদ্ধ্যন্যথা প্রস্থিতম্ ॥*
—সংক্ষেপশারীরক, ৫৫৫ পৃঃ, আনন্দাশ্রম সং।

বিভিন্ন পথে প্রবাহিত মণ্ডন ও সুরেশ্বরের বেদান্তের ধারা এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাদিগের স্মরণার্থ উভয়-প্রস্থানের সিদ্ধান্ত-ভেদ সূচির আকারে নিম্নে প্রদান করা গেল :—

মণ্ডন-প্রস্থান	শঙ্কর-সুরেশ্বর-প্রস্থান
১। মণ্ডনমিশ্র স্ফোটবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শব্দব্রহ্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন।	১। শঙ্কর ও সুরেশ্বর স্ফোটবাদ অঙ্গীকার করেন নাই, খণ্ডনই করিয়াছেন; শব্দব্রহ্মবাদ সমর্থন করেন নাই, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।
২। মণ্ডনমিশ্রের অদ্বৈতবাদ ভাবাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ তাঁহার মতে ভাবপদার্থ এক ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়েও প্রপঞ্চের অভাব এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি এই দুইটি অভাবের অস্তিত্ব বিদ্যমানই থাকিবে।	২। শঙ্কর ও সুরেশ্বরের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাবপদার্থও নাই, অভাব পদার্থও নাই। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই একমাত্র স্বীকার্য।
৩। মণ্ডনের মতে অবিদ্যার আশ্রয় জীব এবং বিষয় ব্রহ্ম। বাচস্পতিও ভামতীতে এই মণ্ডন-মতই অনুসরণ করিয়াছেন।	৩। শঙ্কর ও সুরেশ্বরের মতে অবিদ্যার আশ্রয়ও ব্রহ্ম বিষয়ও ব্রহ্ম। পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি বেদান্তিগণ এই মতই অনুসরণ করিয়াছেন।

*পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর ব্যতীত হস্তামলকাচার্য এবং তোটকাচার্য শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের রচিত কোন বিশেষ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। হস্তামলকের হস্তামলক নামে ১৪টি শ্লোকে রচিত একখানি বেদান্তের গ্রন্থ পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর হস্তামলকের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলি বড়ই মধুর এবং হৃদয়স্পর্শী। তোটকাচার্যের একটি গুরুস্তব মাত্র পাওয়া যায়।

মণ্ডন-প্রস্থান	শঙ্কর-সুরেশ্বর-প্রস্থান
৪। মণ্ডনমিশ্র অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ, এই দুইপ্রকার অবিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি-মিশ্রও ভামতীতে তুলা ও মূলা এই দুইপ্রকার অবিদ্যাই অঙ্গীকার করিয়াছেন (ভামতীর প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।	৪। সুরেশ্বরাচার্য মণ্ডনোক্ত দ্বিবিধ অবিদ্যা মানেন নাই। মণ্ডনের উক্ত মত তিনি তাঁহার বার্তিকে খণ্ডন করিয়াছেন।
৫। ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মণ্ডনমিশ্র ভট্ট-সম্মত বিপরীতখ্যাতি সমর্থন করিয়াছেন। অনির্বাচ্য-খ্যাতিবাদ সমর্থন করেন নাই।	৫। সুরেশ্বরাচার্য ভ্রমে অনির্বাচ্য-খ্যাতিবাদই সমর্থন করিয়াছেন।
৬। মণ্ডনমিশ্রের মতে বেদান্তশ্রবণের ফলে যে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, তাহা পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। কেননা, শব্দপরোক্ষ প্রমাণ, শব্দজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? ঐ পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির ফলে ক্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরিণত হয়।	৬। সুরেশ্বরাচার্যের মতে শব্দজন্য অপরোক্ষ-জ্ঞান হইতে কোন বাধা নাই। শব্দাপরোক্ষবাদই তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। মণ্ডনের মত তিনি গ্রহণ করেন নাই, তদীয় বার্তিকে ও নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিতে খণ্ডনই করিয়াছেন।
৭। মণ্ডনমিশ্র প্রতিবিম্ববাদী।	৭। সুরেশ্বরাচার্য আভাসবাদী।
৮। মণ্ডনমিশ্র দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ সমর্থন করেন।	৮। শঙ্কর-সুরেশ্বর দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ সমর্থন করেন না, জগতের ব্যাবহারিক সত্যতাই স্বীকার করেন।
৯। মণ্ডনমিশ্র জীবন্মুক্তি মানেন নাই।	৯। শঙ্কর-পন্থী বেদান্তিগণ জীবন্মুক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান

(খৃষ্টীয় নবম শতক--A.D. 840.)

আমরা মণ্ডনমিশ্রের বেদান্তমতের পরিচয় দিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমরা ভামতীর দার্শনিক পরিস্থিতির আলোচনা করিব। বাচস্পতিমিশ্র অদ্বৈতবেদান্তের একটি স্তম্ভবিশেষ। তাঁহার ভামতী শাঙ্করভাষ্যের অতি অপূর্ব টীকা। যুক্তির দৃঢ়তায়, ভাবের গভীরতায়, চিন্তার সাবলীল গতিতে, ভাষার সৌন্দর্যে, বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির নৈপুণ্যে বাচস্পতির ভামতী অতুলনীয়। ভামতী শাঙ্করভাষ্যের দুর্গম পথযাত্রীর নিকট বাস্তবিকই 'ভা-মতী' বা দীপ্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। ভামতী টীকায় বাচস্পতি ন্যায় ও মীমাংসার যে সকল সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন টীকায় পাওয়া যায় না। এইজন্য ভামতীর স্থান বহু উর্ধ্বে। ভামতী টীকাকে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের ভামতী-প্রস্থান নামে একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। ভামতীর উপর অমলানন্দস্বামী বেদান্তকল্পতরু টীকা এবং ঐ বেদান্ত-কল্পতরুর উপর অপ্পয়দীক্ষিত কল্পতরু-পরিমল নামে টীকা রচনা করিয়া বাচস্পতির সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ উক্তির তাৎপর্য জিজ্ঞাসুর নিকট সুগম করিয়া দিয়াছেন। ভামতীর দার্শনিক রহস্য বুঝিতে হইলে কল্পতরু ও পরিমলের বিচারশৈলী এবং মতবাদের সহিতও পরিচিত হওয়া আবশ্যক। বাচস্পতিমিশ্র কেবল বেদান্তেরই টীকা রচনা করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সাংখ্যদর্শনের টীকা "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী", পাতঞ্জলের টীকা "তত্ত্ববৈশারদী", ন্যায়দর্শনের "ন্যায়-বার্তিক তাৎপর্য" ও "ন্যায়সূচি-নিবন্ধ", মীমাংসাদর্শনের ভট্টমতের "তত্ত্ববিন্দু", মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেকের টীকা "ন্যায়-কণিকা", ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা "তত্ত্ব-সমীক্ষা" প্রভৃতি রচনা করিয়া ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।[১] ঐ সকল টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার টীকার বিশেষত্ব এই যে, তিনি যখন যেই দর্শনের টীকা রচনা করিয়াছেন, তখন সেই দর্শনের যাহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তাহাই তদীয় টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপরাপর দর্শনের বিভিন্নমুখী চিন্তার ধারা তাঁহার সিদ্ধান্তকে কলুষিত করে নাই। ষড়্‌দর্শনের টীকাকারের পক্ষে এইরূপ

১। বাচস্পতি বৈশেষিক দর্শনেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু ঐ টীকার এখন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

চিন্তার স্বাতন্ত্র্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এইজন্য ষড়্‌দর্শন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র "সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র" বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ন্যায়সূচি-নিবন্ধে ঐ গ্রন্থের রচনাকাল বসু, অঙ্ক, বসু বৎসর (বস্বঙ্ক-বসু বৎসরে) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১] বসু শব্দে ৮ সংখ্যাকে এবং অঙ্ক শব্দে ৯ সংখ্যাকে বুঝায়, সুতরাং বসু, অঙ্ক, বসু বলিলে ৮৯৮ সংবৎসর পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ বিক্রম সংবৎসরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত বিক্রম সংবৎসর অনুসারে খৃষ্টাব্দ ধরিয়া লইলে বাচস্পতির ন্যায়সূচি-নিবন্ধের রচনাকাল খৃষ্টীয় ৮৪০ অব্দ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, বাচস্পতিমিশ্র যে খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। বাচস্পতিমিশ্র ভামতীর সমাপ্তি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, তিনি "নৃগ" নামক নরপতির শাসনকালে ভামতী রচনা করিয়াছিলেন—"শ্রীমন্নৃগে'কারি ময়া নিবন্ধঃ"।[২] এই নৃগ রাজা কে? পুরাণে ইক্ষ্বাকু বংশে নৃগ নামে এক রাজার পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি তো বাচস্পতির সমসাময়িক হইতে পারেন না। ভারতের ইতিহাসে নৃগনামক কোন রাজার পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন কোন মনীষীর মতে নৃগ শব্দে এখানে পালবংশের প্রসিদ্ধ রাজা ধর্মপালকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নৃগ শব্দে "নৃণাং গতিঃ" (নৃ-গম্-ড) নরসমূহের আশ্রয় বলিয়া ধর্মকে বুঝাইয়া থাকে। ধর্মই মানবের একমাত্র আশ্রয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। নামের অংশও সম্পূর্ণ নামই সূচনা করে, সুতরাং নৃগ শব্দে ধর্ম্মপালেরই ইঙ্গিত করা হইয়া থাকিবে। নৃগ-রাজার সম্পর্কে যে সকল বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, ঐ সকল বিশেষণ দিগ্‌বিজয়ী পালরাজ ধর্মপালের পক্ষেই শোভন হয়। ধর্মপাল ৭৯০-৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন,[৩] সুতরাং দেখা যায় যে, তিনি বাচস্পতিমিশ্রের সমসাময়িক অদ্বিতীয় মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। এইরূপ রাজার বর্ণনা সেই সময়ের রচিত গ্রন্থে থাকা একান্তই স্বাভাবিক। আমাদের মতে "নৃগ" শব্দ হইতে ধর্মপালকে বুঝাইবার এইরূপ চেষ্টা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার সহধর্মিণীর নাম অনুসারে তদীয় শাঙ্করভাষ্যের টীকার নাম করিয়াছিলেন বলিয়া একটি আখ্যায়িকা এদেশে

বাচস্পতিমিশ্রের পরিচয়।

১। ন্যায়সূচি-নিবন্ধো'সাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্ক-বসু-বৎসরে।।—ন্যায়সূচি-নিবন্ধ সমাপ্তি দ্রষ্টব্য।

২। নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।
কার্তস্বরাসারসপূরিতার্থ সার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ।।
নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্নৃগে'কারি ময়া নিবন্ধঃ।। ভামতীর সমাপ্তি শ্লোক।

৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৫-১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন গভীর রজনীতে শাস্ত্রচিন্তায় তন্ময় হইয়া বাচস্পতি যখন ভামতী টীকা রচনা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ প্রদীপটি নিভিয়া যায়। বাচস্পতির সহধর্মিণী গৃহান্তর হইতে আসিয়া প্রদীপটি জ্বালিয়া দিলেন এবং কিছু বলিবার জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি তাঁহার টীকার নাম ভামতী রাখার প্রবাদ।

শাস্ত্র-সাধনায় তন্ময় বাচস্পতি তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত। তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে চিনিতে পর্যন্ত পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, ললনে! তুমি কে? ইহা শুনিয়া স্ত্রীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপনার শ্রীচরণের দাসী। আমার দুর্ভাগ্য, আপনিই আমাকে চিনিতে পারেন না, পরে আমাকে কে চিনিবে? আমার পুত্র হইল না, পিণ্ডলোপ তো হইলই, মৃত্যুর পর আমার নাম পর্যন্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। সহধর্মিণীর এই করুণ উক্তি বাচস্পতির হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, সাধ্বি, তুমি হিন্দুরমণীর আদর্শস্থানীয়া। তুমি তোমার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ? আমি তোমাকে বিদ্বন্মণ্ডলীর চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব। আমার এই শাঙ্করভাষ্যের টীকা, তোমার নামানুসারে "ভামতী" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। তোমার নাম দার্শনিক সাহিত্য-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে চিরকালের জন্য অঙ্কিত থাকিবে। বাচস্পতির এই উক্তি সার্থক হইয়াছে। তিনি তাঁহার সহধর্মিণী ভামতীকে বাস্তবিকই অমর করিয়া গিয়াছেন। ধর্মজীবনে বাচস্পতিমিশ্র নিষ্কাম কর্মযোগী ছিলেন। অভিমান তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থরাজি ভগবানের রাঙাচরণে উপহার অর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।[১]

বাচস্পতিমিশ্র ভামতীর আরম্ভশ্লোকেই তাঁহার প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের অতি সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যিনি জগতের প্রভু, মায়াতীত পরমেশ্বর হইয়াও মূলা ও তুলা এই দুই-প্রকার অনির্বচনীয় অবিদ্যার সহায়তায় ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন, যাহা হইতে এই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্‌ভূত হইয়াছে, সেই অপরিমিত সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ অমৃত ব্রহ্মকে নমস্কার করিতেছি।[২] বাচস্পতি

বাচস্পতির বেদান্তমত।

১। যন্ন্যায়-কণিকা-তত্ত্বসমীক্ষা-তত্ত্ববিন্দুভিঃ।
যন্ন্যায়-সাংখ্য-যোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ॥
সমচৈষং মহৎপুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাম্ পরমেশ্বরঃ॥—ভামতীর সমাপ্তি শ্লোক।
(সম্ভবতঃ ভামতীই বাচস্পতিমিশ্রের শেষ গ্রন্থ)।

২। অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়-সচিবস্য প্রভবতো
বিবর্তা যস্যেতে বিয়দনিলতেজো'বনয়ঃ।
যতশ্চাভূদ্ বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং।
নমামস্তদ্‌ব্রহ্মাপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্॥—ভামতীর প্রারম্ভশ্লোক।

এই নমস্কার শ্লোকে অল্পকথায় অনেক অদ্বৈত-বেদান্ত-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে অদ্বৈত বেদান্তে দুই প্রকার অবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। একপ্রকার অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপা জগৎপ্রসবিনী মায়া, ইহারই নাম "মূলা-অবিদ্যা"। এই অবিদ্যাই ঈশ্বরচৈতন্যের উপাধি, দ্বিতীয় অবিদ্যার নাম "তুলা-অবিদ্যা"। এই অবিদ্যা জীব-চৈতন্যের উপাধি। অবিদ্যাই সৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টার সহায়। অবিদ্যার সহায়তায় বিশ্বপতি নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। মায়া, বাচস্পতির মতে, সৃষ্টির সহকারী কারণ, কার্যে অনুগত কারণ নহে। পঞ্চপাদিকা-বিবরণের মতে মায়া-সম্বলিত সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পরমেশ্বরই জগতের উপাদান। সর্বজ্ঞাত্মমুনির মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই উপাদান। শুদ্ধ কূটস্থ ব্রহ্ম স্বতঃ উপাদান হইতে পারেন না। এইজন্য মায়াকে দ্বার করিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইয়া থাকেন। সর্বজ্ঞাত্মমুনির মতে মায়া দ্বারকারণ; দ্বারকারণ মায়াও মায়িক সৃষ্টিতে অনুগত হইয়া থাকে। মায়াবী ব্রহ্ম যে জগদিন্দ্রজাল রচনা করেন, তাহাতে মায়ার সহযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। সৃষ্টিতে মায়ার সহায়তা অঙ্গীকার করিলেও মায়ার ইন্দ্রজাল সেই মায়াতীত বিশ্বনাটকের নটকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়াবী যেমন তাঁহার রচিত ইন্দ্রজালে অসংস্পৃষ্ট, বিশ্বের মহানট ব্রহ্মও সেইরূপ জগদিন্দ্রজাল রচনা করিয়াও স্বতঃ অবিকারী; এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয় হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। ফলে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্তই হইয়া দাঁড়াইল, পরিণাম নহে। মায়া-সচিব জগৎকর্তা পরমেশ্বর হইতে চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় প্রভৃতি বর্ণিত হওয়ায় জগৎ-কর্তৃত্ব প্রভৃতিকেই ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। সূত্রকারও—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) এই সূত্রে ঐরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জগৎকর্তা ব্রহ্মকে মায়া-সচিব বলায় সূত্রোক্ত ঐ লক্ষণটি যে মায়িক ব্রহ্মেরই লক্ষণ, মায়াতীত পরব্রহ্মের লক্ষণ নহে, এইরূপই বুঝা যায়; অর্থাৎ ইহা যথার্থ ব্রহ্মলক্ষণ নহে, ব্রহ্মের গৌণ বা তটস্থ লক্ষণ। "অপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্" ব্রহ্ম সত্য, অমেয়, জ্ঞানানন্দময়, ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ বা স্বরূপ লক্ষণ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১)। এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় বাচস্পতিমিশ্র একটি গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বাচস্পতির আশঙ্কা।

তিনি বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উপদেশ করিলেন, তাহা তো অসম্ভব কথা। ব্রহ্ম তো জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন না। কেননা, যে বস্তু সম্পর্কে লোকের জিজ্ঞাসার উদয় হয়, সেই বস্তুটি পূর্বে অজ্ঞাত, সন্দেহ-সঙ্কুল এবং প্রয়োজনীয় হওয়া আবশ্যক। যে বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞাতার সুস্পষ্ট জ্ঞান আছে, কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই এবং প্রয়োজনও নাই, সেইরূপ বস্তু সম্বন্ধে কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিরই জিজ্ঞাসার উদয় হইতে দেখা যায় না। বেদান্তশাস্ত্র, জীবের আত্মাই ব্রহ্ম, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন, এই সত্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। জীবের আত্মা ও ব্রহ্ম যদি অভিন্নই হয়, তবে, "অহংভাবে" জীবের যে

আত্মদর্শন হইতেছে, তাহাই তো তাহার ব্রহ্ম-দর্শন। এই ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য বেদান্তশাস্ত্র-সেবার আবশ্যক কি? জীবের এই আত্মদর্শন প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই জ্ঞানে কোনরূপ সন্দেহ ও ভ্রমের অবকাশ নাই। "আমি আমি কি, না," কিংবা "আমি আমি না" কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই আত্মার সম্বন্ধে এইরূপ সংশয় বা মিথ্যা-বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায় না। যদিও আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপেই সাধারণতঃ আত্মপ্রত্যক্ষের উদয় হইয়া থাকে। দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মাকে অভিন্ন করিয়াই লোকে ধরিয়া নেয়, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের ধর্মকে আত্মার ধর্ম মনে করিয়া ভুল করে, তবুও দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি যে আত্মা নহে, আত্মা যে দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির অতীত, দেহ-যন্ত্রের চালক এবং ভাসক, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় বিচারশক্তির সাহায্যেই বুঝিতে পারে, তাহার জন্য বেদান্ত অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। দেহ যে আত্মা হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে, দেহ পরিবর্তনশীল, আত্মা অপরিবর্তনীয়। দেহ আত্মা হইলে শৈশবের তরুণ শরীর যখন বৃদ্ধ বয়সে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়, ঐ শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও পরিবর্তিত হইয়া যাইত। বালক বয়সের "আমি" এবং বৃদ্ধ বয়সের "আমি" বিভিন্ন "আমি" হইয়া যাইতাম। এই দুই "আমি" যে অভিন্ন, তাহা বুঝা যাইত না। "যেই আমি বালক বয়সে আমার পিতা মাতাকে দেখিয়াছি, সেই আমিই পরিণত বয়সে আমার পৌত্র, প্রপৌত্রগণকে দেখিতেছি" এইরূপ আমিত্বের ঐক্যবোধ, শৈশব ও বৃদ্ধ অবস্থার শরীরের ঐক্য না থাকায়, কোন মতেই সম্ভবপর হইত না। ঐরূপ ঐক্যবোধ পরিবর্তনশীল দেহ যে আত্মা নহে, আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত এবং শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যেও অপরি-বর্তনীয়, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দিতেছে। দেহ যেমন "আমি" বা আত্মা নহে, ইন্দ্রিয়সকলও সেইরূপ আত্মা হইতে পারে না। কারণ, শরীরে ইন্দ্রিয় একটি নহে, বহু, ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে ইন্দ্রিয়ভেদে প্রত্যেক শরীরেই "আমি" বা আত্মাও বহু হইয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন ঐন্দ্রিয়ক বিজ্ঞানের অন্তরালে যে জ্ঞানময় একই আত্মা বিরাজ করে, এইরূপ আত্মার ঐক্যবোধ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে, যেই আমি চক্ষুর সাহায্যে বইখানি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই উহা স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ আমিত্বের একত্ববোধ, বিভিন্ন প্রকার ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া উদিত হইতে পারে না। বুদ্ধি এবং মনঃ প্রভৃতির সাহায্যে আমি বিষয় দর্শন করিয়া থাকি। বুদ্ধি, মনঃ প্রভৃতি আমার বিষয়দর্শনের সাধন বা উপায়। যাহা আমার বিষয়-দর্শনের সাধন, তাহা কি কর্তা বা দ্রষ্টা "আমি" হইতে পারে? তারপর, আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়, আমার বুদ্ধি, এইরূপে আমি বা আত্মার সহিত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভেদই সর্বদা প্রত্যক্ষ হয়। আমি দেহ, আমি ইন্দ্রিয়, আমি বুদ্ধি, এইরূপ অভেদ তো প্রত্যক্ষের গোচর হয় না, সুতরাং দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতিকে আত্মা বলা যায় কিরূপে?

অহংরূপে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাত আত্মার সম্বন্ধে যেমন কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই বলিয়া জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে না, সেইরূপ আত্মজিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজনও

দেখা যায় না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং সংসারের সমূলে নিবৃত্তিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। যথার্থ আত্মবিজ্ঞানের অভাবই সংসারের কারণ, সুতরাং আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে সংসারের নিবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই সংসারও অনাদি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানও অনাদি। এই দুইটি অনাদি বস্তুই যখন পাশাপাশি চলিতেছে, তখন এই দুই-এর মধ্যে যে কোন বিরোধ আছে, এরূপ তো বুঝা যায় না। বিরোধ থাকিলেই একটি অপরটিকে নিবৃত্তি করিবে। বিরোধ না থাকিলে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হইবে কেন? সংসার যদি মিথ্যা হয়, তবেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মিথ্যা সংসারকে নিবৃত্ত করিতে পারে। অনাদি সংসারকে তো মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, সত্য, স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান সত্য সংসারের নিবৃত্তি করিতে পারে না। ফলে, প্রয়োজন না থাকায় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, এইরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে।[১] বাচস্পতিমিশ্রের উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, "অহং" বা "আমি" বলিয়া সকলেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে, ইহা সত্য কথা। আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মনঃ বা বুদ্ধি নহি, ইহাও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় বিচারশক্তির সাহায্যেই বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ঐরূপ প্রত্যক্ষমূলে যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় কি? আমি যখন আমার আত্মাকে অহংভাবে প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার দেহের আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই আমি প্রত্যক্ষ করি। ফলে, অপরাপর সকলের "আমি" হইতে আমার "আমি" যে বিভিন্ন, ইহাও আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। দেহই দেখা যায় আত্মার

বাচস্পতির আশঙ্কার সমাধান।

১। ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, ইহাই ছিল বেদান্তীর প্রতিজ্ঞা। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞাত জিজ্ঞাস্যত্ব সাধনের জন্য দুইটি হেতুর অবতারণা করিয়াছেন—প্রথমতঃ, ব্রহ্মতত্ত্ব সন্দেহসঙ্কুল, দ্বিতীয়তঃ, উহা প্রয়োজনীয়ও বটে,—(১) সন্দিগ্ধত্ব এবং (২) সপ্রয়োজনত্ব। বাচস্পতি পূর্বপক্ষীর যুক্তি সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম সন্দেহের বিষয় হইতে পারেন না, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজনও নাই। ফলে, মুক্তিকামী ব্যক্তির ব্রহ্ম বিচারের (জিজ্ঞাসার) বিষয় হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম উজ্জ্বল আলোক-মালার মধ্যে অবস্থিত ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ ঘটাদির ন্যায় সন্দেহের অতীত এবং কাক-দন্তের ন্যায় নিষ্প্রয়োজনও বটে।—'মুমুক্ষণা ব্রহ্ম ন বিচার্যং, তং প্রত্যসন্দিগ্ধত্বাৎ, তথাবিধ কুম্ভবৎ; তথা অপ্রয়োজনত্বাৎ, কাক-দন্তবদিতি' (অধ্যাসভাষ্য—ভামতী, ৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)। যেক্ষেত্রে সন্দেহ কিংবা প্রয়োজন থাকে, সেই ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসার উদয় হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে সন্দিগ্ধত্ব এবং সপ্রয়োজনত্ব যে জিজ্ঞাস্যত্বের ব্যাপক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আলোচ্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে জীবমাত্রেরই অহংরূপে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞায়মান আত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কে সন্দেহ এবং প্রয়োজনের কোনরূপ অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে, সন্দিগ্ধত্ব এবং সপ্রয়োজনত্বের বিরুদ্ধ অসন্দিগ্ধত্ব এবং নিষ্প্রয়োজনত্বই এখানে আছে। জিজ্ঞাস্যত্বের ব্যাপক সন্দিগ্ধত্ব ও সপ্রয়োজনত্ব না থাকায়, ব্যাপ্য জিজ্ঞাস্যত্বেরও অভাব এক্ষেত্রে অবশ্যই থাকিবে—'ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যজিজ্ঞাস্যত্বাভাব ইত্যর্থঃ' (ভামতী, ৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)। ইহাই ভামতীর আরম্ভে "ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ" এই কথা দ্বারা বাচস্পতি আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আবাসগৃহ। ঐ আবাসগৃহে অবস্থিত আত্মা যখন আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আত্মা কখনও দেহের ধর্মকে, কখনও বা ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ধর্মকে নিজের ধর্ম করিয়া নিয়া দেহাদির সহিত অভিন্ন হইয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পরিচ্ছিন্ন, দেহবদ্ধ আত্মা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা কলুষিতও বটে। ইহাকে তো প্রকৃত আত্মদর্শন বলা যায় না। আত্মার যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি পাঠে জানা যায়। আত্মা নিত্যশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিন্ময় এবং আনন্দঘন। এই আত্মা দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি সর্ববিধ পরিচ্ছেদের অতীত, সর্বব্যাপী, ভূমা, এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব, ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এইরূপ শাস্ত্রোক্ত ভূমা, অপরিচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বের সহিত প্রত্যক্ষলব্ধ পরিচ্ছিন্ন আত্মদর্শনের বিরোধ অপরিহার্য হওয়ায় আত্মার স্বরূপবিষয়ে সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী। এই সন্দেহ-নিরাসের জন্য আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মমীমাংসা প্রয়োজন। ঐ মীমাংসা বেদান্ত-লভ্য। অতএব বেদান্তশাস্ত্রানুশীলন একান্ত আবশ্যক। ইহার উত্তরে প্রত্যক্ষ আত্মদর্শী বলিবেন যে, দর্শনশাস্ত্রের অপর নাম মননশাস্ত্র। শ্রুতিও আত্মজিজ্ঞাসায় মনন যে অন্যতম প্রধান উপায়, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মননশাস্ত্রে প্রমাণের সাহায্যেই বস্তুতত্ত্ব বিচার করিতে হইবে। প্রমাণের মধ্যেও প্রত্যক্ষপ্রমাণ সর্ববাদি-স্বীকৃত এবং শ্রুতি, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অপেক্ষায় জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বভাবীও বটে। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যে আত্মাকে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই যথার্থ আত্মদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। উপনিষদের বেদীমূলে প্রত্যক্ষকে বিসর্জন করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। প্রত্যক্ষে যাহা পাওয়া যায়, সহস্র বেদই কি তাহার অন্যথা করিতে পারে? বেদ কি গরুকে ঘোড়া করিতে পারে? অতএব প্রত্যক্ষের সহিত বৈদিক আত্মজ্ঞানের বিরোধ হইলে প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া লইয়া উপনিষদ্‌বেদ্য আত্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষের অনুকূল করিয়া (গৌণ-ভাবে) ব্যাখ্যা করিয়া নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সেরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কোন স্থানই থাকে না। ইহাই প্রত্যক্ষবাদীর উল্লিখিত আপত্তির মর্ম।

শ্রুতি ও প্রত্যক্ষপ্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্ প্রমাণটি প্রবল হইবে?

প্রত্যক্ষবাদীর উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষায় জ্যেষ্ঠ বা পূর্বভাবী প্রমাণ, এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণের ভিত্তিতেই যে অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ গড়িয়া উঠে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অনুমান করিতে হইলে অনুমানের হেতু "ব্যাপ্তিজ্ঞান" আবশ্যক। ব্যাপ্তি-জ্ঞানহেতুও সাধ্যের (বহ্নি অনুমানে ধূম ও বহ্নির একত্র) প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভব হয় না; সুতরাং অনুমান প্রমাণের মূলে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। কোন শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে হইলে সেই শব্দের সহিত উহার অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্বে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়। ঐ সম্বন্ধজ্ঞানের নামই শব্দের শক্তিজ্ঞান। শব্দের শক্তিজ্ঞানই শব্দজ বোধের কারণ। শক্তিজ্ঞান ব্যতীত শব্দার্থ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞানটি প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান। শব্দার্থ জ্ঞান যাহার আছে,

সেইরূপ বৃদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়াই প্রথমতঃ বালকের শব্দের শক্তিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। যদিও শব্দশাস্ত্রে শব্দের শক্তিজ্ঞানের সাধন বা উপায় হিসাবে ব্যাকরণ, অভিধান, আপ্তবাক্য প্রভৃতিকেও গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য, সেই সকল স্থলেও শক্তিজ্ঞানের মূলে যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞান বিদ্যমান আছে, তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি প্রমাণও যে প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণরহস্যবিৎ অবশ্যই স্বীকার করিবেন; সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণ যে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষায় জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বভাবী, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জ্যেষ্ঠ হইলেই সেই প্রমাণ শ্রেষ্ঠ হইবে কি? ঝিনুক খণ্ডকে যেখানে ভ্রান্তদর্শী ব্যক্তি "ইদং রজতম্" এইরূপে রজত বলিয়া প্রত্যক্ষ করে, সেখানে রজতজ্ঞানটি প্রথমে উৎপন্ন হয়, শুক্তিজ্ঞান পরে উৎপন্ন হয়। পরে উৎপন্ন শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা প্রথমে উৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। পূর্বভাবী রজতজ্ঞান পর-ভাবী শুক্তিজ্ঞানকে বাধা করিতে পারে না। কারণ, পূর্বে উৎপন্ন রজতজ্ঞানটি মিথ্যা, আর, পরে উৎপন্ন শুক্তিজ্ঞান সত্য। সত্যজ্ঞান পরে উৎপন্ন হইলেও পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞানকে বিনাশ করিয়াই উৎপন্ন হয়, ইহাই সত্যজ্ঞানের স্বভাব। আলোচিত স্থলে পূর্বভাবী প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন যদি মিথ্যা হয় এবং পরভাবী বৈদিক আত্মবিজ্ঞান যদি সত্য হয়, তবে, পূর্বভাবী মিথ্যা আত্মপ্রত্যক্ষ অপেক্ষায় পরে উৎপন্ন বৈদিক আত্মজ্ঞানই প্রবলতর হইবে। অবশ্য পূর্বভাবী প্রত্যক্ষজ্ঞান যদি যথার্থ হয়, তবে অন্য সকল প্রমাণকে বাদ দিয়া প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং এখানে বিচার করা আবশ্যক যে, শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষ এই দুইটি প্রমাণের মধ্যে কোন্ প্রমাণটি সত্য, এবং কোন্ প্রমাণটি মিথ্যা। প্রত্যক্ষপ্রমাণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে উৎপন্ন হয়, অতএব উহা "পৌরুষেয়" (personal), আর বেদ "অপৌরুষেয়"। বিষয়-দর্শনকারী পুরুষ ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত নহে। এইজন্য তাঁহার বিষয়-দর্শনের মূলে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ থাকাও বিচিত্র নহে। বৈদিক সত্য-তত্ত্বজ্ঞ ঋষি তাঁহার ধ্যানদীপ্তনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; প্রজ্ঞাচক্ষুতে ঐ সত্যের বিকাশ হয়। ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষ-দোষ আর্ষ দৃষ্টিকে কলুষিত করিতে পারে না। এইরূপ নির্মল, নিষ্কলুষ বৈদিকজ্ঞান যে দোষ-শঙ্কা-কলুষিত প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে প্রবলতর প্রমাণ, ইহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষের বিরোধে শ্রুতির প্রাধান্যই স্বীকার্য।

জ্ঞানের প্রামাণ্য (validity of knowledge) বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শনের মতে স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যও সুস্থির হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান যদি বেদান্তের মতে স্বতঃপ্রমাণই (self-valid) হয়, তবে (পৌরুষেয়) প্রত্যক্ষজ্ঞানও স্বতঃপ্রমাণ, (অপৌরুষেয়) বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানও স্বতঃ-প্রমাণ। দুইটি স্বতঃপ্রমাণ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ দুর্বল, আর, বৈদিকজ্ঞান প্রবল; প্রবল বৈদিকজ্ঞানের দ্বারা দুর্বল প্রত্যক্ষের বাধ হইবে, ইহা কিরূপে সাব্যস্ত করা

যায়? দ্বিতীয়তঃ, স্বতঃপ্রমাণ জ্ঞানে ভ্রম ও সংশয়ের আশঙ্কাই বা আসে কিরূপে? জ্ঞানমাত্রই তো সত্য, মিথ্যা জ্ঞান তো এই মতে অসম্ভব কথা। এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ, ইহা সত্য কথা। কিন্তু জ্ঞানের যাহা সাধন, ঐ সাধনের মধ্যে যদি কোন একটি সাধন বিকল বা দুষ্ট হয়, তবে সেই দোষ-কলুষিত, বিকৃত সাধনের ফলে উৎপন্ন জ্ঞান সত্য হইবে কি? প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি কামলা রোগে দূষিত হয়, তবে সম্মুখস্থিত সাদা জিনিষটিও সাদা দেখায় না, হলুদবর্ণ দেখায়। কামলা রোগীর এইরূপ প্রত্যক্ষকে সত্য বলা যাইবে কি? তারপর, আলোক যদি অস্পষ্ট হয়, দৃশ্য বিষয়টি যদি দ্রষ্টার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকে, তবেও এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে দেখা যায়। জ্ঞানের কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতির দোষই পৌরুষেয় দোষ। এই সকল দোষের ফলে স্বতঃপ্রমাণ জ্ঞানও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। লৌকিক সর্ববিধ প্রমাণেই ঐরূপ পৌরুষেয় দোষের আশঙ্কা আছে, অপৌরুষেয় বেদে ঐ সকল পৌরুষেয় দোষের আশঙ্কা নাই। এইজন্যই লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অপেক্ষায় বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি তত্ত্বশাস্ত্রই সুদৃঢ় প্রমাণ; এবং নিষ্কলুষ বৈদিকজ্ঞানের দ্বারা লৌকিক (পৌরুষেয়) প্রত্যক্ষের বাধই স্বীকার্য। বৈদিকজ্ঞানকে বস্তুতঃ পক্ষে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাধকই বলা যায় না। বেদান্তের মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণ ব্যাবহারিক প্রমাণ, বৈদিক ব্রহ্ম-বিজ্ঞান পারমার্থিক প্রমাণ। বৈদিকজ্ঞানের পারমার্থিক প্রামাণ্য লৌকিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যে পারমার্থিক প্রামাণ্য নাই, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য যে ব্যাবহারিক, ইহাই সূচনা করে। প্রত্যক্ষের ব্যাবহারিক প্রামাণ্যের মূলে কোন আঘাত করে না। এই অবস্থায় বৈদিকজ্ঞানকে প্রকৃত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের বাধকই বলা চলে না। বেদান্ত-শ্রবণের ফলে যে ভূমা আত্মবিজ্ঞান উদিত হয়, তাহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বা চরম পরিণতি। ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অপর কোন জ্ঞাতব্যই অবশিষ্ট থাকে না। এইরূপ চরম জ্ঞান যে ব্যাবহারিক, পরিচ্ছন্ন আত্মদর্শনের বা অহংজ্ঞানের অসত্যতা সূচনা করিবে, ইহা আর আশ্চর্য কি?[১]

১। শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষের বিরোধে শ্রুতিলব্ধ জ্ঞানের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ভামতী টীকার প্রারম্ভেই, জ্যেষ্ঠ প্রমাণ প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হওয়ায় প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ বেদই অপ্রমাণ হউক, এই বলিয়া যে গভীর বিচারটির অবতারণা করিয়াছেন এবং যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সমস্তই মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের (তর্ককাণ্ডের) প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে মণ্ডনমিশ্র প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির বিরোধে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বভাবী প্রত্যক্ষ-প্রমাণই শ্রুতি অপেক্ষায় প্রবল হউক, এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া, প্রত্যক্ষ ব্যাবহারিকভাবে সত্য হইলেও বেদই পারমার্থিক প্রমাণ। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের সহিত বেদের প্রামাণ্যের কোন বিরোধ নাই। বৈদিক-জ্ঞান উৎপত্তিতে প্রত্যক্ষসাপেক্ষ হইলেও স্বতঃপ্রমাণ বিধায় অপৌরুষেয় বেদই প্রত্যক্ষ অপেক্ষায় প্রবলতর প্রমাণ। বৈদিক প্রমাণের তুলনায় প্রত্যক্ষই দুর্বল।—এই সমস্ত বিষয়ই অতি নিপুণতার সহিত উপন্যাস করিয়াছেন (ব্রহ্মসিদ্ধি, তর্ককাণ্ড ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভামতীর সমগ্র বিচারশৈলী এবং যুক্তিলহরীই মণ্ডনমিশ্রের নিকট হইতে আহৃত, ইহা সুধী পাঠক নিশ্চয় স্বীকার করিবেন। আমরা

যাঁহারা আমিত্বের প্রত্যক্ষকেই আত্মার যথার্থ স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষবলেই আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই "আমি গৃহে থাকিয়া ইহা জানিতেছি" —'অহমিহৈবাস্মি সদনে জানানঃ' (ভামতী, ১২ পৃঃ), এইরূপে দেহে অবস্থিত জ্ঞাতা আত্মাকে দেহের সহিত অভিন্ন করিয়াই ব্যবহার করেন। অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে ঐরূপে গৃহ-পরিচ্ছিন্নভাবে দেখা তো যথাথ আত্মদর্শন নহে। যদি বল যে, ঐ স্থলে দেহেরই পরিচছন্নতার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আত্মার নহে, তবে, "অহম্" এইরূপে বলার কোনই অর্থ হয় না, কারণ, দেহ তো আর "অহম্" নহে। "অহং কৃশঃ" বলিলে যেমন আমার দেহেরই কৃশতা সূচনা করে, সেইরূপ এখানেও অহং শব্দে গৌণভাবে দেহকেই বুঝায়, এইরূপ বলাও এখানে সঙ্গত নহে। কেননা, তাহা হইলে (জানানঃ) "জানিতেছি" এই পদটির সহিত জড়দেহ-বোধক "অহম্" শব্দের অভেদ নির্দেশ করা চলে না। দেহ তো আর জানে না, আত্মাই জানে, সুতরাং আমি গৃহে আছি এবং জানিতেছি এইরূপ ব্যবহারে যে অজড় আত্মাকেই অহম্ শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপী আত্মার ঐরূপ পরিচ্ছিন্নতাবোধ সত্য নহে, মিথ্যা। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অনাদিকাল সঞ্চিত যে পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা বা মিথ্যাজ্ঞান আছে, তাহা বিদূরিত করিয়া যথার্থ আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্যই অধ্যাত্মশাস্ত্র-সেবা আবশ্যক। বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যেও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নে ব্রহ্মসিদ্ধি ও ভামতীর কতক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম।

(ক) প্রত্যক্ষাদিবিরোধে আম্নায়স্য দৌর্বল্যং সাপেক্ষত্বাৎ; তথাহি স্বরূপসিদ্ধ্যর্থমেবতাবৎ প্রত্যক্ষাদীন্যাম্নায়ো'পেক্ষতে; তথাচ তেষাং প্রামাণ্যমভ্যুপগন্তব্যম্ তদপবাধনে স্বরূপস্যৈবতাবদসিদ্ধেঃ। —ব্রহ্মসিদ্ধি, ৩৯ পৃঃ।

(খ) আম্নায় এব বলবাংস্তদ্‌বিরোধে পৌর্বাপর্যে পূর্বদৌর্বল্য প্রকৃতিবৎ পূর্বাবাধেন নোৎপত্তিরুত্তরস্য হি সিধ্যতি। তথাহি---সম্ভবদ্‌বিচিত্রবিভ্রমহেতুত্বাৎ প্রত্যক্ষাদীনাম্, বিগলিত-নিখিল-দোষাশঙ্কত্বাচ্চাম্নায়স্য। পুরুষাশ্রয়াণাংহি দোষাণাং শব্দে পুরুষাভাবে'সম্ভবাৎ। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪০ পৃঃ।

(গ) প্রত্যক্ষাদীনাস্তু ব্যাবহারিকং প্রামাণ্যম্। ন তত্ত্বাবেদনলক্ষণম্। ব্যাবহারিকপ্রামাণ্যোপেতেভ্যঃ প্রত্যক্ষাদিভ্যঃ সিদ্ধাদাম্নায়াত্তত্ত্বদর্শনম্ (ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪১ পৃঃ)। তস্মাৎশব্দস্য প্রামাণ্যাভ্যুপগমে প্রমাণান্তরবিরোধে'পি তস্যৈব বলবত্ত্বমিতি সাম্প্রতম্ (ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪০ পৃঃ)। উল্লিখিত মণ্ডনমিশ্রের উক্তির সহিত নিম্নোক্ত ভামতীর অংশ তুলনীয়।

(ক) নচ জ্যেষ্ঠপ্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদাম্নায়স্যৈব তদপেক্ষস্য অপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বঞ্চেতি যুক্তম্; তস্য অপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য, বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য, স্বকার্যে প্রমিতাবনপেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বে'পি উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাদনুৎপত্তি লক্ষণমপ্রামাণ্যমিতিচেন্ন; উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। নহি আগমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি; যেন কারণাভাবান্ন ভবেৎ, অপিতু তাত্ত্বিকম্;---দর্শিতঞ্চ তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবস্যানপেক্ষিতত্বম্—তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্—পৌর্বাপর্যে পূর্বদৌর্বল্যং প্রকৃতিবদিতি। জৈঃ সূঃ ৬।৫।৫৪, ভামতী, ৯-১০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

কেহ বলেন, আত্মা সগুণ, কেহ বলেন, আত্মা নির্গুণ; কেহ বলেন, সর্বব্যাপী এবং ভূমা। কেহ বলেন, অণুপরিমাণ, কাহারও মতে আত্মা দেহ পরিচ্ছিন্ন বা দেহ পরিমাণ। কেহ বলেন, আত্মা সাবয়ব, কেহ বলেন, নিরবয়ব। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ সম্বন্ধে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী। বৈদিক আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতীত ঐ সন্দেহের অপনোদন অসম্ভব। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্র-বলে আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মমীমাংসা অবশ্য কর্তব্য। বেদান্তের প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা-মুখে এই মীমাংসারই সূচনা করা হইয়াছে। আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বলিয়াও যেমন আত্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন; আত্মজ্ঞান সংসার জ্বালার নিবৃত্তি করিয়া শাশ্বত শান্তির সন্ধান দেয় বলিয়াও আত্মজিজ্ঞাসা অবশ্য কর্তব্য।

আত্মা চৈতন্যময়, দেহ জড়। জড় দেহ এবং চিদানন্দঘন আত্মা যে অভিন্ন হইতে পারে না, আত্মা যে জড় দেহাদি হইতে অতিরিক্ত কিছু, তাহা তো বুদ্ধিমান্ মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে; তবে আর দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ধর্মকে আত্মার ধর্ম মনে করিয়া আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপ ভুল করে কেন?

অধ্যাসের সূচনা

ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে—'মিথ্যা'জ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদম্ মমেদমিতি জায়তে নৈসর্গিকো লোক-ব্যবহারঃ' (অধ্যাস শং ভাষ্য, ১৬-১৭ পৃঃ)। ভাষ্যকারের উক্তির মর্ম এই যে, অনাদি মিথ্যা অজ্ঞানের ফলে চিদাত্মা এবং জড়দেহাদির মধ্যে যে মৌলিক বিভেদ আছে, তাহা ভ্রান্তদর্শী ভুলিয়া যায়; এবং সত্য চিদ্বস্তু ও মিথ্যা জড়বস্তু, এই দুইকে মিশাইয়া ফেলে। কেন মিশাইয়া ফেলে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলিতেছেন যে, "ইতরেতরাবিবেকেন", চিৎ ও জড়বস্তুর প্রকৃত রূপ যে কি, তাহা জানে না বলিয়াই লোকে চিৎ ও জড়কে অভিন্ন করিয়া ধরিয়া নেয়; চৈতন্যের ধর্মকে জড়ের ধর্ম, এবং জড়ের ধর্মকে চৈতন্যের ধর্ম মনে করিয়া ভুল করে। সত্য ও মিথ্যাকে এক করিয়া লয়, ইহাই সত্যানৃতের মিথুন, চিদচিদ্‌গ্রন্থি বা অধ্যাস বলিয়া বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ যে সকল জাগতিক ব্যবহার চলিতেছে এবং লোকে ঐ ব্যবহারকে সত্য এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছে, অধ্যাসই তাহার মূল বলিয়া জানিবে। অধ্যাস বা সত্য ও মিথ্যার মিলন যতক্ষণ আছে, ঐ সকল মিথ্যা ব্যবহারও ততক্ষণ আছে। জাগতিক মিথ্যা ব্যবহার স্মরণাতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ফলে, ব্যবহারের কারণ অধ্যাসও যে অনাদি ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে। ব্যবহারের মূল অধ্যাস এবং অধ্যাসের মূল জড় ও চৈতন্যের স্বরূপের অবিবেক। অবিবেক শব্দের অর্থ কি? জড় দেহ এবং চিন্ময় আত্মা, এই পরস্পরবিরুদ্ধ দুই বস্তুর অনৈক্য বা ভেদবোধই বিবেক। অনৈক্যবোধের অভাব বা ঐক্যবোধই অবিবেক। জড় ও চৈতন্যের ধর্মসমূহের পরস্পর অসংকীর্ণতা অর্থাৎ জড়ের ধর্মকে চৈতন্যের ধর্মের সহিত, চৈতন্যের ধর্মকে জড়ের ধর্মের সহিত মিশাইয়া না ফেলাই বিবেক, মিশাইয়া ফেলাটাই

অবিবেক। এই অবিবেক নিবন্ধনই সত্যানৃতের মিথুন, চিদচিদ্‌গ্রন্থি বা অধ্যাসের সৃষ্টি এবং অধ্যাসমূলেই "আমি" "আমার" এইরূপ মিথ্যা ব্যবহারের উৎপত্তি। এইরূপ ব্যবহার অধ্যাসের ফল। আত্মাও অনাত্মা বা জড় বস্তুর স্বরূপের অবিবেক না থাকিলে অর্থাৎ অবিবেক তিরোহিত হইয়া আত্মা ও অনাত্মার বিবেক জ্ঞানের উদয় হইলে অধ্যাসও থাকিবে না, অধ্যাসমূলক ব্যবহারও থাকিবে না। "সর্বং ব্রহ্মময়ম্" এই ব্রহ্মবোধই উদিত হইবে।

অধ্যাসের লক্ষণ

অধ্যাস শব্দের অর্থ এই যে, "অধিকৃত্য আস্তে", অর্থাৎ যেই বস্তুটির প্রতীতি হইতেছে, সেই বস্তুটি সেখানে নাই, অন্য একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সেই বস্তুর ভাতি বা প্রকাশ হইতেছে মাত্র। এইরূপ অধ্যাসের লক্ষণ কিরূপ হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনুপস্থিত পূর্বদৃষ্ট কোন বস্তুর অপেক্ষাকৃত সত্য বস্তুতে যে ভাতি বা প্রকাশ তাহাই অধ্যাস বলিয়া জানিবে—"অথ কো'য়মধ্যাসো নাম ইতি উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। (ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য ১৭-১৮ পৃঃ)। ভাষ্যকারের উল্লিখিত লক্ষণের "অবভাসঃ" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বাচস্পতিমিশ্র সংক্ষিপ্তভাবে "অবভাসো'ধ্যাসঃ" এইরূপ "অবভাসঃ" কথাটি হইতেই অধ্যাসের লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। স্মৃতিরূপ, পরত্র এবং পূর্বদৃষ্ট, এই তিনটি পদের দ্বারা ঐ সংক্ষিপ্ত লক্ষণেরই তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে। "অবভাসঃ" কথাটি "অব" উপসর্গ পূর্বক ভাস্ ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাস্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ। জ্ঞানই একমাত্র স্বপ্রকাশ পদার্থ. সুতরাং ভাস্ ধাতুর পরে ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে ভাস্ ধাতুর অর্থ দাঁড়ায় শুধু জ্ঞান বা প্রকাশ; কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে "ভাস" শব্দে জ্ঞেয় বা প্রকাশ্য বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে। "অব" এই উপসর্গটি দ্যোতক। "অব" উপসর্গের দ্বারায় এখানে "অবসাদ" ও "অবমানকে" বুঝাইতেছে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের অবসাদ কি? পরভাবী অন্য কোনও জ্ঞানের দ্বারা পূর্বে উৎপন্ন কোন জ্ঞানের বাধ হওয়াকেই "অবসাদ" বলে। "অবমান" শব্দের অর্থ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের কোনরূপ কার্য্য সাধন করিবার শক্তির অভাব। শুক্তি যেপর্যন্ত রজত বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, সেই পর্যন্ত ঐ রজত আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে, বস্তুতঃ ঐ রজতের দ্বারা ব্যাবহারিক জীবনে কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। শুক্তির যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে শুক্তিতে প্রতিভাত মিথ্যা রজতের কার্যকরী শক্তি তো থাকেই না, তাহার প্রলুব্ধ করিবার শক্তিও তিরোহিত হয়। ইহারই নাম "অবমান"।[১]

১। অবসন্নো'বমতো বা ভাসঃ অবভাসঃ প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্য অবসাদো অবমানো বা এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি, তস্যেদমুপব্যাখ্যানং পূর্বদৃষ্ট ইত্যাদি। ভামতী ১৮ পৃঃ বোম্বে সং।

অবসাদ উচ্ছেদঃ। অবমানো যৌক্তিকতিরস্কারঃ। বেদান্তকল্পতরু, ১৮ পৃঃ, উচ্ছেদো বাধকজ্ঞানোদয়ানন্তরং ভ্রমবৃত্ত্যন্তরোৎপত্তিপ্রতিবন্ধঃ। যৌক্তিকতিরস্কারঃ ইচ্ছাপ্রবৃত্ত্যাদিকার্য্যাক্ষমত্বাপাদনম্। কল্পতরু-পরিমল ১৮ পৃঃ

উল্লিখিত "অবসাদ" ও "অবমানের" দ্বারা "ভাসের" অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মিথ্যারূপই প্রকাশ পায়। বস্তুর ঐরূপ মিথ্যা ভাতিকেই অধ্যাস বলা হইয়া থাকে। ভামতী-রচয়িতা বাচস্পতিমিশ্রের মতে ইহাই অধ্যাসের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ। শুক্তি-রজত যেমন অধ্যস্ত ও মিথ্যা, সেইরূপ অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্যাবহারিক সত্য রজত ও অধ্যস্ত এবং মিথ্যা। পার্থক্য এই যে, শুক্তি-রজতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় শুক্তি, আর, ব্যবহারিক সত্য রজতের অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ পরম-ব্রহ্ম। ব্রহ্মের সত্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই রজত সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। শুক্তি-রজত যেমন শুক্তিজ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হয়; তথাকথিত সত্য রজতও সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হয়। এই দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকেই অধ্যাসের লক্ষ্য বলা যায়। এই দ্বিবিধ অধ্যাস বুঝাইবার জন্যই বাচস্পতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত, বিশেষ ও সামান্য, এই দুই প্রকার অধ্যাস-লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন মনীষী মনে করেন। তাঁহাদের মতে "অবভাসো'ধ্যাসঃ" এই সামান্য লক্ষণের লক্ষ্য ব্যাবহারিক সত্য জগৎ; আর, "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ" এই বিশেষ বা বিস্তৃত লক্ষণের লক্ষ্য প্রাতি-ভাসিক শুক্তি-রজত। বাচস্পতিমিশ্র নিজেই ভামতীতে বিস্তৃত লক্ষণটিকে সংক্ষিপ্ত লক্ষণেরই ব্যাখ্যা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া, উভয়প্রকার লক্ষণের যে একই প্রতিপাদ্য, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়-বিভাগের কোন মূল্য দেওয়া চলে না। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জগতের অধ্যাস-ব্যাখ্যায় অধ্যাস-লক্ষণের যে কোন অসঙ্গতি নাই, তাহা সুধী পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। শুক্তি-রজত প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তু যে মিথ্যা, তাহা জগৎকে যাহারা সত্য বলেন, সেই ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ এবং দ্বৈতবেদান্তিগণও স্বীকার করেন। এইজন্য শুক্তি-রজত প্রভৃতিকেই অধ্যাসের দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। "অবভাসঃ" কথাটি দ্বারায়ই যদি অধ্যাস লক্ষণ নিরূপণ করা যায়, তবে সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ছাড়িয়া বিস্তৃত লক্ষণ করিবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, "অবভাস" কথাটির ভাষায় যেরূপ ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে ব্যাবহারিক সত্যবস্তুর ভাতি বা প্রকাশেও অবভাস শব্দের প্রয়োগ করা চলে। যেমন আকাশে নীলের অবভাস দেখা যাইতেছে, মেঘের মধ্যে হলুদবর্ণের অবভাস হইতেছে। "অবভাসপদংচ সমীচীনে'পি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্, যথা নীলস্যাবভাসঃ পীতস্যাবভাসঃ, (ভামতী, ১৮-১৯ পৃঃ)। অবভাস কথাটির এইরূপ ব্যাবহারিক সত্যজ্ঞানেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই মিথ্যা অধ্যাসকে বুঝাইবার জন্য অবভাস বা বস্তুর প্রকাশকে "স্মৃতিরূপ", "পরত্র" এবং "পূর্বদৃষ্ট" এই তিনটি বিশেষণ পদের প্রয়োগের দ্বারা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে। পূর্বদৃষ্ট পদটিকে অবভাস পদটির সহিত সমাস করিয়া লক্ষণে ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐরূপ সমাসের ফলে লক্ষণের অর্থ কিরূপ দাঁড়াইল, তাহা বিচার করা যাইতেছে। "ভাসঃ" শব্দে যেমন (ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে) জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই উভয়ের ভাতি বা প্রকাশকেই বুঝায়, পূর্ব-দৃষ্ট শব্দেও সেইরূপ (দৃশ্ ধাতুর পর ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিলে) পূর্ববর্তী

দর্শন এবং পূর্বে যে বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, সেই বস্তু, এই উভয়কেই পাওয়া যায়। ফলে, পূর্ববর্তী দর্শনের ন্যায় দর্শনের যে প্রকাশ, অথবা পূর্বে দৃষ্ট (জ্ঞেয়) বস্তুর ন্যায় বস্তুর যে ভাতি, তাহাই "পূর্বদৃষ্টাভাসঃ" শব্দে বুঝা গেল। এখন "পরত্র" এবং "স্মৃতিরূপঃ এই দুইটি পদের সহিত "পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ" পদটির অন্বয় করিলে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পরত্র বা অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত সত্যবস্তুতে পূর্বে দৃষ্ট কোন বস্তু বা জ্ঞানের সংস্কারমূলে যে ভাতি বা প্রকাশ তাহারই নাম অধ্যাস। "পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ" কথাটির মধ্যে যে "দৃষ্ট" পদটি আছে, ইহার তাৎপর্য এই যে, অধ্যাসে পূর্বে দৃষ্ট বস্তুর দেখাটুকুই আবশ্যক, ঐ বস্তুর অস্তিত্ব সেখানে আবশ্যক বা অপেক্ষিত নহে; ফলে ঐ পূর্বদৃষ্ট বস্তুর (অপর কোন বস্তুতে) ভাতি যে মিথ্যা, তাহাই আসিয়া পড়িল।[১] আরোপ্য বস্তু মিথ্যা ইহা বুঝিলেই যে বস্তুতে ঐ মিথ্যা আরোপ্য বস্তুর প্রকাশ দেখা যাইতেছে, সেই অধিষ্ঠানটি যে মিথ্যা আরোপ্য বস্তু হইতে আপেক্ষিক সত্য হইবে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। "ইদং রজতম্" এই মিথ্যা রজতের অধ্যাসে "ইদম্" শব্দে রজতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়-শুক্তিকে বুঝায়। মিথ্যা রজত হইতে ব্যবহারিক ভাবে শুক্তি সত্য। এই সত্য শুক্তিতে পূর্বদৃষ্ট মিথ্যা রজতের ভাতি হইতেছে বলিয়াই এই রজতকে অধ্যস্ত বলা হইল। এখানে "ইদম্" শব্দে যদি অপেক্ষাকৃত সত্য শুক্তিকে না বুঝাইয়া রজতের ন্যায় অপর কোন (প্রাতিভাসিক) মিথ্যা বস্তুকেই বুঝায়, তবে উহা অধ্যাসই হইবে না। কেননা, সত্যানৃতের মিথুন বা সত্য ও মিথ্যার মিলনই অধ্যাস। এই অধ্যাস-রহস্য (অর্থাৎ অধ্যাসের অধিষ্ঠানের সত্যতা) বুঝাইবার জন্যই অধ্যাসের লক্ষণে "পরত্র" পদটির অবতারণা করা হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্রের মতে পরত্র শব্দে কেবল যে আরোপের অধিষ্ঠানকেই বুঝায় তাহা নহে, অধিষ্ঠানের আপেক্ষিক সত্যতাও সূচনা করে। "স্মৃতিরূপঃ" কথাটি দ্বারা অধ্যাসকে স্মৃতির তুল্য বলা হইয়াছে। অধ্যাস ও স্মৃতির এই তুল্যতা বা সাদৃশ্য দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্মৃতিজ্ঞান যেরূপ পূর্ব সংস্কার-মূলে উৎপন্ন হয়, ভ্রম জ্ঞানও সেইরূপ পূর্ব পূর্ব বিভ্রম সংস্কারবশেই উদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতিজ্ঞানের বিষয়বস্তু স্মরণ কর্তার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও যেমন স্মৃতি হইতে কোন বাধা নাই, অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কেই স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ভ্রমের বিষয় মিথ্যা-রজত প্রভৃতিও সেইরূপ ভ্রান্তদর্শীর সম্মুখে অনুপস্থিত থাকিয়াই ভ্রম উৎপাদন করে। এই (শেষোক্ত) দৃষ্টিতেই বাচস্পতিমিশ্র ভ্রমকে "স্মৃতিরূপঃ" বা স্মৃতির তুল্য বলিয়াছেন। ফলে, পূর্বে দৃষ্ট কোনও একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে পরত্র অর্থাৎ স্থানান্তরে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, এই সেই বস্তু বা ব্যক্তি, যেটি আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম, এইরূপে যে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের re-representative judgement উদয় হয়, তাহা সম্মুখস্থিত বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান অধ্যাস হইবে না, ইহাই "স্মৃতিরূপঃ" পদের

১। মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চ আরোপবিষয়ারোপণীয়স্য মিথুনমন্তরেণ ন ভবতি ইতি পূর্বদৃষ্টগ্রহণেন অনৃতমারোপণীয়মুপস্থাপয়তি। তস্য চ দৃষ্টত্বমাত্রমুপযুজ্যতে ন বস্তুসত্তেতি দৃষ্টগ্রহণম্। ভামতী, ১৮ পৃঃ

দ্বারা সূচিত হইল। অধ্যাসের লক্ষণে "পরত্র" পদের দ্বারা অসন্নিহিত বা অনুপস্থিত বিষয়ের অপেক্ষাকৃত সত্য বস্তুতে ভাতি বা প্রতীতিকেই অধ্যাস বলা হইয়াছে, ফলে ✓বাচস্পতির মতে স্মৃতিজ্ঞান যে অধ্যাস নহে, ইহা বুঝা গেল। কারণ, স্মৃতির বিষয় সর্বদাই অনুপস্থিত থাকে সত্য, কিন্তু ঐ অনুপস্থিত বিষয়ের পরত্র অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অন্য কোনও সত্য অধিষ্ঠানে প্রতীতি হইতে কস্মিন্‌কালেও দেখা যায় না। যেরূপে যেখানে যে বস্তু লোকে দেখিয়া থাকে, সেইরূপেই ঐ বস্তুর স্মৃতি উদিত হয়। এইরূপে স্মৃতিজ্ঞান অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞান হইবে কিরূপে? আচার্য পদ্মপাদের মতে স্মৃতিজ্ঞান যে ভ্রম নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য অধ্যাসকে স্মৃতিরূপঃ বলা হইয়াছে। অধ্যাস স্মৃতির মত, বস্তুতঃ স্মৃতি নহে, ইহাই "স্মৃতিরূপ' পদের তাৎপর্য। আচার্য পদ্মপাদ কোন অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়, এই শূন্যবাদীর মত অঙ্গীকার করেন না। তাঁহার মতে কোনরূপ অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধ্যাসবাদ শূন্যবাদ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য লক্ষণে "পরত্র" পদের অবতারণা করা হইয়াছে। এই পদ্মপাদের মত বাচস্পতিরও অনুমোদিত, তবে বাচস্পতির মতে কেবল একটি অধিষ্ঠান হইলেই চলিবে না, অধিষ্ঠানের আরোপ্য হইতে অধিকতর সত্যতা থাকাও আবশ্যক। ভাষ্যকার অধ্যাসকে "সত্যানৃতের-মিথুন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যের (সত্য অধিষ্ঠানের) সহিত অনৃতের বা মিথ্যার মিলন হইলেই তাহা অধ্যাস হইবে। আরোপ্য বস্তুটি যে মিথ্যা, তাহা লক্ষণস্থ পূর্ব-দৃষ্ট কথাটির দ্বারাই সূচিত হইয়াছে, সুতরাং সত্য বলিতে অধিষ্ঠানের সত্যতাই বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সর্বপ্রকার অধ্যাসেই যদি আরোপ্য হইতে আরোপের অধিষ্ঠানের অধিকতর সত্যতা আবশ্যক হয়, তবে দেহকে যখন আত্মা বলিয়া লোকে ভুল করে, সেই দেহাত্ম-ভ্রমে অধ্যাস লক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। কেননা, সেখানে জড় এবং বিনাশী দেহই আরোপের অধিষ্ঠান, আর আরোপ্য পরমার্থ সৎ আত্মবস্তু। আরোপ্য আত্মবস্তু হইতে আরোপ্যের অধিষ্ঠান দেহের তো অধিকতর সত্যতা নাই। বাচস্পতির বিরুদ্ধে উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে কল্পতরু-পরিমল-রচয়িতা অপ্পয়দীক্ষিত বলেন যে, ভাষ্যকার সত্যানৃতের মিথুন বা মিলনকেই অধ্যাস বলিয়াছেন। আরোপ্যের অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বস্তুর মধ্যে কোনটি সত্য হইবে, কোনটি মিথ্যা হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। বাচস্পতিমিশ্র (লক্ষণস্থ) পূর্বদৃষ্ট কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া আরোপ্য বস্তুটিকে অনৃত বা মিথ্যা বলিয়াছেন এবং পরত্র পদটির দ্বারা অধিষ্ঠানের আপেক্ষিক সত্যতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাচস্পতির এরূপ ব্যাখ্যার তাৎপর্য ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, আরোপ্য ও আরোপের অধিষ্ঠান, এই দুইটি বস্তুই যদি একই স্তরের সত্য হয়, তবে সেখানে উহা অধ্যাস হইবে না। অদ্বৈতবেদান্তের মতে সত্য তিন প্রকার; (১) পারমার্থিক সত্য, যাহা কোন কালেই বাধিত হয় না, যেমন ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মতত্ত্ব, (২) ব্যাবহারিক সত্য, যেমন পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, যাহা কেবলমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ে বাধিত হইয়া থাকে, (৩) প্রাতিভাসিক সত্য, যাহা যতক্ষণ বস্তুর প্রতীতি বা ভাতি থাকে, ততক্ষণই সত্য, যেমন শুক্তি—রজত। শুক্তির জ্ঞানোদয়েই রজতজ্ঞান

বাধিত হয় সুতরাং উহা ব্যাবহারিক জ্ঞানবাধ্য। এই তিন স্তরের সত্য বস্তুর, এক স্তরের বস্তু যখন অন্য স্তরের বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, অথবা একস্তরের বস্তুব ধর্ম যখন অপর স্তরের বস্তুর ধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কোনটি কাহার ধর্ম তাহা বুঝা যায় না, সেরূপ ক্ষেত্রেই অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়। বাচস্পতি-মিশ্রের মতে পরত্র এবং পূর্বদৃষ্ট এই পদদ্বয়ের দ্বারা যে অধিষ্ঠানের সত্যতা ও আরোপ্যের মিথ্যাত্ব সূচিত হইয়াছিল, তাহার কোনটির প্রতিই আগ্রহ না রাখিয়া আরোপ্য ও আরোপের অধিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকারের সত্যতা দেখিলেই সেইরূপ অবভাসকে অধ্যাস বলিয়া মনে করিবে। অধিষ্ঠানা'সমসত্তাকস্যাবভাসো'ধ্যাস ইত্যেবানুগতম্ লক্ষণম্। পরিমল ১৯ পৃঃ, নির্ণয় সাগর-সং, শুক্তিতে যে রজতের অধ্যাস হয় সেখানে শুক্তি ব্যাবহারিক, রজত প্রাতিভাসিকসৎ। আত্মা বা ব্রহ্মেতে যে জগতের অধ্যাস হয়, তাহাতে ব্রহ্ম বা আত্মা পারমার্থিক, জগৎ ব্যাবহারিকসৎ; দেহে যে আত্মার অধ্যাস হয়, সেখানে দেহ ব্যাবহারিক আত্মা পারমার্থিকসৎ। সকল স্থলেই দেখা গেল যে, যে বস্তুর অধ্যাস হইতেছে, তাহা তাহার অধিষ্ঠানের সহিত এক জাতীয় সত্য বস্তু নহে। দুইটি ভিন্নজাতীয় সত্য বস্তুর মিলন হওয়ায় উল্লিখিত সকল স্থলেই অধ্যাস লক্ষণের সঙ্গতি পাওয়া গেল। আলোচিত অধ্যাস লক্ষণের "স্মৃতিরূপঃ" কথাটির দ্বারা বাচস্পতির মতে আরোপ্য রজতাদির অধিষ্ঠানে অনুপস্থিতিই সূচনা করা হইয়াছে। ফলে, অদ্বৈতবেদান্তীর ভ্রমবাদ যে সৎখ্যাতিবাদ (অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভ্রমস্থলে সৎ বা বিদ্যমান বস্তুরই খ্যাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে, এই মত যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মত) হইতে স্বতন্ত্র, ইহা বুঝা গেল, আর "অবভাসঃ" কথাটি দ্বারা অনুপস্থিত আরোপ্য বস্তুরও সত্য বস্তুর ন্যায় সাময়িক ভাতি বা প্রকাশ অঙ্গীকার করায়, অধ্যাসবাদ যে শূন্যবাদ বা অসৎখ্যাতি নহে, ইহাও প্রদর্শিত হইল।[১] ফলে অধ্যস্ত শুক্তি-রজত সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা সদসদ্‌বিলক্ষণ বা অনির্বচনীয় বস্তু ইহাই বুঝা গেল।

অধ্যস্ত বস্তুর অনির্বচনীয়তা উপাদান

অনির্বাচ্য কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই সত্য নহে, যাহা কস্মিন্‌কালেও বাধিত হয় না, এবং যাহা স্বপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ তাহাই সত্য। ব্রহ্ম বস্তুই একমাত্র সত্য, তদ্‌ভিন্ন সকলই মিথ্যা। যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে মরু-মরীচিকায় যে জলের প্রকাশ হয়, তাহাও সত্যই হইত। সেই জল পান করিয়াও লোকে পিপাসার শান্তি করিতে পারিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আরোপিত বস্তুগুলি প্রকাশিত হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে। উহা সত্য বস্তুর ন্যায় অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে সুতরাং অধ্যস্ত মরীচি-জলকে অসৎ বা

১। অথবা'সন্নিধানেন সৎখ্যাতিরিহ বারিতা।
অবভাসাদসৎখ্যাতির্নৃশৃঙ্গে তদদর্শনাৎ। বেদান্তকল্পতরু, ২০ পৃঃ

একেবারে অলীকও বলা চলে না, সত্যও বলা যায় না; অর্থাৎ মরীচি-জল একেবারে সত্যও নহে, একেবারে অসৎ বা শূন্যও নহে, পরস্পর বিরোধবশতঃ সদসৎও নহে; এই মরীচি-জল অনির্বাচ্য। অধ্যস্ত বস্তুমাত্রকেই এইরূপ অনির্বচনীয় বলিয়া জানিবে। মরীচি-জল মরীচিতে অধ্যস্ত সুতরাং তাহা যেমন অনির্বচনীয়, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রপঞ্চও সচ্চিদানন্দ পরমাত্মায় অধ্যস্ত, অতএব ঐ সকল দেহাদি প্রপঞ্চ ও অনির্বাচ্য এবং মিথ্যা বলিয়াই মনে করিবে।[১]

মরু-মরীচিকায় জলের অধ্যাস, শুক্তিকায় রজতের অধ্যাস বরং বুঝা গেল, এবং অধ্যস্ত জল প্রভৃতি বস্তু যে অনির্বচনীয়, ইহাও স্বীকার করা গেল। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তী যে স্বপ্রকাশ চিদানন্দময় নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরংশ, পরমাত্মায় জড় বিষয় ও তাহার ধর্মের অধ্যাস উপপাদন করিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? সম্মুখ-স্থিত কোন বস্তুতে অনুপস্থিত পূর্ব-দৃষ্ট কোন বস্তুর ভাতিই অধ্যাস। আত্মা জ্ঞানের অবিষয়ও বটে, তারপর, শুক্তি, রজ্জু প্রভৃতি জড়বস্তুর ন্যায় সম্মুখে অবস্থিত এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্টও নহে। এইরূপ অজ্ঞেয়, অমেয় আত্মায় অধ্যাস সম্ভব হয় কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, আত্মাকে "অহংরূপে" সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। ঐ অহংজ্ঞানের গোচর আত্মাকে একেবারে জ্ঞানের অবিষয় বলা যায় কিরূপে? আত্মা সর্বান্তর, আব্রহ্ম-কীট পর্যন্ত সকলের মধ্যে অবস্থিত, সকলের প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে; সুতরাং ঐরূপ আত্মায় দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ধর্মের অধ্যাস হওয়া বিচিত্র নহে। দ্রষ্টার সম্মুখে অবস্থিত প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই যে অধ্যাস বা মিথ্যা বুদ্ধির উদয় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। আকাশ তো প্রত্যক্ষ-দৃষ্টও নহে, দ্রষ্টার সম্মুখে শুক্তি, রজ্জু প্রভৃতির ন্যায় পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতও নহে, অথচ এইরূপ আকাশকে আশ্রয় করিয়াও নীল আকাশের তল প্রভৃতি বহু প্রকার অধ্যাস বা মিথ্যা বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় চিদাত্মায় দেহাদি প্রপঞ্চের অধ্যাস হইতে আপত্তি কি? অনাদিকাল-সঞ্চিত মিথ্যা বিভ্রম-সংস্কারবশে চিদাত্মাও জড়ের মধ্যে ভেদ বোধ তিরোহিত হইয়া অভেদ বোধের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই চিদচিদ্‌গ্রন্থি বা অধ্যাস। চিৎ ও জড়ের বিবেক জ্ঞানোদয়ের ফলে অধ্যাসের মূল অবিদ্যা বা অবিবেক সমূলে

পরমাত্মায় দেহাদি প্রপঞ্চের অধ্যাসের উপপাদন

১। ন চ প্রকাশমানতামাত্রং সত্ত্বং, নহি সর্পাদিভাবেন রজ্জ্বাদয়ো ন প্রতিভাসন্তে, প্রতিভাসমানা বা ভবন্তি তদাত্মান স্তদ্ধর্মাণো বা। তথা সতি মরুষু মরীচিচয়মুচ্চাবচমুচ্চলত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গমালেয়মভ্যর্ণমবতীর্ণা মন্দাকিনী ইত্যভিসন্ধায় প্রবৃত্তস্তত্তোয়ম্পাপীয়াপি পিপাসামুপশময়েৎ। তস্মাদকামেনাপি আরোপিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্তুসত্ত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। -----ন চ ইদমত্যন্তমসন্নিরস্তসমস্তস্বরূপমলীকমেবাস্থিতি সাম্প্রতম্, তস্য অনুভব গোচরত্বানুপপত্তেঃ: তস্মান্ন সৎ; নাপি সদসৎ; পরস্পর-বিরোধাদিত্যনির্বাচ্যমেব আরোপণীয়ং মরীচিষু তোয়মাস্থেয়ম্। ভামতী ২২।২৩ পৃঃ নির্ণয় সাগর সং

এবঞ্চ দেহাদি প্রপঞ্চো'পি অনির্ব্বাচ্যঃ, অপূর্ব্বো'পি পূর্ব্বমিথ্যাপ্রত্যয়োপদর্শিত ইব পরত্র চিদাত্মনি অধ্যস্যত ইত্যুপপন্নং অধ্যাসলক্ষণযোগাৎ। ভামতী ২৪ পৃঃ।

বিনষ্ট হয়, চিদচিদ্‌গ্রন্থি ছিন্ন হয়। সর্বত্র এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা বিবেকজ্ঞান। এই ব্রহ্মবিদ্যার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারই বেদান্তের লক্ষ্য।

বেদান্ত অনুশীলনের ফলে যে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, তাহা মণ্ডনমিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র এই উভয়ের মতেই পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। ঐ পরোক্ষ জ্ঞান মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে ক্রমে প্রত্যক্ষের রূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা আমরা মণ্ডনমিশ্রের দার্শনিকমত বিচার-প্রসঙ্গে ১১শ পরিচ্ছেদের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। বাচস্পতির মত এবিষয়ে মণ্ডনের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই অবিদ্যা-সংস্কারবশে যে অধ্যাস বা মিথ্যা বুদ্ধির উদয় হয়, সেই অধ্যাসকেও ভাষ্যকার 'অবিদ্যা' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্‌বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। অধ্যাস-শং ভাষ্য ৪০, পৃঃ। অধ্যাস অবিদ্যার কার্য এবং স্বরূপতঃ তাহাই অবিদ্যা, নতুবা বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অধ্যাসের উচ্ছেদই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, বিদ্যা একমাত্র অবিদ্যাকেই নিবৃত্তি করিতে পারে, অবিদ্যা ব্যতীত অপর কিছুই নিবৃত্তি করিতে পারে না।

শব্দাপরোক্ষবাদ

অবিদ্যামূলক অধ্যাসের অবিদ্যারূপতা সাধন

অবিদ্যা বাচস্পতির মতে বিদ্যার অভাব নহে। ইহা অনাদি, অনির্বচনীয়, ভাবপদার্থ। এই ভাবরূপ অবিদ্যাই বিশ্বসৃষ্টির বীজ, এবং ইহা পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ। মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন চরাচর বিশ্ব সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অবিদ্যায় বিলীন থাকে। সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ-বৃত্তি, অবিদ্যা-সংস্কার, বাসনা প্রভৃতিও অব্যক্তভাবে অবিদ্যার মধ্যেই অবস্থান করে। সৃষ্টির উষায় যখন পরমেশ্বরের সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির ইচ্ছার বিকাশ হয়, তখন ঐ ঐশী ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, সঙ্কুচিত কচ্ছপের দেহ হইতে যেমন বিলীন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব হয়, বর্ষার শেষে মৃত্তিকাখণ্ডের মত অবস্থিত ভেক-দেহ হইতে নব বর্ষার বারিধারা-পাতে যেমন নবীন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল বহির্গত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-বীজ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্কার ও বাসনাবাসিত ব্যষ্টি, সমষ্টি অন্তঃকরণ এবং পূর্বকল্পানুরূপ ভোগ্য নামরূপাত্মক নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হয়।[১] ভেক-দেহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অমলানন্দস্বামীও তাঁহার

অবিদ্যার ভাবরূপতা সাধন

১। যদ্যপি মহাপ্রলয়ে নান্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্‌বৃত্তয়ঃ সন্তি; তথাপি স্বকারণে অনির্বচ্যায়াম-বিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেণ কর্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব। তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা যথা কূর্মদেহে নিলীনানি অঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদ্‌ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্‌বাসনাবাসিততয়া ঘনাঘনাসারসুহিতানি পুনর্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবন্তি, তথা পূর্ববাসনাবশাৎ পূর্বসমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে। ভামতী ১।৩।৩০

বেদান্ত-কল্পতরুতে জগৎপ্রসবিনী অবিদ্যা যে বিদ্যার অভাব বা অজ্ঞান-সংস্কারমাত্রই নহে, ইহা যে ভাবস্বরূপ এবং ভাবজগতের জননী, তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১] ভাবরূপ অবিদ্যা মানিতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম অদ্বৈত বেদান্তের মতে স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ। পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বিধায় তাঁহার প্রকাশে অপর কোন প্রকাশের আবশ্যকতা নাই, তিনি নিজেই প্রকাশস্বরূপ। এই প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ-বিভ্রমের প্রশ্নই আসে না, যদি না, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ এই অবিদ্যা-যবনিকা অন্তরাল করিয়া রাখে। অবিদ্যা বিদ্যার অভাব হইলে, অভাবের তো কার্যকারিতা নাই, সে স্বপ্রকাশ চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিবে কিরূপে? অবিদ্যাকে যে ব্রহ্মের তিরস্করণী বলা হইয়াছে, ইহা হইতেই অবিদ্যার ভাবরূপতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, শুক্তি-রজত প্রভৃতি বিভ্রমে অবিদ্যাকেই অদ্বৈত বেদান্তের মতে শুক্তিতে প্রতিভাত মিথ্যা রজতের উপাদান বলা হইয়াছে। অভাব তো কোন বস্তুর উপাদান হয় না। অবিদ্যাকে রজতের উপাদানরূপে স্বীকার করায়, অবিদ্যা যে ভাবরূপ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

অমলানন্দ অবিদ্যার ভাবরূপতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন। অমলানন্দের ভাবরূপ অবিদ্যার প্রত্যক্ষ বিবরণোক্ত

ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ

প্রত্যক্ষেরই অনুরূপ। "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ স্বীয় অজ্ঞতা বোধ, কিংবা "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" তোমার কথিত বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, এইরূপ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়শূন্য অজ্ঞানের প্রত্যক্ষই ভাবরূপ অবিদ্যায় প্রমাণ। যে বস্তুর অভাব বোধের উদয় হয় এবং যেই স্থানে (যেই অধিকরণে) সেই অভাবের প্রতীতি হয়, তাহাদের—অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর জ্ঞান পূর্বে না থাকিলে, অভাব বোধের উদয়ই হইতে পারে না। আশ্রয় ও বিষয়শূন্য অজ্ঞানের প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের অভাব না বুঝিয়া ভাববস্তু বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কল্পতরু ১।৩।৩০ সূঃ ।; এবং এই পুস্তকের ১০ম পরিচ্ছেদ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমান সম্পর্কে অমলানন্দ বলেন কোনও বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে যখন কাহারও যথার্থ-জ্ঞানে উদয় হয়, তখন ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা ঐ বস্তু বা ব্যক্তিসম্বন্ধে তাঁহার অনাদিকাল-সঞ্চিত যে অজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া উহার ব্যক্তিগত স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়, ইহা সকলেই অনুভব করেন। এই অজ্ঞতা জ্ঞানোদয়ের পূর্ব-কালীন জ্ঞানের অভাব বা প্রাগভাব নহে, জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, প্রাগভাবের অধিকরণ বা আশ্রয়েই বিরাজমান, অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞেয় বস্তুর আচ্ছাদক, জ্ঞান-বিনাশ্য, এক প্রকার অনাদি বস্তু। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের ভাবরূপ অবিদ্যা। যেখানেই প্রমাণ-মূলে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানেই দেখা যায় যে, জ্ঞানোদয়ের পূর্বে প্রমেয় বস্তুটি আমাদের দৃষ্টিতে তিরোহিত থাকে, উহা যেন কোনও

১। বমাৎ সংস্কারতশ্চান্যা মণ্ডূকমৃদুদাহৃতেঃ।
ভাবরূপা মতাহবিদ্যা স্ফুটং বাচস্পতেরিহ। বেদান্ত-কল্পতরু ১।৩।৩০

অজ্ঞাত আবরণে আবৃত থাকে। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে ঐ আবরণের অন্ধকারময়ী যবনিকা তিরোহিত হইয়াই জ্ঞেয় বস্তুটি প্রকাশিত হয়। এই আবরণের যবনিকা ভাবরূপ অবিদ্যা ব্যতীত অপর কিছু নহে।[১] অদ্বৈত বেদান্তের মতে ব্রহ্মই অবিদ্যার সাক্ষী, অবিদ্যা সাক্ষী ব্রহ্মে অধ্যস্ত এবং সাক্ষি-ভাস্য অর্থাৎ সাক্ষীর আলোকেই আলোকিত, সাক্ষীর প্রকাশের দ্বারায়ই প্রকাশিত। এইরূপ সাক্ষি-ভাস্য অবিদ্যার অস্তিত্ব সাধনের জন্য প্রমাণ উপন্যাসের কোন আবশ্যকতা নাই। কেবল অজ্ঞান যে অভাব পদার্থ নহে, ভাবপদার্থ, ইহা বুঝাইবার জন্যই অবিদ্যার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের উপন্যাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[২]

এই অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে? আর অবিদ্যার বিষয়ই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবরণপন্থী বৈদান্তিকগণ বলেন যে,

অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় নিরূপণ

ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে। আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-ভাগিনী নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা। সংক্ষেপ-শারীরক ৫৩৪ পৃঃ। মণ্ডন ও বাচস্পতি এই মত অনুমোদন করেন নাই। তাঁহাদের মতে জীবের ব্রহ্মবিষয়ে অনাদি অজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়, আর, ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়—জীবপদা ব্রহ্মবিষয়া। জীবের জীবত্বই তো অজ্ঞানের কল্পনা, অজ্ঞান-কল্পিত জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? ইহাতে তো পরস্পরাশ্রয় দোষ অপরিহার্য হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনমিশ্রের মতানুবর্তন করিয়া বলেন যে,

---

১। ভাবরূপা'বিদ্যা সপ্রয়োজনা প্রমাণত্ব--ডিত্থপ্রমা, ডিত্থগতত্বে সতি যঃ প্রমাহভাবস্তত্ত্বানধিকরণানাদিনিবর্তিকা, প্রমাত্বাৎ ডপিত্থপ্রমাবৎ। কল্পতরু, ১।১।৩০। ডপিত্থপ্রমা, ডিত্থপ্রমা-প্রাগভাবের অনধিকরণ ডপিত্থগত অনাদির (প্রাগভাবের) নিবর্তক হওয়ায় উক্ত অনুমানের সাধ্যটি দৃষ্টান্তে প্রসিদ্ধই হইল, (সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইল না)। এইরূপ দৃষ্টান্তবশতঃ ডিত্থপ্রমাও ডিত্থগত প্রাগভাবের অতিরিক্ত ডিত্থপ্রমানাশ্য ডিত্থগত অনাদির নিবর্তক, ইহা সাব্যস্ত হইল। ডিত্থগত, ডিত্থপ্রমা-নাশ্য, ডিত্থপ্রমা-প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদি বস্তু অদ্বৈত বেদান্তীর ভাবরূপ অবিদ্যা ব্যতীত অপর কিছু হইতে পারে না। ফলে, উক্ত অনুমানই ভাবরূপ অবিদ্যায় প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। ডিত্থ এবং ডপিত্থ শব্দে রাম ও শ্যামের ন্যায় দুই বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। এই অনুমানটিকে আরও পরিষ্কারভাবে চিৎসুখাচার্য তৎকৃত তত্ত্বপ্রদীপিকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

দেবদত্তপ্রমা তৎস্থ-প্রমাভাবাতিরেকিণঃ।
অনাদের্ধ্বংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা।।

বিগীতং দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাজ্ঞানং দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমা'ভাবাতিরিক্তানাদেনির্বর্তকং প্রমাণত্বাদ্ যজ্ঞদত্তাদিগতপ্রমাণজ্ঞানবৎ। চিৎসুখী ৫৮ পৃঃ। বিবরণরচয়িতা প্রকাশাত্মযতিও ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমান-শৈলী বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বেই (১০ম পরিচ্ছেদে) আলোচনা করিয়াছি। বিবরণোক্ত অনুমানের মৌলিক অনুভব যে এই সকল অনুমান-চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, ইহা সুধীপাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন।

২। সদা সাক্ষিণি অধ্যস্ততয়া ভাসমানে'জ্ঞানে নাগমস্য প্রামাণ্যম্। তস্য অপ্রাপ্তার্থবিষয়ত্বাৎ নানুমানস্য, সিদ্ধসাধনত্বাৎ, চক্ষুরাদ্যপ্রবৃত্তিঃস্পষ্টা। তত্রাগমানুমানাথপত্ত্যুপন্যাসস্তু সাক্ষি-সিদ্ধস্য তস্য অভাবরূপত্বশঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ইত্যর্থাপত্তিরূপপ্রমাণপর্যবসায়ী ভবতি। পরিমল ১।১।৩০;

বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় জীব ও অবিদ্যার অনাদি পরস্পরাশ্রয়তা দোষাবহ নহে।[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাচস্পতি ও মণ্ডনমিশ্রের মতানুবর্ত্তন করিয়া অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তো শঙ্করাচার্য্যের মতের সহিত বাচস্পতির মতের বিরোধ হইয়া দাঁড়ায়। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌বীজ অবিদ্যাকে স্পষ্টতঃ "পরমেশ্বরাশ্রয়া" বলিয়া ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তির-ব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ যস্যাং স্বরূপ-প্রতিরোধ-রহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।৪।৩। উক্ত শঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি বলেন যে, ভাষ্যের আশ্রয় শব্দের অর্থ বিষয়, পরমেশ্বরাশ্রয়া অর্থ-পরমেশ্বর-বিষয়া। বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্ম কোনমতেই অবিদ্যার আশ্রয় বা অধিকরণ হইতে পারেন না, আলোক কি কখনও অন্ধকারের আশ্রয় হয়? ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জীবের অনাদি অজ্ঞান চলিতেছে। ব্রহ্ম জীবের দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই অবিদ্যাকে পরমেশ্বরাশ্রয়া বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অবিদ্যার আধার বলিয়া নহে।[২]

অবিদ্যাই জীব, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতি সর্ববিধ ব্রহ্ম-বিভাবের জননী। অনাদি অবিদ্যাবশে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরংশ হইলেও অনাদি, অনির্বচনীয় অবিদ্যাবশতঃ বুদ্ধি, মনঃ, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আবেষ্টনীর মধ্যে পতিত হইয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা স্বভাবতঃ অসীম, অনন্ত হইলেও সসীমের ন্যায়, অনবচ্ছিন্ন হইলেও অবচ্ছিন্নের ন্যায়, অভিন্ন হইলেও ভিন্নের ন্যায়, অকর্তা হইলেও কর্তার ন্যায়, অভোক্তা হইলেও ভোক্তার ন্যায়, অবাঙ্মনসগোচর হইলেও অহং প্রত্যয়-গোচর হইয়া জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক অনন্ত আকাশ যেমন অভিন্ন হইলেও ঘটাদি উপাধি ভেদে বিভিন্নের ন্যায়, অখণ্ড হইলেও সখণ্ডের ন্যায়, অনেকধর্মযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ আত্মাও সেইরূপ বুদ্ধি, মনঃ, স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বুদ্ধি, মনঃ ও শরীরের বিবিধ ধর্মের দ্বারা নানাধর্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইয়া থাকে। নির্গুণ, নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ আত্মার সহিত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধ্যাসের ফলে আত্মায় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ শক্তিদ্বয়ের আবিভাব হইতে দেখা যায়। সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা যখন স্বতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং উদাসীন, তখন তাঁহার ক্রিয়াশক্তি বা

জীব ও জগৎ

১। নচ অবিদ্যোপাধিভেদাধীনোজীবভেদঃ, জীবভেদাধীনশ্চ অবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরা-শ্রয়াদুভয়াসিদ্ধিরিতি সাম্প্রতম্। অনাদিত্বাদ্ বীজাঙ্কুরবদুভয়সিদ্ধেঃ। ভামতী ১।৪।৩।

তুলনা করুন—মণ্ডনের ব্রহ্মসিদ্ধি ১০ পৃঃ, অনাদিত্বাদুভয়োরবিদ্যাজীবয়োর্বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিব নেতরেতরাশ্রয়ত্বমপ্রকপ্তিমাবহতীতি।

২। তস্যাজ্জীবাধিকরণাপি অবিদ্যা নিমিত্ততয়া বিষয়তয়াচ ঈশ্বরমাশ্রয়ত ইতীশ্বরাশ্রয়েত্যুচ্যতে। নতু আধারতয়া, বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেঃ। ভামতী ১।৪।৩

ভোগ-শক্তি কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। জড় বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ক্রিয়া-শক্তি থাকিলেও চৈতন্য নাই সুতরাং তাহাদেরই বা বিষয়-ভোগ হইবে কিরূপে? সেইজন্য বলিতে হয় যে, চিদানন্দঘন আত্মাই বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-প্রভৃতির জালে জড়িত হইয়া ক্রিয়া-শক্তি, ভোগশক্তি প্রভৃতি শক্তিলাভ করিয়া থাকে, এবং কর্ত্তা, ভোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব অহংঅভিমানী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।[১]

বাচস্পতি মিশ্র জীবের স্বরূপ বিষয়ে অবচ্ছেদবাদী, না-প্রতিবিম্ববাদী?

উপরে জীবভাবের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে বাচস্পতিকে অবচ্ছেদবাদী বলিয়াই মনে হয়; ঘটাকাশ প্রভৃতির দৃষ্টান্তও অবচ্ছেদবাদেরই অনুকূল। অবচ্ছেদবাদে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ প্রভৃতি অবচ্ছেদক বা বিশেষণ হয়। সমষ্টি মায়া হইতে সমষ্টি অন্তঃকরণ ও ব্যষ্টি অবিদ্যা হইতে ব্যষ্টি অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমষ্টি ও ব্যষ্টি অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যের বিশেষণ হয়, তখন সমষ্টি অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধি, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যার কার্য। মায়া, অবিদ্যা যখন চৈতন্যের বিশেষণ হয়, তখন মায়া-বিশিষ্ট চৈতন্যকে ঈশ্বর ও অবিদ্যা-বিশিষ্টকে জীব নামে অভিহিত করা হয়। অন্তঃকরণ বা মায়া প্রভৃতি যখন বিশেষণ না হইয়া উপাধি হয়[২] তখন সেই চৈতন্যকেই ঈশ্বরসাক্ষী ও জীবসাক্ষী বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ

১। (ক) সত্যং প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রকাশত্বাদবিষয়ঃ অনংশশ্চ, তথাপি অনির্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা-পরিকল্পিতবুদ্ধিমনঃসূক্ষ্মস্থূলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদেন অনবচ্ছিন্নো'পি বস্তুতো'বচ্ছিন্ন ইব, অভিন্নো'পি ভিন্ন ইব, অকর্তা'পি কর্তেব, অভোক্তা'পি ভোক্তেব, অবিষয়ো'পি অস্মৎপ্রত্যয়বিষয় ইব জীব-ভাবমাপন্নঃ অবভাসতে। নভ ইব ঘট-মণিক-মল্লিকাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিব অনেকধর্মক মিব ইতি। ভামতী ৩৮ পৃঃ। (খ) তস্যাচ্চিদাত্মনঃ স্বয়ম্প্রকাশস্য এব অনবচ্ছিন্নস্য অবচ্ছিন্নেভ্যো বুদ্ধ্যাদিভ্যো ভেদাগ্রহাৎ, তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি। ভামতী ৩৮ পৃঃ। (গ) কর্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহং-প্রত্যয়ে প্রত্যবভাসতে। নচ উদাসীনস্য তস্য ক্রিয়া শক্তিঃ ভোগশক্তির্বা সম্ভবতি। যস্য চ বুদ্ধ্যাদেঃ কার্য-কারণ-সংঘাতস্য ক্রিয়া-ভোগশক্তী ন তস্য চৈতন্যম্। তস্মাৎ চিদাত্মা এব কার্য্য-কারণ-সংঘাতেন গ্রথিতঃ লব্ধক্রিয়াভোগশক্তিঃ স্বয়ংপ্রকাশঃ অপি বুদ্ধ্যাদিবিষয়-বিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিৎ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ঃ অহংকারাস্পদং জীব ইতিচ, জন্তুরিতিচ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতিচ আখ্যায়তে। ভামতী ৩৯ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং

২। উপাধি ও বিশেষণের পার্থক্য এই যে, বিশেষণটি বিশেষ্যের স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝায়। উপাধিটি ব্যাবর্তক হয় বটে, কিন্তু বিশেষ্যের স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করে না, কেবল বিশেষ্যের সম্মুখে তাহার সাময়িক উপস্থিতি দ্বারা বিশেষ্যে কোনও নূতন গুণ বা ধর্ম আধান করিয়া উহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেয় মাত্র। যেমন নীল উৎপল, এখানে নীলটি বিশেষণ, সে সর্বদাই বিশেষ্যের শরীরে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে অন্য সকল প্রকার উৎপল হইতে পৃথক্ করিতেছে। "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এখানে স্ফটিকের রক্ততা উপাধি। কেননা, উহা স্ফটিকের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, লাল জবাফুল স্ফটিকের কাছে আছে বলিয়া ঐ জবা নিজের রক্ততা স্ফটিকে আধান করিয়াছে। স্ফটিকের রক্ততা সর্বদা নীলোৎপলের নীল রূপের ন্যায় বর্তমান থাকে না; সুতরাং জবা-সংযোগ স্ফটিকের উপাধি, বিশেষণ নহে। উপাধিটি হয় আগন্তুক ধর্ম, বিশেষণ হয় বিশেষ্যের স্বভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট ধর্ম, ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

উপহিত চেতন হয় সাক্ষী, আর বিশিষ্ট চেতন হয় জীব ও ঈশ্বর। বিশেষ্য ও বিশেষণের সর্ববিধ সম্বন্ধই ব্রহ্মে আধ্যাসিক ও অবিবেক প্রসূত। জ্ঞানোদয়ে সর্বপ্রকার আবিদ্যক সম্বন্ধ তিরোহিত হয় এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়া যায়। জীবকে ঘটাকাশ স্বরূপ বলায় ঘটের সহিত আকাশের যেরূপ কোন সংস্পর্শ নাই, চৈতন্যের সহিতও সেইরূপ অন্তঃকরণ, অবিদ্যা প্রভৃতির কোন বাস্তব সংস্পর্শ নাই, ইহাই বুঝা যায়। এইমতে অবিদ্যা, অন্তঃকরণ প্রভৃতি অবচ্ছেদ তিরোহিত হইলে জীবের ব্রহ্মরূপতা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ইহাই অবচ্ছেদ-বাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম। বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন কি ? অবচ্ছেদ-বাদের অনুকূল যুক্তি তর্ক যে ভামতীতে প্রচুর আছে, তাহা ভামতী পাঠ করিয়া সুধী পাঠক কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভামতীতে প্রতিবিম্ব-বাদের অনুকূল যুক্তিরও প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ, ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২। এই সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন, নির্মল বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও প্রতিবিম্ব যে-সকল বিভিন্ন দর্পণে পতিত হয়, সেই সকল নীলমণি, কৃপাণ, কাচ প্রভৃতি উপাধির ভেদবশতঃ যেমন ঐ সকল বিভিন্ন উপাধিতে প্রতিবিম্বিত মুখের সম্পর্কেও এইটি শ্যামল, এইটি নির্মল, এইরূপ ভেদবুদ্ধি এবং ভেদমূলক ব্যবহারের উদয় হইতে দেখা যায়, সেইরূপ জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অনাদি অনির্বচনীয় অবিদ্যা-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলে জীবকে শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি পীড়িত বলিয়া মনে হইয়া থাকে ; বিভিন্ন জীবের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদবুদ্ধিরও উদয় হয়। মুখবিম্বের যেমন মণি, কৃপাণ, কাচ প্রভৃতি প্রতিবিম্ব-গ্রাহী দর্পণগুলিকে "গুহা" বলা হয়, ব্রহ্মের পক্ষেও সেইরূপ প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণ, অবিদ্যা প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন "গুহা" বলা হয়। ঐ বিভিন্ন গুহায় প্রতিবিম্বত জীবও বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্মও সেইরূপ বস্তুতঃ অভিন্ন।[১] অংশোনানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেও (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৩) বাচস্পতিমিশ্র উল্লিখিত যুক্তি অনুসরণ করিয়াই স্পষ্টতঃ জীবকে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবিদ্যাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উপযুক্ত

১। তত্র যথা বিম্বাদবদাতাত্তাত্ত্বিকে প্রতিবিম্বানামভেদে'পি নীলমণি-কৃপাণকাচাদ্যুপধানভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদো বর্তয়তি। ইদং বিম্বমবদাতমিমানিচ প্রতিবিম্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্ত-দীর্ঘাদিভেদভাঞ্জি বহূনীতি, এবং পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজ্জীবানামভেদ ঐকান্তিকে'পি অনির্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যোপধানভেদাৎ কাল্পনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়ঞ্চ পরমাত্মা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমেচ জীবা অবিদ্যাশোকদুঃখাদ্যুপদ্রবভাজ ইতি বর্তয়তি। অবিদ্যো-পধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি, তথাপি তৎপ্রতিবিম্বকল্পজীবদ্বারেণ পরস্মিন্ন চ্যতে। -------যথাহি বিম্বস্য মণিকৃপাণাদয়োগুহা এবং ব্রহ্মণো'পি প্রতিজীবং ভিন্না অবিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিম্বেষু ভাসমানেষু বিম্বং তদভিন্নমপি গুহ্যম্ এবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপিব্রহ্ম গুহ্যম্। ভামতী, ১।৪।২২

দর্পণ। ঐ দর্পণ অপনীত হইলে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয়। প্রতিবিম্ব বিম্ব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।[১] ব্রহ্মসূত্রের ২।২।২৮ সূত্রে ভামতী এবং কল্পতরুতে জীব যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র-চতুঃসূত্রীর সমাপ্তিতে অপ্যয়দীক্ষিত তাঁহার বেদান্তকল্পতরু-পরিমলে অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ, এই বাদদ্বয়ের তাৎপর্য বিচার করিয়া এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্ মতটি দার্শনিক আচার্য-গণের সম্মত, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২] সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে অপ্যয়দীক্ষিত অতিনিপুণতার সহিত উভয় মতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুই পক্ষেরই অনুকূলে এবং প্রতিকূলে কি বলিবার আছে, তাহা তিনি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ প্রতিবিম্ববাদের বিরুদ্ধে নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না, কারণ যাহার রূপ আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িতে দেখা যায়, অবচ্ছেদবাদীর এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া ইহার খণ্ডনে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে, যাহার রূপ আছে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ে, অরূপের প্রতিবিম্ব পড়ে না, এরূপ বলার কোন অর্থ নাই, কেননা, রূপের তো কোন রূপ নাই, (রূপ গুণ পদার্থ, গুণের আর গুণ থাকে না, সুতরাং রূপের আর রূপ কল্পনা করা চলে না) অথচ অরূপ রূপের তো দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়িতে দেখা যায়। যদি বল যে, নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না, ইহাই অবচ্ছেদবাদীর বক্তব্য। অরূপ রূপের প্রতিবিম্ব পড়িলেও রূপ দ্রব্য পদার্থ নহে, গুণ পদার্থ, সুতরাং রূপের প্রতিবিম্ব পড়ায় কোন আপত্তি আসে না। আত্মা দ্রব্যপদার্থ অথচ রূপশূন্য সুতরাং আত্মার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, ইহাই অবচ্ছেদবাদীর আপত্তির মর্ম। প্রতিবিম্ব-বাদ অসিদ্ধ। এই আপত্তির উত্তরে দীক্ষিত বলেন যে, নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, প্রতিবাদী যে ইহা সাব্যস্ত করিতেছেন, তাঁহার ঐরূপ কল্পনার মূল কি? রূপবান দ্রব্যেরই প্রতিবিম্ব পড়িতে দেখা যায়, নীরূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বও প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, এই পর্যন্তই প্রতিবাদী বলিতে পারেন। প্রতিবিম্ব পড়ে না, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া তিনি বলেন কিরূপে? কারণ, বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি প্রত্যক্ষই তো একমাত্র প্রমাণ নহে। নীরূপ দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বলিয়া ঐ নীরূপ দ্রব্যের অস্তিত্ব যেমন মানিয়া লইতে হয়, উহার প্রতিবিম্বও সেইরূপই মানিয়া লইতে হয়। এইরূপে শ্রুতি-প্রমাণ-মূলে আত্মার প্রতিবিম্বের অস্তিত্বই বা মানিয়া নিতে

১। তস্মাদদ্বৈতে তাত্ত্বিকে স্থিতে জীবভাবস্তস্য ব্রহ্মণো'নাদ্যনির্বচনীয়া বিদ্যোপধানভেদাৎ একস্যৈব বিম্বস্য দর্পণাদ্যুপাধিভেদাৎ তৎপ্রতিবিম্বভেদাঃ। এবঞ্চ অনুজ্ঞাপরিহারৌ লৌকিকবৈদিকৌ সুখদুঃখমুক্তিসংসারব্যবস্থা চোপপদ্যেত। নচ মোক্ষস্য অনর্থবহুলতা; যতঃ প্রতিবিম্বানামিব শ্যামতা-বদাততাদি জীবানামেব নানা বেদনাতিসম্বন্ধো ব্রহ্মণস্তু বিম্বস্যেব ন তদভিসম্বন্ধঃ। যথা চ দর্পণাপনয়ে তৎপ্রতিবিম্বং বিম্বভাবে'বতিষ্ঠতে, ন কৃপণে প্রতিবিম্বিতমপি এবং অবিদ্যোপধানবিগমে জীবে ব্রহ্মভাব ইতি। ভামতী ২।৩।৪৩

২। অত্রেদং সকলমূলপূর্বাপরগ্রন্থগতজীববিষয়প্রতিবিম্বাবচ্ছেদব্যবহারদ্বয়তাৎপর্যাবধারণায় চিন্তনীয়মনয়োঃ পক্ষয়োরাচার্যাণাং কতরঃ পক্ষঃ সিদ্ধান্তইতি। পরিমল ১৫৫ পৃঃ।

বাধা কি? দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদীর মতে দ্রব্যশব্দের অর্থ কি? যাহা গুণের আশ্রয় বা অধিকরণ হয়, তাহাই দ্রব্য, এইরূপে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের অনুমোদিত দ্রব্যের লক্ষণ স্বীকার করিলে এক, দুই প্রভৃতিতে একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা আছে বলিয়া, তাহাও গুণের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়া দ্রব্যই হইয়া দাঁড়ায়। এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যার রূপ নাই, অতএব উহা নীরূপ দ্রব্যও বটে, অথচ ঐ সকল সংখ্যার তো প্রতিবিম্ব পড়িতে দেখা যায়। আয়নার সম্মুখে দুইটি ফল ধরিলে দুইটি প্রতিবিম্ব পড়ে নাকি? "নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না" প্রতিবাদীর এই কল্পনা তো এখানে অচল হইয়া পড়ে। যদি বল যে, দ্রব্য শব্দে "গুণের আশ্রয় দ্রব্য" এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত দ্রব্যকে বুঝাইবে না; ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি যে নয়টি পদার্থকে বৈশেষিকগণ দ্রব্য আখ্যা দিয়াছেন, উহাদিগকেই প্রতিবাদী দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিবেন; অর্থাৎ নীরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যের প্রতিবিম্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইহাই অবচ্ছেদবাদীর বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে বিচার্য এই যে, পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু প্রভৃতি নয়টি পদার্থকেই যে দ্রব্য শব্দে বুঝায়, ইহা অবচ্ছেদ-বাদী কিরূপে বুঝিলেন? উক্ত নয়টি পদার্থে দ্রব্যত্বরূপ একটি জাতি (বা অনুগত প্রত্যয়) আছে বলিয়া ঐ নয়টিকেই দ্রব্য বলিয়া বুঝা যাইবে, অবচ্ছেদ-বাদীর এই যুক্তিরও কোন মূল্য নাই। কেননা, ঐ নয়টি দ্রব্যে যে একটি দ্রব্যত্ব জাতি আছে, তাহা তো অবিসংবাদিত নহে। কোন কোন দার্শনিক জাতি বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ স্বীকারই করেন না; ফলে পৃথিব্যাদি নয়টি পদার্থের এবং ঐ নয়টি পদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আত্মার দ্রব্যত্ব জাতি কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং প্রতিবাদীর নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, এই কল্পনাও ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। তারপর, আত্মাকে নীরূপ দ্রব্য বলিয়া প্রতিবাদী যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, এই আপত্তি অদ্বৈত বেদান্তীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয় কি? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে আত্মার কতকগুলি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া আত্মাকে দ্রব্য বলা যাইতে পারে। অদ্বৈত-বাদীর মতে আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। এই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় আত্মাকে নীরূপ দ্রব্য বলা যায় কি হিসাবে? আরও দেখ, শব্দ দ্রব্য পদার্থ অথচ শব্দের রূপ নাই, কিন্তু ঐ নীরূপ শব্দের প্রতিবিম্ব আছে, প্রতিধ্বনিই শব্দের প্রতিবিম্ব, ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সকলেই স্বীকার করেন। বৈশেষিকের মতেও আকাশ দ্রব্য পদার্থ অথচ তাহার রূপ নাই, নীরূপ দ্রব্য; অভ্র-নক্ষত্র-খচিত আকাশের জলে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? যদি বল যে, উহা আকাশের প্রতিবিম্ব নহে, অনন্ত আকাশে সূর্যের যে কিরণ-মালা তরঙ্গ তুলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা তাহারই প্রতিবিম্ব; ঐ প্রতিবিম্বই আকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা যদি সৌর কিরণেরই প্রতিবিম্ব হয়, তবে প্রতিবিম্বটিকে একটি বিশাল কড়াইএর (কটাহ) মত দেখায় কেন? ঐরূপ প্রতিবিম্বকে আকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়াই দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নীরূপ, অমূর্ত, আকাশ যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ নীরূপ, অমূর্ত চিদাত্মার বুদ্ধিতে প্রতিবিম্ব পড়িতে বাধা কি?

এইরূপে নীরূপ চিদাত্মার প্রতিবিম্ব উপপাদন করিয়া অপ্যয়দীক্ষিত প্রতিবিম্ববাদ সমর্থন করিয়াছেন। "আভাস এবচ", ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০। অতএব চোপমা সূর্য-কাদিবৎ, ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮ প্রভৃতি সূত্রও প্রতিবিম্ববাদই সমর্থন করে। প্রতিবিম্বপক্ষ এব সূত্রকারাদিসম্মতঃ। প্রতিবিম্ব পক্ষেই যে আচার্যগণের সম্মতি আছে তাহা অপ্যয়দীক্ষিত—প্রতিবিম্ব পক্ষ এব আচার্যাণাম্ অভিমতঃ। প্রতিবিম্বপক্ষ এব আচার্যাণাং সিদ্ধান্তঃ। এই সকল কথাদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১] দীক্ষিত এইরূপ প্রতিবিম্বপক্ষ উপপাদন করিয়া, অবচ্ছেদবাদেও যে কোন সূত্রের সহিত কোনরূপ বিরোধ নাই, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবচ্ছেদবাদীর মতে—ন স্থানতো'পি ব্রঃ সূঃ ২।২।১১ ইত্যাদি সূত্রোক্ত অধিকরণে প্রতিবিম্ববাদ ভাষ্যকার স্বয়ংই নিরাকরণ করিয়াছেন ; উক্ত অধিকরণের অন্তর্গত "অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ," ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮ এই সূত্রে জল-সূর্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়ায় প্রতিবিম্ব-বাদই সূত্রে গৃহীত হইয়াছে, প্রতিবিম্ববাদীর এই আপত্তির উত্তরে অবচ্ছেদবাদী বলেন যে—"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৯) এই সূত্রে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সূর্যের জলপূর্ণ ভাণ্ডে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেখানেও দেখা যায় যে, সূর্যের মূর্তি আছে এবং সূর্য জল-ভাণ্ড হইতে বহু দূর দেশে আকাশপথে বিরাজ করেন, দূরস্থিত মূর্ত বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়ে। চিদাত্মা ভূমা, সর্বব্যাপী, এবং সর্বান্তর্যামী। ঐরূপ আত্মার দূর নিকট বলিয়া কিছুই নাই ; সুতরাং সর্বব্যাপী চিদাত্মার সুদূর আকাশচারী সূর্যের মত প্রতিবিম্ব পড়িবে কিরূপে ? যথা অম্বু সূর্যাদিভ্যো মূর্তেভ্যো বিপ্রকৃষ্টং দেশং গৃহ্যতে ন তথা আত্মনোবিপ্রকৃষ্টদেশং প্রতিবিম্বনযোগ্যং বস্তু গৃহ্যতে। অতো নকাপ্যাত্মনঃ সর্ব্বগতস্য প্রতিবিম্বোযুক্তঃ। পরিমল ১৭ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং। পরব্রহ্মের পক্ষে সূর্যাদি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই যে, সূর্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলগত বৃদ্ধি, হ্রাস, কম্পন প্রভৃতি উপাধিধর্মের অধীন হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ অন্তঃকরণাদিপরিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তঃকরণগত সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ প্রভৃতি বিবিধ ধর্মের অধীন হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম সূর্যের মত প্রতিবিম্বিত হন, সূর্যাদি দৃষ্টান্তের এইরূপ তাৎপর্য নহে। "আভাস এব চ" ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০, এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত আভাসবাদের তাৎপর্যও ঐরূপেই বুঝিতে হইবে ; সুতরাং অবচ্ছেদবাদেও কোন সূত্রের অসামঞ্জস্য বা অনুপপত্তি নাই। অপ্যয়দীক্ষিত পরিমলে এইরূপে উভয় মতের অনুকূল এবং প্রতিকূল যুক্তিজাল আলোচনা করিলেও উল্লিখিত বাদদ্বয়ের মধ্যে কোন মতবাদটি তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা কিছুই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে অপ্যয়দীক্ষিতের আলোচনাশৈলী দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি প্রতিবিম্ববাদের অনুকূলে পুনঃ পুনঃ আচার্য-সম্মতি জ্ঞাপন করায় প্রতিবিম্ববাদের পক্ষেই নিজের সম্মতি ও ব্যক্ত করিয়াছেন। অবচ্ছেদবাদের অনুকূলে—এবং জীবেশ্বরয়োরপ্যবচ্ছেদভেদেন ভেদোভবিষ্যতীতি নানুপপন্নমত্র-কিঞ্চিদিতি। পরিমল ১৫৯ পৃঃ, এইরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াও, নতু স্বতন্ত্রেষু

১। পরিমল ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাক্যেষু জীবোঽবচ্ছেদ ইতি ক্বচিদপ্যুক্তম্, এইরূপে দীক্ষিত যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে অবচ্ছেদ-বাদ হইতে প্রতিবিম্ববাদের প্রতিই তাঁহার আগ্রহ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা সুধী পাঠক কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারেন না।[১]

ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীবের বিশ্বরচনা-লীলা বাচস্পতির মতে জৈব অবিদ্যার বিলাস এবং অসত্য। আবিদ্যক, অসত্য সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দ্বিচন্দ্র-দর্শন, আকাশে গন্ধর্ব-নগরের রচনা প্রভৃতি আবিদ্যক সৃষ্টির যেমন কোন প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না, মিথ্যা দৃশ্য বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কেও সেইরূপই জানিবে। অবিদ্যা স্বভাবতঃ জড়; জড় অবিদ্যা চেতনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করিতে পারে না, এইজন্য নিত্য চৈতন্যময় ব্রহ্মকে (অধিষ্ঠানরূপে) জগৎকর্তা, জগদ্‌যোনি বলা হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্করের মতে মূল কারণ ব্রহ্মই কার্যরূপে, জগদ্‌রূপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন। অভিজ্ঞ নট যেমন নিজের স্বরূপটি দর্শকের নিকট অপ্রকাশিত রাখিয়াই বিভিন্ন বিচিত্র অভিনয় প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় অভিনয়ের দ্বারা তিনি কোনরূপ পরিবর্তিত হন না, সেইরূপ মায়া-সচিব ব্রহ্ম সৃষ্টির অভিনয় প্রদর্শন করিয়াও সৃষ্টির ইন্দ্রজালে জড়িত হন না। সমস্ত বিকার-বর্গের মধ্যে অনুস্যূত হইয়াও অবিকারী, অস্পৃষ্ট অসঙ্গরূপেই অবস্থান করেন।[২] বিশ্ব-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সর্বদা বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে, নতুবা অসত্য, আবিদ্যক সৃষ্টিকে সত্য, স্বাভাবিক বলা যায় কিরূপে?

বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য

আমরা বাচস্পতির মতে দ্বিবিধ অবিদ্যার পরিচয় পাইয়াছি। অবিদ্যার মূলে আছে পূর্ব পূর্ব ভ্রমের সংস্কার। এই বিভ্রম-সংস্কারই অধ্যাসের মূল। অধ্যাস হইতে সংস্কার, আবার সংস্কার হইতে অধ্যাস, এইরূপে অধ্যাস ও বিভ্রম-সংস্কারের চক্র অনাদিকাল হইতে জীবের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া আবর্তিত হইতেছে; এবং সেই আবর্তনের ফলে জীব তাঁহার স্বীয়সংস্কারের অনুরূপ দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ ও ভোগ্য জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। উপাধি ভেদে জীব বহু, এবং প্রত্যেক জীবগত এই অবিদ্যা বিভিন্ন, অবিদ্যা-সংস্কারবশে উৎপন্ন দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চও প্রত্যেক জীবের পক্ষে সুতরাং বিভিন্ন। জীবের আবিদ্যক দৃষ্টিবিভ্রমই তাঁহার অবিদ্যা-কল্পিত দৃশ্য বিশ্বসৃষ্টির মূল। এই আবিদ্যক সৃষ্টি ও সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে জীবের জ্ঞান সাদৃশ্যবশতঃ বিভিন্ন জীবের তুল্যরূপই উদয় হইতে দেখা যায়। এইজন্য একই গরু বা ঘোড়া দেখিয়া প্রত্যেকের একরূপ বুদ্ধিই উৎপন্ন হয়। শুক্তি-রজত প্রত্যেক ভ্রান্তদর্শীরই আবিদ্যক সৃষ্টি, অথচ প্রত্যেকেই তাহা একরূপই প্রত্যক্ষ করে, ব্যাবহারিক বস্তু সম্পর্কেও ঐ নিয়মই প্রযোজ্য। এইরূপে বাচস্পতিমিশ্র

বাচস্পতির দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ

১। পরিমল ১৫৭-১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ২।১।১৮,

ভামতী টীকার আরম্ভ শ্লোকে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের পথই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আচার্য অমলানন্দ স্বামীও বেদান্ত-কল্পতরুতে বাচস্পতির সৃষ্টি-রহস্যকে জীবের অজ্ঞান-মূলক "দৃষ্টিসৃষ্টি" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] বাচস্পতি জ্ঞেয় বিষয়ের কেবল জ্ঞানকালেই সত্তা স্বীকার করেন নাই, অজ্ঞাত অবস্থায়ও বিষয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার মতে প্রপঞ্চকে ব্যাবহারিকভাবে সত্য বলিতেও কোন বাধা নাই। বিষয়গুলি যখন জ্ঞানে ভাসে না, তখনও উহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া বাচস্পতির দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের সহিত যাঁহারা একমাত্র জ্ঞানকালেই জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, জীবের দৃষ্টিকেই বিশ্বসৃষ্টির মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই একজীব-বাদী দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদীর (মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতির) মতের যে পার্থক্য আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য লক্ষ্য করা আবশ্যক।[২]

বাচস্পতির মতে বিশ্বসৃষ্টি বিভিন্ন জীবগত অবিদ্যার বিলাস, জীবের ভ্রান্তির ফল, ইহাই যদি সাব্যস্ত হয়, তবে সূত্রকার বিশ্বসৃষ্টিকে যে পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের লীলা বলিয়া লোকবত্তু লীলাকেবল্যম্ (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন, ঐ লীলাসূত্র বাচস্পতির মতে অর্থহীন হইয়া পড়ে না কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আপ্তকাম পরমেশ্বরের সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য, ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা তাঁহার মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, তাঁহার দ্বারা এই বিশ্বচক্র সর্বদা আবর্তিত হইতেছে। মায়া তাঁহার সহকারিণী থাকিয়া জগচ্চক্রের আবর্তনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। তিনি সৃষ্টির রথচক্র আবর্তিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। নিজের ছায়ার সরল, বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়া মানুষ যেমন আনন্দ অনভব করে, সেইরূপ স্বীয় প্রতিবিম্ব জীবের বিভিন্ন সৃষ্টিলীলা দেখিয়া আনন্দময় নন্দিত হইতেছেন, এইরূপভাবেই বাচস্পতির মতে লীলা সূত্রের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে।[৩]

১। স্বশক্ত্যা নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করো'ব্রবীৎ।
জীবভ্রান্তিনিমিত্তং তদ্‌বভাষে ভামতীপতিঃ॥
অজ্ঞাতং নটবদ্ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করো'ব্রবীৎ।
জীবাজ্ঞাতং জগদ্‌বীজং জগৌ বাচস্পতিস্তথা। কল্পতরু ২।১।১৯

২। মণ্ডনমিশ্রের দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের স্বরূপ জানিবার জন্য এই পুস্তকের ১১শ পরিচ্ছেদ দেখুন।

৩। জীবভ্রান্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্‌বীজমজূঘুষৎ।
বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ॥
প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
পুমান্‌ক্রীড়েদ্ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ॥
এবং বাচস্পতে লীলা লীলাসূত্রীয় সঙ্গতিঃ।
অস্বতন্ত্রত্বতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্॥ কল্পতরু ২।১।৩৩
ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমিতিচাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবো'য়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥
স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালংতথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দৈবস্যৈষ মহিমাতু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥ পরিমল ২।১।৩৩

এই প্রসঙ্গে ইহাও আলোচ্য যে, নিখিল জগৎপ্রপঞ্চই জৈব অবিদ্যার বিলাস। জীবই দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের স্রষ্টা, ইহাই যদি বাচস্পতির সিদ্ধান্ত হয়, তবে ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম হইতে যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাচস্পতির মতে কিরূপে সঙ্গত হয়? বাচস্পতির সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তের বিরোধী মনে হয় বলিয়া উহাকে প্রকৃত সিদ্ধান্তই বলা চলে না। তারপর, জীব হইতে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাচস্পতির মতে ব্রহ্মে নিখিল জগতের সমন্বয় প্রদর্শন না করিয়া, জীবেই নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সমন্বয় ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ সমন্বয় সিদ্ধান্তও সূত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া কোন মতেই গ্রহণ-যোগ্য নহে। পুনঃ পুনঃ তদীয় ভামতীতে এইরূপ সূত্র-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করায় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতা বাচস্পতির লজ্জিত হওয়া উচিত নহে কি? বাচস্পতির বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগের উত্তরে অমলানন্দস্বামী বলেন যে, বাচস্পতি বিশ্বসৃষ্টিকে জীবাশ্রিত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলেও অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান হইয়া থাকেন, ব্রহ্মই যে জগদ্‌যোনি ইহা স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন। অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকার উদিত হইলেই রজত-বিভ্রম তিরোহিত হয়, মিথ্যা রজত স্বীয় অধিষ্ঠান শুক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই সত্য জ্ঞানের উদয়ে মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তির স্বরূপ। জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার উদিত হইলে জগদ্‌জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থাকিবে না, সর্বত্র এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবোধেরই উদয় হইবে। জীবের স্বরূপজ্ঞান জগদ্‌ভ্রমের নিবৃত্তি করিতে পারে না, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানই জগদ্‌ভ্রমের নিবৃত্তি করিতে পারে, এইরূপ অবস্থায় অধিষ্ঠান ব্রহ্মে জগতের সমন্বয় স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।[১]

বেদান্ত-শ্রবণের ফল ও অবিদ্যার নিবৃত্তি

অবিদ্যাই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল। ইহার উচ্ছেদও বড় সহজ নহে। জ্ঞান-বলেই অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। অবিদ্যা-বশতঃই আত্মাও অনাত্মার, চিৎ ও জড়ের অধ্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান-অসির সাহায্যে অধ্যাস-গ্রন্থির ছেদ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অজ্ঞান-নাশের অন্য কোন সাধন নাই। অজ্ঞান-নাশ এবং তাহার ফলে উৎপন্ন বিবেকজ্ঞান বেদান্ত-লভ্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই বেদান্ত-শ্রবণ একান্ত

১। জগৎকর্তৃত্বমন্যত্র ব্রহ্মণো নেতি দুষ্যতি।
বাচস্পতাবুপালম্ভমনালোচ্যোচিরে পরে॥
জীবাজ্ঞজ্ঞে জগৎ সর্বং সকারণমিতিব্রুবন্।
ক্ষিপন্ সমন্বয়ং জীবে ন লেজে বাক্‌পতিঃ কথম্॥ ইতি
অধিষ্ঠানং হি ব্রহ্ম ন জীবঃ। অধিষ্ঠানে চ
সমন্বয় ইত্যানবদ্যম্। কল্পতরু ১।৪।১৬

আবশ্যক। শ্রুতিও "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" এইরূপে পুনঃ পুনঃ আত্ম-দর্শনের উপদেশ দিয়া দর্শনের উপায় হিসাবে বেদান্ত-শ্রবণের বিধান করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, বেদান্ত-শ্রবণের এই বিধিটি কিরূপ বিধি? বেদের কর্মকাণ্ডে তিন প্রকার বিধির পরিচয় পাওয়া যায়, (১) অপূর্ববিধি, (২) নিয়মবিধি ও (৩) পরিসংখ্যাবিধি।[১] উক্ত তিনপ্রকার বিধির মধ্যে এখানে

বেদান্ত শ্রবণে বিধির অবকাশ আছে কি, না?

১। যাহা অন্য কোনও প্রমাণের সাহায্যে কোনকালেই জানা যায় না, সেইরূপ বিধি অর্থাৎ বিধির বোধক বাক্যই **অপূর্ববিধি**। "স্বর্গকামো যজেত" যিনি স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা একটি বৈদিক বিধি। যজ্ঞ যে স্বর্গের সোপান, তাহা এই বিধিবাক্য হইতে জানা যায়, অন্য কোনও প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না, এইজন্য ঐ বিধিবাক্যটি দ্বারা অপূর্ব-বিধিই সূচনা করিতেছে বুঝিতে হইবে। উৎপত্তিবিধি অপূর্ববিধিরই নামান্তর।

পক্ষতো'প্রাপ্তৌ **নিয়মবিধিঃ**। লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা যাহা বুঝিতে পারি, তাহার সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বেদে যে সকল বিধিবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাহার নাম নিয়মবিধি। "ব্রীহীন্ অবহন্তি" চাউল বাহির করিবার জন্য ব্রীহি বা ধানগুলিকে অবঘাত অর্থাৎ ঢেকীছাঁটা করিবে। ঢেকীছাঁটা করিয়া ধানের তুষগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া চাউল বাহির করা যায়, ইহা বেদে না বলিলেও মানুষ তাঁহার ব্যাবহারিক জ্ঞান দিয়াই বুঝিতে পারে। এইরূপ উপদেশ দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, ঢেঁকিছাঁটা করিয়াই যজ্ঞীয় চরুর জন্য চাউল প্রস্তুত করিবে, নখে ছিঁড়িয়া বা অন্য কোনও উপায়ে করিবে না। নখে ছিঁড়িয়া চাউল করিলে এবং তাহা দ্বারা যজ্ঞীয় চরু প্রস্তুত হইলে ধানের তুষ ছাড়াইবার জন্য বেদে অবঘাতের অর্থাৎ ঢেকীছাঁটা করিবার বিধান করার কোনই আবশ্যকতা বুঝা যায় না। নখে ছিঁড়িয়াও চাল প্রস্তুত করার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অবঘাতের পাক্ষিক অপ্রাপ্তিই আসিয়া পড়ে, ফলে বেদ অপ্রমাণ এবং বেদের উপদেশ অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়। অবঘাতের এই অপ্রাপ্তি-সম্ভাবনাকে পরিহার করতঃ বৈদিক বিধির প্রামাণ্য স্থাপনোদ্দেশ্যেই নিয়ম করা হইল যে, যজ্ঞীয় চরুর চাউলের জন্য ব্রীহির অবঘাতই করিবে। **পরিসংখ্যাবিধি**। যেখানে বেদে যাহা বিধান করা হইয়াছে, তাহা ঐরূপ বিধান না করিলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই পাওয়া যায়, এবং বেদের বিধানের অতিরিক্তও পাওয়া যায়, সেইরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিস্রোতঃকে প্রতিরোধ করিয়া বেদে যে বিধি প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম পরিসংখ্যাবিধি। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ", যে সকল প্রাণীর পাঁচ পাঁচটি নখ আছে, তাহাদের মধ্যে খরগোশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার প্রাণীকেই ভোজন করিবে। বিড়াল, বানর প্রভৃতি প্রাণীকে ভোজন করিবে না। এইরূপ বিধির তাৎপর্য এই যে, যাহারা মাংস ভালবাসে তাহারা প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ইচ্ছা করিলে সকল প্রকার পঞ্চনখধারী প্রাণীকেই ভক্ষণ করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় মাংসাশীর পক্ষে শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখধারী প্রাণীই ভক্ষণ করিবে, এইরূপ বিধির তাৎপর্য কি তাহা বিবেচ্য। শাস্ত্রে বিধান না থাকিলে কি মাংসাশী ব্যক্তি শশক প্রভৃতি পঞ্চনখ খাইত না? ইহা ত সম্ভব নহে, তবে শাস্ত্রে ঐরূপ বিধান করা হইতেছে কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, উল্লিখিত বিধির তাৎপর্য এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ পশু ব্যতীত অন্য বিড়াল, বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষণ করিবে না। মাংসাশীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে যেমন বেদোক্ত শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ প্রাণীর ভোজন পাওয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বিড়াল, বানর প্রভৃতি অন্যান্য পঞ্চনখধারী পশুরও ভোজন পাওয়া গিয়াছিল। এরূপক্ষেত্রে বেদ বিধান করিলেন যে, যদি পঞ্চনখধারী প্রাণী ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে খরগোশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ প্রাণীই ভোজন করিবে, বিড়াল, বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণী ভোজন করিবে না, তাহাতে অনিষ্ঠ ঘটিবে। এইরূপ বিধানে বেদোক্ত

বেদান্ত-শ্রবণে কিরূপ বিধি প্রযোজ্য? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকটার্থ বিবরণকার বলেন—বেদান্ত-শ্রবণ যে আত্মদর্শনের সাধন, তাহা 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' এইরূপ শ্রুতির বিধানমূলেই জানা যায়। শ্রুতির বিধান ব্যতীত অপর কোনও প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না। অতএব বেদান্ত-শ্রবণের বিধিটিকে "অপূর্ববিধি" বলিয়া জানিবে।

প্রকটার্থ কারের মতে অপূর্ববিধি

বিবরণপন্থী বৈদান্তিকগণের মতে বেদান্ত-শ্রবণে যে বিধি পাওয়া যায়, তাহা নিয়মবিধি, অপূর্ববিধি নহে। বেদান্ত-শ্রবণ যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাও তত্ত্বশাস্ত্র-রহস্যবিৎ সুধী অস্বীকার করিতে পারেন না। বিচার যে বিচারিত অর্থ বা তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল হয়, তাহাই বা কোন্ মনীষী অস্বীকার করিতে পারেন? সুতরাং বেদান্ত-শ্রবণে অপূর্ববিধির কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার শ্রবণের ফল। একবার মাত্র বেদান্ত-শ্রবণ করিলেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উদিত হইতে দেখা যায় না। এইজন্য যে পর্যন্ত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উদিত না হইবে, সেই পর্যন্তই বেদান্ত-শ্রবণ অনুষ্ঠেয়, সকৃৎ বা একবার শ্রবণই পর্যাপ্ত নহে। সূত্রকার এবং ভাষ্যকারও পুনঃ পুনঃ বেদান্ত-শ্রবণের উপদেশ করিয়াছেন—আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ব্রঃ সূঃ ৪।১।১। দর্শনপর্যবসানানি হি শ্রবণাদীন্যাবর্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য ৪।১।১। ব্রহ্ম-দর্শনে বেদান্ত-শ্রবণকে কারণরূপে পাওয়া গেলেও শ্রবণের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান যে কর্তব্য, তাহা বুঝা যায় নাই; অথচ ঐরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই আত্মদর্শনের সাধন, এইজন্যই অপ্রাপ্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণানুষ্ঠানের নিয়ম করা গেল যে, শ্রবণের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হইবে—শ্রবণাদ্যাবৃত্তিঃ কর্তব্যা। দ্বিতীয়তঃ শ্রবণকে যেমন আত্মদর্শনের সাধন বলিয়া বেদান্তে উপদেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" এই সকল শ্রুতিদ্বারা সাবধানী মনকেও শ্রবণের ন্যায় আত্মদর্শনের সাধন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফলে, আত্মদর্শীকে যে বেদান্ত-শ্রবণই করিতে হইবে, তাহাতো বুঝা যাইতেছে না। এইজন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে বেদান্ত শ্রবণই করিতে হইবে, "শ্রোতব্য এব" এইরূপে শ্রবণের নিয়ম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে, বেদান্ত-শ্রবণের ফলে যেমন আত্মসাক্ষাৎকার উদিত হয়, সেইরূপ ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি (দ্বৈত) শাস্ত্র-বিচারের ফলেও মুক্তি বা আত্মবিজ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয়,

বিবরণের মতে নিয়মবিধি

বিধিরও সার্থকতা পাওয়া গেল। এইরূপ বিধির নাম **পরিসংখ্যাবিধি**—বিধি-তৎপ্রতিপক্ষয়োঃ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যাবিধিঃ

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥

বিধি সম্বন্ধে বিশেষ মীমাংসা দর্শনে দ্রষ্টব্য।

এইরূপ মনে করিয়া কোনও জিজ্ঞাসু যদি ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত পথ অনুসরণ করেন, তবে ঐরূপ জিজ্ঞাসুর পক্ষে অদ্বৈত বেদান্ত শ্রবণের পাক্ষিক অপ্রাপ্তিই আসিয়া দাঁড়ায়, এইজন্যও বেদান্ত-শ্রবণের নিয়ম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। গুরুর নিকট বিধিমতে বেদ, বেদান্ত পাঠ না করিয়াও নিজ বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়দ্বারা কোন কোন সুধী হয়তো বেদ, বেদান্ত রহস্য বিচার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন ; ফলে গুরুর নিকট হইতে বৈধ ভাবে বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শ্রবণের অপ্রাপ্তি আশঙ্কা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, এইরূপ ক্ষেত্রেও উপযুক্ত গুরুর নিকট বেদান্ত শ্রবণের নিয়ম প্রবর্তনের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে মূল অদ্বৈত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ না করিয়াও ভাষান্তরে লিখিত অদ্বৈততত্ত্ব-প্রতিপাদক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াও কোন জিজ্ঞাসুর পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে জানিবার ইচ্ছা উদিত হইতে পারে, সেরূপ ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য বেদান্ত-শ্রবণ অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়, এইজন্যই মূল বেদান্ত-শ্রবণের জন্য নিয়ম অবশ্য কর্তব্য। বার্তিকপন্থী কোন কোন আচার্য বলেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধকের বেদান্ত শ্রবণে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলেও জগতের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে কল্যাণকর কর্মের কিংবা বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত যাগ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয় হইতে কোন বাধা হয় না, এইরূপ মনে করিয়া ঐ সকল বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বা লৌকিক অনুষ্ঠানের প্রতি জিজ্ঞাসু চিত্তের সাময়িক প্রবণতা স্বাভাবিক বলিয়া ঐ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিস্রোতঃ প্রতিরোধ করিয়া সর্বতোভাবে বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য শ্রবণে পরিসংখ্যাবিধিই স্বীকার্য। বাচস্পতিমিশ্রের মতে "আত্মা শ্রোতব্যঃ" বলিয়া পরমাত্ম-শ্রবণের যে উপদেশ করা হইয়াছে, সেখানে শ্রবণ শব্দের অর্থ শুধু কানে শোনা নহে, অধ্যাত্ম শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশের ফলে উৎপন্ন আত্মবিজ্ঞানই শ্রবণ। জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। পুরুষের ইচ্ছাতন্ত্র বা ইচ্ছাধীন নহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই বস্তুতন্ত্র জ্ঞানকে অন্যরূপ করিতে পারে না। ন বস্তুযথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্, কিং তর্হি বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য ১।১।৪। এইজন্যই জ্ঞান ক্রিয়া নহে। ক্রিয়া কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, যাহা বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা করে না, এবং "কর" এইরূপে উপদিষ্ট হয়, তাহাই ক্রিয়া, তাহা পুরুষের ইচ্ছার অধীন। ক্রিয়াহি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১।৪ পুরুষ ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম করিতেও পারে, না করিতেও পারে, যেরূপে করিতে উপদেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ না করিয়া অন্যরকমেও করিতে পারে। জ্ঞান কিন্তু কর্ম্মের অনুরূপ নহে। জ্ঞান প্রমাণের ফল। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া সত্য জ্ঞান উৎপাদন করে, বস্তুতন্ত্র জ্ঞানকে করা, না করা, বা অন্যরূপ করা যায় না। জ্ঞানের সামগ্রী উপস্থিত হইলে জ্ঞানোদয় হইবেই, তাহাতে জ্ঞাতার ইচ্ছা, অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না। এই দৃষ্টিতেই জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র বলা হয়।

বার্ত্তিকারের মতে পরিসংখ্যা বিধি

বাচস্পতি মিশ্রের মতে জ্ঞানে কোনরূপ বিধিরই অবকাশ নাই

এইরূপ বস্তুতন্ত্র জ্ঞানে পূর্বোক্ত বিধিত্রয়ের কোনরূপ বিধিরই সম্ভাবনা বুঝা যায় না। ন তত্র বিধিত্রয়স্যাপ্যবকাশ ইতি। সিদ্ধান্তলেশ ৩৯ পৃঃ। দ্বিতীয়তঃ যাহাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করে, তাহাকে বিকৃত না করিয়া ক্রিয়া জন্মিতেই পারে না। যদাশ্রয়াহি ক্রিয়া তমবিকুর্বতী নৈবাত্মানং লভতে। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১।৪। আত্মা বা ব্রহ্ম সর্ববিধ বিকারের অতীত, নির্লেপ, কূটস্থ এবং নিত্য-শুদ্ধ। এইরূপ আত্মায় বিকারজননী ক্রিয়া থাকা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ক্রিয়া থাকিলেই বিকার থাকিবে, এবং ফলে আত্ম-বিজ্ঞান বা মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়িবে। নিত্য ব্রহ্মরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। এইরূপ মুক্তিতে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ কোনমতেই কল্পনা করা যায় না। দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ প্রভৃতি তব্য প্রত্যয়ান্ত পদ উল্লিখিত ত্রিবিধ বিধির কোনরূপ বিধিরই সূচনা করে না। উহাদ্বারা মানুষের বিষয়ের প্রতি স্বভাব-সিদ্ধ যে অনুরাগ আছে, বিষয়ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা আছে, সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-স্রোতকে প্রতিরোধ করিয়া চিত্তগতিকে আত্মাভিমুখী, ভগবন্মুখী করিয়া থাকে মাত্র— কিমর্থানি তর্হি আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইতি বিধিচ্ছায়াপত্তিবচনানি স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি-বিষয়বিমুখীকরণার্থানীতি ক্রমঃ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১।৪, আচার্য্য সুরেশ্বরের মতেও নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানে বা আত্মদর্শনে কোনরূপ বিধি বা নিয়োগের অবসর নাই। সংক্ষেপশারীরক-রচয়িতা সর্বজ্ঞাত্ম মুনির মতেও ব্রহ্মজ্ঞানে কোনরূপ বিধির অবকাশ নাই— জ্ঞানে বিধ্যনুপপত্তেঃ। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন যে, বেদান্তবাক্যগুলির অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য। বেদান্ত-শ্রবণের অর্থ ঐরূপ তাৎপর্য-নির্ণয়ের অনুকূল বিচার। এইরূপ বিচারাত্মক শ্রবণের ফলে জিজ্ঞাসু চিত্তের মালিন্য অপনীত হইয়া এক-অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-নির্ণয়ের অনুকূল চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। নির্মল, নিষ্কলুষ চিত্তে স্বতঃই নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় এবং জীব যে শিবস্বরূপ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। যাঁহার অধ্যাস ভাঙ্গিয়াছে, অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়াছে, তিনিই অমৃত, অভয় ব্রহ্মণ্যপদ লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া যান। ইহাই বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তি।[১] জ্ঞানই ইহার একমাত্র সাধন। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অপর কোন সাধন নাই। মুক্তি বা পরিপূর্ণ আত্ম-বিজ্ঞান লাভের জন্যই বেদান্তসেবা একান্ত আবশ্যক।

সুরেশ্বরাচার্য্য ও সর্বজ্ঞাত্মমুনির মত

মুক্তি বা চরমাবস্থা

১। ইয়মনাদিরতিনিরূঢ়নিবিড়বাসনানুবিদ্ধা অবিদ্যা ন শক্যা নিরোদ্ধুমুপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে তং প্রতি নিরোধোপায়মাহ----প্রত্যগাত্মনি খলু অত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ্যাদিভ্যো বুদ্ধ্যাদিভেদাগ্রহনিমিত্তো বুদ্ধ্যাত্মত্বতদ্ধর্মাধ্যাসঃ। তত্র শ্রবণ-মননাদিভির্যদ্ বিবেকজ্ঞানং জায়তে তেন বিবেকাগ্রহে নিবর্ত্তিতে অধ্যাসাপবাধাত্মকং বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যা চিদাত্মরূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠতে।

ভামতী ৪০ পৃঃ নির্ণয় সাগরসং।

মণ্ডন-প্রস্থান, বাচস্পতির প্রস্থান ও বিবরণ প্রস্থানের বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা

মণ্ডন-প্রস্থান	বাচস্পতির প্রস্থান	বিবরণ-প্রস্থান
১। মণ্ডন স্ফোটবাদ এবং শব্দব্রহ্মবাদসমর্থন করেন।	বাচস্পতি স্ফোটবাদ মানেন নাই। ব্রঃ সূঃ ১৷৩৷২৮ সূত্রের ভামতীতে স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।	বিবরণ-পন্থীরাও স্ফোটবাদ মানেন নাই, তাহা খণ্ডনই করিয়াছেন।
২। মণ্ডনমিশ্র ভাবাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে অবিদ্যার নিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত।	অবিদ্যা-নিবৃত্তি বাচস্পতির মতে ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ভাবাদ্বৈতবাদ স্বীকার্য নহে, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই অভিপ্রেত।	বিবরণ-মতেও অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। ভাবা-দ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে, ব্রহ্মাদ্বৈত-বাদই সঙ্গত।
৩। মণ্ডনের মতে অবিদ্যার আশ্রয় জীব, বিষয় ব্রহ্ম।	এবিষয়ে বাচস্পতির মত মণ্ডনের সম্পূর্ণ অনুরূপ।	বিবরণের মতে অবিদ্যার আশ্রয়ও ব্রহ্ম, বিষয়ও ব্রহ্ম।
৪। মণ্ডন মিশ্রের মতে অবিদ্যা দুইপ্রকার—অগ্রহণ এবং অন্যথা গ্রহণ।	বাচস্পতিও মূলা এবং তুলা এই দ্বিবিধ অবিদ্যা (ভামতীর প্রথম শ্লোকে) অঙ্গীকার করিয়া-ছেন।	পদ্মপাদও স্বরেশ্বর প্রভৃতি বৈদান্তিকেরা দুই প্রকার অবিদ্যা অঙ্গীকার করেন নাই। স্বরেশ্বর বার্তিকে ঐ মত খণ্ডনই করিয়া-ছেন।
৫। ভ্রমের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় মণ্ডনমিশ্র ভট্টসম্মত বিপরীত-খ্যাতি সমর্থন করিয়াছেন।	বাচস্পতিমিশ্র ভ্রম স্থলে অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদই সমর্থন করেন। শুক্তি-রজতের অনির্বাচ্যতা স্থাপনের জন্য ভামতীতে বাচস্পতিমিশ্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ভামতী ২১-২৩ পৃঃ নির্ণয়সাগর সংস্করণ দ্রষ্টব্য।	বিবরণ-পন্থী বৈদান্তিকগণও ভ্রমে অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদই অঙ্গীকার করেন।
৬। শব্দজন্য জ্ঞান মণ্ডন ও বাচস্পতির মতে পরোক্ষ জ্ঞান। শব্দ পরোক্ষ প্রমাণ। পরোক্ষ প্রমাণমূলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। অতএব ইহা-দের মতে বেদান্ত-শ্রবণের ফলে ব্রহ্মজ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহা থাকে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। ঐ পরোক্ষ জ্ঞান মনন ও নিদি-ধ্যাসনের ফলে ক্রমে ক্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণত হয়।	শব্দজন্য জ্ঞান যে অপরোক্ষ হইতে পারে না, এ বিষয়ে বাচস্পতির মত মণ্ডনের সম্পূর্ণ অনুরূপ।	বিবরণ-প্রস্থানের মতে শব্দ-জন্য, বেদান্ত-শ্রবণজন্য অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই উদিত হয়। 'দশমস্ত্বমসি' প্রভৃতি স্থলে শব্দ হইতেও অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়।

মণ্ডন-প্রস্থান	বাচস্পতির-প্রস্থান	বিবরণ-প্রস্থান
৭। জগৎসৃষ্টিতে মণ্ডনমিশ্র দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া অনেক মনীষী মনে করেন।	বাচস্পতিমিশ্রের মতে জীবের অজ্ঞানই বিশ্বসৃষ্টির বীজ। জগৎ-প্রপঞ্চ জৈব অবিদ্যারই বিলাস; সুতরাং বাচস্পতির মতকেও ঐ দৃষ্টিতে অনেকাংশে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের অনুরূপ বলা যায়। তবে বাচস্পতি অজ্ঞাত অবস্থায়ও দৃশ্য-বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন বলিয়া দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের সহিত বাচস্পতির মতের মৌলিক পার্থক্যও অবশ্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। বাচস্পতির মতে জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকার্য্য।	পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি আচার্যগণ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ সমর্থন করেন না। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জগতের সত্যতাই স্বীকার করেন।
৮। জীবসম্পর্কে মণ্ডনমিশ্র প্রতিবিম্ববাদী।	বাচস্পতিমিশ্র অনেকের মতে অবচ্ছেদবাদী। আমাদের মতে বাচস্পতিমিশ্র অবচ্ছেদবাদী নহেন, প্রতিবিম্ববাদী।	পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির মতে ঈশ্বর বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব। সুরেশ্বর আভাসবাদী। আভাস-বাদে আভাস বা প্রতিবিম্ব মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যা ভেদের ন্যায় মিথ্যা প্রতিবিম্বেরও বাধ বা উচ্ছেদ সাধন করা আবশ্যক। প্রতিবিম্ববাদে ভেদের উচ্ছেদ সাধন করিলেই চলে, প্রতি-বিম্বের বাধের প্রয়োজন হয় না। কেননা, এই মতে প্রতি-বিম্ব সত্য এবং বিম্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন! সত্যের বাধ হইবে কিরূপে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সর্বজ্ঞাত্ম মুনির বেদান্ত মত

(খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক)

সর্বজ্ঞাত্ম মুনি অদ্বৈত বেদান্তের অন্যতম প্রধান আচার্য। ইনি সংক্ষেপ-শারীরক নামে একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্করের ভাবধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। সংক্ষেপ-শারীরকের সমাপ্তি শ্লোকে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি দেবেশ্বরের শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। টীকাকার রামতীর্থ দেবশব্দ ও সুরশব্দের অর্থ অভিন্ন বলিয়া দেবেশ্বরাচার্য শব্দে সুরেশ্বরাচার্যকে বুঝিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরের শিষ্য। তিনি তাঁহার সংক্ষেপ-শারীরকের সমাপ্তিতে ঐ গ্রন্থের রচনাকালেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মনুবংশ-সূর্য "শ্রীমৎ" রাজার শাসনসময়ে তিনি সংক্ষেপ-শারীরক রচনা করেন।[১] এই শ্রীমৎ রাজা কে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কোন কোন মনীষী শ্রী শব্দের লক্ষ্মী অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ শব্দে রাষ্ট্রকূটবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা প্রথম শ্রীকৃষ্ণ ৭৬০-৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আমাদের মতে "শ্রীমৎ" শব্দ হইতে রাজা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবার চেষ্টা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। অধ্যাপক ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে "শ্রীমৎ" রাজা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমা[illegible]। অবশ্য এ বিষয়েও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ ছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠের লেখানুসারে তাঁহার স্থিতিকাল খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী বলিয়া জানা যায় (৭৫০–খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

সর্বজ্ঞাত্ম মুনি-কৃত সংক্ষেপ-শারীরক নামে সংক্ষেপ হইলেও ইহার আয়তন বড় সংক্ষিপ্ত নহে। এই গ্রন্থে শঙ্কর-বেদান্তের রহস্য অপূর্ব মনীষার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সংক্ষেপ-শারীরকের পরিচয়।

ব্রহ্মসূত্র-শারীরক-ভাষ্য যেমন চার অধ্যায়ে বিভক্ত, এই গ্রন্থও সেই[illegible] চতুরধ্যায়ে সমাপ্ত। শারীরকের সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল, এই চার প্রকার বিষয়-বিভাগই এই গ্রন্থে অনুসৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শারীরক-ভাষ্যের বার্তিকের ন্যায় শ্লোকাকারে লিখিত। ইহাকে ভাষ্যের "প্রকরণবার্তিক" বলা

১। শ্রীদেবেশ্বর-পাদপঙ্কজরজঃসম্পর্কপূতাশয়ঃ।
সর্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপ-শারীরকম্॥
চক্রে সজ্জনবুদ্ধি-মণ্ডনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে।
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি॥ সংক্ষেপ-শারীরক, সমাপ্তি শ্লোক।

হইয়া থাকে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ৫৬৩ শ্লোকে অদ্বয়ব্রহ্মে বেদান্তের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪৮ শ্লোকে অদ্বৈতবেদান্ত মতের সহিত অপরাপর দার্শনিক ভাবধারার এবং দ্বৈতপ্রতিপাদক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬৫ শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন নির্ণীত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ৬৩ শ্লোকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল বা মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থের সাবলীল ভাষা, ভাব ও বিচারশৈলী গ্রন্থকর্তার অপূর্ব মনীষা বা অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। পরবর্তী কালে অনেক আচার্য সংক্ষেপ-শারীরকের উক্তি প্রমাণহিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন,[১] এবং অনেকে ইহার উপর টীকা রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।[২] ইহা হইতেই এই গ্রন্থ যে বেদান্ত-চিন্তার ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চার সূত্রেই যেমন অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপন্যাস করা হইয়াছে, সেইরূপ সংক্ষেপ-শারীরকেরও প্রথম চার শ্লোকেই সর্বজ্ঞাত্ম মুনি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর সার সংকলন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রে—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (ব্রঃ সূঃ, ১।১।১), এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসামুখেই জিজ্ঞাসু জীব এবং জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম যে অভিন্ন, এই তত্ত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সত্যানৃতের মিথুনের নাগপাশে বদ্ধ জীব যদি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ফলে অজ্ঞানের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে না পারে, তবে তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ থাকে কি? ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হইলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার ফলে অবিদ্যা এবং অবিদ্যামূলক অধ্যাসবন্ধনের সমূলে নিবৃত্তি হয় এবং জীববিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে মিশিয়া অভিন্ন হইয়া যায়। জীব ব্রহ্মের অভেদই অদ্বৈত-বেদান্তের লক্ষ্য। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই এই লক্ষ্যে পেঁছিবার একমাত্র সোপান। এইজন্য সর্বপ্রথমে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃ সূঃ, ১।১।২) ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় সূত্রে—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ, ১।১।৩) এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত পথই যে একমাত্র পথ, এই সত্য নির্ধারিত হইয়াছে। চতুর্থ সূত্রে—'তত্তু সমন্বয়াৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের এই প্রকার নিরূপণ-শৈলী অনুসরণ করিয়া সর্বজ্ঞাত্ম মুনিও সংক্ষেপ-শারীরকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকেই অজ্ঞান-কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ জীব এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য

সংক্ষেপ শারীরকের দার্শনিক পরিস্থিতি।

১। প্রসিদ্ধ আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে বহুস্থানে সংক্ষেপ-শারীরকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—সিদ্ধান্তলেশ ২৬, ১৮৬, ২৩৩, ৩৫৯, ৪৩৩ পৃঃ, শ্রীবিদ্যা সং দ্রষ্টব্য।

২। সংক্ষেপ-শারীরকের উপর নৃসিংহাশ্রমের তত্ত্ববোধিনী টীকা, পুরুষোত্তম দীক্ষিতের সুবোধিনী টীকা, রাঘবানন্দের বিদ্যামৃত বর্ষিণী টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর সার-সংগ্রহ টীকা ও রামতীর্থের অন্বয়ার্থ-প্রকাশিকা টীকা প্রসিদ্ধ। মধুসূদন সরস্বতীর টীকা বস্তুতঃই অপূর্ব। আমরা বহুস্থানে পাদটীকায় মধুসূদনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং চতুর্থ শ্লোকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানে অধ্যাত্মশাস্ত্রই যে **একমাত্র সাধন** ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন।[১] পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থ এই প্রথম চার শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

অজ্ঞান এবং অজ্ঞানমূলক অধ্যাস বা মিথ্যাবোধই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে যে দুইটি শক্তি আছে, সেই শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে অজ্ঞান পরব্রহ্মের যথার্থ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আবৃত করিয়া ঈশ্বর, জীব, জগৎ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মিথ্যা ভেদপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে।[২] ফলে এক অদ্বিতীয় আত্মদৃষ্টি কলুষিত হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বিশ্বের অন্তরাত্মা। এই জগদন্তরাত্মা পরব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে। ব্রহ্মাশ্রিত হইয়া অবিদ্যা ব্রহ্মবিষয়েই বিবিধ বিচিত্র বিভ্রমের সৃষ্টি করে। মণ্ডন ও বাচস্পতিমিশ্রের মতে জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়, এবং ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়। এই মত সর্বজ্ঞাত্ম মুনি অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার গুরু সুরেশ্বরাচার্যের মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, জীব অজ্ঞানেরই কল্পনা, অজ্ঞানকল্পিত জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে ? যদি বল যে, **"অহমজ্ঞঃ"** এইরূপেই তো সকলে অজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যক্ষে অহম্ বা আমিপদবাচ্য জীবই তো অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইবেন কিরূপে ? ইহার উত্তরে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন যে, সত্য বটে, অজ্ঞানকে লোকে "অহমজ্ঞঃ" এইরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যক্ষই অজ্ঞানের প্রমাণ। কিন্তু এখানে বিচার্য এই যে, এইরূপ প্রত্যক্ষের মূল কোথায় ? অজ্ঞান স্বভাবতঃ জড়, সে চৈতন্য দ্বারা আলোকিত না হইলে স্বতঃ কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না। এইজন্য অদ্বৈত আচার্যগণ অজ্ঞানকে সাক্ষি-ভাস্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাক্ষী-চৈতন্যে অজ্ঞানের সম্বন্ধও নিছক কল্পনা মাত্র, বাস্তব নহে। স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মায় অজ্ঞান বাস্তবরূপে কখনই থাকিতে পারে না ; সুতরাং অধ্যস্তরূপেই আত্মায় অজ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। চৈতন্যে অধ্যস্ত অজ্ঞান যখন অভিমানাত্মক চিত্তবৃত্তিকে

অবিদ্যা

অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়।

১। সংক্ষেপ-শারীরক—১-৪ শ্লোক মধুসূদন সরস্বতী-কৃত টীকা সহ দ্রষ্টব্য।

২। আচ্ছাদ্য বিক্ষিপতি সংস্ফুরদাত্মরূপং জীবেশ্বরত্বজগদাকৃতিভির্মৃষৈব।
অজ্ঞানমাবরণ-বিভ্রমশক্তিযোগাদাত্মত্বমাত্রবিষয়াশ্রয়তা বলেন।

সংক্ষেপ শাঃ ১।২০

স্বস্মিন্ যদজ্ঞানং স্বাশ্রয়বিষয়কমবিদ্যামায়াশব্দিতমনাদি ভাবরূপমনির্বাচ্যমাবরণ-বিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানম্, তেন আবরণশক্ত্যা আত্মস্বরূপভানং তিরোধায় বিক্ষেপশক্ত্যা কল্পিতানি অধ্যস্তানি যানি জগৎ-পরমেশ্বরত্ব-জীবাত্মানি তৈরনুযোগিত্বেন প্রতিযোগিত্বেনচ তন্নিমিত্তো জীবজগদ্ভেদঃ, জীব-পরমেশ্বর-ভেদঃ, জীবপরস্পরভেদঃ, জগৎপরস্পরভেদঃ, জগৎপরমেশ্বরভেরদশ্চেতি পঞ্চবিধো বিভেদঃ।

সং শাঃ-মধুসূদনকৃত টীকা, ১।২

অবলম্বন করিয়া উদিত হয়, তখনই "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহঙ্কার জড়। জড়রূপ অহঙ্কারে উপহিত চৈতন্যই 'অহম্'রূপে আত্ম-প্রকাশ লাভ করে। জড় অজ্ঞান, জড় অহঙ্কারকে আশ্রয় করে না, অহঙ্কারে উপহিত ব্রহ্মচৈতন্যকেই আশ্রয় করে বুঝিতে হইবে।[১] যদি বল যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তো অজ্ঞানের বিরোধী, জ্ঞানরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞানের বিরোধী নহে, "ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ" এইরূপ (ব্রহ্মাকার) বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ যে ব্যক্তির "ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ" এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হইবে, তাঁহার আর ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান থাকিবে না, অজ্ঞানমূলক বন্ধও থাকিবে না। অপরোক্ষ জ্ঞানোদয়ের ফলে অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় অজ্ঞান-সম্পর্কশূন্য এক অদ্বিতীয় চিদানন্দময় ব্রহ্মই বিরাজ করিবে। এই অবিদ্যা অনাদি এবং ভাবরূপ। অবিদ্যা ভাবরূপ বলিয়াই অবিদ্যার আবরণে চিদানন্দঘন আত্মার আবরণ সম্ভব হয়। অভাব-পদার্থ আবরক হয় না, হইতে পারে না, ইহা অভাব-পদার্থ-বিশেষজ্ঞ তার্কিকগণও স্বীকার করিয়াছেন।

অবিদ্যা ভাবরূপ ও অনির্বচনীয়।

সূর্যের মেঘাদি আবরণ যেমন ভাবরূপ, স্বপ্রকাশ চিন্ময় ব্রহ্মের অজ্ঞানাবরণও সেইরূপ ভাবরূপ। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় পার্থসারথি—'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ' (গীতা ৫।১৫), এই বলিয়া জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানের ভাবরূপতাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতেও অজ্ঞানের ভাবরূপতাই সমর্থিত হইয়াছে। অজ্ঞানকে তিমির, তমিস্রা, প্রকৃতি, জড় প্রভৃতি শব্দে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেও অজ্ঞানের ভাবরূপতাই সূচিত হয়।[২] অজ্ঞান অভাবরূপ হইলে আত্মজ্ঞানের অভাব আত্মজ্ঞান থাকাকালে আত্মায় কোনমতেই থাকিতে পারে না। অজ্ঞান ভাবরূপ

১। আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-ভাগিনী নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা।
পূর্বসিদ্ধ তমসোহি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপিগোচরঃ। সং শাঃ, ১।৩১৯

অহমজ্ঞ ইত্যাদি প্রতীতিস্ত অজ্ঞানাশ্রয় পূর্ণ চৈতন্যস্যৈব অহঙ্কারাদ্যুপহিততয়া তত্রাপি তৎসম্বন্ধাদুপপদ্যতে। অতএব এতদনুক্তাদহঙ্কারাশ্রয়ং ব্রহ্মবিষয়ং তদিতি প্রত্যুক্তম্ অজ্ঞানস্য কেবলজড়বৃত্তিত্বানুপপত্তেশ্চ। সংক্ষেপ শাঃ, মধুসূদন-কৃত টীকা ১।৩১৯

২। অজ্ঞানমিত্যজড়বোধতিরস্ক্রিয়াত্মা জাড্যঞ্চ মৌঢ্যমিতিচ প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধা।
সাচাতিদুঃস্থিতবপুর্দৃশমদ্বিতীয়ামালিঙ্গতি স্ম ঘৃতপিণ্ড ইবাগ্নিবিম্বম্॥
চিদ্‌বস্তনশ্চিতি ভবেত্তিমিরং তমিস্রং তামিস্রমন্ধতমসং জড়িমা তমিস্রা।
মায়া জগৎপ্রকৃতিরচ্যুতশক্তিরান্ধ্যং. নিদ্রা সুষুপ্তিরনৃতং প্রলয়ো গুণৈক্যম্॥
সং শাঃ, ১।৩১৭-১৮

অজ্ঞান জড়স্বভাব হইলেও উল্লিখিত শ্লোকে জাড্য শব্দ দ্বারা জড়-প্রকৃতি জগজ্জননী অবিদ্যার [metaphysical Nescience] এবং মৌঢ্য শব্দ দ্বারা পুরুষমোহাত্মক অজ্ঞানের [psychological Nescience] ভাবরূপতা সূচনা করা হইয়াছে। যদ্যপ্যজ্ঞানং জড়মেব তথাপি জড়প্রপঞ্চানুগততয়া জাড্যমিতি তদ্‌ব্যবহার উপপদ্যতে, মৌঢ্যমিতিচ পুরুষগতং মোহাত্মকাজ্ঞানমেব ব্যবহ্রিয়তে ইতি তদ্‌ভাবরূপমিতি ভাবঃ। (সং শাঃ, মধুসূদন কৃত টীকা ১।৩১৭)। জগৎপ্রকৃতি অজ্ঞান এবং ভ্রমের কারণ অজ্ঞান বস্তুতঃ একই অজ্ঞান। অজ্ঞানের কোন ভেদ নাই।

হইলে আত্মজ্ঞান বিদ্যমান থাকাকালেও আত্মার আবরক অজ্ঞান থাকায় কোন বাধা নাই। অতএব অজ্ঞানকে অভাবরূপ না বুঝিয়া ভাবরূপই বুঝিতে হইবে। সুরেশ্বরাচার্যও অনুরূপ যুক্তিবলেই অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই ভাবরূপ অবিদ্যা অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয় কাহাকে বলে? যে বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, তাহাই অনির্বচনীয়। শুক্তি-রজত আমাদের ইদংরূপে সম্মুখস্থিত হইয়া প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, অতএব শুক্তি-রজতকে অসৎ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলা চলে না। শুক্তিজ্ঞানের উদয় হইলে রজতজ্ঞান বাধিত হয় সুতরাং শুক্তি-রজতকে সত্যও বলা যায় না। কোন বস্তু একই সময়ে সদসৎ (বা ভাবাভাবস্বরূপ) হইতেই পারে না, সুতরাং শুক্তি-রজতকে অনির্বাচ্যই বলিতে হয়। অবিদ্যাই শুক্তি-রজতের উপাদান। এই অবিদ্যা অনির্বচনীয়। আবিদ্যক প্রপঞ্চমাত্রই অনির্বচনীয় বলিয়া জানিবে।[১] এই অনাদি, অনির্বচনীয় অজ্ঞানপ্রভাবে স্বপ্রকাশ, চিদানন্দময়, এক অদ্বিতীয় আত্মায় মিথ্যা দ্বৈতবোধের উদয় হইয়া থাকে। একই পরব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব, জগৎপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বিবিধরূপে প্রতিভাত হন। একের এই বিবিধ প্রকারে ভাতি সত্য হইতে পারে না, ইহা মিথ্যা এবং অজ্ঞানমূলক। 'ভগবতি পরমাত্মন্যদ্বিতীয়ে বিচিত্রা দ্বয়মতিরিয়মস্ত ভ্রান্তিরজ্ঞানহেতুঃ' (সং শাঃ, ১।৩০)।

অধ্যাস

অবিদ্যাই আমাদের বুদ্ধির ও দৃষ্টির তিরস্করণী। অবিদ্যা-বশতঃ স্বপ্রকাশ, অদ্বিতীয়, চিন্ময়ব্রহ্ম ও বিভিন্ন জড়-প্রপঞ্চের মধ্যে ভেদদৃষ্টি তিরোহিত হয়। জড় ও চৈতন্য এবং জড়ের ধর্ম ও চৈতন্যের ধর্ম পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই শঙ্করের ভাষায় সত্যানৃতের মিথুন বা চিদচিদ্‌গ্রন্থি। জড় ও চৈতন্যের "ইতরেতরাবিবেক"ই এইরূপ মিথুন বা চিদচিদ্‌গ্রন্থির মূল। দ্বৈত জড়প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হওয়ার ফলে ব্রহ্মসত্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; পক্ষান্তরে অনন্ত, অখণ্ড, চিন্ময়ব্রহ্ম অবিদ্যা, অন্তঃকরণ এবং জ্ঞেয় বিষয় প্রভৃতির আবরণে আবৃত হইয়া পরিচ্ছিন্ন, সসীম, সখণ্ড, সুখ, দুঃখ, শোক, ব্যাধি, জরা, মরণশীল বলিয়া প্রতিভাত হয়। আত্মার ও অনাত্মার, জড় ও চৈতন্যের পরস্পর অধ্যাস স্মরণাতীত কাল হইতে চলিতেছে এবং যতদিন পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যার মিলনগ্রন্থি ছিন্ন না হইবে, জীবের জীবনপ্রবাহ ব্রহ্ম-পারাবারে মিশিয়া না যাইবে, ততদিন পর্যন্ত চলিবে। এইরূপ পরস্পর অধ্যাসের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন—"শুক্তিতে যে,

---

১। অজ্ঞানকল্পিতমনির্বচনীয়মস্মিন্নাবালবৃদ্ধমবিবাদপদং প্রসিদ্ধং।। সং শাঃ কাঃ, ১।৩৩৬

ভ্রান্তিপ্রতীতিবিষয়ো নচ সন্নচাসন্নাকাশতৎকুসুময়োর্নহি সান্তি নাপি।।
তস্যা ভবেৎ সদসদাত্মকগোচরত্বং নহ্যস্তি তৎ কিমপি যৎ সদসৎস্বরূপম্।।
আলম্বনঞ্চ বিরহয্য ন বিভ্রমস্য জ্ঞানাত্মনো ভবতি জন্ম কদাচিদত্র।
সিদ্ধং ততঃ সদসতী ব্যতিরিচ্য কিঞ্চিদালম্বনং ভ্রমধিয়ঃ সকলপ্রবাদে।

সংক্ষেপ শাঃ, ১।৩৩৯—৪০

"ইদং রজতম্" এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধির উদয় হয়, ঐ বোধকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবেই দেখা যাইবে যে, শুক্তিগত "ইদন্তা" (thisness) রজতে আরোপিত হইয়া যেমন মিথ্যা রজতকে সম্মুখস্থিত সত্য রজতরূপে ভ্রান্তদর্শীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, সেইরূপ 'ইদন্তা'ও রজতের আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। "ইদম্"-এর সহিত যেমন রজতের তাদাত্ম্য বা অভেদবোধ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ রজতের সহিতও "ইদম্"-এর অভেদবোধের উদয় হইয়াছে। ফলে, "ইদম্"কে রজত বলিয়া বুঝিয়া ভ্রান্তদর্শী রজতের আশায় "ইদম্"-এর অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন।[১] ইদম্ ও রজতের পরস্পর অধ্যাসের ন্যায় আমাদের অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির সহিত চিদাত্মার অভেদ বা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফলে যে "অহম্"-বোধ বা আমিত্বের স্ফুরণ হয়, সেখানেও অন্তঃকরণের ধর্ম, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা চিদাত্মা সুখ-দুঃখময় বলিয়া বোধ হন; এবং জড় অন্তঃকরণও পরব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত হইয়া সত্য স্বাভাবিক এবং চিৎপ্রভায় ভাস্কর বলিয়া মনে হয়। অন্তঃকরণে চৈতন্যাধ্যাসের ফলে চিদালোকে আলোকিত অন্তঃকরণকেই আত্মা বলিয়া লোকে ভ্রম করে। পক্ষান্তরে, চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম অন্তঃকরণের বিবিধ ধর্ম দ্বারা চিত্রিত হইয়া প্রকাশিত হন। এই পরস্পরাধ্যাস সম্পূর্ণই মিথ্যা অজ্ঞানের খেলা। প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় প্রকার তাদাত্ম্যাধ্যাসই যদি মিথ্যা হয়, তবে যে দুই বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্য-বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও তো মিথ্যাই হইবে। ফলে বৌদ্ধসম্মত সর্বশূন্যতাই আসিয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যেই আশ্রয়ে বা অধিষ্ঠানে যে বস্তুর অধ্যাস বা মিথ্যাবোধের উদয় হয়, সেই অধিষ্ঠানটি মিথ্যা নহে, সত্য। সত্য অধিষ্ঠানের সহিত মিথ্যা আরোপ্যের মিথুন বা মিলনই অধ্যাস। সত্য অধিষ্ঠানটি কস্মিন্কালেও অধ্যাস বা মিথ্যা দৃষ্টিদ্বারা বিকৃত বা কলুষিত হয় না, হইতে পারে না। 'যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে' (অধ্যাস, শং-ভাষ্য)। কারণ, ভ্রান্তদর্শীর কলুষিত দৃষ্টি ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের সত্যরূপ বিকৃত করিবে কিরূপে? শুক্তিকে ভ্রান্তদর্শী রজতরূপে দেখিলেও মিথ্যা রজতাধ্যাসের অধিষ্ঠান যেই শুক্তি সেই শুক্তিই আছে; মিথ্যাদৃষ্টির ফলে শুক্তির কোনই পরিবর্তন হয় নাই। এইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে জড়প্রপঞ্চ অধ্যস্ত হইলেও মিথ্যাপ্রপঞ্চ-দর্শন পরব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপকে কোনমতেই বিকৃত করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান যখন উদিত হয়, তখন এক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, নিত্য চৈতন্যে জড়বস্তুর কল্পিত সর্বপ্রকার

১। ইদমর্থবস্তুপি ভবেদ্ রজতে পরিকল্পিতং রজতবস্তিদমি।
রজতত্বমেস্য চ পরিস্ফুরণান্ন যদি স্ফুরেন্ন খলু শুক্তিরিব॥
রজতপ্রতীতিরিদমি প্রথতে ননুযদ্বদেবমিদমিত্যপি ধীঃ।
রজতে তথাসতি কথং ন ভবেদিতরেতরাধ্যসননির্ণয়ধীঃ॥

সং শাঃ কাঃ, ১।৩৪-৩৫

ইতরেতরাধ্যাসনমেব ততশ্চিতিচৈত্যয়োরপি ভবেদুচিতম্।
রজতভ্রমাদিষু তথাবগমান্নহি কল্পনা গুরুতরা ঘটতে॥ সং শাঃ কাঃ, ১।৩৭

মিথ্যা সম্বন্ধই বাধিত হয়। ব্রহ্মের জগৎসম্বন্ধই মিথ্যা, ব্রহ্মবস্তু মিথ্যা নহে, সত্য, সুতরাং নিত্য, সত্যব্রহ্মের বাধ হয় না, বা তাঁহার স্বরূপেরও কোন বিচ্যুতি হয় না, তিনি যেমন তেমনই থাকেন, এইজন্য ব্রহ্মবাদীর মতে সর্বশূন্যতার আপত্তি উঠে না।[১]

সর্ববিধ বিভ্রমের লীলানিকেতন সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই জগদ্‌যোনি। সর্বজ্ঞাত্ম মুনির মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। তবে, কূটস্থ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কারণ হইতে পারেন না, এইজন্য অনাদি মায়াকে দ্বার করিয়া পরব্রহ্ম বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন। এইমতে মায়া দ্বারকারণ। মায়া-সম্বন্ধব্যতীত শুদ্ধ ব্রহ্ম কোনমতেই জীব ও জগৎরূপে বিবর্তিত হইতে পারেন না; সুতরাং ব্রহ্মের বিবর্তে মায়ার সহায়তা অপরিহার্য। দ্বারকারণ মায়াও কার্যে (মায়িক সৃষ্টিতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বাচস্পতিমিশ্র কার্যে অনুগত দ্বারকারণ স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে মায়া সহকারীকারণ। প্রকাশাত্মযতির মতে মায়া-সম্বলিত সর্বজ্ঞ। সর্বশক্তি ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান। প্রকাশাত্মযতির এই মত সর্বজ্ঞাত্ম মুনি গ্রহণ করেন নাই, খণ্ডনই করিয়াছেন। অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্ম-বিবর্তের ফলে ঈশ্বর, জীব, জগৎ প্রভৃতি বিভাবের সৃষ্টি হইয়াছে; তন্মধ্যে জগৎ অচেতন ও ভোগ্য, জীব চেতন ভোক্তা, ঈশ্বর নিয়ন্তা। ঈশ্বরের উপাধি মায়া, মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি, জগতের স্রষ্টা, পালক ও পোষক। মায়া উপাধি-বিগমে ঈশ্বরভাবেরও ব্রহ্মে বিলয় হইয়া থাকে। জীবের উপাধি অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব। জীব অবিদ্যার বশ, সুতরাং অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি। ঈশ্বরের অজ্ঞান-সম্বন্ধ থাকিলেও ঈশ্বরে অজ্ঞান স্পষ্ট নহে, অস্পষ্ট বা অপ্রকট, জীবের অজ্ঞতা স্পষ্ট, "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ জীবের অজ্ঞানের অনুভবও স্পষ্ট।[২] কারণ, জীবের অহঙ্কার আছে, ঈশ্বরের অহঙ্কার নাই। অহমিকাই অজ্ঞতার লীলাভূমি। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব নানা নহে, এক। অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির নানাত্ববশতঃ জীব নানা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। জীবের জীবভাবও

ব্রহ্মের জগৎকারণতা; মায়া দ্বারকারণ

ঈশ্বর ও জীব

১। কিঞ্চানৃতদ্বয়মিহাধ্যসিতব্যমিষ্টং স্যাচ্চেত্তদা ভবতি চোদ্যমিদং ত্বদীয়ম্।
সত্যানৃতাত্মকমিদং মিথুনং মিথশ্চেদধ্যস্যতে কিমিতি শূন্যকথাপ্রসঙ্গঃ।। সং শাঃ, ১।৩৩

২। মায়োপাধেরদ্বয়স্যেশ্বরত্বং কার্যোপাধে জীবতা চ প্রতীচঃ। সং শাঃ, ৩।১৪৮
মায়ানিবিষ্টবপুরীশ্বরবোধ এষ সর্বেশ্বরো ভবতি সর্বমপেক্ষমাণঃ।
বুদ্ধিপ্রবিষ্টবপুরেষ তথেশ্বরঃ স্যাদাত্মীয়ভৃত্যজনবর্গমপেক্ষমাণঃ।। সং শাঃ, ৩।১৫৩
স্পষ্টংতমঃ স্ফুরণমত্র নতত্র তদ্বৎ সর্বেশ্বরে তদিতি তত্র নিষিধ্যতে তৎ।।
বিম্বে তমোনিপতিতে প্রতিবিম্বকে বা দেহদ্বয়াবরণবর্জিতচিৎস্বরূপে।। সং শাঃ, ২।১৭৬
অজ্ঞানমাত্রপ্রতিবিম্বত্বমীশ্বরত্বমহঙ্কারতাদাত্ম্যাপন্নাজ্ঞানপ্রতিবিম্বত্বং জীবত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্।
সং শাঃ-মধুসূদন-কৃত টীকা, ২।১৭৬

ঈশ্বরভাবের ন্যায় অনাদি। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীবের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন হইলে জীব আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সর্বজ্ঞাত্ম মুনির মতে জীব এবং জীবের অজ্ঞান যখন এক তখন এক জীব মুক্ত হইলে, কিংবা জীবের মধ্যে একজন তত্ত্বজ্ঞানী হইলে সকলেই মুক্ত, সকলেই তত্ত্বজ্ঞানী হয় না কেন? একজীববাদে বন্ধ, মোক্ষ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন যে, অজ্ঞান একই বটে, তবে ঐ এক অজ্ঞানই অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে বিভিন্ন অসংখ্য জীবব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া একই গোত্ব জাতি যেমন নিখিল গোশরীরে বিদ্যমান থাকে, এইরূপ জাতিপদার্থের ন্যায় অসংখ্য জীবে বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হইতেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞান বিনষ্ট হইতেছে, তিনি মুক্ত হইতেছেন; অপরাপর অজ্ঞানীর অজ্ঞানবন্ধনই থাকিয়া যাইতেছে, সে মুক্ত হইতেছে না। এইরূপে এক অনাদি অজ্ঞান স্বীকার করিলেও বন্ধ বা মুক্তির কোন অসুবিধা হয় না।[১]

জড়জগৎ সর্বজ্ঞাত্ম মুনির মতে মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা হইলেও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত ইহা মানস-কল্পনাপ্রসূত নহে। জাগতিক বস্তুগুলির ব্যাবহারিক জীবনে সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। 'চক্ষুরাদি প্রমাণের সাহায্যে লোকে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। প্রমাণের সাহায্যে যে বস্তু নিশ্চিতরূপে জানা যায়, উহাকে একেবারে অসত্য বলা যায় কিরূপে?[২] বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ বস্তু উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষণিক বস্তুর প্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ করা চলে না। কারণ, যে দেখে সেই দ্রষ্টাও ক্ষণিক, দৃশ্যও ক্ষণিক, দর্শনও ক্ষণিক। সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তবে দ্রষ্টার বিষয়-দর্শন সম্ভব হইতে পারে কি? এই মতে প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি অবিদ্যাকল্পিত হইলেও প্রমাণের সাহায্যে জড়বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব নহে। স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম অপ্রমেয় এবং স্বতঃপ্রমাণ। লৌকিক প্রমাণসকল অপ্রমেয় ব্রহ্মে প্রযোজ্য নহে। কেবল বেদ, বেদান্ত শাস্ত্রমূলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ বিচারের ফলে ত্বম্-শব্দবাচ্য জীবের, তৎশব্দবাচ্য নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ব্রহ্মের সহিত অভেদ-সাক্ষাৎকার উদিত হয়। ব্রহ্মই মায়ার এবং মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চের সাক্ষী, আশ্রয় এবং ভাসক।[৩] এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিভাব। অবিকারী কূটস্থ ব্রহ্মই একমাত্র

জগৎ

১। অজ্ঞানং সকলভ্রমোদ্ভবনকৃৎ পিণ্ডেষু সামান্যব-
জ্জীবানাং প্রতিবিম্বকল্পবপুষাং বিম্বোপমে ব্রহ্মণি॥
বিদ্বাংসং পুরুষং জহাতি ভজতে বিদ্যাবিহীনং নরম্
নষ্টানষ্টমিবাত্মপিণ্ডমধুনা জাতিস্তথৈকে জগুঃ॥ সং শাঃ, ২।১৩২

২। অজ্ঞাতমর্থমববোধয়িতুং ন শক্তমেবং প্রমাণমখিলং জড়বস্তুনিষ্ঠম্।
কিন্তু প্রবুদ্ধপুরুষং ব্যবহারকালে সংশ্রিত্য সংজনয়তি ব্যবহারমাত্রম্। সং শাঃ, ২।২১

৩। সংক্ষেপ-শারীরক, ২।২২-৩০ কারিকা দ্রষ্টব্য।

সত্য বস্তু, সেই তুলনায় ব্যাবহারিক জগৎপ্রপঞ্চ প্রমাণগম্য হইলেও অসত্য। বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাজ্ঞান হইলেও তাহার সত্যতা অদ্বৈত-বেদান্তের মতে গৌণ, বা ব্যাবহারিক, জ্ঞানময় ব্রহ্মের সত্যতা পারমার্থিক। সাংসারিক আনন্দ আনন্দের আভাস মাত্র, ব্রহ্মানন্দই বস্তুতঃ আনন্দের পরাকাষ্ঠা বা পূর্ণ আনন্দ। আকাশাদির নিত্যতা ব্যাবহারিক, পরব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ এবং বস্তুতঃ অভিন্ন। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান; যাহা জ্ঞান, তাহাই আনন্দ। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন হইলে আনন্দ দৃশ্য বা জ্ঞেয় হইয়া পড়ে। পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে দৃশ্য আনন্দের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানই আনন্দ, আত্মবোধই আনন্দ, ব্রহ্ম আনন্দের সমুদ্র।[১] জীব প্রতিদিন সুষুপ্তি অবস্থায় মনোবৃত্তির বিলীন হইলে রসস্বরূপ, পরমপ্রেম-নিদান আত্মাকে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মায়াকে দ্বার করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। জড়বস্তু-সকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বা কার্য জড়বস্তুর অবশ্যই একজন কর্তা থাকিবে। এই কর্তা জড় হইতে পারে না। কেননা, চেতনের সাহায্য ব্যতীত জড়ের স্বতঃ-প্রবৃত্তি হইতে পারে না, সুতরাং পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বশক্তিমান্ একজন চেতন-কর্তা অবশ্য স্বীকার্য। 'জগতিহি পরিদৃষ্টং চেতনাদেব কার্যম্' (সং শাঃ, ১।৪৯৮)। 'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি পাঠে জানা যায় যে, এক অদ্বিতীয় নিখিল জ্ঞানাকর চেতনই লীলাবশে জড়-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই জগতের উপাদানও বটেন, নিমিত্তও বটেন। মায়া দ্বারাই এক বহু হইয়াছেন। অসীম তিনি সসীমের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে মায়া যবনিকার উচ্ছেদই সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য। মায়ার সমূলে উচ্ছেদই মুক্তি, এতদ্ব্যতীত মুক্তি অপর কিছু নহে। জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অনাদি অজ্ঞানই জীবের ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছে। জীবকে অবিদ্যার প্রাচীর বিধ্বস্ত করিতে হইবে। অবিদ্যার যবনিকা ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান-ভূমিতে পেঁীছিতে হইলে (ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে হইলে) ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে শম, দম প্রভৃতি বিবিধ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন আয়ত্ত করিতে হইবে। নিত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে কর্ম কোনমতেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কারণ হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম যত উচ্চস্তরেরই হউক না কেন, উহা ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন। শম দমাদি বহিরঙ্গ সাধন আয়ত্ত করার ফলে মনঃ-সংযম অভ্যাস হয়। সর্বপ্রকার প্রাণি-হিংসাদি হইতে নিবৃত্তিই যম, এবং শৌচাদির অনুশীলনই নিয়ম। যম-নিয়মের ফলে চিত্তের আত্মপ্রবণতা, আত্মাভিমুখী বা ভগবন্মুখী হওয়াই মনঃসংযমের, যম ও নিয়মানুশীলনের সার্থকতা।[২] কর্মও

১। সংক্ষেপ-শারীরক—১ম অধ্যায়, ১৭৮-১৮৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। যমস্বরূপা সকলা নিবৃত্তি স্তথাপ্রবৃত্তি র্নিয়মস্বরূপা।
নিবর্তকাদত্র যমপ্রসিদ্ধিঃ প্রবর্তকাৎ স্যান্নিয়মপ্রসিদ্ধিঃ॥ সং শাঃ, ১।১৮৫

সর্বজ্ঞাত্ম মুনির যম ও নিয়মের ব্যাখ্যা বড়ই মধুর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। আচার্য শঙ্করও তাঁহার অপরোক্ষানুভূতিতে এইরূপেই যম ও নিয়মের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জনপূর্বক ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে ঐরূপ কর্ম চিত্তের শুচিতা সাধন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়তা করে, এবং ব্রহ্মকে জানিবার প্রবল ইচ্ছা "বিবিদিষা" উৎপাদন করে। কর্ম এইরূপে পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানের সাধন হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সর্বজ্ঞাত্ম মুনির অভিপ্রেত নহে। প্রথমতঃ কর্ম কর, তাহার পর জ্ঞান-বিভাকরের উদয় হইবে এবং জ্ঞানের ফলে অবিদ্যার ধ্বংস বা মুক্তি লাভ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন বেদান্ততত্ত্ব-বিচার বা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যার্থের বিচার বা বিশ্লেষণ।[১] এই বিচারশক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-লভ্য। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুশীলন বা গুরুমুখ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণ এবং উহার যুক্তিমূলক বিচার বা মনন ও মননগম্য অর্থের ধ্যান বা নিদিধ্যাসনের ফলেই অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার উদিত হয়। বেদ-বেদান্তাদি পরোক্ষ প্রমাণমূলে কিংবা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য বিচারের ফলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতে সর্বজ্ঞাত্ম মুনির মতে কোন বাধা নাই। 'নিত্যাপরোক্ষমপি বস্তু পরোক্ষরূপং বেদান্তবাক্যমববোধয়তি স্বভাবাৎ' (সং শাঃ, ১।২৩)। বেদান্ত অনুশীলনের ফলে অবিদ্যার আবরণ বিধ্বস্ত হইয়া জীব পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়।

শব্দাপরোক্ষবাদ

নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সন্ বিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ।
আনন্দাব্ধির্যঃ পরঃ সো'মস্যি প্রত্যগ্‌ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি॥

সং শাঃ, ১।১৭৩

আচার্য শঙ্করের সময়ে এবং শঙ্করের অব্যবহিত পরবর্তী কালে (খৃষ্টীয় ৮ম এবং ৯ম শতকে) অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তাকে যাহারা পরিপূর্ণ রূপ দান করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্তপ্রস্থান-প্রবর্তক আচার্যগণের মতবাদের পরিচয় আমরা দিয়া আসিয়াছি। ঘাত ও প্রতিঘাত, খণ্ডন এবং মণ্ডনের ফলে দার্শনিক-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শঙ্করের পূর্ববর্তী যুগে বৌদ্ধবাদ বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে বৈদিক কর্মমার্গের প্রবর্তক, প্রবীণ মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্ট বৌদ্ধদিগকে বাদযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধ-চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। কুমারিলের আক্রমণে বৌদ্ধমত বিধ্বস্ত হওয়ায় অদ্বৈতবাদ গৌড়পাদ প্রভৃতি আচার্যের অবদানে নবজীবন লাভ করিয়া উপনিষদের সরণি অনুসরণ করিয়া মৃদু গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই

অদ্বৈতচিন্তার অষ্টম ও নবম শতাব্দীর উপসংহার।

১। সর্বজ্ঞাত্মমুনি তাঁহার গ্রন্থে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ এবং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যগুলির তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য অতি বিস্তৃত এবং গভীর বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এ বিষয়ে এরূপ বিস্তৃত বিচার অপর কোন আচার্যই করেন নাই (তৃতীয় অধ্যায়, ৫৭-২১১ কারিকা এবং ১ম অধ্যায়, ১৪৬-২৭৪ কারিকা দেখুন)। সুতরাং সর্বজ্ঞাত্ম মুনির চিন্তার মৌলিকতা অবশ্য স্বীকার্য।

সময় অদ্বৈতকেশরী আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হন। তিনি বিবিধ ভাষ্যাবলী এবং মৌলিক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া উপনিষদের উৎস হইতে প্রবাহিত অদ্বৈতবেদান্তের রুদ্ধ স্রোতঃ প্রবর্তিত করেন। আচার্য শঙ্করের চিন্তাধারায় পুষ্ট হইয়া সেই স্রোতঃ এতই প্রবলাকার ধারণ করে যে, তাহার বিরোধী সমস্ত চিন্তা বন্যাপ্রবাহে তৃণ-গুল্মের মত ভাসিয়া চলিয়া যায়। শঙ্কর তাঁহার পূর্ববর্তী অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, দিঙ্‌নাগ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণের মতের অসারতা প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করের দেহরক্ষার পর শঙ্করের নির্দেশ অনুসারে পদ্মপাদ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীও প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া শঙ্করের চিন্তাধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য বিভিন্ন প্রস্থান প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন।[১] তখনও বৌদ্ধ, জৈন এবং অপরাপর প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণ অদ্বৈতমত খণ্ডনে এবং তাঁহাদের স্ব স্ব মত স্থাপনের জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শান্তরক্ষিত তত্ত্বসংগ্রহ নামে এক অতিবিস্তৃত প্রমেয়বহুল বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার শিষ্য কমলশীল তত্ত্বসংগ্রহের উপর পঞ্জিকা নামে টীকা রচনা করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বৌদ্ধ-মত স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। প্রায় ঐ সময়েই জৈন পণ্ডিত বিদ্যানন্দ তাঁহার গুরু অকলঙ্কের রচিত অষ্টশতী নামক গ্রন্থের উপর অষ্টসাহস্রী নামে টীকা লিখিয়া এবং মাণিক্যনন্দী নামক অপর একজন জৈন পণ্ডিত পরীক্ষামুখ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈত-মত খণ্ডন এবং জৈনমত স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। ব্যোমশিবাচার্য বৈশেষিক ভাষ্যের উপর ব্যোমবতী নামে বৃত্তি রচনা করিয়া দ্বৈতবাদী, জগৎসত্যতাবাদী ন্যায় ও বৈশেষিক চিন্তাধারার পুষ্টিসাধন করেন, ফলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র-ভাস্কর-ভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্করের অদ্বৈতমত সর্বতোভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। মাধবাচার্য-কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয় পাঠে জানা যায় যে, ভাস্কর পণ্ডিত শঙ্করাচার্যের সহিত বাদযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পরাজয়ের গ্লানি বিস্মৃত হইতে না পারিয়াই শঙ্কর-মত খণ্ডনের জন্য ভাস্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ভাষ্যের প্রারম্ভেই শঙ্কর-মতকে কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ—

সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং বৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥

ভাস্কর-কৃত ভাষ্যের প্রারম্ভ

ভাস্করাচার্য স্বীয় ভাষ্যে সর্বত্রই শঙ্কর-মতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

১। শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরের মতের পরিচয় আমরা দিয়া আসিয়াছি। তোটকাচার্যের একটি গুরুস্তব ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। হস্তমলকাচার্যের হস্তামলক নামে চৌদ্দটি শ্লোকে লিখিত এক মনোরম গ্রন্থ পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর উহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

শঙ্করের মায়াবাদ, অভেদবাদ, জ্ঞানবাদ, মুক্তিবাদ প্রভৃতি সমস্ত অদ্বৈত-মতবাদকেই তিনি অযৌক্তিক ও অসার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করের দর্শনকে—'বিগীতং ছিন্নমূলং মহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ কদর্থয়ন্তি' (ভাস্কর ভাষ্য, ৮৫ পৃঃ), এইরূপে প্রকাশ্যে শঙ্করের মতকে মহাযান বৌদ্ধমত বলিয়া কটাক্ষ করিতেও ভাস্কর মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বাচস্পতিমিশ্র ভামতীতে (ব্রঃ সূঃ, ৩৷৩৷২৮) ভাস্করাচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া অমলানন্দ কল্পতরুতে (৩৷৩৷২৮ সূত্রের ভামতীর উক্তির ব্যাখ্যায়) স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি তদীয় সংক্ষেপ-শারীরকে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য উদয়ন ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে ভাস্কর-মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—'ব্রহ্মপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে' (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৩৩২ পৃঃ, চৌখাম্বা সং)। উদয়নাচার্যের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় দশম শতক। ভাস্করাচার্য যে তাহা হইতে প্রাচীন এবং বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। ভাস্করাচার্য, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, বিদ্যানন্দ, মাণিক্যনন্দী প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অদ্বৈত-চিন্তাকে পূর্ণাঙ্গ, নির্মল ও নিষ্কলুষ করিবার জন্যই বাচস্পতিমিশ্র, সর্বজ্ঞাত্ম মুনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যগণ শাস্ত্রসাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সে সাধনায় যে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অমূল্য গ্রন্থরাজি আলোচনা করিলে কোন মনীষীই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিমুক্তাত্মন্ ও অদ্বৈতবেদান্ত

খৃষ্টীয় ৯ম—১০ম শতক

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে অব্যয়াত্ম ভগবানের শিষ্য বিমুক্তাত্মন্ ইষ্টসিদ্ধি নামে এক অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। ইষ্টসিদ্ধি অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধি নামাঙ্কিত চারখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বিমুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধি এবং মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি) অন্যতম সিদ্ধিগ্রন্থ।[১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য তাঁহার আত্ম-সিদ্ধিতে আত্মার স্বরূপবিচার-প্রসঙ্গে ইষ্ট-সিদ্ধির প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ তদীয় শ্রীভাষ্যে অনভূতিই আত্মার স্বরূপ, অনুভূতি এক, নিত্য অমেয় এবং স্বপ্রকাশ, এই অদ্বৈতমতের বিবরণে (মহাপূর্বপক্ষের বিশ্লেষণে) ইষ্টসিদ্ধির ব্যাখ্যা ও বিচারশৈলীর অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদান্তদেশিক তৎকৃত তত্ত্বটীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। যামুনাচার্য দশম-একাদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। রামানুজাচার্য একাদশ শতকে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। সুতরাং বিমুক্তাত্মন্ যে কোনমতেই দশম শতকের পরবর্তী হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহ। বিমুক্তাত্মন্ ইষ্টসিদ্ধিতে সুরেশ্বরের বার্তিক ও ভাস্কর-বেদান্ত-মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুরেশ্বর শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। শঙ্করের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতক, ভাস্করাচার্যও শঙ্করের সমসাময়িক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভাস্করাচার্য শঙ্করের কিছু পরবর্তী। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহা হইতে বিমুক্তাত্মনের আবির্ভাবকাল যে নবম শতকের পূর্ব হইতে পারে না, ইহাও নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। ইষ্টসিদ্ধির চিন্তার মৌলিকতা আছে। বিমুক্তাত্মনের পূর্ব পর্যন্ত আমরা যে সকল অদ্বৈতবাদী আচার্যের দার্শনিক মতের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে মণ্ডনমিশ্র ব্যতীত অপর সকলই শঙ্করের ভাষ্য-ধারার ব্যাখ্যাতা মাত্র। স্বাধীনভাবে তর্কের ভিত্তিতে শঙ্করোক্ত মায়াবাদ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা ইষ্টসিদ্ধিতেই প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ বা অনির্বাচ্যবাদের প্রতিষ্ঠা করাই বিমুক্তাত্মনের ইষ্ট। এই স্বাভীষ্ট তাঁহার গ্রন্থে সিদ্ধি বা চরম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই তদীয় গ্রন্থকে ইষ্টসিদ্ধি বলা হইয়া থাকে—'অতো মায্যাদ্বৈকো মমেষ্টঃ সিদ্ধঃ' (ইষ্টসিদ্ধি, ৩৪৭ পৃঃ)। ইষ্টসিদ্ধি পরবর্তী দার্শনিকগণের চিন্তাকে

১। ইষ্টসিদ্ধি পাঠে জানা যায় (ইষ্টসিদ্ধি, ৩৭ পৃঃ) যে বিমুক্তাত্মন্ প্রমাণবৃত্ত-নির্ণয় নামে প্রমাণের উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের এখন আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।[১] খৃষ্টীয় দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে শ্রীহর্ষ, আনন্দবোধ, চিৎসুখাচার্য প্রভৃতির অবদানে অদ্বৈতবেদান্তে যে খণ্ডন-মণ্ডনযুগের (Vedantic Dialectics) বিকাশ হইয়াছিল, বিমুক্তাত্মনই ছিলেন তাহার অগ্রদূত। আনন্দবোধ তৎকৃত ন্যায়মকরন্দে বিভিন্ন দার্শনিকগণের স্বীকৃত খ্যাতিবাদ বা ভ্রমবাদের যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন এবং অনির্বচনীয় মায়ার ব্যাখ্যায় যে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিমুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধিতে পূর্ণরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিমুক্তাত্মনের নিকট আনন্দবোধের ঋণ অপরিশোধ্য। ইষ্টসিদ্ধির উপর আনন্দানুভবেরও জ্ঞানোত্তমের ইষ্টসিদ্ধি-বিবরণ নামে টীকা আছে। জ্ঞানোত্তমের বিবরণসহ ইষ্টসিদ্ধি অধ্যাপক হিরণ্যের (M. Hiriyanna) সম্পাদনায় গত ইং ১৯৩৩ সনে গাইকোয়াড় অরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইষ্টসিদ্ধি আটটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থের আয়তনও বড় কম নহে। আট পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদটিই অতি বিস্তৃত, গ্রন্থের অর্ধেকেরও বেশী। অপরাপর পরিচ্ছেদগুলি স্বল্পায়তন। ইহা গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। অনুষ্টুভ্ ছন্দে সংক্ষেপে যে দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাই গদ্যে বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া প্রতিপক্ষের মতের অসারতা প্রদর্শনপূর্বক সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইষ্টসিদ্ধির বিচারের গভীরতা ও গ্রন্থকারের সর্বতোমুখী প্রতিভা সুধীমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। ইষ্টসিদ্ধির আরম্ভে, নমস্কার শ্লোকেই নিত্য জ্ঞানময়, স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের স্বরূপ ও জগজ্জননী মায়ার স্বভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছে :—

ইষ্টসিদ্ধির দার্শনিক মত

যানভূতিরজামেয়ানন্তাত্মানন্দবিগ্রহা।
মহদাদি জগন্মায়াচিত্রভিত্তিং নমামি তাম্।। ইষ্টসিদ্ধি, ১ম পৃঃ।

পরমাত্মা পরব্রহ্মই নিখিল মায়িক দৃশ্য প্রপঞ্চের ভিত্তি। পরব্রহ্মের ভিত্তিতেই মায়া ভ্রান্তদর্শীকে বিচিত্র জগচ্চিত্র আঁকিয়া দেখাইতেছে এবং সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম ঐ মায়া-কল্পিত চিত্রের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছেন বলিয়া ইহা সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মব্যতীত জ্ঞেয় বা দৃশ্য বলিয়া কিছুই নাই। দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, দৃক বা জ্ঞানই একমাত্র সত্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের, চিৎ ও জড়ের ভেদ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ; দৃশ্য বস্তুকে সকলেই জ্ঞান হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই অবস্থায় জ্ঞেয়প্রপঞ্চকে এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদবোধকে মিথ্যা বলা যায় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিমুক্তাত্মন্

১। চিৎসুখাচার্য তৎকৃত তত্ত্বপ্রদীপিকায় (৩৮১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং) অমলানন্দস্বামী তদীয় বেদান্ত-কল্পতরুতে ৯৩২ পৃঃ (নির্ণয়সাগর সং), বিদ্যারণ্য তৎকৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহে ২২৫ পৃঃ, বেঙ্কটদেশিক সর্বার্থসিদ্ধিতে ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠায়, পণ্ডিত রামাদ্বয় বেদান্ত-কৌমুদীতে ইষ্টসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

বলেন যে, জ্ঞেয় বস্তুই দৃশ্য হয়, জ্ঞান দৃশ্য নহে, অদৃশ্য, অজ্ঞেয়! জ্ঞান দৃশ্য বা জ্ঞেয় হইলে তাহা জ্ঞানই হইতে পারে না। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের, চিৎ ও জড়ের স্বভাব আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া চিৎ ও জড়ের ভেদ থাকিলেও ঐ ভেদ বুঝিবার কোন উপায় নাই। কেননা, ভেদকে জানিতে হইলেই যেই দুই বস্তুর পরস্পর ভেদ বুঝা যায়, সেই ভেদের অনুযোগী এবং প্রতিযোগীর স্বরূপ পূর্বাহ্ণেই জানা আবশ্যক হয়। যে বস্তু হইতে যে বস্তুর ভেদ বুঝায় সেই বস্তুদ্বয়ের কোন একটি অজ্ঞেয় হইলে, জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় বস্তুর ভেদ কোনমতেই বুঝিবার উপায় থাকে না। 'নহি অদৃষ্টস্য দৃষ্টাৎ দৃষ্টস্য বা অদৃষ্টাৎ ভেদো দ্রষ্টুং শক্যঃ, ধর্মিপ্রতিযোগ্যপেক্ষত্বাৎ ভেদদৃষ্টেঃ' (ইষ্টসিদ্ধি, ২ পৃঃ)। চিদ্ বস্তু অদৃষ্ট বা অজ্ঞেয় হইলেও উহা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ, সুতরাং চিদ্ বস্তু প্রসিদ্ধই বটে, তাহা হইতে দৃশ্য বা জড় বস্তুর ভেদ-বোধ হইতে আপত্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিচার্য এই যে, "ভেদ" বলিলে কি বুঝায়? ভেদ কি বস্তুর স্বরূপ, না, তাহার ধর্ম? ভেদ যদি বস্তুর স্বরূপ হইত, তবে বস্তুকে চিনিবামাত্রই তাহার অপরাপর বস্তু হইতে ভেদও বুঝা যাইত। ভেদকে জানিবার জন্য যে বস্তুর যে বস্তু হইতে ভেদ সূচিত হয়, সেই ভেদের অনুযোগী এবং প্রতিযোগী বস্তু-জ্ঞানের কোন অপেক্ষা থাকিত না। গরুকে চিনিবামাত্রই ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণী হইতে গরুর যে ভেদ আছে তাহা বুঝা যাইত, এবং ঐরূপ ভেদবোধের জন্য ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর সহিত গরুর অবয়বের তুলনামূলক বিচারের আবশ্যক হইত না। গরুর স্বরূপজ্ঞান যেমন অপরজ্ঞান নিরপেক্ষ, ভেদজ্ঞানও সেইরূপ অপর (প্রতিযোগী) জ্ঞাননিরপেক্ষই হইত। কেননা, ভেদ তো বস্তুর স্বরূপ ব্যতীত অপর কিছু নহে। বস্তুতঃ পক্ষে বস্তুর স্বরূপ জানার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর বস্তু হইতে ঐ বস্তুর ভেদ বুঝা যায় কি? সুধী পাঠক বিচার করিবেন। পক্ষান্তরে, ভেদ যদি বস্তুর ধর্ম হয়, তবে প্রশ্ন এই যে, সেই ভেদ ধর্মী বস্তু হইতে ভিন্ন, না, অভিন্ন? যদি অভিন্ন বল, তবে ধর্মী বস্তুকে জানা মাত্রই তাহার ধর্ম ভেদকেও জানা যাইত, তাহা তো জানা যায় না। সুতরাং ভেদকে কোনমতেই ধর্মী হইতে অভিন্ন বলা যাইতে পারে না। ভেদকে ধর্মী হইতে ভিন্ন বলিলে ধর্মী হইতে ভিন্ন ঐ ভেদকে জানিবার জন্য অপর ভেদের জ্ঞান আবশ্যক হয়, সেই ভেদও ধর্ম, তাহারও ধর্মী বস্তু হইতে ভেদ আছে, ঐ ভেদকে জানিবার জন্যও অপর ভেদজ্ঞান আবশ্যক, এইরূপে অনবস্থাদোষ অপরিহার্য হয়। দৃক্ ও দৃশ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ যেমন বুঝিবার উপায় নাই, উহাদের পরস্পরের অভাবও সেইরূপ বোধগম্য নহে। অভাবজ্ঞান প্রতিযোগী জ্ঞানকে (যে বস্তুর অভাব বুঝা যায়, সেই বস্তুকে অভাবের প্রতিযোগী বলা হয়) অপেক্ষা করে। গরুকে না জানিলে গরুর অভাব বুঝিবে কিরূপে? জ্ঞানের অভাবে জ্ঞান হইবে প্রতিযোগী। প্রতিযোগী বিদ্যমান থাকিলে উহার অভাব থাকিতে পারে না। ঘট বিদ্যমান থাকিলে ঘটের অভাব থাকে কি? সুতরাং জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারিবে না। জ্ঞানের অভাবও জ্ঞানগম্য। অতএব জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে হইবে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ। স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানের স্বরূপের অজ্ঞান অসম্ভব কথা। জ্ঞানের

অভাব-বোধ অসম্ভব বলিয়া দৃক্ ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব-জ্ঞানও অসম্ভবই হইয়া দাঁড়াইবে। দৃক্ এবং দৃশ্য বস্তুর পরস্পর ভেদ বা অভাব ইহারাও দৃশ্যই বটে। দৃশ্য বলিয়া ইহারা কোন মতে দৃক্ বা জ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে না। জড় দৃশ্য বস্তু স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যের ধর্ম হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, ভেদ এবং পরস্পরের অভাব যদি দৃশ্য না হয়, তবে ঐ সকল পদার্থ তো দৃক্ বা জ্ঞান হইতে পারিবে না। দৃক্ ও দৃশ্য ব্যতীত অপর যখন কোন পদার্থ নাই, তখন ভেদ বা অভাবের অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ('দৃশ্যত্বে চ ভেদাভাবয়োর্ন দৃগ্‌ধর্মত্বম্, দৃশ্যান্তরবৎ। অদৃশ্যত্বেচ তয়োরসিদ্ধিঃ' (ইষ্টসিদ্ধি, ৪ পৃঃ)। তারপর, অভাব কাহাকে বলে? যাহা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধির যোগ্য, ঐরূপ বস্তুর অনুপলব্ধিকেই অভাব বলা হইয়া থাকে। স্বয়ংপ্রকাশ বা নিত্য দৃক্ বস্তুর অনুপলব্ধি বা অভাববোধ কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি নিত্যজ্ঞানের অভাব সম্ভবই হয়, তবে ঐ অভাবকে জানিবে কিরূপে? জ্ঞানের অভাবকেও জ্ঞানের সাহায্যেই জানিতে হইবে। জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানের অভাব থাকিতেই পারিবে না। ফলে, জ্ঞানের অভাববুদ্ধি মিথ্যা এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়িবে। জ্ঞানের অভাববোধ যেমন মিথ্যা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদবুদ্ধিও সেইরূপ মিথ্যা। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ মিথ্যা হইলে ইহাদের অভেদবোধই সত্য হউক। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং জ্ঞেয় বস্তুই জ্ঞানকে আকার দিয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট হইলেও ইহাদের অভেদ অসম্ভব। জ্ঞান ও বিষয়, চিৎ ও জড়, একটি আলোক, অপরটি অন্ধকার। স্বপ্রকাশ জ্ঞানের সহিত পরপ্রকাশ জড়ের অভেদ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই কল্পনা করিতে পারে না। চিৎ ও জড়, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন ভাবেই সকলের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ইহাদের স্বরূপও বিভিন্নই বটে; একটি অজ্ঞেয়, অপরটি জ্ঞেয়, একটি প্রকাশক, অপরটি প্রকাশ্য, একটি স্বপ্রকাশ, অপরটি পরপ্রকাশ। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ চিৎ ও জড়ের অভেদ কোন মতেই গ্রহণ-যোগ্য নহে। যদি বল যে, দৃক্ ও দৃশ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, দৃক্ ও দৃশ্য বস্তুরূপে বিভিন্ন হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্মরূপে তাহারা অভিন্নই বটে। দৃক্ও ব্রহ্ম, দৃশ্যও ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই ব্রহ্মবাসিত এবং একরূপ। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, দৃক্ এবং দৃশ্যের মধ্য দিয়া যখন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধই ফুটিয়া উঠিবে, তখন আর তাহা দৃক্ও নহে, দৃশ্যও নহে। কোনরূপ ভেদের কল্পনাই সেখানে উঠিবে না। বস্তুতত্ত্ব দৃক্ ও দৃশ্যরূপে ভিন্ন, ব্রহ্মরূপে অভিন্ন; এইরূপ দৃক্ ও দৃশ্যের ভেদাভেদ কল্পনাও যুক্তিসহ নহে। কেননা, এখানে প্রশ্ন এই যে, ঐ দুইটি রূপ (দৃক্ ও দৃশ্যরূপ) পরস্পর ভিন্ন, না অভিন্ন। ঐ রূপদ্বয় ভিন্ন হইলে দৃক্ এবং দৃশ্যও ভিন্নই হইয়া দাঁড়ায়। অভিন্ন হইলে দৃক্ এবং দৃশ্যের মধ্যেও ভেদ বুঝা যাইতে পারে না। অথচ এই ভেদ সকলেই প্রত্যক্ষ করে। তারপর, দৃক্ এবং দৃশ্য বস্তুর দৃক্‌রূপ এবং দৃশ্যরূপ ব্যতীত অপর কোন রূপ নাই। সুতরাং তাহাদের একরূপে অভেদ, অপররূপে ভেদ কল্পনা করাও চলে না। উহাদিগকে পরস্পর হয় ভিন্ন, নতুবা অভিন্নই বলিতে হয়। উহাদের পরস্পর ভেদ বা অভেদ কিছুই কল্পনা করা যায় না, ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। ফলে,

দৃশ্য বস্তু নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ দৃক্ বস্তু হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, ভিন্নাভিন্নও নহে। দৃশ্য বস্তু অনির্বচনীয় এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈতমতে দুই প্রকার দৃশ্য বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়—প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক। শুক্তিতে রজতের যে প্রত্যক্ষ হয় সেখানে রজত বস্তুতঃ নাই, রজতের ভাতি বা প্রতিভাসই মাত্র আছে। শুক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রাতিভাসিক রজত জ্ঞানের বাধ হয়, সুতরাং উহা মিথ্যা। যাহা বাধিত হয় তাহাই মিথ্যা। এই দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্য শুক্তিও মিথ্যা। কেননা, সকলই ব্রহ্মময় "সর্বং ব্রহ্মময়ম্" এইরূপে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের উদয় হইলে জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাও মিথ্যাই বটে। একমাত্র স্বয়ংজ্যোতি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য। তস্মাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ানুভববলাবষ্টম্ভাৎ যথোক্তং ব্রহ্মৈব বস্তু নান্যৎকিঞ্চিদিতি নিশ্চিনুমঃ। ইষ্টসিদ্ধি ৩২ পৃঃ।

ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই যদি অবস্তু এবং মিথ্যা হয়, তবে প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান এই সকল বিশ্বপ্রপঞ্চেরও কোনই অস্তিত্ব নাই, ইহাই মানিয়া নিতে হয়। জগৎপ্রপঞ্চ যদি নাই থাকে, তবে বিশ্বপ্রপঞ্চের যে প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষও তো মিথ্যা এবং অপ্রমাণই হইয়া দাঁড়াইবে। প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হইলে অন্য কোন প্রমাণই সেখানে বলবত্তর হইতে পারে না। কেন না অপরাপর সকল প্রমাণই প্রত্যক্ষমূলক। ফলে, প্রমাণ শাস্ত্র মিথ্যা এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে। প্রমাণমূলে দর্শনশাস্ত্রে প্রমেয়সিদ্ধি কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। এই আশঙ্কার উত্তরে বিমুক্তাত্মন্ বলেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়াময় এবং অনির্বচনীয়। প্রপঞ্চ অনির্বচনীয় ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুও নহে, অবস্তুও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে। প্রপঞ্চের বাস্তবতা স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ অসম্ভব হয়, আবার অবস্তু অসৎ হইলে উহা কোনমতেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না। আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকই হইয়া দাঁড়ায়। জগৎপ্রপঞ্চ মায়ার কার্য। মায়া অনির্বচনীয় সুতরাং মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চও অনির্বচনীয়।[১] মায়া বিশ্বপ্রপঞ্চ-চিত্রের উপাদান। জ্ঞানময় ব্রহ্ম বিশ্বচিত্রের ভিত্তি বা আশ্রয়, সাক্ষাৎ উপাদান নহে, বিবর্ত-কারণ। চিত্রাবলী ভিত্তির সহজাত নহে, উহা তাহার কোনরূপ গুণ, ধর্ম বা অবস্থান্তরও সূচনা করে না। কেবল কোনরূপ আশ্রয় ব্যতীত চিত্রাবলী থাকিতে পারে না, এইজন্য জগচ্চিত্রের ব্রহ্মভিত্তি আবশ্যক। চিত্রের আশ্রয় বা ভিত্তি কিন্তু চিত্রাবলী না থাকিলেও থাকিতে পারে। চিত্র মুছিয়া ফেলিলেও চিত্র-ভিত্তি চিত্রাবলীর উৎপত্তির পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিবে। চিত্রাবলী তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্তন আনয়ন করিবে না। ভিত্তি সর্বদাই অপরিবর্তনীয়।

জগৎ প্রপঞ্চের অনির্বচনীয়তা

ব্রহ্ম বিবর্ত জগৎ

১। মায়েতি সদসত্ত্বাভ্যামনির্বচনীয়া অবিদ্যা উচ্যতে। ইষ্টসিদ্ধি ৩৫ পৃঃ। মায়ায়াঃ সকার্যায়া অপি বস্তুত্বাবস্তুত্বাভ্যামনির্বচনীয়ত্বাৎ----প্রপঞ্চস্য বস্তুত্বাভাবান্নাদ্বৈতহানিঃ। অবস্তুত্বাভাবাচ্চ প্রত্যক্ষাদ্যপ্রামাণ্যাদ্যুক্তদোষাভাবাৎ ন যথোক্ত ব্রহ্মাসিদ্ধিঃ। ইষ্টসিদ্ধি ৩২-৩৩ পৃঃ।

ঐ অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মভিত্তির গাত্রে জগচ্চিত্রের বিচিত্র রঙ্গ চলিতেছে। জ্ঞানের নির্মল সলিলে আবিদ্যক জগচ্চিত্র ধুইয়া মুছিয়া ফেলিলে চিত্রভিত্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকিবে। মায়াও থাকিবে না, মায়ার খেলাও থাকিবে না। বহু চলিয়া গেলে একই বিরাজ করিবে। ইহাই মায়াচিত্রিত জগৎ ও তাহার অধিষ্ঠান চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সম্পর্ক বলিয়া জানিবে।[১]

এই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন। মণ্ডনমিশ্রের শব্দব্রহ্মবাদ বিমুক্তাত্মন্ তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থে নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন[২] ইষ্টসিদ্ধি ১৭১-১৭৫ পৃঃ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বহুরূপে, জীবও জগৎপ্রপঞ্চরূপে ভাতি অজ্ঞানের খেলা। নিখিল জড় বস্তুর উপাদান জড়াত্মিকা অবিদ্যা শক্তিই অজ্ঞান বলিয়া পরিচিত—ব্রহ্মাজ্ঞানমিতি সর্বজড়োপাদানভূতা জড়াত্মিকা অবিদ্যাশক্তিরুচ্যতে। ইষ্টসিদ্ধি ৬৯ পৃঃ। এই অজ্ঞান অনাদি এবং ভাবরূপ, জ্ঞানের অভাব নহে—অতো ন কশ্চিদভাবো'জ্ঞানম্। ইষ্টসিদ্ধি ৬৭ পৃঃ,

অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপ এবং সাক্ষি-ভাস্য

তথৈব জ্ঞানমপ্যজ্ঞানমস্বভাবমপি ভাবমাত্রেণৈব নিবর্তয়িতুমলমিত্যজ্ঞানং ন জ্ঞানাভাব ইতি সিদ্ধম্।[৩] ইষ্টসিদ্ধি ৬৯ পৃঃ, অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য সাক্ষীর আলোকেই আলোকিত। এইজন্য অজ্ঞানসিদ্ধির জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। অজ্ঞানের আশ্রয় কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিমুক্তাত্মন্ বলেন যে, ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত, অবিদ্যা-কল্পিত বস্তু অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না সুতরাং ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয় এবং বিষয়—

অতো'বিদ্যাকৃতং বন্ধং বিদ্যয়া হন্তুমিচ্ছতা।
এষ্টব্যা ব্রহ্মণো'বিদ্যা নতয়া কল্পিতস্য সা॥ ইষ্টসিদ্ধি ৩৩৯ পৃঃ।

অবিদ্যাই ব্রহ্মের আবরণ। এই আবরণের নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া অবিদ্যার অধিষ্ঠান ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান উদিত হইলেই জীব ব্রহ্ম-ভাবপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। বন্ধ মিথ্যা। এই মিথ্যা অবিদ্যা-বন্ধনের নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যা অজ্ঞান-বন্ধনের নিবৃত্তির অন্য কোন সাধন নাই। জ্ঞানই অজ্ঞান-উচ্ছেদের একমাত্র সাধন। কর্ম সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মুক্তির সাধন নহে, কর্ম চিত্তের শুচিতা সম্পাদন করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির সহায়তা করে বলিয়া মুক্তির তাহা গৌণ সাধন। নহি জ্ঞানাদন্যো

১। যথা চিত্রস্য ভিত্তিঃ সাক্ষান্নোপাদানম্, নাপি সহজং চিত্রং তস্যাঃ; নাপ্যবস্থান্তরং মৃদ ইব ঘটাদিঃ, নাপিগুণান্তরাগম আম্রস্যেব রক্তাদিঃ, ন চাস্যাশ্চিত্রজন্মাদৌ জন্মাদিঃ; চিত্রাৎ প্রাগর্দ্ধ্বঞ্চ ভাবাৎ; যদ্যপি ভিত্তিং বিনা চিত্রং ন ভাতি, তথাপি ন সা চিত্রং বিনা ন ভাতীত্যেবমাদি অনুভূতিভিত্তি-জগচ্চিত্রয়োর্যোজ্যম্। ইষ্টসিদ্ধি ৩৭ পৃঃ।

২। শব্দব্রহ্মবিবর্তত্বাদ্ বাচ্যবাচকয়োর্ভবেৎ।
শব্দত্বমিতিচেন্নৈবমশব্দং ব্রহ্ম হি শ্রুতম্॥ ইষ্টসিদ্ধি ১৭২ পৃঃ।

৩। ইষ্টসিদ্ধি ৬৫—৬৯ পৃঃ।

হেতুর্বন্ধনুদ্-যুজ্যতে অজ্ঞানজত্বাদ্ বন্ধস্য। ইষ্টসিদ্ধি ১৪৭ পৃঃ, জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্ নত্বন্নীয়সো'পি বস্তুনঃ। সর্বকর্মণাঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থত্বেন জ্ঞানোৎপত্তাবেব শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ বিনিযুক্তত্বাৎ—ইষ্টসিদ্ধি, ১৪৮ পৃঃ। বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি তত্ত্বশাস্ত্র পাঠের ফলে কিংবা সদ্‌গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, অদ্বৈত বেদান্তের মতে যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রও তো এই মতে মিথ্যাই হইবে। মিথ্যা শাস্ত্র হইতে সত্য ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে কিরূপে? অবিদ্যার নিঃশেষে নিবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বিমুক্তাত্মন্ বলেন যে, শুষ্ক বংশদণ্ডের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সেই অগ্নি ক্রমে ক্রমে যেমন অগ্নির উৎপাদক বংশদণ্ডকেও নিঃশেষে দগ্ধ করে, সেইরূপ অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সাহায্যে অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে সেই সত্য, শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি সর্বপ্রকার অজ্ঞান এবং অজ্ঞানমূলক, দ্বৈতসাপেক্ষ অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রভৃতিকেও নিঃশেষে বিনাশ করিবে।[১]

অবিদ্যা নিবত্তি স্বরূপ

অবিদ্যার নিঃশেষে নিবৃত্তিই বেদান্তের লক্ষ্য। এখানে প্রশ্ন এই যে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি কিরূপ? ইহা কি সত্য, না, মিথ্যা; সৎ না, অসৎ; না সদসৎ; না অনির্বচনীয়; না, উল্লিখিত চার পক্ষ হইতেও অতিরিক্ত কিছু? অবিদ্যা-নিবৃত্তি যদি সত্য হয়, তবে ব্রহ্মও সত্য, অবিদ্যা-নিবৃত্তিও সত্য, এই দুইটি সত্য বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার করায় অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে। মণ্ডনমিশ্র তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে অদ্বৈতবাদ বলিতে ভাব পদার্থ একটি ব্যতীত দুইটি নাই, এইরূপে "ভাবাদ্বৈতবাদই" বুঝিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে সত্য বলিয়া মানিলেও কোন আপত্তি উঠে না। বিমুক্তাত্মন্ মণ্ডনের ভাবাদ্বৈতবাদ মানেন নাই, সুতরাং তাঁহার মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে সত্য বলিয়া মানিলে দ্বৈতবাদের আপত্তি অপরিহার্যই হয়। অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে যদি অসৎ বলা যায়, তবে সেখানেও জিজ্ঞাস্য এই যে, অসৎ বলিতে এখানে কি বুঝায়। অসৎশব্দে যদি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বা শূন্যকে বুঝায়, এবং অবিদ্যা-নিবৃত্তিও সেইরূপ অলীক হয়, তবে অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য কারণ অনুসন্ধানের কোন সার্থকতা থাকে না। কেননা, অলীক আকাশ-কুসুমের কারণ অনুসন্ধানের কোন প্রশ্ন উঠে কি? অসৎ শব্দে যদি (নৈয়ায়িক বা মীমাংসকগণের মতানুসারে) অভাবকে বুঝায় সেখানেও দ্রষ্টব্য এই যে, নৈয়ায়িকের মতে ভাবের সম্বন্ধ ব্যতীত অভাবের কল্পনাই করা যায় না। অদ্বৈত বেদান্তের মতে মুক্তিতে একমাত্র নির্গুণ, নির্লেপ, নির্বিশেষ, কূটস্থ ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকে। ঐরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ববিধ সম্বন্ধের অতীত; অসঙ্গ ব্রহ্মে কোনরূপ সম্বন্ধ কল্পনারই অবকাশ নাই; সুতরাং কোনরূপ ভাব সম্বন্ধ নাই বলিয়া ন্যায়-মতানুসারে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অভাবরূপ বলা যায় না। মীমাংসার মতে অভাব অধিকরণ

১। ইষ্টসিদ্ধি, ৬৯ পৃঃ।

স্বরূপ। অবিদ্যা-নিবৃত্তি এই মতে অবিদ্যার অধিষ্ঠান আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। পরব্রহ্ম নিত্য, অবিদ্যার নিবৃত্তিও সুতরাং নিত্য সৎস্বরূপ। অবিদ্যা আর সে অবস্থায় অবিদ্যা নহে। তখন অবিদ্যাও থাকিবে না। আবিদ্যক সংসারও থাকিবে না, মুক্তির প্রয়াসও থাকিবে না। এইরূপ নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ অবিদ্যা-নিবৃত্তির কারণ অনুসন্ধানও নিষ্প্রয়োজনই হইয়া দাঁড়াইবে। সৎ ও অসৎ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে সদসৎস্বরূপও বলা যায় না। যদি বল যে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনির্বচনীয়, সেখানে আপত্তি এই যে, অনির্বচনীয় অবিদ্যার নিবৃত্তি বা অভাব অনির্বচনীয় হইবে কিরূপে? ভাবের অভাব যেমন ভাব হইতে অতিরিক্ত, অভাবের অভাব যেমন অভাব হইতে অতিরিক্ত, অনির্বচনীয় অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ অনির্বচনীয় হইতে অতিরিক্তই বটে, অনির্বচনীয় স্বরূপ নহে। ফলে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, অনির্বাচ্যও নহে; উহা উল্লিখিত চার প্রকার কোটি বা পক্ষ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার কিছু বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ তৎকৃত ন্যায়মকরন্দে বিমুক্তাত্মনের মত অনুসরণ করিয়াই অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে পঞ্চম প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] বিমুক্তাত্মন্ তাঁহার ইষ্টসিদ্ধিতে প্রথম অধ্যায়ে ৮৩-৮৮ পৃঃ, অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে পঞ্চম প্রকার বলিয়া বিবৃত করিবার চেষ্টা করিলেও অষ্টম পরিচ্ছেদে অবিদ্যা-নিবৃত্তির যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বিমুক্তাত্মন্ অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অনির্বাচ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রথম ও অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনায় পরস্পর বিরোধ আসিয়া পড়ে না কি? এই আশঙ্কার উত্তরে ইষ্টসিদ্ধির টীকাকার জ্ঞানোত্তম মিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রথম পরিচ্ছেদে অজ্ঞান-নিবৃত্তি অনির্বাচ্য নহে বলিয়া যে বিবৃত করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, প্রদীপের আলোক গৃহমধ্যস্থ অন্ধকারকে নিবৃত্তি করিয়া উৎপন্ন হয়, এখানে অন্ধকারের নিবৃত্তি যেমন অন্ধকার-স্বরূপ নহে, জ্ঞানের আলোকও সেইরূপ অনির্বাচ্য অজ্ঞানান্ধকারকে নিবৃত্তি করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া অনির্বচনীয় অবিদ্যার নিবৃত্তিও অনির্বচনীয় অবিদ্যা জাতীয় নহে। অনির্বাচ্য শব্দে এখানে জ্ঞান-নিবর্ত্যকে অনির্বাচ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, নির্বচন অর্থাৎ স্বরূপ-নিরূপণের অযোগ্য এইরূপ অর্থে গ্রহণ করা হয় নাই। অষ্টম পরিচ্ছেদে নির্বচনের অযোগ্যকেই

১। সদসৎ সদসদনির্বচনীয়প্রকারেভ্যোঽন্যপ্রকারৈবাজ্ঞানস্য নিবৃত্তির্যুক্তা; ইষ্টসিদ্ধি ৮৫ পৃঃ।
তুলনা করুন—ন সন্নাসন্ন সদসন্নানির্বাচ্যোঽপি তৎক্ষয়ঃ।
যস্মাত্তস্মাত্ত্রপোহি বলিরিত্যাচার্য্যা ব্যচীচরন্॥ ন্যায়মকরন্দ ৩৫৫ পৃঃ।

নাগার্জুন প্রভৃতি মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে শূন্যের বর্ণনায় শূন্যকে সৎ, অসৎ, সদসৎ, এবং সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপে উক্ত চার প্রকার কোটি বা পক্ষ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে সকল অদ্বৈতবাদী আচার্য অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে উল্লিখিত চার প্রকার পক্ষ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চ প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা যে বৌদ্ধ চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে।

অনির্বাচ্য বলা হইয়াছে।[১] অবিদ্যাও যেরূপ নির্ব্বচন বা নিরূপণের অযোগ্য এবং অনির্বচনীয় অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ নির্বচনের অযোগ্য এবং অনির্বাচ্য। ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই আবিদ্যক এবং অনির্বচনীয়। এই দৃষ্টিতে অবিদ্যাকেও যেমন অনির্বচনীয় বলা যায়, অবিদ্যার নিবৃত্তিকেও সেইরূপ অনির্বাচ্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়।

বিমুক্তাত্মনের মতের আলোচনায় দেখা গেল যে, বিমুক্তাত্মন্ অভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ মানিতে প্রস্তুত নহেন। অভাব অধিকরণ-স্বরূপ এই মীমাংসক মত অনুসরণ করিয়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অবিদ্যার অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ, "নিবৃত্তিরাত্মামোহস্য" এইরূপ শঙ্কর-বেদান্তের সিদ্ধান্তেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার বা অনির্বাচ্য এই মণ্ডন মতেরও প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মণ্ডন-প্রস্থান ও শঙ্কর-প্রস্থান এই উভয় প্রস্থানের যুক্তির স্বাতন্ত্র্যই বিমুক্তাত্মনের চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অবিদ্যার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইলে জীব তাহার ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তির আনন্দ লাভ করে। এই মুক্তি দুই প্রকার, জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ মুক্তি। জীবিতকালে এই ভোগদেহ বিদ্যমান থাকিতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীব অবিদ্যার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। আচার্য শঙ্করের মতে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তের মধ্যে জ্ঞানের কোনও তারতম্য নাই। জীবন্মুক্তেরও বিদেহমুক্তের ন্যায় সর্বপ্রকার অবিদ্যা-বন্ধনই বিনষ্ট হয়, কেবল প্রারব্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না। এইজন্য ভোগের দ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত জীবন্মুক্তকে ভোগদেহে বিচরণ করিতে হয়। মণ্ডনের মতে এইরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ নহে, উন্নততরের সাধক পুরুষ। এইরূপ পুরুষের ভোগদেহ এবং দৈহিক ক্রিয়া বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহার কর্ম-বন্ধন এবং অবিদ্যার সংস্কার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়াছে, এমন বলা যায় না। তাঁহার হৃদয়াকাশে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ শশধর উদিত হইতে চলিয়াছে মাত্র। জ্ঞানশশীর কিরণসম্পাতে তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশের অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অবিদ্যাসংস্কার-চক্রের বেগ তখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই, মন্দীভূত হইয়াছে মাত্র। এই অবস্থায় উন্নত সাধক পুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলা হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তের অবিদ্যা-সংস্কার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় না বলিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ বলা চলে না। এ বিষয়ে মণ্ডনের মতই বিমুক্তাত্মন্ তাঁহার ইষ্টসিদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিমুক্তাত্মনের মতেও সঞ্চিত, প্রারব্ধ প্রভৃতি নিখিল কর্ম এবং কর্মময় সংসারের বীজ অজ্ঞানই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়। কেবল অবিদ্যা-সংস্কারের

মুক্তি জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি

১। প্রদীপপ্রকাশহেতুকতমোনিবৃত্তি র্যথা ন তমোহন্তরং তদ্বজ্‌জ্ঞানপ্রকাশহেতুকাজ্ঞাননিবৃত্তির্ন নিবর্ত্যসজাতীয়াজ্ঞানমিত্যর্থঃ। অত্রচ অজ্ঞাননিবৃত্তে স্তাদৃশ মেবানির্বাচ্যত্বং খণ্ড্যতে যাদৃশমজ্ঞানস্য-জ্ঞাননিবর্ত্যত্বেনানির্বাচ্যত্বম্, নতু সর্বথা বাস্তবরূপেণ নিরূপণাসহত্বম্। ইতরথা মিথ্যাত্বানুমানভঙ্গ-প্রসঙ্গাৎ। অষ্টমাধ্যায়ে চানির্বচনীয়ত্বাঙ্গীকারাচ্চ। জ্ঞানোত্তমের বিবরণ ৪৫২ পৃঃ।

লেশমাত্রই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বিদ্যমান থাকে এবং এইজন্যই তাঁহার ভোগ-শরীরের ক্রিয়া চলিতে দেখা যায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ-দেহের পতন হয় না। 'তস্যাদ বিদুষো'পি কঞ্চিৎ কালং শরীরস্থিতেরভ্যুপেয়ত্বাং তাবন্মাত্রহেতুরবিদ্যাশেষ-গন্ধো'ভ্যুপেয়ঃ।' ইষ্টসিদ্ধি ৭৬ পৃঃ। 'অতো বিদুষো'পি প্রারব্ধভোগশেষাভাস-মাত্রসম্পাদনপটীয়ো'জ্ঞানশেষাভ্যুপগমে ন কশ্চিদ্দোষ ইতি মম প্রতিভাসতে।' ইষ্ট-সিদ্ধি ৭৭ পৃঃ। বিদেহমুক্ত অবস্থায় সমস্ত অবিদ্যা-সংস্কার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের ভেদের আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং জীব নিজের শিবরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। ইহাই বেদান্তের চরম ও পরম পুরুষার্থ।[১]

১। ইষ্টসিদ্ধিতে বিভিন্ন খ্যাতিবাদ ও অনির্বাচ্য খ্যাতির স্বরূপ অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। খ্যাতিবাদ সম্পর্কে ইষ্টসিদ্ধির আলোচনা অতি বিস্তৃত এবং গভীর। ঐ আলোচনার স্বরূপ জানিবার জন্য আমরা জিজ্ঞাসু পাঠককে ইষ্টসিদ্ধি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্তের দশম ও একাদশ শতাব্দী

খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে অদ্বৈত-চিন্তা উচ্চগ্রামে আরোহণ করিলেও তাহার পর প্রায় দুই শতাব্দীকাল অদ্বৈতবেদান্তের ক্ষেত্রে কোন নূতন আলোকপাত হইতে দেখা যায় না। খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষ, কি একাদশ শতকের প্রথমভাগে গঙ্গাপুরী ভট্টারকাচার্য পদার্থতত্ত্ব-নির্ণয় নামে অদ্বৈতবেদান্তের একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। আচার্য আনন্দজ্ঞান ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পদার্থতত্ত্ব-নির্ণয়ে গঙ্গাপুরী মায়া এবং ব্রহ্ম এই উভয়কেই জগতের উপাদানকারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মায়া জড়জগতের পরিণামী উপাদান, ব্রহ্ম অপরিণামী বা বিবর্ত উপাদান। গঙ্গাপুরীর এই মত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে অপ্যয়-দীক্ষিত উল্লেখ করিয়াছেন—'ব্রহ্ম মায়াচেত্যুভয়মুপাদানম্, সত্ত্বজাড্যরূপোভয়ধর্মানুগত্যুপপত্তিশ্চ' (সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ৭২ পৃঃ)। গঙ্গাপুরীর উল্লিখিত মত আনন্দবোধ তাঁহার প্রমাণ-মালায় খণ্ডন করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয়[১] রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয়ে অদ্বৈতবেদান্তকে নাটকের রূপ দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতির প্রবোধচন্দ্রোদয়।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র শ্রীহর্ষের ন্যায় একাধারে অসামান্য কবি এবং দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক আদর্শ অদ্বৈতবাদী হন। প্রবোধ বা জ্ঞানই চন্দ্র। চন্দ্রের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বস্ত হয়। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণমিশ্র তাঁহার নাটকের ঐরূপ নাম করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয়ে মানুষের বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলিকে নট ও নটীরূপে চিত্রিত করিয়া ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য প্রভৃতিকে রক্ত মাংসের মানুষ সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। অজ্ঞান নাটকীয় চরিত্রের রাজা। পাপ, অধর্ম প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সহচর। অজ্ঞান কাশী রাজ্য অধিকার করিয়া তত্রত্য ধর্মপ্রাণ রাজা জ্ঞানকে নির্বাসিত করিল। কাশী অর্থাৎ জ্ঞানপুরী অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইল। পুণ্য পলায়ন করিল, পাপের শ্রীবৃদ্ধি হইল। এই দুঃসময়ে ভবিষ্যদ্বাণীতে জানা গেল যে,

---

১। শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়ের উপর রামদাস দীক্ষিতের প্রকাশ নামক টীকা ও নাণ্ডিল্য-গোপ প্রভুর চন্দ্রিকা নামে টীকা আছে।

পুনরায় জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, উপনিষদুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের সহিত জ্ঞানরাজের মিলন হইবে। তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অজ্ঞান পরাজিত ও বিনষ্ট হইল, পাপ বিধ্বস্ত হইল। জ্ঞানের নির্মল আলোকে নিখিল জীব, জগৎ উদ্‌ভাসিত হইল, ইহাই সংক্ষেপে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রতিপাদ্য। অদ্বৈতবেদান্তবাদ এইরূপে নাটকীয় চিত্রে চিত্রিত করা গ্রন্থকারের কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

১০ম ও ১১শ শতাব্দীর অদ্বৈতবেদান্তের দুরবস্থা ও অপরাপর দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা, ন্যায়-দীপাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং নৈয়ায়িকগণের সূক্ষ্ম বিচারশৈলী অনুসরণ করিয়া প্রতিপক্ষ মত-খণ্ডনে ও স্বীয় অদ্বৈত মত-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। ন্যায়মকরন্দে আনন্দবোধ অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের নিবন্ধ-কুসুমাকর হইতে নির্মল ভাব-কুসুম আহরণ করিয়া তিনি তাঁহার চিন্তার কুসুমদাম রচনা করিয়াছেন।[১] আনন্দবোধের উক্তি হইতে তাঁহার পূর্বেও যে বিবিধ অদ্বৈতবেদান্ত-নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থরাজির এখন আর বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে শ্রীহর্ষ তাঁহার প্রসিদ্ধ খণ্ডনগ্রন্থ "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য" রচনা করিয়া প্রতিপক্ষ-মত বিধ্বস্ত করেন। এই শতকেই প্রকটার্থবিবরণকারও প্রকটার্থবিবরণ নামে শারীরক মীমাংসাভাষ্যের বিবরণ-প্রস্থানানুযায়ী এক পূর্ণাঙ্গ টীকা রচনা করেন; অদ্বৈতানন্দ সম্পূর্ণ ব্রহ্মসূত্র-শঙ্কর ভাষ্যের উপর ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামে এক অতি অপূর্ব টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। সুতরাং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে অদ্বৈতবেদান্ত-তটিনীতে যে নবীন চিন্তার লহরী খেলিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের তুলনায় দশম ও একাদশ শতককে অদ্বৈত চিন্তাজগতের মরুময় প্রান্তর বলিয়াই মনে হয়। ঐ সময়ে অদ্বৈত-বেদান্তের ক্ষেত্র অনুর্বর হইলেও অপরাপর দর্শনের ক্ষেত্র যে বিবিধ চিন্তা-শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। ন্যায় এবং বৈশেষিকের আলোচনায় দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় দশম শতকে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরী নামে সূক্ষ্ম বিচারবহুল গভীর গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়মতের পুষ্টিসাধন করেন। উদয়নাচার্য (A.D. 944) আত্মতত্ত্ব-বিবেক, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি, প্রশস্তপাদ-কৃত বৈশেষিক ভাষ্যের টীকা কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায় ও বৈশেষিকের চিন্তায় যুগান্তর আনয়ন করেন।

১। নানানিবন্ধকুসুমপ্রভবাবদাত-
ন্যায়োপদেশ-মকরন্দকদম্ব এষঃ॥
—ন্যায়মকরন্দ, সমাপ্তি শ্লোক।

উদয়নের সূক্ষ্ম বিচারশৈলী সুধীমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ শতকেরই শেষভাগে শ্রীধরাচার্য (A.D. 991) প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের উপর ন্যায়-কন্দলী নামে অতি উপাদেয় টীকা রচনা করিয়া বৈশেষিক-মতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ন্যায় এবং বৈশেষিক আচার্যগণ দ্বৈতবাদী, জগৎ তাঁহাদের মতে মিথ্যা নহে, সত্য, সুতরাং অদ্বৈতবাদের সহিত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিরোধ চিরন্তন। অবশ্যই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অদ্বৈতবেদান্তবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীধরাচার্য অদ্বৈতবেদান্তের উপর অদ্বৈতসিদ্ধি নামে একখানা গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে কুলার্ক পণ্ডিত মহাবিদ্যা অনুমান প্রবর্তন করেন। মহাবিদ্যা অনুমানে মীমাংসোক্ত শব্দ-নিত্যতাবাদ খণ্ডন করিয়া নৈয়ায়িক-সম্মত শব্দের অনিত্যতা পক্ষ স্থাপন করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কুলার্ক পণ্ডিত তাঁহার দশশ্লোকী-মহাবিদ্যা-সূত্রে স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে ষোল প্রকার বিভিন্ন মহাবিদ্যা অনুমানের লক্ষণ, শৈলী এবং প্রয়োগবাক্য (syllogisms) প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] ঐ সকল বিভিন্ন মহাবিদ্যা অনুমান নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত কেবলান্বয়ী[২] অনুমানেরই আকার-ভেদ। গঙ্গেশ, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর, মথুরানাথ প্রভৃতির গ্রন্থে নব্য ন্যায়ের

১। If we examine the Daśaślokī Mahāvidyā sūtra, we find that it consists of only ten verses in Anushtubh Metre, the 9th verse being in Upajāti Metre. These ten verses lay down 16 rules for framing the various Mahāvidyā syllogisms, each rule being followed by an example of the syllogism framed under that rule. Introduction of Mahāvidyā Vidambana, P. VIII Gaekwad's Oriental Series.

২। কেবলান্বয়ী অনুমান কাহাকে বলে? যে অনুমানের সাধ্য এবং হেতু [Probandum and Proban] এই দুইটি এতই ব্যাপক যে, উহাদের অভাব কোথায়ও বুঝা যায় না, সর্বত্র কেবল অন্বয় বা অস্তিত্বই পাওয়া যায়। ঐরূপ অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। কেবলান্বয়ী অনুমানের কোন বিপক্ষ পাওয়া যায় না। [সাধ্যের অভাব যেখানে নিশ্চয় আছে, তাহাকে বিপক্ষ বলে। নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ, পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ, এই অনুমানে জলহ্রদকে বিপক্ষ বলা হয়। কেননা, জলহ্রদের মধ্যে বহ্নি নাই, উহার অভাবই নিশ্চিতভাবে আছে।] অসদ্ বিপক্ষং কেবলান্বয়ি। যেমন "ঘটো বাচ্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে বাচ্যত্ব সাধ্য, আর প্রমেয়ত্ব হেতু। এই হেতু এবং সাধ্য এই দুইটিই এত ব্যাপক যে, কোথায়ও ইহাদের অভাব বা ভেদ বুঝা যায় না। জগতের সমস্ত বস্তুই বাচ্যও বটে, প্রমেয়ও বটে, অবাচ্য এবং অপ্রমেয় বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং বাচ্যত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত্ব হেতুর অত্যন্তাভাব অপ্রসিদ্ধ। যে অনুমানের সাধ্যের অত্যন্তাভাব বা ভেদ অপ্রসিদ্ধ হয়, তাহাকেই কেবলান্বয়ী অনুমান বলে—'অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যকত্বম্ কেবলান্বয়িত্বম্'। সাধ্যের অত্যন্তাভাব অসম্ভব হইলে হেতুর অত্যন্তাভাবও অসম্ভবই হইবে। কেননা, যেখানে সাধ্য থাকিবে, সেখানে হেতুও অবশ্যই থাকিবে। নতুবা ঐরূপ হেতু হেতুই হইবে না। অনুমানের সাধ্যকে ব্যাপক এবং হেতুকে ব্যাপ্য বলে। ব্যাপকের সাধ্যের অভাব হইলে ব্যাপ্যের, হেতুর অভাবও নিশ্চিতই হইবে। কেবলান্বয়ী শব্দের অর্থ অনুমানের সাধ্যটি সর্বত্র কেবল অন্বিতই হয়, সাধ্যের ব্যতিরেক বা অভাব কোথায়ও থাকে না।

পূর্ণ বিকাশের যুগে যে-জাতীয় সূক্ষ্ম অনুমানের প্রয়োগ ও শৈলী দেখিতে পাওয়া যায়, কুলার্ক পণ্ডিতের মহাবিদ্যা বিচারের সূক্ষ্মতায় ও চিন্তার গভীরতায় কোন অংশেই তাহা হইতে ন্যূন নহে। সেই যুগে এইরূপ সূক্ষ্ম অনুমানের অবতারণা যে অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। কুলার্ক পণ্ডিতের এই বিভিন্ন মহাবিদ্যা অনুমানশৈলী যে নব্যন্যায়-গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায়, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির অনুমান-চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গঙ্গেশ, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি কোন নব্য-ন্যায়াচার্যই তাঁহাদের গ্রন্থে কুলার্ক পণ্ডিত বা তাঁহার মহা-বিদ্যা অনুমানের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ১২শ শতকে শ্রীহর্ষ তদীয় খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে (১১৮১ পৃঃ, কাশী সং) ভেদবাদ সম্পর্কে উদয়নাচার্যের মতের যে খণ্ডন-শৈলী প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রীহর্ষ কুলার্ক পণ্ডিতের মহাবিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন।[১] খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে (A.D. 1220) চিৎসুখাচার্য তাঁহার তত্ত্ব-প্রদীপিকায় (১৩, ১৮০ ও ৩০৪ পৃঃ) প্রত্যগ্রূপ ভগবান্ তৎকৃত (তত্ত্ব-প্রদীপিকার টীকা) নয়নপ্রসাদিনীতে, অমলানন্দ স্বামী তদীয় বেদান্ত-কল্পতরুতে, আনন্দজ্ঞান তৎকৃত তর্কসংগ্রহে, বেঙ্কটনাথ তাঁহার তত্ত্বমুক্তাকলাপ এবং ন্যায়পরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে মহাবিদ্যা অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] বৈদান্তিক আচার্যগণ মহাবিদ্যা অনুমান সমর্থন করেন নাই। মহাবিদ্যার খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা মহাবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে ভট্ট বাদীন্দ্র মহাদেব মহাবিদ্যা-বিড়ম্বন নামক গ্রন্থে বিভিন্ন মহাবিদ্যা অনুমানের অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রদর্শন করিয়া কুলার্ক পণ্ডিতের মহাবিদ্যা অনুমান খণ্ডন করেন এবং ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয়ভাবে অদ্বৈত মতের পুষ্টিসাধন করেন। ভট্ট বাদীন্দ্র চিৎসুখের পূর্ববর্তী। চিৎসুখ তাঁহার গ্রন্থে ভট্ট বাদীন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভট্ট বাদীন্দ্রের মহাবিদ্যা-বিড়ম্বনের উপর

১। গন্ধে গন্ধান্তরপ্রসক্তিকা ন চ যুক্তিরস্তি; তদস্তিত্বে বা কা নো হানিঃ তস্যা অপি অস্মাভিঃ খণ্ডনীয়ত্বাৎ।—খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ১১৮১ পৃঃ, কাশী সং।

২। অথবা অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটান্যত্বে সতি বেদ্যতানধিকরণান্যঃ পদার্থত্বাৎ পটবদিত্যাদি মহা-বিদ্যাপ্রয়োগৈরপ্যবেদ্যত্বপ্রসিদ্ধিরপ্যূহনীয়া। চিৎসুখ, ১৩ পৃঃ, কুলার্ক পণ্ডিতোন্নীতমনুমানমুদ্‌ভাবয়তি দূষয়িতুম্। নয়নপ্রসাদিনী, ৩০৪ পৃঃ। এবং সর্বা মহাবিদ্যা স্তচ্ছায়াবন্যে প্রয়োগাঃ খণ্ডনীয়া ইতি, কল্পতরু, ৩০৪ পৃঃ, বেনারস সং। তর্হি সর্বাস্বেব মহাবিদ্যাসু এবমাভাসসমানতা-সম্ভবাদুচ্ছিন্নসংকথাস্তাঃ স্যুঃ। আনন্দজ্ঞান-কৃত তর্কসংগ্রহ, ২৩ পৃঃ; বেঙ্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১২৫, ১৯৯, ২৭২, ২৭৫, ২৭৮ পৃঃ।

তত্ত্বমুক্তাকলাপ, ৪৭৮, ৪৮৬, ৪৮৯-৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। কুলার্ক পণ্ডিতের মহাবিদ্যা-অনুমানকে বেঙ্কট "বক্রানুমান" বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবিদ্যার উল্লেখ সম্পর্কে বিশেষ জানিবার জন্য অধ্যাপক তেলাঙ্গ (Mr. M. R. Telang) কর্তৃক গাইকোয়াড্ অরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত মহাবিদ্যা-বিড়ম্বনের ভূমিকা দেখুন।

ভুবনসুন্দর সূরির ব্যাখ্যানদীপিকা এবং আনন্দপূর্ণের মহাবিদ্যা-বিড়ম্বন-ব্যাখ্যান নামে টীকা আছে।

খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের চিন্তাধারা যেমন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ বেদান্তের ক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শৈববেদান্তবাদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদ প্রভৃতিরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম, একাদশ শতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য সিদ্ধিত্রয় (আত্মসিদ্ধি, ঈশ্বর-সিদ্ধি ও সংবিৎ-সিদ্ধি) গীতার্থসংগ্রহ, আগম-প্রামাণ্য, স্তোত্ররত্ন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। একাদশ শতকে আচার্য রামানুজ যামুনাচার্যের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া ব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদার্থ-সংগ্রহ, গীতা-ভাষ্য, উপনিষদের তাৎপর্য-নির্ণয়, গদ্যত্রয়, ভগবদারাধন-ক্রম প্রভৃতি প্রভূত গ্রন্থ রচনা করিয়া একদিকে যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তমতের পূর্ণ রূপের পরিচয় প্রদান করেন, অপর দিকে তেমন শঙ্করোক্ত অদ্বৈতবাদকে তর্কের শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করেন। রামানুজের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে "সপ্তধা অনুপপত্তি" বা সাতপ্রকার দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই যুগে শঙ্কর-মতের বিরুদ্ধে অপর কোন আচার্যই ঐরূপ তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন নাই। শঙ্কর-মত-খণ্ডনে এবং স্বপক্ষ-স্থাপনে রামানুজের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রামানুজের সমসাময়িককালে বা কিছু পূর্বে আচার্য শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার শৈবভাষ্য রচনা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র অপ্যয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠের শৈবভাষ্যের উপর শিবার্কমণি-দীপিকা নামে অতি অপূর্ব টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অপ্যয় দীক্ষিতের শিবার্কমণি-দীপিকা শ্রীকণ্ঠের শৈবভাষ্যের দুর্গম পথযাত্রীর অপরিহার্য পাথেয়। শৈব বেদান্তের মতে শিবই পরম ব্রহ্ম। শিবের উপাসনায়ই সংসার-স্তম্ভে বদ্ধ পশু জীব, সংসারপাশ-বিমুক্ত হইয়া শিব-সাজুয্য লাভ করে। শিবের অনুগ্রহেই জীব শিবভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকণ্ঠের মতে শিব নির্গুণ-নির্বিশেষ নহেন, সগুণ-সবিশেষ। শিব অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা, অসীম জ্ঞান ও আনন্দের আধার। কোনরূপ পাপ-কলঙ্ক-কালিমা তাঁহার নাই। "নিরস্তসমস্তোপপ্লবকলঙ্কনিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদিশক্তি-মহিমাতিশয়বত্ত্বম্ হি ব্রহ্মত্বম্"। এইরূপে শৈববেদান্তী শ্রীকণ্ঠ তাঁহার ভাষ্যে শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রূপায়িত করিয়াছেন। ঐ সময়েই শ্রীধরাচার্য শৈব লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া জানা যায়। শৈব প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের আচার্য অভিনব গুপ্ত খৃষ্টীয় দশম শতকেই তাঁহার শৈব প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বা স্পন্দবাদ প্রচার করেন।[১] স্পন্দ শব্দের অর্থ স্পন্দন বা

১। অভিনব গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞা মতের অতি প্রবীণ আচার্য। তিনি ব্রহ্মসূত্রের কোন ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন নাই। পরমার্থসার, বোধপঞ্চদশিকা, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক, প্রভৃতি বহু তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গীতার্থ-সংগ্রহ নামে গীতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

চলন। পরমাত্মা মহেশ্বর জ্ঞানময় হইলেও নিষ্ক্রিয় নহেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তির ন্যায় ক্রিয়াশক্তিও অপ্রতিহত। ঐ ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবেই স্বেচ্ছাবশে তিনি জগৎ নির্মাণ করেন। জীব বস্তুতঃ শিবস্বরূপ। অজ্ঞানবদ্ধ জীব মোহগ্রস্ত হইয়াই সংসারের আগুনে পুড়িয়া মরে। জ্ঞানদৃষ্টির উদয়ে "সেই ব্রহ্মই আমি," সেই "আনন্দ-ঘন মহেশ্বরই আমি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান উদিত হইলেই জীব মহেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়া মুক্তিলাভ করে। এই মতে মহেশ্বরে পরিস্পন্দ বা ক্রিয়াস্বীকার করায় মহেশ্বরকে নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় বা নির্গুণ তত্ত্ব বলা যায় না। জীব ও শিবের অভেদ স্বীকার করায় এই মত শৈব অদ্বৈতবাদ বলিয়া পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা সগুণ ব্রহ্মবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে বৈষ্ণব আচার্য নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের উপর বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ নামে এক ভাষ্য রচনা করিয়া তদীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য নিম্বার্ক মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের উপর বেদান্ত-কৌস্তুভ নামে ভাষ্য রচনা করিয়া নিম্বার্ক মতের বিস্তৃতি সাধন করেন। প্রায় ঐ সময়েই আচার্য যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া "সন্মাত্রব্রহ্মবাদ" প্রচার করেন। যাদবপ্রকাশের "সন্মাত্রব্রহ্মবাদ" অদ্বৈতবাদের কাছাকাছি হইলেও বস্তুতঃ ইহা অদ্বৈতবাদ নহে, ভেদাভেদবাদ। খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতকেই প্রবীণ মীমাংসকাচার্য পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার বিখ্যাত মীমাংসাগ্রন্থ শাস্ত্রদীপিকা প্রণয়ন করেন। এইরূপে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতকেই ন্যায়, বৈশেষিক, বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত, শৈবদর্শন, মীমাংসাদর্শন প্রভৃতি বিবিধ দর্শনের ক্ষেত্রেই নূতন নূতন চিন্তাফল-সম্ভারে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই সময়ে অদ্বৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে যে আক্রমণের ধারা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মতা এবং বৈষ্ণব বেদান্তী রামানুজাচার্য প্রভৃতির তীব্রতা লইয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ, ন্যায়মকরন্দ প্রভৃতিতে এবং অসামান্য তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত শ্রীহর্ষ তৎকৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য প্রভৃতিতে বিধ্বস্ত করেন, প্রকটার্থ-কার এবং অদ্বৈতানন্দ শঙ্করের ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন করেন। শ্রীহর্ষের আক্রমণ এতই তীব্র হইয়াছিল যে, ন্যায় ও বৈশেষিক মত তাঁহার আক্রমণ-বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং প্রতিপক্ষ-বিজয়ে অদ্বৈতবাদ পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা ক্রমে শ্রীহর্ষ, আনন্দবোধ প্রভৃতির দার্শনিক মতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বাদশ শতকের অদ্বৈত-বেদান্তের অভ্যুদয় ও খণ্ডন-মণ্ডন যুগের সূচনা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী

বেদান্ত-চিন্তায় শ্রীহর্ষের দান

একাধারে অসামান্য কবি ও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষ ভাগে (৯৮৪ খৃষ্টাব্দে) উদয়নাচার্য লক্ষণাবলী প্রভৃতি রচনা করিয়া ন্যায়মতের পুষ্টিসাধন করেন এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ অথবা ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে গঙ্গেশ উপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণি রচনা করিয়া নব্য-ন্যায়ের গোড়া-পত্তন করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তদীয় তত্ত্বচিন্তামণিতে শ্রীহর্ষের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন—"এতেন খণ্ডনকারমতমপাস্তম্"। শ্রীহর্ষ উদয়ন-কৃত লক্ষণাবলী হইতে লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা হইতে শ্রীহর্ষ যে উদয়নাচার্যের পর এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্বে খৃষ্টীয় একাদশ কি দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদের আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের সমাপ্তি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] জয়চাঁদ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যবনরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও পরাভূত হন। ইহা হইতে শ্রীহর্ষের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক বলিয়া নির্ণয় করা যায়। কবি শ্রীহর্ষ তৎকৃত নৈষধ-চরিতের প্রতি সর্গের সমাপ্তি শ্লোকে পিতামাতার এবং তাঁহার রচিত বিবিধ গ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐ পরিচয়ে মূলে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর পণ্ডিত এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। তিনি অর্ণব-বর্ণন, শিব-শক্তি-সিদ্ধি, নবসাহসাঙ্ক-চরিত, ছন্দঃ-প্রশস্তি, বিজয়-প্রশস্তি, গৌড়োর্বীশকুল-প্রশস্তি[২], ঈশ্বরাভিসন্ধি, স্থৈর্য-বিচারণ, নৈষধচরিত এবং খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা

১। তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ১৩৪২ পৃঃ।

২। মহাকবি শ্রীহর্ষ গৌড়োর্বীশকুল-প্রশস্তি নামে গৌড়াধীশের বংশ-প্রশস্তি রচনা করায় কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, এই প্রশস্তি গৌড়াধিপতি আদিশূরের বংশের যশোগাথার বর্ণনা এবং শ্রীহর্ষ গৌড়রাজ আদিশূরের আহ্বানে যজ্ঞকার্যের জন্য যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণগণ একাদশ শতকের প্রথমভাগে আনীত হন। শ্রীহর্ষ-আনীত ব্রাহ্মণগণের অন্যতম হইলে তাঁহার জীবৎকালও একাদশ শতকের প্রথম ভাগই হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাকে কনোজরাজ জয়-চাঁদের সমসাময়িক বলা যায় না। যাঁহারা শ্রীহর্ষকে কান্যকুব্জেশ্বরের সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে গৌড়োর্বীশকুল-প্রশস্তির গৌড়াধীশ্বর আদিশূর নহেন, জয়চাঁদের পিতা। জয়চাঁদের পিতার কার্যাবলী বর্ণনার জন্যই উক্ত প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল।

করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নৈষধচরিত এবং খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যই প্রধান। নৈষধচরিত শ্রীহর্ষের কবিপ্রতিভার অপূর্ব অবদান; খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য তাঁহার তর্কোজ্জ্বল দার্শনিক মনীষার বিজয়-প্রশস্তি। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য জগৎ-সত্যতাবাদী নৈয়ায়িকগণের মত-খণ্ডনোদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ইহাতে চারিটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নৈয়ায়িক-সম্মত বিভিন্ন প্রমাণ এবং হেত্বাভাস (false reasoning) প্রভৃতির খণ্ডন করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদটি অতিশয় বিস্তৃত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নিগ্রহস্থান প্রভৃতির লক্ষণের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্বনাম পদার্থের নির্বচন-প্রক্রিয়া খণ্ডিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ন্যায়োক্ত দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ভাব পদার্থ এবং অভাব পদার্থের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া সমস্ত বস্তুই যে অনির্বচনীয় এবং মায়াময় তাহা আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১] খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ। সমালোচকগণ পাঠ করিবামাত্রই যাহাতে গ্রন্থের রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারে, সেইজন্য গ্রন্থকার স্বেচ্ছাবশতঃই তাঁহার গ্রন্থকে স্থানে স্থানে জটিল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২] তর্ক-কঠোর এই দুর্বোধ গ্রন্থকে সহজবোধ্য করিবার জন্য পরবর্তীকালে অনেক টীকা রচিত হইয়াছে;[৩] তন্মধ্যে আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর-কৃত বিদ্যাসাগরী টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগরী টীকার অপর নাম খণ্ডন-ফক্কিকা-বিভজন। উক্ত টীকাসহ খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়

১। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য নামটির অর্থ কি? খণ্ডখাদ্য শব্দে খণ্ড শর্করার খাদ্য বা ভক্ষ্য বস্তুকে বুঝাইতে পারে। পদ্য... খণ্ডনরূপ খণ্ড শর্করার খাদ্য বা ভক্ষ্য, এই অর্থেও নামটির ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, খণ্ডখাদ্য ...বল ও পুষ্টির আধায়ক বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত কোন রসায়ন ঔষধকে বুঝায়, খণ্ডন বা বাদিমত-নিরাসক...র ঔষধ এইরূপ অর্থও অসমীচীন নহে। এই গ্রন্থের আরও অনেক প্রকার নাম শুনিতে পা...য়—যেমন (১) খণ্ডন-খণ্ডরখাদ্যম্, (২) খণ্ডনখণ্ডম্, (৩) খণ্ডনখাদ্যম, (৪) খাদ্য-খণ্ডনম্, (৫)...ম্। গ্রন্থখানির এইরূপ বিভিন্ন নাম শুনা গেলেও খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য এই নামই ইহার প্রকৃত না... অন্য সকল নাম এই নামেরই রূপান্তর।

...গ্রন্থিরিহ ক্বচিৎ ক্বচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্ খলঃ খেলতু।
শ্রদ্ধারাদ্ধগুরুঃ শ্লথীকৃতদৃঢ়গ্রন্থিঃ সমাসাদয়-
ত্বেতত্তর্করসোর্ম্মিমজ্জনসুখেষ্বাসঞ্জনং সজ্জনঃ ॥—খণ্ডন, সমাপ্তি শ্লোক, ১৩৪১ পৃঃ,।

৩। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের উপর নিম্নলিখিত টীকাগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।—(১) পরমানন্দ-বিরচিত খণ্ডনমণ্ডন, (২) ভবনাথ-কৃত খণ্ডনমণ্ডন, (৩) রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত খণ্ডন-দীধিতি, (৪) বর্ধমানোপাধ্যায়-কৃত খণ্ডন-প্রকাশ, (৫) বিদ্যাভরণ বিরচিত বিদ্যাভরণী টীকা, (৬) আনন্দ-পূর্ণের বিদ্যাসাগরী, (৭) পদ্মনাভ পণ্ডিত-রচিত খণ্ডন-টীকা, (৮) শঙ্করমিশ্র কৃত আনন্দবর্ধন, (৯) শুভঙ্কর-মিশ্রের শ্রীদর্পণ, (১০) চরিত্রসিংহ-কৃত খণ্ডন মহাতর্ক, (১১) প্রগল্ভমিশ্র বিরচিত খণ্ডনখণ্ডন, (১২) পদ্মনাভ-কৃত শিষ্য-হিতৈষিণী টীকা। নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের খণ্ডনকুঠার এবং বাচস্পতিমিশ্র-কৃত খণ্ডনোদ্ধার রচিত হয়। খণ্ডনোদ্ধার রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র (A.D. 1350) এবং ষড়্দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এক ব্যক্তি নহেন।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়ের সম্পাদনায় বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যকে "অনির্বচনীয়তাবাদ-সর্বস্ব" বলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের এইরূপ আখ্যা সঙ্গতই মনে হয়। কারণ, অনির্বচনীয়বাদ বা মায়াবাদের উপরই অদ্বৈতদর্শনের ভিত্তি এবং মায়াবাদই নৈয়ায়িক,. বৈশেষিক প্রভৃতি প্রতিপক্ষ-গণের আক্রমণের বিষয়। শ্রীহর্ষ সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া অনির্বাচ্যবাদ বা মায়াবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন। পরমত-খণ্ডনে এবং স্বীয় মত-স্থাপনে শ্রীহর্ষের শৈলী অপূর্ব। নৈয়ায়িক, বৈশেষিকগণ বস্তুর লক্ষণ এবং প্রমাণ নিরূপণ করিয়া ঐ লক্ষণ ও প্রমাণের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন ;—"লক্ষণ-প্রমাণভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ ; লক্ষণাধীনা লক্ষ্যব্যবস্থিতিঃ"। নৈয়ায়িকগণের লক্ষণ-নিরূপণ-নৈপুণ্য সর্বজন-বিদিত। শ্রীহর্ষ স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে উদয়ন প্রভৃতি আচার্যের উদ্‌ভাবিত লক্ষণেরও দোষ এবং অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষণে দোষ উদ্ভাবন করায় দুষ্ট বা অসম্পূর্ণ লক্ষণ-মূলে যে সকল লক্ষ্যবস্তু নির্ণীত হইবে, তাহাও দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণই হইবে, যথার্থ বলা চলিবে না, ইহাই শ্রীহর্ষের লক্ষণ সমালোচনার তাৎপর্য। শ্রীহর্ষের মতে পার্থিব, কি অপার্থিব কোন বস্তুরই নির্দোষ লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না ; এবং ঐ বস্তু আছে, কি নাই ; সত্য, কি অসত্য (সৎ কি অসৎ) কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। ফলে, বিশ্বপ্রপঞ্চ অনির্বাচ্যই হইয়া দাঁড়ায়। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণও বস্তুর স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া বস্তুর স্বভাব অবধারণ অসম্ভব, বস্তুসকল নিঃস্বভাব এবং নির্বাচনের অযোগ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ ॥

—লঙ্কাবতার সূত্র, ২।১৭৫ কাঃ,

বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন তৎকৃত মাধ্যমিক-কারিকায় ও বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রকীর্তি তদীয় মাধ্যমিক-বৃত্তিতে বস্তুর স্বভাব বিচার করিতে অগ্রসর হইয়া বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে—"সদসৎসদসচ্চেচ্চতি নোভয়ঞ্চেতি কথ্যতে" (মাধ্যমিক-বৃত্তি, ১৩২ পৃঃ)। এইরূপে সাংখ্য-সম্মত সৎকার্যবাদ ও নৈয়ায়িক-সম্মত অসৎকার্যবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া শূন্যতা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নাগার্জুন, চন্দ্রকীর্তি, আর্যদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্যগণের খণ্ডনশৈলীকেই শ্রীহর্ষ তৎকৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের খণ্ডনে বিজয়াস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূন্যবাদীর খণ্ডন-প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াই শ্রীহর্ষ ন্যায়োক্ত প্রমাণ, প্রমেয়াদি পদার্থের খণ্ডন করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা অঙ্গীকার করিয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ, চিন্ময় ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।[১] নাগার্জুন প্রভৃতির বিচারশৈলী শ্রীহর্ষের

১। শব্দার্থনির্বচনখণ্ডনয়ানয়ন্তঃ সর্বত্রনির্বচনভাবমখণ্ডগর্বান্।
ধীরা যথোক্তমপি কীরবদেতদুক্ত্বা লোকেষুদিগ্‌বিজয়কৌতুকমাতনুধ্বম্॥
—খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ৯ পৃঃ।

চিন্তাকে প্রভাবিত করিলেও শ্রীহর্ষের দার্শনিক সিদ্ধান্ত নাগার্জুন প্রভৃতির অনুরূপ হয় নাই। নাগার্জুন প্রভৃতির তূণীর হইতে শর গ্রহণ করিলেও শ্রীহর্ষ সত্যের অনুরোধে তাহা নাগার্জুনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত বস্তুর স্বভাব অনির্বচনীয় হইলে শূন্যবাদীর মহাশূন্যতাই আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন যে, মহাশূন্যতার আপত্তি আসিতে পারে না। কারণ, জাগতিক অনির্বচনীয় বস্তুর আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তু আছে। সেই সত্য বস্তু নিত্যসিদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ম্প্রকাশক এবং স্বতঃপ্রমাণ পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। অসত্য জগতের অন্তরালে স্বপ্রকাশ নিত্য চৈতন্য অবস্থিত না থাকিলে অসত্যের কোন মতেই প্রকাশ হইতে পারিত না। জগৎ কেবল অন্ধকারেরই খেলা হইত। জগতের প্রকাশের দ্বারায় জগদতীত জগদাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। বিষয় সকল জ্ঞানে কল্পিত হইয়া থাকে। যাহা কল্পিত তাহাই মিথ্যা; মিথ্যার অধিষ্ঠান জ্ঞানই একমাত্র সত্য। শ্রীহর্ষোক্ত তর্কের শাণিত কৃপাণ প্রধানতঃ ন্যায় এবং বৈশেষিক প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও তাঁহার সর্বতোমুখ যুক্তি-শরজাল মায়াবাদের সমস্ত প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মায়াবাদ বা অনির্বচনীয়তা-বাদের সকল প্রতিপক্ষই শ্রীহর্ষের আক্রমণের লক্ষ্য; সুতরাং তিনি এক দিকে যেমন ন্যায় ও বৈশেষিকের পদার্থ-গঠন-প্রণালী খণ্ডন করিয়াছেন, অপর দিকে তেমন রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আক্রমণ-প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া অদ্বৈত চিন্তায় এক নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। এই যুগকে অদ্বৈতবেদান্তের "খণ্ডন-মণ্ডন-যুগ" বলা যাইতে পারে। স্বীয় পক্ষ স্থাপনের জন্য পরমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা শাঙ্কর-ভাষ্য, ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বার্তিক, ভামতী প্রভৃতিতে স্পষ্টতঃ দেখা গেলেও নৈয়ায়িক পরিভাষা ও বস্তুবিচারের শৈলী অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষ-মত খণ্ডনের এবং অদ্বৈতমতের পুষ্টি-সাধনের যে ধারা শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই এই নব যুগ-পর্যায়ের জননী। পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে চিৎসুখাচার্য নব্যন্যায়-মত বিধ্বস্ত করিয়া এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈত-বেদান্তী ব্যাসরাজের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" এই অদ্বৈতবাদ প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রীহর্ষ প্রথমতঃ জগতের তথা জাগতিক বস্তুগুলির অনির্বচনীয়তা এবং মিথ্যাত্বই সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন্ প্রমাণমূলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্যগণ জগৎকে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করেন? যদি বল যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বলেই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতা নির্ধারণ করা যায়, তবে সেখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সব সময় সত্য হয় কি? সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষই যদি সত্য হয়, তবে স্বপ্নের প্রত্যক্ষকে সত্য বল না কেন? শুক্তিকে রজত বলিয়া লোকে যে (ভ্রম) প্রত্যক্ষ করে তাহাকেই বা সত্য বলিতে বাধা কি? কারণ, উহাও

শ্রীহর্ষের দার্শনিক মত

তো তোমাদের তথাকথিত সত্যবস্তুর প্রত্যক্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে যদি বল যে প্রত্যক্ষের বাধ হয় না, সেইরূপ অবাধিত প্রত্যক্ষ বলেই বস্তুর সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে। শুক্তি-রজতের প্রত্যক্ষ বাধিত হয় সুতরাং উহা মিথ্যা। ঐরূপ মিথ্যা প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর সত্যতা নির্ধারণ করা চলে না। ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীহর্ষ বলেন যে, অবাধিত প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? ঘটাদি সত্য বস্তুর বাধ হয় না, ইহাই বা তোমাকে কে বলিল? স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর যেমন জাগরিত অবস্থায় বাধ হইয়া থাকে সেইরূপ জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট সমস্ত বস্তুরও স্বপ্নে বাধ হইতে দেখা যায়। ফলে, জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলিও স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্ন ও জাগরিত কালে দৃষ্ট বস্তুর পরস্পর এইরূপ বাধ হওয়ায়, উহাদের কোন্‌টি সত্য, আর কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফলে, দৃশ্য বস্তুর অনির্বচনীয়তা এবং মিথ্যাত্বই আসিয়া পড়ে।[১] তারপর, নৈয়ায়িকগণের প্রমা এবং প্রমাণের লক্ষণগুলিও পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ নহে। ঐরূপ অসম্পূর্ণ এবং দোষ-কলুষিত লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য বস্তুর সত্যতা নির্ধারণ করা চলে না, প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়-নিরূপণ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ন্যায়োক্ত প্রমাণ-লক্ষণের অযৌক্তিকতা।

প্রমাণকে বুঝিতে হইলে প্রমার স্বভাব এবং প্রমার করণ বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের স্বরূপটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। এইজন্য সর্বাগ্রে প্রমার লক্ষণেরই যৌক্তিকতা বিচার করা যাইতেছে। কেহ কেহ "তত্ত্বানুভূতি" অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয়কেই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করেন। বস্তুর প্রকৃত পরিচয় অসম্ভব। কেননা, এই প্রসঙ্গে বিচার্য এই যে, লক্ষণস্থ "তত্ত্ব" শব্দের অর্থ কি?—"তস্য ভাবঃ" (তাহার ভাব) এই অর্থে তৎশব্দের পর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিয়া "তত্ত্ব" শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। "তৎ" শব্দে পূর্বে উল্লিখিত কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায়। আলোচিত স্থলে ঐরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ফলে, লক্ষণটি অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে যদি বল যে, "তত্ত্ব" শব্দটির অবয়বের অর্থ বিচার করিয়া অর্থ নিরূপণ করিতে গেলে ঐরূপ দোষ দাঁড়ায় বটে, সুতরাং অবয়বার্থ পরিত্যাগ করিয়া রূঢ়ার্থ গ্রহণ করা যাউক। তত্ত্ব শব্দে জ্ঞেয় বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপকে বুঝায়। জ্ঞেয় বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপের অনুভূতিই সত্য জ্ঞান বলিয়া জানিবে। এখানে শ্রীহর্ষ বলেন যে, ভ্রমজ্ঞান যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই নৈয়ায়িকগণ প্রমার লক্ষণে "তত্ত্ব" শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। তত্ত্ব শব্দটি বস্তুর স্বরূপের বোধক হইলে "ইদং রজতম্" এইরূপে শুক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয়, সেখানেও রজতের স্বরূপের প্রতীতি হইয়া থাকে সুতরাং ঐরূপ রজত প্রত্যক্ষকেই বা প্রমা বলিতে বাধা কি? ঐ রজত প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এখানে "ইদং" বস্তুটি ধর্ম্মী, রজত

১। প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য গৌড়পাদও এই দৃষ্টিতেই জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন, এই পুস্তকের ১২৯—১৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

(রজতত্ব) তাহার ধর্ম, সমবায় বা স্বরূপ সম্বন্ধে ধর্ম (রজত) ধর্মী ইদং বস্তুতে বিদ্যমান। ধর্মী, ধর্ম এবং সম্বন্ধ এই তিনটি পদার্থেরই, এখানে প্রতীতি হয়, এবং পদার্থত্রয় তাহাদের স্ব স্ব রূপকেই বুঝাইয়া থাকে ; সুতরাং তত্ত্বশব্দের স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে ভ্রান্ত রজত প্রত্যক্ষেও প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। যদি নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বস্তুর স্বরূপই তত্ত্ব নহে, যে বস্তু যেই দেশে এবং যেই কালে যেরূপে প্রতীতির বিষয় হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেইরূপে ঐ বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্বই বস্তুর "তত্ত্ব" বলিয়া জানিবে। ভ্রমস্থলে "ইদং" বস্তুতে রজতের প্রতীতি হইলেও রজতের ইদং বস্তুতে সত্তা নাই সুতরাং ঐ রজত প্রত্যক্ষ প্রমা বা যথার্থ নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এইরূপে দেশ, কাল, দেশ ও কালের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ, এবং সম্বন্ধী বস্তুর উপস্থিতিকে "তত্ত্ব" বলিয়া নির্বাচন করিলে দেশ এবং কাল সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকে আর প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। কেননা, দেশ ও কালের তো আর অপর কোনও দেশ বা কালের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করা চলে না। যদি বল যে, যে বস্তু যেইরূপে প্রতীতির বিষয় হয়, সেই বস্তু যদি বস্তুতঃ সেইরূপই হয়, তবে তাহাই বস্তুতত্ত্ব বলিয়া বুঝিবে। ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানই প্রমাজ্ঞান। পিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সমস্ত বস্তুই লাল দেখে, ইহা তাহার রোগের ধর্ম। কাঁচা মাটির ঘট যে পর্যন্ত কাঁচা থাকে সে পর্যন্ত ঐ ঘট কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, আগুনে পোড়াইলে উহা লাল হয়। পিত্তরোগী কাঁচা কালা ঘটকেও লালই দেখে। তোমার মতে তাহার এই দেখাটিকেও সত্য বা তত্ত্ব বলা যায়। কেননা, সে কাঁচা অবস্থায় ভুল দেখিলেও সে যেরূপ লাল দেখিয়াছিল বস্তুতঃ ঘট তো সেইরূপই বটে। এইজন্যই "তত্ত্ব" পদার্থের উক্তরূপ নির্বাচনও নির্দোষ নহে।[১] দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বানুভূতি অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয়কে প্রমা বলিলে মিথ্যা প্রমাণ মূলে উৎপন্ন জ্ঞান এবং কাকতালীয়, আকস্মিক জ্ঞানও স্থলবিশেষে প্রমা হইয়া দাঁড়ায়। পর্বতগাত্র হইতে উত্থিত ধূলিসমূহকে ধূম মনে করিয়া যদি কোন ভ্রান্তধী দর্শক পর্বতে বহ্নির অনুমান করেন এবং কাকতালীয় সংযোগে বস্তুতঃই যদি সেস্থলে পর্বতে বহ্নি পাওয়া যায়, তবে অসত্য উল্লিখিত হেতুমূলে উৎপন্ন ঐরূপ বহ্নির অনুমান জ্ঞানকেও তত্ত্বানুভূতি বা যথার্থানুভূতিই বলিতে হয়। আমার হাতের মুঠায় পাঁচটি কড়ি রাখিয়া পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি আমার হাতে কয়টি কড়ি? সেই ব্যক্তি মনের খেয়ালে বলিয়া বসিল পাঁচটি কড়ি। হাত খুলিয়া গণিয়া দেখা গেল কড়ি বাস্তবিক পাঁচটিই। এক্ষেত্রেও তত্ত্বানুভূতি বা যথার্থ বস্তু জ্ঞানেরই উদয় হইয়াছে সুতরাং ঐরূপ জ্ঞানও প্রমাই হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই উক্ত প্রমা লক্ষণটিকে যথার্থ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অসৎ প্রমাণমূলে উৎপন্ন উল্লিখিত জ্ঞান যে প্রমা নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রমার লক্ষণে "তত্ত্বানুভবকে" যদি বিশেষ করিয়া বলা যায় যে, যে সকল বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান সত্য বা যথার্থ প্রমাণ মূলে উৎপন্ন হইবে, তাহাই প্রমা হইবে, মিথ্যা কারণমূলে

১। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ২৩৯—২৪৭ পৃঃ, কাশী সং।

উৎপন্ন হইলে তাহা আর প্রমা হইবে না। (অব্যভিচারকারণজত্বে সতীতি বিশেষণীয়ম্, খণ্ডন, ৩৮৭ পৃঃ) এরূপক্ষেত্রে "তত্ত্ব" শব্দটির কোন তাৎপর্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেননা, যথার্থ কারণমূলে উৎপন্ন হইলে নৈয়ায়িকগণের মতে সেই অনুভব তত্ত্ব বা যথার্থই হইবে। লক্ষণস্থ তত্ত্ব শব্দটি সেই অবস্থায় অনর্থক হইয়া দাঁড়ায় নাকি? নৈয়ায়িকগণের "তত্ত্বানুভতিঃ প্রমা" এই লক্ষণটি যেমন অসম্পূর্ণ, সেইরূপ "যথার্থানুভবঃ প্রমা" এই লক্ষণটিও অসম্পূর্ণ। কারণ, এই লক্ষণের "যথার্থ" শব্দের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যথার্থ শব্দে বস্তু-তত্ত্বকে বুঝাইলে এই লক্ষণেও পূর্ব লক্ষণেরই দোষ সকল আসিয়া পৌঁছায়। অর্থের যাহা সদৃশ, তাহাই যথার্থ হইলে শুক্তিতে রজতের অনুভবকেও যথার্থানুভব বলা যায়। কেননা, সত্যশুক্তিও যেমন জ্ঞানের বিষয় হইয়া জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়, মিথ্যা রজতও সেইরূপই প্রতিভাত হয়। ঐরূপে মিথ্যা রজত এবং সত্য শুক্তির মধ্যে সাদৃশ্য বোধ অসম্ভব হয় না। আচার্য উদয়নের মতে বস্তুতত্ত্বের সম্যক্ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ যথার্থ পরিচয়কেই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এখন এই সম্যক্ পরিচ্ছেদ বলিতে কি বুঝিব? "সম্যক্" শব্দের অর্থ যদি তত্ত্ব বা যথার্থ হয়, তবে পূর্বে আলোচিত লক্ষণদ্বয়ে যে সকল দোষ দেখা গিয়াছে, এই লক্ষণেও সেই সকল দোষই আসিয়া পড়িবে। সম্যক্ শব্দের সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া বস্তুতত্ত্বের সর্ববিধ পরিচ্ছেদ বা অবধারণকেই যদি প্রমা বলা যায়, তবে অল্পজ্ঞ, অসর্বজ্ঞ জীবের বিষয়-দর্শন অপ্রমাই হইয়া পড়ে। কেননা, সর্বজ্ঞ ব্যতীত কেহই বস্তুর সম্যক্ বা সমস্ত পরিচয় জানিতে পারে না। যদি সম্যক্ পরিচ্ছেদ বলিতে বস্তুর নিখিল অবয়বের পরিচ্ছেদ বা পরিচয় বুঝায়, তবে যে সকল দ্রব্যের অবয়ব নাই, ঐ সকল নিরবয়ব দ্রব্যের পরিচ্ছেদ বা অবধারণকে আর প্রমা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদয়নাচার্যকৃত প্রমার নির্বচনও নির্দোষ নহে।[১]

তারপর, প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ—(প্রমায়াঃ করণম্ প্রমাণম্)। এখন এই "করণ" শব্দের অর্থ কি? করণ শব্দে সাধারণতঃ হেতু বা নিমিত্তকে বুঝায়।

প্রমাণের লক্ষণের অসারতা।

প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যেমন করণ বলা যায়, সেইরূপ দ্রষ্টা পুরুষকেও প্রমার করণ বা প্রমাণ বলা যায়। কেননা, দ্রষ্টা পুরুষ না থাকিলে প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইবে কাহার? দ্রষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতিও যে প্রমা জ্ঞানের নিমিত্ত হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যদি বল যে, কর্তা করণ নহে, কর্তার ব্যাপারের যাহা বিষয় হয়, তাহাই করণ—(কর্তৃব্যাপারবিষয়ঃ করণমিতি, খণ্ডন, ৪৬১ পৃঃ), কর্তা যখন কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষচ্ছেদন করে, তখন কুঠার যে উঠা-পড়া করে (উদ্যমন-নিপতনরূপঃ) তাহাই ব্যাপার, সেই ব্যাপার কুঠারে আছে বলিয়া কুঠারকে করণ বলা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে কুঠার যেমন করণ হইল, সেইরূপ কর্তা

১। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ৪১১—৪১৩ পৃষ্ঠা, কাশী সং।

যে কুঠার উঠাইবার এবং ফেলিবার জন্য শারীরিক প্রয়াস করিতেছেন তাহাও কর্তৃ-ব্যাপারই বটে। কর্তার শরীর সেই ব্যাপারের আশ্রয় এবং বিষয় হইয়াছে, ফলে, কর্তার শরীরও ছেদনের করণ হইয়া পড়ে। সুতরাং উল্লিখিত করণের লক্ষণকেও নির্দোষ বলা চলে না। তারপর, "যদ্‌বানেব করোতি তৎ করণম্।" "যদ্‌বানেব প্রমিমীতে তৎ প্রমাণম্" এইরূপ উদ্দ্যোতকরের করণ বা প্রমাণের লক্ষণও গ্রহণযোগ্য নহে। ঐ লক্ষণে আত্মায় সুখ-দুঃখের যে অনুভূতি হয়, সেখানে আত্মসংযুক্ত মনের ন্যায় মনের ব্যাপারও (function of mind) কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রমার করণ নিরূপণ অসম্ভব। ন্যায়ের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটিকে প্রমাণ বলা হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণেরও পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ লক্ষণ নির্বাচন করা দুরূহ। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের (দৃশ্যবস্তুর) সন্নিকর্ষ বা সংযোগবশতঃ জ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কে যে যথার্থ বা অব্যভিচারী জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখানে অব্যভিচারী বা যথার্থ কথাটির অর্থ কি? শুক্তি-রজতে যে রজতের ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা ব্যভিচারী বা অযথার্থ; তাহা যে প্রকৃত প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই লক্ষণে অব্যভিচারী পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের এইরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যার কোন মূল্য নাই। কেননা, শুক্তি-রজতে বস্তুতঃ রজত নাই সুতরাং সেখানে তো ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের (রজতের) সন্নিকর্ষ বা সংযোগই নাই। অব্যভিচারী পদটি না দিলেও সেইস্থলে ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের অন্যতম টীকাকার চিৎসুখাচার্য তাঁহার তত্ত্ব-প্রদীপিকায় ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, লক্ষণস্থ অব্যভিচারী পদটির কোন তাৎপর্যই বুঝা যায় না। প্রত্যক্ষের সামগ্রী বা উপাদান যদি নির্দোষ হয়, তবেই প্রত্যক্ষকে অব্যভিচারী বলিবে? না, প্রত্যক্ষ যদি অবাধিত হয় এবং প্রত্যক্ষে যে বস্তু দেখা যায়, সেই বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, ঐ প্রবৃত্তি যদি সফল হয়; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়া দ্রষ্টা যদি বিষয়টি সেখানে পান, তবেই প্রত্যক্ষকে অব্যভিচারী বলিবে? স্থূল বস্তু প্রত্যক্ষেরও এমন অনেক উপাদান আছে যাহা স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ঐ সকল অপ্রত্যক্ষ সামগ্রী বা উপাদান সদোষ, কি নির্দোষ, তাহা সূক্ষ্মদর্শী দর্শকও দেখিয়া বুঝিতে পারেন না। পরবর্তী কালে ঐ প্রত্যক্ষ বাধিত না হইলে প্রত্যক্ষের উপাদানের নির্দোষতা বুঝা যাইবে, এইরূপ কথারও কোন মূল্য নাই। কেননা, প্রত্যক্ষ যে বাধিত হইবে না, তাহাই বা বুঝিবার উপায় কি? সকল প্রকার প্রত্যক্ষকে পরীক্ষা করিয়া তাহা যে অবাধিত, ইহা বুঝা যায় না। দূর আকাশচারী গ্রহ-উপগ্রহের প্রত্যক্ষ কিংবা তারকারাজির প্রত্যক্ষ বাধিত, কি অবাধিত, সত্য, কি মিথ্যা, তাহা কিরূপে বুঝিবে? প্রত্যক্ষের উপাদান যেখানে নির্দোষ হইবে, সেখানেই তাহা অবাধিত বা সত্য হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে আলোচ্য স্থলে পরস্পরাশ্রয় দোষই আসিয়া পড়িবে। কারণ, প্রত্যক্ষের উপাদান নির্দোষ হইলে সেই প্রত্যক্ষই সত্য বা যথার্থ হইবে, আবার, প্রত্যক্ষ সত্য হইলেই উহার উপাদান যে নির্দোষ, তাহা প্রমাণিত হইবে। তারপর, এখন সাময়িকভাবে কোন

প্রত্যক্ষ অবাধিত হইলেও চিরকালই যে তাহা অবাধিত থাকিবে তাহারই বা নিশ্চয় কি? জগতের সকল পুরুষের সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ বাধিত, কি অবাধিত, তাহা সর্বজ্ঞ ব্যতীত কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। বস্তু গ্রহণের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তি যেখানে সফল হইবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তুটি যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানেই প্রত্যক্ষকে অবাধিত বা সত্য বলিয়া জানিবে, এইরূপ সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, কোনও মণির উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া ঐ আলোককে মণি মনে করিয়া উহার প্রতি ধাবিত হইলে সেখানেও মণি পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে মণির প্রভা যে মণি নহে, মণির প্রভাকে মণি মনে করা যে ভুল, তাহা সুধী দর্শক অস্বীকার করিতে পারেন কি?[১] ফলে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ লক্ষণের "অব্যভিচারী" কথাটির তাৎপর্য নির্ণয় করা দুরূহ। তারপর, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে যে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, সেখানে প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়ই জড়। জড়ের সহিত জড়ের সন্নিকর্ষ হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইবে কিরূপে? যদি বল যে, জড় বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সহিত যেরূপ সংযোগ আছে, চৈতন্যময় সর্বব্যাপী আত্মার সহিতও তাহার সেইরূপ সংযোগ আছে। ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া আত্মার নিকটই বিষয় প্রকাশিত হয়। আত্মাই জ্ঞাতা, আত্মার জ্ঞানোদয় হইতে কোন বাধা নাই। ঐরূপ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার সহিত বিষয়ের সংযোগের কথাটির লক্ষণে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায় লক্ষণটি অসম্পূর্ণই হইয়া দাঁড়াইবে। জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত যেমন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে, আত্মার সহিতও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে; প্রত্যক্ষে জ্ঞেয় বিষয়ের যেরূপ প্রতিভাস হয়, আত্মারও সেইরূপ প্রত্যেক প্রত্যক্ষেই প্রতিভাস বা প্রকাশ হওয়া উচিত। আত্মার প্রতিভাস না হইয়া বিষয়েরই বা কেন প্রতিভাস হইবে, তাহা উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ হইতে স্পষ্টতঃ কিছু বুঝা যায় না। "বস্তুর সাক্ষাৎকারই প্রত্যক্ষ" এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণও নির্দোষ নহে। কেননা, বস্তুর সাক্ষাৎকার অর্থ কি? বস্তুর অসাধারণ ধর্ম বা গুণের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ই বস্তুর সাক্ষাৎকার হইলে, অসাধারণ ধর্ম বা স্বভাবকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য ঐ ধর্মের বা গুণেরও পুনরায় ধর্ম এবং গুণ কল্পনা করা এবং ঐ কল্পিত গুণ বা ধর্মের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক হয়; এবং এইরূপে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। আচার্য শ্রীহর্ষ উল্লিখিতরূপে নৈয়ায়িক-সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষমূলে কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। অনুমান, উপমান প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রমাণই প্রত্যক্ষমূলক। প্রত্যক্ষই যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও অসম্পূর্ণই হইবে এবং প্রমাণমূলে প্রমেয় নির্ধারণ অসম্ভবই হইয়া পড়িবে। বস্তু সত্য, কি মিথ্যা, কিছুই নির্ণয় করা চলিবে

১। দৃশ্যতে হি মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধ্যা প্রবর্তমানস্য মণিপ্রাপ্তেঃ প্রবৃত্তিসামর্থ্যং ন চাব্যভিচারিত্বম্। চিৎসুখী, ২১৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

না। ফলে, সকল প্রমের বস্তু অনির্বাচ্যই হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাই নৈয়ায়িক-সম্মত লক্ষণগুলির অসারতা প্রদর্শন করিয়া শ্রীহর্ষ আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন ন্যায়-বৈশেষিকের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত প্রতিজ্ঞার অসারতা উপপাদন করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ জাগতিক বস্তুর অনির্বচনীয়তা বা মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ শ্রুতি ও যুক্তিমূলে তাঁহার গ্রন্থে উপপাদন করিয়াছেন। তাঁহার নিশিত-বুদ্ধি-ভেদ্য তর্কজাল কেবল পরমত খণ্ডন ও বাদি-বিজয়েই পর্যবসিত হয় নাই। স্বীয় অদ্বৈত পক্ষ স্থাপনেও তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার খণ্ডন প্রক্রিয়া অদ্বৈত ব্রহ্ম-মন্দিরে পৌঁছিবারই সোপানস্বরূপ। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন :—

অভীষ্টসিদ্ধাবপি খণ্ডনানামখণ্ডি রাজ্ঞামিব নৈবমাজ্ঞা।
তত্ত্বানি কস্মান্ন যথাভিলাষং সৈদ্ধান্তিকে'প্যধ্বনি যোজয়ধ্বম্ ॥

খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য ২২৮-২৯ পৃঃ; চৌখাম্বা সং

আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে[১] আনন্দবোধ দক্ষিণ দেশে খ্যাতিলাভ করেন এবং ন্যায়ের সূক্ষ্মতা লইয়া ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা এবং ন্যায়দীপাবলী রচনা করিয়া অদ্বৈত মতের অশেষ পুষ্টিসাধন করেন।[২] খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে শ্রীহর্ষ ন্যায় ও বৈশেষিকের লক্ষণও পদার্থ খণ্ডনের প্রতিই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীহর্ষ প্রধানতঃ ন্যায় এবং বৈশেষিকের খণ্ডনেই ব্যস্ত। আনন্দবোধ তদীয় ন্যায়মকরন্দে ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যায়, ন্যায়, মীমাংসা, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনের বিভিন্ন খ্যাতিবাদ বা ভ্রমবাদের যুক্তিজাল আলোচনা করিয়া ঐ সকল মতের অসারতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অনির্বাচ্য খ্যাতিবাদ সুদৃঢ় যুক্তির সহিত স্থাপন করিয়াছেন। অনির্বাচ্যবাদ এবং অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদই প্রধানতঃ প্রতিপক্ষগণের আক্রমণের বিষয় বলিয়া আনন্দবোধ অনির্বাচ্যবাদ স্থাপনে এবং ভেদবাদ খণ্ডনেই প্রগাঢ় যুক্তি-তর্কের উপন্যাস করিয়াছেন। খণ্ডন ও মণ্ডন এই দুই প্রকার চিন্তার ধারাই আনন্দবোধের গ্রন্থে তরঙ্গায়িত হইয়া সুধীগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দ্বৈতবেদান্ত-কেশরী ব্যাসতীর্থ তদীয় ন্যায়ামৃতে মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে

১। অধ্যাপক ত্রিপাঠি আনন্দজ্ঞান-কৃত তর্কসংগ্রহের মুখবন্ধে আনন্দবোধের জীবৎকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক (A.D. 1200) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

২। উল্লিখিত গ্রন্থ তিনখানির মধ্যে ন্যায়মকরন্দই আয়তনে নাতিবৃহৎ এবং প্রমেয়বহুল। অপর দুইখানি গ্রন্থই স্বল্পায়তন এবং উহাতে নূতন চিন্তার সমাবেশও বেশী নাই। ন্যায়মকরন্দের উপর আচার্য চিৎসুখ ও তাঁহার শিষ্য সুখপ্রকাশ ন্যায়মকরন্দ-টীকা ও ন্যায়মকরন্দ-বিবেচনী নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। সুখপ্রকাশ ন্যায়দীপাবলীর উপরও ন্যায়দীপাবলী-তাৎপর্য টীকা নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আনন্দজ্ঞানের গুরু অনুভূতি স্বরূপাচার্য আনন্দবোধের তিনখানি গ্রন্থেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্যকে অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া আনন্দবোধের যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই অদ্বৈত চিন্তায় আনন্দবোধের দান কত মহার্ঘ, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আনন্দ বোধের দার্শনিক মত—জীব ও জড়ভেদ নিরাস।

সাংখ্য দর্শনোক্ত জীবভেদ নিরাস করিতে গিয়া আনন্দবোধ বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ এবং এক। জীবভাব উপাধি-কল্পিত এবং মিথ্যা। একই চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হইয়া নানা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা প্রতিক্ষেত্রে উপহিত হইয়া নানা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। একই অনন্ত-বিসারী মহাকাশ কর্ণপুটে উপহিত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে যেমন শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভোগায়তন বিভিন্ন শরীরে একই ভূমা পরমাত্ম-চৈতন্য উপহিত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ণপুটে পরিচ্ছিন্ন গগন-প্রদেশেই যেমন শব্দ শ্রবণ সম্ভব হয়, অন্য প্রদেশে হয় না, সেইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা শরীরপ্রদেশেই সুখ-দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। ভোগায়তন ক্ষেত্র বিভিন্ন বলিয়া একের সুখভোগ অপরের হইবার প্রশ্ন উঠে না। জীব ভেদ স্বীকার করিবার অনুকূলে কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।[১] জীবভেদ নিরাস করিয়া আনন্দবোধ জড়ভেদ নিরাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন প্রকার ভেদই প্রত্যক্ষতঃ জানা যায় না। কারণ, ভেদ বুঝিতে হইলে যে বস্তুদ্বয়ের ভেদ জ্ঞান হইবে ঐ বস্তুদ্বয়ের স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পর পার্থক্য বোধ পূর্বে থাকা আবশ্যক হয়। বস্তুর স্বরূপবোধ ও পরস্পর পার্থক্য বোধ এক সময়ে উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। প্রথমতঃ বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়, পরে অপরাপর বস্তু হইতে তাহার ভেদ বুঝা যায়। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জ্ঞাতার নিকট দৃষ্ট বস্তুর স্বরূপটিই মাত্র প্রকাশ করে। বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফল। এই ফল উৎপাদন করিয়াই ক্ষণস্থায়ী প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পরক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ক্ষণস্থায়ী প্রত্যক্ষ অপর বস্তু হইতে ঐ বস্তুর ভেদ বুঝাইবে কিরূপে? ভেদ বুঝিতে হইলে যাহার ভেদ করা হয় এবং যাহা হইতে ভেদ করা হয়, ভেদের সেই প্রতিযোগী এবং অনুযোগীকে পূর্বে জানা আবশ্যক হয়। প্রতিযোগী ও অনুযোগীকে না জানিলে ভেদকে জানা সম্ভব হয় না। প্রতিযোগী ও অনুযোগীর জ্ঞান এককক্ষণে উৎপন্ন হয় না। এইজন্যই ক্ষণস্থায়ী প্রত্যক্ষদ্বারা ভেদের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না। যদি বল যে "ভেদ" বস্তুর স্বরূপই বটে, বস্তুর স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। লাল গোলাপ অর্থই এই যে, তাহা নীল বা শাদা নহে। ইহার উত্তরে আনন্দবোধ বলেন যে, ভেদ যদি বস্তুর স্বরূপই হয়, তবে বস্তু যেমন ভাব পদাথ, ভেদও সেইরূপ ভাব পদার্থই হইয়া দাঁড়ায়।

১। কর্ণশষ্কুলীমণ্ডলাবচ্ছিন্নস্য নভসস্তত্র তত্র শ্রোত্রভাববৎ তত্তদ্ভোগায়তনাদ্যবচ্ছেদলব্ধজীবভাবভেদস্য তত্র তত্র ভোগোপপত্তৌ কিমনেকাত্মককল্পনাদর্ব্যসনেন? ন্যায়মকরন্দ, ২৭ পৃষ্ঠা।

ভেদ আর সে ক্ষেত্রে ভেদ বা অভাবরূপ থাকে না, ভাবরূপই হইয়া পড়ে। বস্তুর ন্যায় ভাবরূপে তাহার ব্যবহারও চলিতে পারে। ভেদ বা অভাব কি কখনও ভাবরূপ হয়? দ্বিতীয়তঃ ভেদ যদি ভাবরূপ হয়, তবে ভাব বস্তুর স্বরূপবোধে যেমন ভেদের অপেক্ষা আছে, সেইরূপ ভাবরূপ ভেদের স্বরূপজ্ঞানেও অপর ভেদের অপেক্ষা অপরিহার্য হয়। ফলে অনবস্থা দোষই আসিয়া পড়ে—তদ্ভেদস্য ভেদান্তরভেদ্যত্বেন অনবস্থাপাতাৎ। ন্যায়মকরন্দ ৪৬ পৃঃ। অতএব ভেদ কোনমতেই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। ভেদ মিথ্যা, অবাধিত সর্বানুস্যূত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, ইহাই অদ্বৈতবাদের রহস্য। আনন্দবোধ

আনন্দবোধের মতে জগতের মিথ্যাত্ব

ন্যায়মকরন্দে মিথ্যাত্বের একটি নূতন সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সদ্ভিন্নত্বম্ মিথ্যাত্বম্।" জড় দৃশ্যপ্রপঞ্চমাত্রই সদ্ ভিন্ন এবং মিথ্যা। আনন্দবোধ তদীয় ন্যায়দীপাবলীতে দৃশ্যত্বকেই মিথ্যাত্বের সাধক হেতু বলিয়া উপন্যাস করিয়াছেন—"বিবাদপদং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ"।[১] দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সৎও নহে, অসৎ আকাশকুসুমও নহে। এইজন্য ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হইয়া থাকে। অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাই অনির্বচনীয় প্রপঞ্চ সৃষ্টির মূল। এই অবিদ্যা ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে। ইহা ভাবাভাব বিলক্ষণ বা সদসদ্বিলক্ষণ অতএব অনির্বচনীয়। অবিদ্যার অনির্বচনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য আনন্দবোধ অপূর্ব যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন। আনন্দবোধের মতে ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয়। "তস্মাদনাদিনিধনং ব্রহ্মতত্ত্বমেব অবিদ্যাশ্রয়" ইতি, ন্যায়মকরন্দ ৩২ পৃঃ। জীব অবিদ্যার আশ্রয় নহে। মণ্ডনমিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের জীবাশ্রয়ত্ব-সিদ্ধান্ত আনন্দবোধ নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানময় ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইবেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দবোধ বলেন যে, অবিদ্যা যদি প্রকাশের অভাব হইত, তবেই প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মে প্রকাশাভাব অবিদ্যা থাকিতে পারিত না, অবিদ্যার ব্রহ্মাশ্রয়ত্ব উপপাদন অসঙ্গত হইত। অবিদ্যা আমাদের মতে অভাবরূপ নহে, ইহা ভাবাভাব-বিলক্ষণ ও অনির্বচনীয়। এই অনির্বাচ্য অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের স্বতঃ কোন বিরোধ নাই, সুতরাং ব্রহ্মের অবিদ্যার আশ্রয় হইতে বাধা কি?[২]

১। পঞ্চপাদিকার মতে সদসদ্বিলক্ষণত্বম্ মিথ্যাত্বম্, ইহাই মিথ্যাত্বের লক্ষণ। বিবরণকার প্রকাশাত্ম যতি তৎকৃত বিবরণে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্, এবং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক নিষেধ-প্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্, এই দুইটি মিথ্যাত্বের লক্ষণ যোজনা করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য-স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণএব প্রতীয়মানত্বম্ মিথ্যাত্বম্, এইরূপে চতুর্থ মিথ্যাত্ব লক্ষণ নির্বচন করিয়াছেন। আনন্দবোধ "সদ্ভিন্নত্বম্ মিথ্যাত্বম্" এই পঞ্চম মিথ্যাত্ব লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই পাঁচটি মিথ্যাত্ব লক্ষণের যৌক্তিকতাই মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন।

২। নহি বয়ং প্রকাশাভাবমবিদ্যামাচক্ষ্মহে যেন সা প্রকাশাত্মনি ব্রহ্মণি ন ভবেদিতি; উক্তং হি ন ভাবো নাপ্যভাবঃ কিন্তু অনির্বাচ্যোবাবিদ্যা, ন্যায়মকরন্দ, ৩১৮ পৃঃ।

অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি এবং নিত্য আনন্দময় ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি। ব্রহ্ম আত্মরূপে বা অহংরূপে সর্বদা প্রাপ্ত হইলেও আত্মার যথার্থ স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ প্রাপ্ত আত্মায়ও অপ্রাপ্তির ভ্রম হইয়া থাকে। অবিদ্যার আবরণ তিরোহিত হইলে ব্রহ্মাত্মভাবের স্ফুরণ হয়। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে অবিদ্যারূপ আবরণের নিবৃত্তি ব্যতীত অপর কিছু করণীয় নাই। অবিদ্যা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার উদয়েই তিরোহিত হয়, অপর কোন কারণে হয় না। এইজন্য জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎসাধন। কর্ম সাক্ষাৎসাধন নহে, গৌণসাধন, "আরাদুপকারক"। তস্মাজ্‌জ্ঞানমেবৈকং মোক্ষসাধনং ন পুনঃ কর্মলেশোঽপীতি সিদ্ধম্। ন্যায় মঃ, ৩৫২ পৃঃ। মুক্তির স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে আনন্দবোধ সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনের মুক্তিবাদ খণ্ডন করিয়া, অবিদ্যা-নিবৃত্তি এবং নিত্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মুক্তি, এই স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অবিদ্যা-নিবৃত্তি আনন্দবোধের মতে ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপই নহে, ইহা হইতে অতিরিক্ত। আনন্দবোধ অবিদ্যা-নিবৃত্তি পরমাত্ম-স্বরূপ, এই সুরেশ্বরের মত ন্যায়মকরন্দ গ্রহণ করেন নাই, কটাক্ষই করিয়াছেন—

মুক্তির স্বরূপ

অবিদ্যা নিবৃত্তির স্বরূপ।

—অত্র কেচিৎ পরিহারালোচনকাতরান্তঃকরণাঃ পরমাত্মৈবাবিদ্যানিবৃত্তিরিত্যাহুঃ। ন্যায়মকরন্দ ৩৫৬ পৃঃ। ব্রহ্মসিদ্ধিতে ভাবাদ্বৈতবাদী মণ্ডনমিশ্র অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে যে আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আনন্দবোধ সেই মণ্ডনের মতই অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছেন। অবিদ্যা নিবৃত্তি, আনন্দবোধের মতে সৎ নহে। অবিদ্যা নিবৃত্তি সত্য হইলে অদ্বৈত বা আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে; অবিদ্যা-নিবৃত্তি অসৎও নহে, অসৎ হইলে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে জ্ঞানসাধ্য বলা যায় না; কারণ, অসৎ আকাশকুসুম তো জ্ঞানসাধ্য নহে। সদসদ্‌বস্তু পরস্পরবিরোধী বলিয়া ইহাকে সদসৎস্বরূপও বলা যায় না। অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনির্বাচ্যও নহে। ন সন্নাসন্ন সদসন্নানির্বাচ্যোঽপি তৎক্ষয়ঃ। ন্যায়মকরন্দ, ৩৫৫ পৃঃ। কারণ, অজ্ঞানই অনির্বাচ্যের উপাদান। মুক্তিতে অনির্বাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তি আছে বলিয়া তখন ঐ অনির্বাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অস্তিত্বও অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। মুক্তিতে পূর্ণ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়েও (অনির্বাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপাদান) অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে ঐ অজ্ঞানকে বিনাশ করিবে কে? মুক্তি অবস্থায়ও ঐ অজ্ঞান থাকিয়াই যাইবে। ফলে "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ ভবেদ্ বিদ্যৈকহেতুকঃ" এই মুক্তি অসম্ভব হইবে। অবিদ্যা-নিবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আনন্দবোধ অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে উক্ত চার প্রকার কোটি বা পক্ষ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চম প্রকারের স্বরূপ কি, তাহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার দর্শনের ন্যূনতাই সূচনা করে। চিৎসুখাচার্য অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অনির্বাচ্য বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন, পঞ্চম প্রকার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। চিৎসুখী ৩৮১ পৃঃ। অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনির্বাচ্য হইলে মুক্তিতে অনির্বাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তির

উপাদান অজ্ঞানের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়, চিৎসুখের মতে এই যুক্তির কোনও মূল্য নাই। অদ্বৈতবেদান্তের মতে অবিদ্যাও অনির্বাচ্য, অবিদ্যার নিবৃত্তিও অনির্বাচ্য। জ্ঞানের উদয় হইলে অনির্বাচ্য অবিদ্যা এবং অবিদ্যার সর্ববিধ বিলাসের নিবৃত্তি হয়। অতএব মুক্তিতে অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠে না। আচার্য চিৎসুখের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। সংসারের অনন্ত দুঃখই ভূমা আনন্দের আবরক। দুঃখের হেতু অনাদি অবিদ্যা। অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে নিত্য সুখাভিব্যক্তির প্রতিবন্ধক সংসার-দুঃখের নিবৃত্তি হয় এবং অনাবিল ভূমা আনন্দের স্ফুরণ হয়। এই আনন্দই স্বতঃ পুরুষার্থ। অবিদ্যা-নিবৃত্তিও আত্মস্বরূপই বটে, তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে—'তস্মাদুপলক্ষিতাত্মবিজ্ঞানস্য জ্ঞাত আত্মৈব সবিলাসাজ্ঞান-নিবৃত্তিরিতি স্থিতম্।' চিৎসুখী ২৮৩ পৃঃ।

অবিদ্যার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইলে বিজ্ঞানময়, স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা বা ব্রহ্মই অবস্থিত থাকে। উহাই তত্ত্ব, তদ্ব্যতীত অপর সকলই অতত্ত্ব এবং মিথ্যা। আত্মা যে স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ তাহা আনন্দবোধ অতি সুন্দরভাবে তাঁহার গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞেয় জড়বস্তু আত্মার আলোকে আলোকিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানময় আত্মা তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না। এইজন্য আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে। আত্মা অনুভূতিস্বরূপ, উহা কখনও অনুভাব্য বা জ্ঞেয় হয় না, প্রকাশস্বরূপ আত্মা প্রকাশ্য নহে। যাহা প্রকাশ্য তাহাই জড়। আত্মা যদি প্রকাশ্য হইত তবে তাহাও জড় এবং অনাত্মাই হইত। জ্ঞান যে জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে তাহাদ্বারাই তাহার সংবিদ্রূপতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। বিষয় জড়। জড় জড়কে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং জড়ের যাহা প্রকাশক তাহা কোন মতেই জড় হইতে পারিবে না, উহা অজড়, চৈতন্যস্বরূপই হইবে। এই চৈতন্য স্বভাবতঃ ভূমা এবং অখণ্ড। জড় বিষয়সকল সসীম ও সখণ্ড। অখণ্ড জ্ঞান যখন সখণ্ড বিষয়ের আবরণে আবৃত হইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তখনই তাহাকে আমরা "জ্ঞান" সংজ্ঞায় অভিহিত করি। বিষয়বস্তু পরিবর্তনীয়, জ্ঞান অপরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল বিষয় যখন তিরোহিত হয়, তখন এক অদ্বিতীয়, নিরুপাধি, অখণ্ড চৈতন্যই বিরাজ করে। তাহাই বেদান্ত-বেদ্য, আনন্দঘন, পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা।[১]

প্রকটার্থ-বিবরণের দার্শনিক মত

প্রকটার্থ-বিবরণকার সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে প্রকটার্থ-বিবরণ নামে সম্পূর্ণ শাঙ্কর ভাষ্যের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। প্রকটার্থ-বিবরণের রচনাভঙ্গি সরস ও

১। ন্যায়মকরন্দ, ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা।
তুলনা করুন—পঞ্চপাদিকা, ১৯ পৃঃ
তস্মাচ্চিৎস্বভাব আত্মা তেন তেন প্রমেয়ভেদেন উপধীয়মানো'নু-
ভবাভিধানীয়কং লভতে, অবিবক্ষিতোপাধিরাত্মাদিশব্দৈঃ।

সহজবোধ্য। এইজন্য এই গ্রন্থকে প্রকটার্থ-বিবরণ বলা হইয়া থাকে। প্রকটার্থ-বিবরণের রচয়িতার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি প্রকটার্থকার বলিয়াই সুধী সমাজে পরিচিত। প্রকটার্থকার তদীয় বিবরণে আচার্য উদয়নের নামোল্লেখ করিয়াছেন। (ব্রঃ সূঃ ১।১।২ প্রকটার্থ বিবরণ দ্রষ্টব্য) আনন্দগিরি তৎকৃত শাঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বহু স্থলে প্রকটার্থ-বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] উদয়নাচার্য খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন। আনন্দগিরি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বর্তমান ছিলেন। ইহা হইতে প্রকটার্থকারের আবির্ভাবকাল একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। প্রকটার্থ-বিবরণের রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক বলিয়া অনেক মনীষী মনে করেন।

প্রকটার্থ-বিবরণের দার্শনিক মত অনেকাংশে পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির অনুরূপ। স্থলবিশেষে প্রকটার্থকার স্বাধীন চিন্তারও পরিচয় দিয়াছেন। পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্ম-যতির মতে মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন। প্রকটার্থকারের মতে মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। চৈতন্যাশ্রিত জগজ্জননী প্রকৃতিই মায়া, ঐ মায়ায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। 'ভূতপ্রকৃতিশ্চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী মায়া তস্যাং চিৎ-প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ' প্রকটার্থ-বিবরণ ১।১।১। এই মায়ার পরিচ্ছন্ন রূপই অনির্বাচ্য অজ্ঞান বলিয়া পরিচিত। ঐ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। জৈব অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন। সকল জীবই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্যেরই সখণ্ড অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি ঔপাধিক সুতরাং মিথ্যা, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যই সত্য। বিশ্বযোনি মায়া অনাদি ও অখণ্ড। ঐ অখণ্ড মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি। সখণ্ড অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি। পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির মতে ঈশ্বর বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব। প্রকটার্থকারের মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব। অবিদ্যা প্রকটার্থকারের মতে অভাব পদার্থ নহে, ভাব পদার্থ। অবিদ্যাই জগদ্‌ভ্রমের উপাদান। অভাব কাহারও উপাদান হয় না, সুতরাং জগদুপাদান অবিদ্যাকে ভাবরূপেই বুঝিতে হইবে। 'অজ্ঞানং নাভাবঃ উপাদানত্বাৎ,' ব্রঃ সূঃ ১।১।১। দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যা ব্রহ্মের তিরস্করণী। জাগতিক বস্তুর আবরক অন্ধকার যেমন অভাব পদার্থ নহে, ভাব পদার্থ, সেইরূপ ব্রহ্মের আবরণ অজ্ঞানও ভাব পদার্থ। এই ভাবরূপ অবিদ্যা ভাববস্তুর ন্যায় প্রতীতির বিষয় হয়, অথচ পরিণামে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হয় সুতরাং ইহাকে পরমার্থ ভাববস্তুও বলা যায় না, অসদ্‌বস্তুও বলা যায় না। ইহাকে অনির্বচনীয় বলিয়াই জানিবে।[২] আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মা ব্যতীত সমস্তই পরপ্রকাশ। আত্মাই আলোক, আত্মার আলোকেই নিখিল বিশ্ব আলোকিত হইয়া থাকে। আত্মাকে

১। আনন্দগিরি-কৃত তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য-ব্যাখ্যা, ৩১ পৃঃ, মাণ্ডুক্য-ভাষ্য-ব্যাখ্যা, ৩২ পৃঃ কেন-ব্যাখ্যা, ২৩ পৃঃ, কঠ-ব্যাখ্যা, ১২৪ পৃঃ, আনন্দাশ্রম সং দ্রষ্টব্য।

২। প্রকটার্থ-বিবরণ, ১১-১২ পৃঃ।

প্রকাশ করিবার জন্য আত্মসংবিদ্ বা অপর কোন প্রকাশক সংবিদের অপেক্ষা নাই—'স্বসংবিদৈবরপেক্ষ্যেণ স্ফুরণম্,' প্রকটার্থ বিঃ ১৪ পৃঃ। এইরূপ প্রকাশই আত্মার স্বভাব, আত্মা প্রকাশ্য নহে। আত্মা স্বাধীনসিদ্ধি, এই দৃষ্টিতেই আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে।[১] আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের স্বরূপ প্রভৃতি প্রকটার্থকার তাঁহার বিবরণে অতি নিপুণতার সহিত উপপাদন করিয়াছেন।

জ্ঞান ও প্রমাণ তত্ত্বের আলোচনায় প্রকটার্থকার ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় আত্মগত বা আত্মসমবেত বিষয়-প্রকাশকেই জ্ঞান বলিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞান যদি আত্ম-সমবেতই হয়, তবে উহা দৃশ্য ঘটাদি বিষয়গত হইয়া প্রত্যক্ষ হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বিষয় ঘটাদিই জ্ঞানকে আকার দিয়া থাকে। ন্যায়-বৈশেষিকের মতে নিরাকার, বিষয়শূন্য জ্ঞান কাহারও উপলব্ধি-গোচর হয় না। জ্ঞান এবং বিষয় এই দুইই অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত। এইজন্যই জ্ঞান বিষয়ের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত ন্যায়-বৈশেষিক মতের সমালোচনায় প্রকটার্থকার বলেন যে, প্রকাশ্য ঘটাদি ও প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান কখনও অভিন্ন হয় না। প্রকাশক প্রদীপ ও প্রকাশ্য ঘট কখনও অভিন্ন হয় কি?[২] ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ, এইরূপ নৈয়ায়িকদিগের প্রত্যক্ষের লক্ষণটিও অসম্পূর্ণ, কেননা, ন্যায়মতে ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় না থাকায় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষই হয় না। নিত্য, স্বপ্রকাশ, চিদ্‌বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হওয়ার ফলেই জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তই সমীচীন। ধী বা বুদ্ধিকে মনের পরিণাম বলা হইয়া থাকে। 'মনঃপরিণামঃ সংবিদ্‌ব্যঞ্জকো জ্ঞানম্।' প্রকটার্থ বিঃ ৩৪ পৃঃ। মনঃ সত্ত্ব-প্রধান। সত্ত্বের ধর্ম প্রকাশ। প্রকাশশক্তিসম্পন্ন মনঃই অদৃষ্টবশে দীর্ঘ আলোক-রেখার ন্যায় বিসর্পিত হইয়া বিষয় দেশে গমন করিয়া বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। বিষয়ের আকারে আকারিত মনোদর্পণে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা দ্বারাই মনঃ এবং মনোময় বিষয় প্রকাশিত হয়। বিষয়-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের সহিত স্বয়ং-জ্যোতিঃ নিত্য আত্মচৈতন্যের অভেদের ফলেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।[৩] বিষয়-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সসীম, সখণ্ড ও অনিত্য, তাহার সহিত অখণ্ড নিত্য আত্মচৈতন্যের অভেদ সম্ভব হয় কিরূপে? প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে পৃথক্ নহে। উহা বিম্বেরই ঔপাধিক অভিব্যক্তি, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ অভিন্ন। সুতরাং বিষয়-চৈতন্য ও শুদ্ধ পরমাত্ম-চৈতন্যের অভেদ উক্তি দোষাবহ নহে। মনের বিষয়াকারে পরিণাম বিষয় প্রত্যক্ষের অপরিহার্য অঙ্গ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ই সম্পর্কে

১। আত্মা স্বপ্রকাশঃ ততোঽন্যথা অনুপপদ্যমানত্বে সতি প্রকাশমানত্বাৎ, ন য এবং ন স এবং যথা কুম্ভঃ। ন আত্মা স্বাশ্রয়প্রকাশপ্রকাশ্যঃ প্রকাশকত্বাৎপ্রদীপবৎ, নাত্মা স্বাতিরেকিসংবিদধীনসিদ্ধিঃ সংবিৎ-কর্মত্বমন্তরেণ অপরোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ। প্রকটার্থ-বিবরণ, ১৪ পৃঃ।

২। প্রকটার্থ-বিবরণ, ৩২ পৃঃ।

৩। প্রকাশনশক্তিমৎ সত্ত্বপ্রধানং মনঃ অদৃষ্টাদিসহকৃতং দীর্ঘপ্রভাকারেণ স্বকর্মদেশং সরীসর্তি। তৎ সংসৃষ্টে বিষয়ে চৈতন্যং প্রতিবিম্বতে। তদ্‌বিষয়সংবেদনম্। প্রকটার্থ-বিবরণ, ৩৪-৩৫ পৃঃ।

বিষয়-প্রত্যক্ষের অনুকূল মনঃ পরিণাম সম্ভব হয়। কেননা, ইন্দ্রিয়ই মনের দ্বার। অনুপস্থিত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া মনের ইন্দ্রিয়-পথে বিষয়-দেশে গমন ও বিষয়াকারে পরিণাম সম্ভব হয় না। এইজন্য অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, পরোক্ষ জ্ঞান। অনুমেয় বহ্নি প্রভৃতির জ্ঞান ঐরূপ পরোক্ষ জ্ঞান। বহ্নির পরিচায়ক ধূমের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে বলিয়া মনঃপরিণামবশে ধূমের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট ধূমের সহিত অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নিশ্চয় আছে বলিয়া, ধূমদর্শনে বহ্নির যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুমান জ্ঞান। প্রকটার্থকার প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণতত্ত্বের (Epistemology) ব্যাখ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চপাদিকা এবং বিবরণেও প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ-নির্বচনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের প্রমাণ-ব্যাখ্যা এত বিস্তৃত এবং পরিস্ফুট নহে। প্রকটার্থ-বিবরণকার পঞ্চপাদিকা এবং বিবরণের সংক্ষিপ্ত উক্তিকে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণতত্ত্বের এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী শতকে পণ্ডিত রামাদ্বয় তৎকৃত বেদান্ত-কৌমুদীতে প্রমাণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন। রামাদ্বয়ের ব্যাখ্যায় প্রকটার্থ-বিবরণের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি অনেক স্থলে মতবাদের সহিত প্রকটার্থকারের ভাষাও অনুকরণ করিয়াছেন। প্রকটার্থকারের শারীরক ভাষ্যের ব্যাখ্যা অদ্বৈত-বেদান্তে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীমদ্ অদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র

প্রকটার্থ-বিবরণ রচয়িতার সমসাময়িককালেই শ্রীমদ্‌অদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র ব্রহ্ম-বিদ্যাভরণ নামে সম্পূর্ণ শাঙ্কর ভাষ্যের এক পূর্ণাঙ্গ টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের চিন্তা-ধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতকেই চিৎসুখাচার্যের গুরু আচার্য জ্ঞানোত্তম সুরেশ্বরাচার্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উপর চন্দ্রিকা টীকা, বিমুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধির ইষ্টসিদ্ধি-বিবরণ নামে টীকা এবং জ্ঞানসিদ্ধি নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে খণ্ডন ও মণ্ডন এই উভয় প্রকার চিন্তাধারাই শ্রীহর্ষ, আনন্দবোধ, প্রকটার্থ-বিবরণকার ও অদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র এবং জ্ঞানোত্তমাচার্য প্রভৃতির অবদানে পরিপুষ্টি এবং সমৃদ্ধি লাভ করে।[১]

১। এই শতকে অদ্বৈতবাদ পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরাপর দর্শনের কাননেও নবীন নবীন চিন্তা-কুসুমের বিকাশ হইতে দেখা যায়। এই শতকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য পুরুষোত্তম বেদান্তরত্নমঞ্জুষা রচনা করিয়া এবং দেবাচার্য বেদান্তজাহ্নবী নামে ব্রহ্মসূত্র চতুঃসূত্রীর এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন ও স্বীয় মতের পুষ্টি সাধন করেন। দেবাচার্যের বেদান্তজাহ্নবীর উপর দেবাচার্যের শিষ্য সুন্দর ভট্টের সিদ্ধান্তসেতু নামে টীকা আছে। বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের দেব-রাজাচার্য বিম্বতত্ত্ব-প্রকাশিকা নামে গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতবাদীর প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করেন। দেবরাজের পুত্র, রামানুজের ভাগিনেয় ও শিষ্য বরদাচার্য তত্ত্বনির্ণয় নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম, এই স্বীয় মত স্থাপন করিয়া নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্ত ও ত্রয়োদশ শতক

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে নব্যন্যায়-গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণি রচনা করেন। তত্ত্বচিন্তামণিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের মত খণ্ডন করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় তদীয় পিতৃদেবের রচিত তত্ত্বচিন্তামণির টীকা, উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলির টীকা, বল্লভাচার্যের ন্যায়লীলাবতীর টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া ন্যায় ও বৈশেষিক মতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বল্লভাচার্য উদয়নের পরবর্তী এবং বর্ধমান উপাধ্যায়ের পূর্বতন। বল্লভাচার্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তাঁহার প্রশস্তপাদের টীকা ন্যায়লীলাবতী রচনা করেন। বৈশেষিক চিন্তার অভ্যুদয়ে অদ্বৈতবেদান্তের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। অপরদিকে দ্বৈত বেদান্তের ক্ষেত্রে মধ্বাচার্য আবির্ভূত হইয়া তদীয় "স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ" প্রবর্তিত করেন। মধ্বাচার্যের অপর নাম বাসুদেব, পূর্ণপ্রজ্ঞ বা আনন্দতীর্থ। ইনি অদ্বৈতমতাবলম্বী অচ্যুতপ্রকাশের শিষ্য। অদ্বৈতবাদীর শিষ্য হইয়াও শঙ্করানন্দ প্রভৃতির বিরোধিতায় মধ্বাচার্য অদ্বৈতবাদের ঘোরতর শত্রু হন, এবং স্বীয় মতানুসারে গীতা, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্ত প্রস্থানের ভাষ্য রচনা করিয়া এবং বহুপ্রকার গ্রন্থ লিখিয়া[১] ও পরিশেষে দিগ্‌বিজয় করিয়া অদ্বৈতবাদ বিধ্বস্ত করিতে এবং স্বীয় দ্বৈতমত স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হন। মধ্বাচার্যের গ্রন্থে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার এবং মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধ্ব-মতের অনুরূপ কোন মতের পরিচয় পাওয়া যায় না। রামানুজ আচার্য প্রভৃতির বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জড়কে পরব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, জীবও জড় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। জীব ও জড়বিশিষ্ট ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিয়াই এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে। মধ্বাচার্যের মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে অদ্বৈতবাদের প্রভাব স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়। এইজন্য অদ্বৈতবিরোধী মধ্বাচার্য ঐরূপ কোন মতের

১। মধ্বাচার্যের নিম্নলিখিত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়:—১। গীতাভাষ্য, ২। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য, ৩। অনুব্যাখ্যান, ৪। প্রমাণ-লক্ষণ, ৫। উপাধি-খণ্ডন, ৬। মায়াবাদ-খণ্ডন, ৭। কথা-লক্ষণ, ৮। প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-খণ্ডন, ৯। তত্ত্বসংখ্যান, ১০। তত্ত্ববিবেক, ১১। তত্ত্বোদ্যোত, ১২। কর্ম-নির্ণয়, ১৩। বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়, ১৪। ঋগ্-ভাষ্য, ১৫। ঐতরেয়-ভাষ্য, ১৬। বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ১৭। ছান্দোগ্য-ভাষ্য, ১৮। তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ১৯। ঈশা-ভাষ্য, ২০। কঠ-ভাষ্য, ২১। মাণ্ডুক্য, ২২। মুণ্ডক, ২৩। কেন, ও ২৪। প্রশ্ন-ভাষ্য, ২৬। গীতাতাৎপর্য-নির্ণয়, ২৭। ন্যায়-বিবরণ, ২৮। ভাগবত তাৎপর্য-নির্ণয়, ২৯। মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়, ৩০। যমক ভারত, ৩১। দ্বাদশস্তোত্র, ৩২। শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ৩৩। তত্ত্বসারসংগ্রহ, ৩৪। সদাচার স্মৃতি, ৩৫। জয়ন্তী নির্ণয়, ৩৬। শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি প্রভৃতি।

অনুসরণ করেন নাই। পুরাণে বর্ণিত সনৎকুমার সম্প্রদায় প্রভৃতির মত অনুবর্তন করিয়া গীতা, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির দ্বৈতবাদ বা "স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ"ই প্রতিপাদ্য, এইরূপ স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন। রামানুজ ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ, পুরুষোত্তম, জীব ও জগৎ, এই তিন প্রকার তত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য রামানুজের ত্রিবিধ তত্ত্বকে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, এই দুই তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র তত্ত্ব, জীব ও জগৎ শ্রীহরির অধীন সুতরাং অস্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র এই দ্বিবিধ তত্ত্ব অঙ্গীকার করায় মধ্ব-মত "স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, জীব অণুপরিমাণ, নিত্য এবং ভগবানের দাস। জগৎ সত্য। অনির্বচনীয়বাদ বা মায়াবাদ অসঙ্গত, ভক্তিই মুক্তির কারণ, এই সকল বিষয়ে রামানুজ এবং মধ্ব একমত। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতির ব্যাখ্যায় মধ্ব রামানুজের সরণি অনুসরণ করেন নাই। তিনি তদীয় দ্বৈতবাদের অনুকূল করিয়াই, স আত্মা, অতৎ ত্বমসি, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা পরব্রহ্ম, তুমি ক্ষুদ্র জীব কোন অংশেই ভগবান্ নও, তুমি অতৎ। তিনি কৃপাসিন্ধু তাঁহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা কর। তাঁহার অনুগ্রহ হইলেই তোমার এই জীববিন্দু সেই অপার করুণাসিন্ধুর সাযুজ্য লাভ করিয়া ধন্য হইবে। মধ্বাচার্যের যুক্তির দৃঢ়তা, বিচারের সূক্ষ্মতা এবং চিন্তার স্বৈরগতি অনেক দার্শনিকের চিত্তকে জয় করিয়াছিল এবং তৎকালে অনেকেই মধ্বাচার্যের প্রদর্শিত সরণি অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে মধ্বের আক্রমণই রামানুজ অপেক্ষায় গুরুতর হইয়াছিল এবং বাদযুদ্ধে অনেক অদ্বৈতবাদী আচার্যকেই মধ্বের নিকট পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। অদ্বৈতবাদী আচার্য ত্রিবিক্রম ও পদ্মনাভ মধ্বাচার্যের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া মধ্ব-মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ত্রিবিক্রম মধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের উপর পদার্থ-প্রদীপিকা নামে টীকা রচনা করেন। পদ্মনাভ মধ্ব-মতের পদার্থ-সংগ্রহ ও তাঁহার টীকা মধ্ব-সিদ্ধান্ত-সার রচনা করিয়া মধ্ব-মত প্রচার করেন। নব্যন্যায়ের আকর তত্ত্বচিন্তামণির স্বচ্ছ আলোকমালায় যখন দার্শনিক চিন্তারাজ্যের দিক্‌চক্রবাল উদ্‌ভাসিত সেই সময় মধ্বাচার্য নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। এইরূপ শত্রুর আক্রমণ যে তীব্রতর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? একদিকে নব্যন্যায়গুরু গঙ্গেশ, বৈশেষিক আচার্য বল্লভ, অপরদিকে দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্য যখন অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সেই সময় অদ্বৈতবাদের মূর্ত বিগ্রহ তার্কিককেশরী চিৎসুখ, শঙ্করানন্দ, অমলানন্দ প্রভৃতি সেই বাদযুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়পতাকা বহন করিয়া অগ্রসর হন।

চিৎসুখাচার্য

চিৎসুখ তাঁহার গ্রন্থে বল্লভাচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বল্লভাচার্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১২শ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যারণ্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে চিৎসুখের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চিৎসুখ বল্লভের পরবর্তী এবং বিদ্যারণ্যের পূর্ববর্তী। এইজন্য তাঁহার স্থিতিকাল

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে। আচার্য চিৎসুখ একজন অতি প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদের একটি স্তম্ভ বিশেষ। চিৎসুখ নব্যন্যায়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি প্রতিপক্ষমত খণ্ডনপূর্বক অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার জন্য তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী নামে একখানি পরম উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। তত্ত্বপ্রদীপিকা ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় চার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, চতুর্থে ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল বা মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের রচনাশৈলী অনুসরণ করিয়াই তত্ত্বপ্রদীপিকা লিখিত হইয়াছে। গদ্যে তত্ত্ববিচার করিয়া শ্লোকে সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ করা হইয়াছে। তত্ত্বপ্রদীপিকার উপর খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে চিৎসুখের শিষ্য সুখপ্রকাশের শিষ্য প্রত্যগ্‌রূপ ভগবান্ নয়ন-প্রসাদিনী নামে অতি অপূর্ব টীকা রচনা করিয়াছেন। তত্ত্বপ্রদীপিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিৎসুখ ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থ এবং বৈশেষিকের সপ্ত পদার্থ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বল্লভাচার্যের ন্যায়-লীলাবতীর এবং উদয়নাচার্য প্রভৃতির লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধরাচার্য এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও খণ্ডনে বাদ যান নাই। শ্রীহর্ষ তৎকৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে উদয়নাচার্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে তর্কের শরজাল বিস্তার করিয়া ন্যায়মত বিধ্বস্ত করিলে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বল্লভাচার্য, বর্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতির আবির্ভাবে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের যে জাগরণ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ গঙ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক তত্ত্বচিন্তামণিতে শ্রীহর্ষের মত খণ্ডিত হওয়ায় অদ্বৈতবেদান্ত চিন্তার যে দুর্বলতা দেখা দেয়, আচার্য চিৎসুখ সেই দৌর্বল্য বিদূরিত করতঃ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। পরপক্ষ খণ্ডন এবং স্বীয় পক্ষ স্থাপন, এই উভয় অংশে চিৎসুখের তত্ত্বপ্রদীপিকার ন্যায় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তত্ত্বপ্রদীপিকা ব্যতীত চিৎসুখ শাঙ্কর ভাষ্যের ভাব-প্রকাশিকা টীকা, মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধির অভিপ্রায়-প্রকাশিকা নামে টীকা, সুরেশ্বরের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির ভাবতত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকা, খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের টীকা, বিবরণ-তাৎপর্য-দীপিকা টীকা, আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের এবং প্রমাণমালার টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা, শঙ্করচরিত, অধিকরণমঞ্জরী, ষড়্‌দর্শনসংগ্রহবৃত্তি প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থমালা রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রতিপক্ষ মত নিরাস করতঃ শঙ্করের ভাষ্যধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। শুনা যায় যে, মধ্বাচার্য দিগ্‌বিজয় কালে ইঁহার সহিত বিচার করেন নাই। চিৎসুখাচার্য তত্ত্বপ্রদীপিকার নমস্কার শ্লোকে জ্ঞানোত্তমাচার্যকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রন্থসমাপ্তিতে গৌড়েশ্বরাচার্য বলিয়া উহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[১] তত্ত্বপ্রদীপিকা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিৎসুখ বলিয়াছেন :—

> বিপ্রতিপত্তিব্রাতধ্বংসপ্রগল্‌ভবাচালা।
> ক্রিয়তে চিৎসুখমুনিনা প্রত্যক্‌তত্ত্ব-প্রদীপিকা বিদুষা।। ৩ পৃঃ।

১। জ্ঞানোত্তমকে গৌড়েশ্বরাচার্য বলার তাৎপর্য কি? কেহ কেহ বলেন, গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানোত্তমের অপর নাম। কাহারও মতে গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানোত্তমের উপাধি। জ্ঞানোত্তম গৌড়দেশীয়

অদ্বৈত প্রতিপক্ষগণের অদ্বৈত সিদ্ধান্তবিরোধী যুক্তিজালের অন্ধকাররাশি বিধ্বংস করিয়া মায়ামুগ্ধ জীবের হৃদয়-গুহায় চিরভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে চিৎসুখ তত্ত্ব-প্রদীপিকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানদীপ স্বপ্রকাশ এবং স্বয়ংজ্যোতিঃ, অপরাপর সকল জড় বস্তুই ব্রহ্মের আলোকে আলোকিত, ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্। স্বপ্রকাশ কাহাকে বলে? পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতি পঞ্চপাদিকায় এবং বিবরণে জ্ঞানময় আত্মা বা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানময় ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ। ব্রহ্ম স্বীয় প্রকাশে অপর কোন প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা রাখেন না—'সংবেদনন্তু স্বয়ংপ্রকাশ এব ন প্রকাশান্তর-হেতুঃ' (বিবরণ, ৫২ পৃঃ)। জ্ঞান স্বীয় প্রকাশে জ্ঞানের তুল্যজাতীয় অপর কোন প্রকাশকের অপেক্ষা রাখে না বলিয়াই জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রকাশের দ্বারাই বিষয়ও প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষতঃ বিষয়কে প্রকাশিত করিবার শক্তি একমাত্র জ্ঞানেরই আছে। জ্ঞান নিজের বা অপর কোন প্রকাশকের প্রকাশ্য নহে। বিষয়কে প্রকাশ করিয়া বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই জ্ঞানকে লোকে জ্ঞান সংজ্ঞায় অভিহিত করে। নিরুপাধি জ্ঞানই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা।[১] পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে ন্যায়-বৈশেষিকের পদার্থ-নিরূপণ-শৈলীর অনু-করণে রূপ দিয়াছেন চিৎসুখাচার্য এবং স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ প্রদর্শনের পূর্বে প্রতিপক্ষের সর্বপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া চিৎসুখ খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কোন্ বস্তুকে স্বপ্রকাশ বলিবে? যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব এবং প্রকাশ, এই দুইই আছে, তাহাই স্বপ্রকাশ। এইরূপ বলিলে জ্ঞান যাঁহাদের মতে (ন্যায়-বৈশেষিকের মতে) পর-প্রকাশ বা জ্ঞেয়, তাঁহাদের মতেও জ্ঞানের সত্তা, অস্তিত্ব এবং প্রকাশ, এই উভয়ই বিদ্যমান আছে বলিয়া, ন্যায়-বৈশেষিকের মতেও (পরপ্রকাশ) জ্ঞান স্বপ্রকাশই হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, যে বস্তু নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে তাহাকেই যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে

আত্মা স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞান-স্বরূপ।

আচার্যগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন বলিয়া উঁহাকে গৌড়েশ্বরাচার্য বলা হইত। কোন কোন মনীষীর মতে জ্ঞানোত্তম গৌড়দেশীয় রাজার গুরু ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে গৌড়েশ্বরাচার্য বলা হয়। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। সুরেশ্বরের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির চন্দ্রিকা টীকার রচয়িতা জ্ঞানোত্তম "মিশ্র" বলিয়া পরিচিত। এই জ্ঞানোত্তমমিশ্র ও চিৎসুখের গুরু জ্ঞানোত্তম অভিন্ন ব্যক্তি কি না তাহা বিচার্য। জ্ঞানোত্তমমিশ্রের মিশ্র উপাধি হইতে তিনি যে গৃহী ছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। তিনি চোল দেশের মঙ্গল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। চিৎসুখের গুরু জ্ঞানোত্তম সন্ন্যাসী, সুতরাং তাঁহার মিশ্র পদবী থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞানোত্তম মিশ্রের রচিত চন্দ্রিকা টীকা অনুসরণ করিয়াই চিৎসুখ তাঁহার নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির টীকা ভাবতত্ত্ব-প্রকাশিকা রচনা করিয়াছেন। চন্দ্রিকার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া চন্দ্রিকার রচয়িতা জ্ঞানোত্তমই তাঁহার গুরু বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ গুরুর গৃহস্থাশ্রমের পদবী সন্ন্যাসাশ্রমের নামের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

১। তস্মাদনুভবসজাতীয়প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ প্রকাশমাত্র এব বিষয়ে প্রকাশাদিব্যবহারনিমিত্তং ভবিতুমর্হতি অব্যবধানেন বিষয়ে প্রকাশাদিব্যবহারনিমিত্তত্বাৎ। বিবরণ, ৫২ পৃঃ।

একই বস্তু প্রকাশের কর্তা এবং কর্ম হইয়া পড়ে। একই বস্তু কর্তা এবং কর্ম হইলে সে ক্ষেত্রে কর্ম-কর্তৃ-বিরোধ অপরিহার্য হয় বলিয়া, ঐরূপ কোন লক্ষণ নিরূপণ করা চলে না। তৃতীয়তঃ, যাহা সজাতীয় প্রকাশের অপ্রকাশ্য তাহাই যদি স্বপ্রকাশ হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তের মতে জড় প্রদীপও অন্য কোনও প্রদীপের দ্বারা প্রকাশিত হয় না বলিয়া উহাও সজাতীয় প্রকাশের অপ্রকাশ্যই বটে, ফলে প্রদীপও স্বপ্রকাশই হইয়া দাঁড়ায়। চতুর্থতঃ, যে বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্তা থাকিলেই প্রকাশও থাকে, যাহার অস্তিত্ব কখনও অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাকেই যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে সুখ-দুঃখ প্রভৃতিও স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। কেননা, সুখ বা দুঃখ মনের মধ্যে উদিত হইলেই তাহা প্রকাশিত এবং অনুভূত হয়, অপ্রকাশ থাকে না। প্রকাশিত এবং অনুভূত না হইলে সেই সুখ-দুঃখকে সুখ-দুঃখ বলা যায় কি? পক্ষান্তরে, যাহা স্বীয় ব্যবহারের হেতুও বটে, প্রকাশস্বরূপও বটে, তাহাই স্বপ্রকাশ এইরূপ লক্ষণও অসম্পূর্ণ। কেননা, এই লক্ষণ অনুসারে প্রদীপও স্বপ্রকাশই হইয়া পড়ে। যাহা জ্ঞানের অবিষয় তাহাই স্বপ্রকাশ, এইরূপ লক্ষণও যুক্তিসহ নহে। কারণ, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানও জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বের সাধক অনুমান-জ্ঞান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতির বিষয়ই হইয়া থাকে, জ্ঞানের অবিষয়ত্ব সে ক্ষেত্রে অসম্ভব কথা হইয়া দাঁড়ায়। 'এইরূপে উল্লিখিত বিভিন্ন লক্ষণের দোষ আলোচনা করিয়া চিৎসুখ বলিয়াছেন যে, অবেদ্য বা অজ্ঞেয় হইয়াও যাহা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারের যোগ্য হইবে, তাহাই স্বপ্রকাশ বলিয়া জানিবে— 'অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতায়াস্তল্লক্ষণত্বাৎ'। চিৎসুখী, ৯ পৃঃ

> অপরোক্ষব্যবহৃতে র্যোগ্যস্যাধীপদস্য নঃ।
> সম্ভবে স্বপ্রকাশস্য লক্ষণাসম্ভবঃ কুতঃ॥ চিৎসুখী, ৯ পৃঃ।

জ্ঞান অদ্বৈতবেদান্তের মতে অপর কোন জ্ঞানের জ্ঞেয় হয় না, এবং জ্ঞান উদিত হইলে উহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জানা যায়। এই দৃষ্টিতে জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। জাগতিক জড় বস্তুগুলি জ্ঞেয়ও বটে, জ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যতীত উহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানাও যায় না, অতএব জাগতিক জড় বস্তুসকল স্বপ্রকাশ নহে। আত্মা বা ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন। আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই লোকে জানিতে পারে। আত্মাকে প্রত্যক্ষতঃ জানিতে পারে বলিয়াই আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ বা ভ্রমজ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে আত্মা যে স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। 'আত্মা সংবিদ্রূপঃ সংবিৎকর্মতামন্তরেণ অপরোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ' (চিৎসুখী, ২২ পৃঃ)। এই আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই মিথ্যা এবং অবস্তু।

চিৎসুখের মতে জগতের মিথ্যাত্ব।

মিথ্যা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যাত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া চিৎসুখাচার্য নানাপ্রকার বিরোধী মতের উল্লেখ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে বস্তুর যাহা আশ্রয় বলিয়া বুঝা যাইবে, ঐ আশ্রয়ে সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকিলে (স্বীয় আশ্রয়ে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী) সেই বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া জানিবে।

সর্বেষামেব ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা ।। চিৎসুখী, ৩৯ পৃঃ

শুক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে শুক্তিই হয় রজতের আশ্রয়। ঐ আশ্রয়শুক্তিতে রজত বস্তুতঃ নাই, রজতের প্রতিভাসই মাত্র আছে, সুতরাং রজতের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান শুক্তিতে "রজতং নাস্তি" রজত নাই, এইরূপ রজতের অত্যন্তাভাব পাওয়া যাইবে। ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে রজত, অতএব রজত মিথ্যা। কার্যের উপাদান বা অবয়বে ভাবী কার্যের অর্থাৎ অবয়বীর অত্যন্তাভাব আছে। অবয়বগুলি কার্য অবয়বীর আশ্রয়। ঐ আশ্রয় অবয়বে অবয়বী থাকে না। অবয়বীর অত্যন্তাভাবই থাকে। সুতরাং স্বীয় আশ্রয় অবয়বে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অবিয়বীমাত্রই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। বস্ত্রের অবয়ব সূতাগুলি বস্ত্রের উপাদান এবং আশ্রয়। ঐ বস্ত্রাবয়ব বস্ত্রের আশ্রয় যে কোন সূতা লও না কেন, প্রত্যেক সূতাতেই "বস্ত্রং নাস্তি" এইরূপে বস্ত্রের অত্যন্তাভাব থাকিবে। কেননা, সূতা তো আর কাপড় নহে। সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে বস্ত্র সুতরাং বস্ত্র মিথ্যা। বস্ত্র অবয়বী বা অংশী, সূতাগুলি উহার অবয়ব বা অংশ। অবয়বী বা অংশী বলিয়া যদি কোন সত্য বস্তু থাকে, তবে যে সকল অংশ বা অবয়বের দ্বারা অবয়বী বস্তুটি গঠিত হইয়াছে, সেই সকল অবয়বেই অবয়বীর সত্যতা বুঝা যাইবে। অবয়বী বস্তুর সংগঠক অবয়বগুলিতেই যদি অবয়বীর অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়, তবে অবয়বীর মিথ্যাত্বই আসিয়া পড়িবে। অবয়বী দ্রব্য যেমন মিথ্যা, সেইরূপ অবয়বীর গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিও মিথ্যা। বস্ত্রের অবয়ব সূত্রে অবয়বী বস্ত্রের যেরূপ অভাব আছে, সেইরূপ সূত্রের রূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিতেও বস্ত্রের রূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতির অভাব আছে। ফলে, বস্ত্রের (দ্রব্যের) ন্যায় উহার গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিও মিথ্যাই হইয়া দাঁড়াইবে।[১] স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জড়জগতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে সর্বদেশে সর্বকালেই জড় বিশ্ব প্রপঞ্চের অত্যন্তাভাব আছে। ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নিখিল জগৎপ্রপঞ্চই মিথ্যা। ব্রহ্মের কোন আশ্রয় নাই, সুতরাং কোন আশ্রয়ে ব্রহ্মের অত্যন্তাভাবের প্রতীতি হওয়াও

১। অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিনঃ।
অংশিত্বাদিরাংশীব দিগেষৈবগুণাদিষু ।।

বিমতঃ পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অবয়বিত্বাৎ, পটান্তরবৎ। এবমেতদ্গুণ-কর্ম-জাত্যাদয়োঽপি তত্তত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনঃ তত্তদ্রূপত্বাদিতরতত্তদ্রূপবদিত্যেবমাদিপ্রয়োগঃ সর্বত্রৈবোহনীয়ঃ। চিৎসুখী, ৪০-৪১ পৃঃ। উল্লিখিত অনুমানে পট বা বস্ত্রকে পক্ষ করিয়া বিশেষভাবে দ্রব্যের মিথ্যাত্ব সাধন করা হইয়াছে। কোন বিশেষ দ্রব্যকে পক্ষ না করিয়া সামান্যভাবে "অংশী"রূপে অনুমানের পক্ষ নিরূপণ করিলেও সর্ববিধ দ্রব্যের এবং উক্ত দৃষ্টিতে গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি সকলেরই মিথ্যাত্ব সাধন করা যাইতে পারে। মোট কথা, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যে সকল পদার্থকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার কিছুই সত্য নহে, সকলই মিথ্যা, ইহাই চিৎসুখ তাঁহার গ্রন্থে মিথ্যাত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সম্ভব নহে। ফলে, কোনও আশ্রয়ে অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী পরব্রহ্ম মিথ্যা নহে, সত্য। চিৎসুখের উক্ত মিথ্যাত্ব নির্বচনের মূলসূত্র অনুসরণ করিয়াই মধুসূদন সরস্বতী তদীয় অদ্বৈতসিদ্ধিতে অংশী বা অবয়বীর মিথ্যাত্ব উপপাদন করিয়াছেন। চিৎসুখের মতের উল্লেখ করিয়া মধুসূদন বলিয়াছেন যে, সূতায় কাপড়ের অভাব থাকে ইহার অর্থ এই যে, উপাদানে অবয়বী কার্য বস্তুর অত্যন্তাভাব সর্বদাই আছে। তন্তু শব্দে এখানে উপাদানকে বুঝায়। এই উপাদানতন্তুতে পটের নিয়তই অভাব আছে। তন্তুর কোনও দেশেই পট নাই, অতএব পট মিথ্যা। এই দৃষ্টিতে কার্যমাত্রই মিথ্যা ইহা সাব্যস্ত হয়।[১] প্রকাশাত্মযতি তদীয় বিবরণে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই প্রপঞ্চের কল্পিত আশ্রয় বা উপাধিতে সেই বস্তুর অভাব সাধন করিয়া প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব উপপাদন করিয়াছেন, আর, চিৎসুখাচার্য উপাদানের সর্বদেশেই অবয়বী বস্তুর অভাব প্রদর্শন করিয়া প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন। মিথ্যা কোন দেশে কোন কালেই নাই বা থাকে না, ইহাই মিথ্যার স্বভাব।

অবিদ্যার ভাবরূপতা এবং অনির্বচনীয়তা সাধন।

মিথ্যা জড়প্রপঞ্চের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপ, অনির্বচনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান-বিনাশ্য।

'অনাদি ভাবরূপং যদ্‌বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদ্‌জ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে ॥' চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ

'অনাদিত্বে সতি ভাবরূপং বিজ্ঞান-নিরস্যমজ্ঞানমিতি লক্ষণমিহ বিবক্ষিতম্।' (চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ)। উল্লিখিত লক্ষণে ভাবরূপ শব্দে যাহা ভাবও নহে, অভাবও নহে, ভাবাভাব-বিলক্ষণ, সেই অদ্বৈতসম্মত অনির্বচনীয় অজ্ঞানকে বুঝায়। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে বলিয়াই (অভাববৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন) অজ্ঞানকে গৌণভাবে ভাবরূপ বলা হইয়া থাকে—'ভাবাভাববিলক্ষণস্য অজ্ঞানস্য অভাববিলক্ষণত্বমাত্রেণ ভাবত্বোপচারাৎ' চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ। অনির্বচনীয় ভাবরূপ অজ্ঞান অনাদিও বটে, তত্ত্বজ্ঞান-বিনাশ্যও বটে। এইজন্য ঐরূপ অবিদ্যা উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা গেল। ভাবশব্দের স্বাভাবিক ভাববস্তু অর্থ গ্রহণ করিলে, অনাদি ভাববস্তু বলিলে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুকে বুঝায়। সেই অনাদি ভাববস্তু তো আর জ্ঞাননিবর্ত্য হয় না। ফলে, ঐরূপ লক্ষণ অসম্ভবই হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ অনির্বচনীয় অবিদ্যার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে চিৎসুখ প্রকাশাত্ম-যতি ও বাচস্পতিমিশ্রের মত অনুসরণ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন। অনুমান-প্রমাণ উপন্যাস করিতে গিয়া চিৎসুখ বলিয়াছেন যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে যেখানে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞান উক্ত বস্তু বা

১। চিৎসুখাচার্যৈস্তু অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ, ইতরাংশিবদিত্যুক্তম্---- তত্র তন্তুপদমুপাদানপরম্, এতেন উপাদাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৩২২ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

ব্যক্তির প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, ঐ বস্তু বা ব্যক্তির আবরক অনাদি অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হয়। কেননা, উহা যথার্থ জ্ঞান। যেখানেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানেই ঐ জ্ঞান ঐরূপ ভাবরূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়া থাকে।[1] ভাবরূপ অবিদ্যার প্রত্যক্ষসম্পর্কে চিৎসুখ বলেন যে, তোমার কথিত বিষয় আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য, কি মিথ্যা, তাহা আমি বুঝি নাই ; এইরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষই ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ। এই সকল স্থলে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা জ্ঞানের অভাব নহে, জ্ঞানের অভাব হইলে জ্ঞান থাকাকালে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। উহাকে জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞান বলিয়াই জানিবে। এই অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য, সাক্ষীর আলোকেই আলোকিত, সাক্ষীর প্রকাশেই প্রকাশিত হয়। সাক্ষি-ভাস্য অজ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের বা ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপারের কোন অপেক্ষা নাই। যে সকল স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবশে বস্তুজ্ঞানের উদয় হয়, সেই সকল স্থলে যথার্থ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবৃত (অজ্ঞান-বিশিষ্ট) অর্থ বা জ্ঞেয় বিষয় "জ্ঞাত নহে" এইরূপে সাক্ষি-ভাস্য হইয়া আমাদের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। জ্ঞানোদয়ের পরে উহাই আবার "জানিয়াছি" বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্বের তাবদ্ বস্তুই জ্ঞাত হইয়াই হউক, কি অজ্ঞাত হইয়াই হউক, সাক্ষী চৈতন্যের বিষয় হইয়া অর্থাৎ সাক্ষি-ভাস্য হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষি-চৈতন্যস্য বিষয় এবেতি,' (চিৎসুখী, ৬০ পৃঃ)। অজ্ঞান "ন জানামি" এইরূপে (অজ্ঞাত ভাবে) অনুভবের বিষয় হয়। সুষুপ্তি সময়ে "ন কিঞ্চিদবেদিষম্"—আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, এইরূপে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় শূন্য অজ্ঞানকে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সাক্ষি-ভাস্য অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। 'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ; আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম,' এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতেও তমঃ শব্দ দ্বারা অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অজ্ঞান ভাবরূপ না হইলে তমঃ বা অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের কোনই অর্থ হয় না। কেননা, তমঃ তো আর অভাব পদার্থ নহে, উহা ভাব পদার্থ এবং আলোক বিনাশ্য, অজ্ঞানান্ধকারও সেইরূপ ভাব পদার্থ এবং জ্ঞানালোক-বিনাশ্য।

১। দেবদত্তপ্রমাতৎস্বপ্রমাভাবাতিরেকিণঃ।
অনাদের্ধ্বংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা॥

বিগীতং দেবদত্তনিষ্ঠ-প্রমাজ্ঞানং দেবদত্তনিষ্ঠ-প্রমা'ভাবাতিরিক্তানাদের্নিবর্তকং প্রমাণত্বাদ্ যজ্ঞদত্তাদি-গতপ্রমাণজ্ঞানবদিত্যনুমানম্॥ চিৎসুখী, ৫৮ পৃঃ, অবিদ্যার অনুমান সম্পর্কে চিৎসুখের মত প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতিরই অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে প্রকাশাত্মযতি এবং বাচস্পতিমিশ্রের অনুমানের শৈলী এবং প্রয়োগ বাক্য তুলনা করুন এবং তুলনার জন্য এই পুস্তকের ১৮১ পৃঃ ও ২২৯ পৃষ্ঠার ১ নম্বর চিহ্নিত পাদটীকা দেখুন।

সাক্ষী কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে চিৎসুখ বলিয়াছেন যে, —'সর্বপ্রত্যগ্‌ভূতং বিশুদ্ধং ব্রহ্মাত্র জীবাভেদেন সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে' (চিৎসুখী, ৩৭৪ পৃঃ)। শ্রুতিতে "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" বলিয়া সাক্ষীর স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। নির্গুণ, নির্বিশেষ চৈতন্যই সাক্ষী, ইহাই শ্রুতির মর্ম। শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে মায়াময়, সগুণ পরমেশ্বর সাক্ষী হইতে পারেন না। এক অদ্বিতীয় মায়াতীত, নির্গুণ, বিশুদ্ধ পরব্রহ্মই জীবের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকিয়া, জীবের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া এবং প্রত্যেক জীব-শরীরের ভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রতীতিগোচর হইয়া সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সাক্ষী স্বয়ং উদাসীন সুতরাং সাক্ষী জীবকোটিও নহে, ঈশ্বর কোটিও নহে। কেননা, জীব বা ঈশ্বর কেহই উদাসীন নহেন। কূটস্থ চৈতন্যই, স্বভাবতঃ উদাসীন এবং সাক্ষী হইবার যোগ্য। বিদ্যারণ্য তৎকৃত পঞ্চদশীর কূটস্থ দীপে (অষ্টম পরিচ্ছেদে) জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইপ্রকার শরীরের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় নির্বিকার কূটস্থ চৈতন্যকে সাক্ষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠান-চৈতন্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহদ্বয়কে দেখিতে পায় বলিয়া উহাকে সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। কূটস্থ চৈতন্য দ্রষ্টা বা দর্শন ক্রিয়ার কর্তা হইলেও তো একপ্রকার বিকারীই হইল। নির্বিকার উদাসীন চৈতন্য দ্রষ্টা হইবেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অধিষ্ঠান-চৈতন্যই বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুর প্রকাশক। জড় ও জীবের অন্তরালে স্বয়ংজ্যোতিঃ, সর্বাবভাসক নিত্য-চৈতন্য বিরাজ করে বলিয়াই জড় ও জীব প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বয়ংজ্যোতিঃ প্রকাশস্বভাব সর্বাবভাসক ঐ চৈতন্য দৃক্ বা জ্ঞান স্বরূপ হইলেও উহাকে দ্রষ্টা বলিয়াই লোকে মনে করে। দৃক্‌স্বরূপ শুদ্ধ-চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব বা দর্শনক্রিয়ার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, উহা ঔপাধিক বা গৌণ। দেহদ্বয়ের অবভাসক সাক্ষী-চৈতন্যে প্রমাণ কি? দেহদ্বয়ের অবভাসই সাক্ষী চৈতন্যে প্রমাণ। চৈতন্য ব্যতীত জড় দেহের প্রকাশ সম্ভব হয় কি? যদি বল যে, জীবের অন্তঃকরণ-বৃত্তিই জীবকে বিষয় দর্শন করায়, সেখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দৃশ্য বিষয়ও জড়, অন্তঃকরণ-বৃত্তিও জড়। জড় বৃত্তি তো জড় বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং বৃত্তির অন্তরালে বৃত্তির ভাসক যে নিত্য চৈতন্য বিরাজ করে, সেই চৈতন্যই বিষয়কে প্রকাশ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যে-বিষয় সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হয়, অন্তঃকরণ-বৃত্তি ঐ বিষয়াকারে পরিণতি লাভ করে এবং বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণ-বৃত্তি চৈতন্যের দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া স্পষ্টতঃ বিষয়কে প্রকাশ করে। ইহাই বিষয় প্রত্যক্ষের রহস্য। বিষয়টি চৈতন্যের দ্বারা পূর্বেও প্রকাশিত হইতেছিল, তবে সেই প্রকাশটি ছিল অস্পষ্ট। বৃত্তি-জ্ঞানোদয়ের ফলে অস্পষ্ট প্রকাশটি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। দৃশ্য বস্তুটির সহিত জ্ঞাতাকে পরিচিত করাইয়া দিল। জ্ঞাতাও দেখিয়াছি, জানিয়াছি বলিয়া বস্তুটিকে চিনিয়া লইল। অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। জীবের অন্তর্যামী, নিত্য কূটস্থ চৈতন্যই সাক্ষী। জীব প্রতিবিম্ব, সাক্ষী কূটস্থ বিম্ব-চৈতন্য। এই কূটস্থ বিম্ব-চৈতন্যের সহিত জীব-চৈতন্যের (অন্যোন্যাধ্যাসের ফলে) অভেদ

সাক্ষী-নিরূপণ এবং জীব ও সাক্ষীর ভেদ প্রদর্শন।

বোধের উদয় হইয়া থাকে বলিয়া সাক্ষী ও জীব-অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। জীব এবং সাক্ষী অভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ উহারা অভিন্ন নহে। কূটস্থ সাক্ষী-চৈতন্যের কোন প্রকার ভোগ নাই, সে উদাসীন দ্রষ্টামাত্র। জীব তাঁহার স্বীয় কর্মানুরূপ সুখ, দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং বিষয়ভুক্ জীব-চৈতন্যকে কোনমতেই উদাসীন সাক্ষী বলা যায় না। জীব ও সাক্ষীর ভেদ কিরূপ, তাহা বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীর নাটক-দীপে (১০ম পরিচ্ছেদে) নাটকীয় রঙ্গমঞ্চের প্রদীপের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পরিষ্কার ভাবে আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের প্রদীপ যেমন নাচঘর, নট, নটী, দর্শক প্রভৃতি সকলকেই সমানভাবে প্রকাশিত করে এবং অভিনয় সমাপ্ত হইলে নট, নটী, দর্শকগণ চলিয়া গেলেও পূর্বের ন্যায়ই জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ সর্বসাক্ষী, স্বপ্রকাশ, নিত্য ব্রহ্ম-দীপ জীব, জৈব অহঙ্কার, বুদ্ধি-বৃত্তি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলকে স্বীয় ভাস্বর জ্যোতিঃদ্বারা প্রকাশিত করে, আবার সর্বপ্রকার জৈব অভিমান, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রভৃতি বিলীন হইলে উহাদের অবর্তমানেও পূর্ণ জ্যোতিতেই বিরাজ করিতে থাকে। সংসারের রঙ্গমঞ্চে সর্বদা বুদ্ধির নৃত্য চলিতেছে। (চিদাভাস বিশিষ্ট) অহং অভিমানী জীব বিষয় ভোগের আশায় মশ্‌গুল। অহং অভিমানী জীবই গৃহ-স্বামী। বিষয়সকল তাঁহার ভোগের সাধন। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি-বিকাশের আনুকূল্য সম্পাদন করে বলিয়া উহারা বুদ্ধির নৃত্যের তাল-লয়-রক্ষক বাদ্যকর স্থানীয়। কূটস্থ নিত্য চৈতন্য সাক্ষী। এই সর্বসাক্ষী নিত্য আনন্দময় জ্যোতিঃ বিদ্যমান আছে বলিয়াই সংসারের রঙ্গশালায় বুদ্ধির নৃত্য দেখা যাইতেছে। বুদ্ধির নৃত্যকলা সমাপ্ত হইলেও এই নিত্য জ্যোতিঃ এইভাবেই বিরাজ করিবে। ইহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহা শাশ্বত, সদা ভাস্বর এবং সদা পূর্ণ। সাক্ষী সর্বপ্রকার অজ্ঞান লীলারই নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। সাক্ষীর অজ্ঞান-দর্শনে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এইজন্য সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত প্রমাণ-বৃত্তি বিলীন হইলে এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় হইলেও সাক্ষীর পক্ষে বিষয়শূন্য অজ্ঞানকে "নকিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপে প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করার কোন অসুবিধা হয় না। সাক্ষী নির্বিকার কূটস্থ বিধায় ইহাকে দ্রষ্টা বা প্রমাতা বলা যায় না, ইহার সাক্ষী সংজ্ঞাই যুক্তিযুক্ত। কৌমুদীকারের মতে পরমেশ্বরই রূপভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি রূপে সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরই জীবের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির নিয়ন্তা এবং স্বয়ং উদাসীন সুতরাং পরমেশ্বরকে সাক্ষী বলায় কোন অসঙ্গতি নাই। তত্ত্ব-শুদ্ধিকারের মতেও পরমেশ্বরই সাক্ষী। উল্লিখিত সকল মতেই সাক্ষী ও জীবের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। কোন কোন মনীষী জীব ও সাক্ষীর ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অবিদ্যোপাধি জীবই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং সাক্ষী। ব্রহ্ম-মূর্তি জীব স্বয়ং উদাসীন এবং সাক্ষীই বটে। কেবল অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন হওয়ার ফলে অন্তঃকরণের ধর্ম জীবে আরোপিত হওয়ায় জীবে মিথ্যা কর্তৃত্ববোধের উদয় হয়। এই মতে অবিদ্যা-উপাধি-বিশিষ্ট জীব সাক্ষী, আর, অন্তঃকরণ-উপাধি-বিশিষ্ট জীব কর্তা, ভোক্তা বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ অন্তঃকরণ-উপাধি-বিশিষ্ট জীবকেও সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অন্তঃকরণ জীবভেদে বিভিন্ন সাক্ষীও সুতরাং জীবভেদে বিভিন্ন। সুষুপ্তি অবস্থায়

অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিলীন হইলেও অন্তঃকরণ সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া সুষুপ্তি অবস্থায়ও অন্তঃকরণ-উপাধি-বিশিষ্ট সাক্ষীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই মতে জীব সাক্ষী হইলেও প্রমাতা জীব এবং সাক্ষী জীব বিভিন্ন। সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষী জীব বিরাজ করে বটে, কিন্তু তখন সর্বপ্রকার প্রমাণ-বৃত্তি বিলীন হইয়া যায় বলিয়া জীবকে তখন আর প্রমাতা বলা যায় না। অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যের বিশেষণ হয়, তখনই জীবকে প্রমাতা বলা হয়; আর, অন্তঃকরণ যখন বিশেষণ না হইয়া উপাধি হয়, তখন ঐরূপ জীবকে সাক্ষী বলা হয়। বিশেষণ ও উপাধির ভেদবশতঃই প্রমাতা জীব ও সাক্ষীর ভেদ নির্ধারণ করা যায়।[১]

সাক্ষী এবং সাক্ষি-ভাস্য অবিদ্যার স্বরূপ বিচার করা গেল। এই অবিদ্যা-বন্ধনের নিবৃত্তিই মুক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তি মণ্ডনমিশ্রের মতে ব্রহ্মস্বরূপ নহে, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত। বিমুক্তাত্মন্ ও আনন্দবোধের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, অনির্বাচ্যও নহে, উহা পঞ্চম প্রকার, ইহা আমরা বিমুক্তাত্মন্ ও আনন্দবোধের দার্শনিক মতের বিচারপ্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি। বিমুক্তাত্মন্ ও আনন্দবোধের (পঞ্চম প্রকার) সিদ্ধান্ত চিৎসুখ অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অনির্বাচ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। 'নাপি পঞ্চমপ্রকারা সদসদ্‌বিলক্ষণতয়া তস্যা অপি অনির্বাচ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ' (চিৎসুখ, ৩৮১ পৃঃ)। তাঁহার মতে দার্শনিক পদার্থ বিশ্লেষণে নির্বচনের অযোগ্য পঞ্চম প্রকারের কোন স্থান নাই। অবিদ্যাও যেমন সদসদ্‌ বিলক্ষণ এবং অনির্বচনীয়, অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ সদসদ্‌বিলক্ষণ এবং অনির্ব্বচনীয়। চিৎসুখের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। নিত্য সুখাভিব্যক্তিই মুক্তি বা স্বতঃ পুরুষার্থ। নিত্য সুখাভিব্যক্তির পক্ষে অবিদ্যা প্রতিবন্ধক সুতরাং ঐ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিকেও পুরুষার্থ বলিতে হয়। অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিও সুখরূপই বটে। আনন্দময় আত্মস্বরূপই অবিদ্যার নিবৃত্তি। মিথ্যা রজতের নিবৃত্তি যেমন শুক্তিস্বরূপই বটে, শুক্তি হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপই বটে, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।[২] অবিদ্যার নিবৃত্তি ও আনন্দময় ব্রহ্মপ্রাপ্তিই বেদান্ত সেবার চরম ফল।

অবিদ্যা নিবৃত্তির স্বরূপ ও মুক্তি।

১। উপাধি ও বিশেষণের ভেদ আমরা ১২শ পরিচ্ছেদে পাদটীকায় আলোচনা করিয়াছি। সুধী সেই আলোচনা দেখুন।

২। যথালোকে সকারণস্য কলধৌতবিভ্রমস্য জ্ঞাতা শুক্তিরেব নিবৃত্তিঃ। -----তথেহাপি অনৃতজড়দুঃখানাত্মদ্বৈতবিরোধি সত্যজ্ঞানানন্দানন্তাদ্বয়লক্ষণং ব্রহ্মৈব বেদান্তবাক্যজনিতব্রহ্মৈকাকারান্তঃকরণপরিণামদর্পণপ্রতিবিম্বিতং সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি যুক্তমভ্যুপগন্তুম্। চিৎসুখ, ৩৮২ পৃঃ। চিৎসুখের গ্রন্থের সর্বত্রই তাঁহার চিন্তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী মত খণ্ডনপূর্বক স্বসিদ্ধান্ত তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ কোন স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে চিৎসুখের বিস্তৃত আলোচনার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। আমরা শুধু তাঁহার মতের আংশিক পরিচয় দিলাম এবং চিৎসুখের আলোচনা-শৈলীর সহিত আমাদের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদিগকে পরিচিত করিতে চেষ্টা

শঙ্করানন্দ

খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে আচার্য শঙ্করানন্দ আবির্ভূত হন। শঙ্করানন্দ মাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্যের গুরু ছিলেন। বিদ্যারণ্য তৎকৃত পঞ্চদশীর আরম্ভে গুরু শঙ্করানন্দের পাদপদ্মে তাঁহার প্রণতি জানাইয়াছেন। বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের আরম্ভেও বিদ্যারণ্য শঙ্করানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য ১৪শ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করানন্দের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ১৩শ শতক ধরা যাইতে পারে। শঙ্করানন্দ শৃঙ্গেরী মঠে ১২৯৮—১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মঠাধীশ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি একাধারে অসামান্য পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। মধ্বাচার্য তিনবার শঙ্করানন্দের সহিত বিচার করিয়া পরাজিত হন বলিয়া শুনা যায়। ইহা হইতেই শঙ্করানন্দের অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-দীপিকা ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যানুসারী অতিসরল ও প্রাঞ্জল টীকা। ঐ দীপিকাকে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। শঙ্করানন্দের গীতার টীকাও অতিমনোরম। তিনি ১০৮ খানি উপনিষদের উপরই বৃত্তি রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আত্মপুরাণ নামে এক অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, শ্রুতির রহস্য এবং যোগবিদ্যা প্রভৃতি সাধক জীবনের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় উক্ত পুরাণে সন্নিবেশিত করেন। শঙ্করানন্দের আত্মপুরাণ

করিলাম। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তত্ত্ব-প্রদীপিকা পাঠ করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তবেই আমরা আমাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব। চিৎসুখ তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায় ও বৈশেষিকের সমস্ত প্রমাণ এবং প্রমেয়ের লক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার খণ্ডন-শৈলী খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষেরই অনুরূপ। আমরা শ্রীহর্ষের বেদান্তমতের আলোচনায় তাঁহার ন্যায়োক্ত প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থের খণ্ডন-শৈলীর সহিত আমাদের পাঠকদিগকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য এই প্রবন্ধে চিৎসুখের খণ্ডনরীতির কোন আলোচনা করা হয় নাই। অবিদ্যার ব্রহ্মাশ্রয়ত্ব, শব্দাপরোক্ষবাদ, অখণ্ডার্থত্ব প্রভৃতির আলোচনাও আমরা বিভিন্ন দার্শনিকমতের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং সেই সকল আলোচনা দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব ও স্বতঃপ্রামাণ্য প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রমাণ-তত্ত্বের (Epistemology) বিচারপ্রসঙ্গে করিবার ইচ্ছা আছে। অদ্বৈতবেদান্তের প্রমাণ ও প্রমেয়-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে চিৎসুখের তত্ত্ব-প্রদীপিকার বিচার-শৈলীকেই প্রধানভাবে অনুসরণ করিয়াছি। অদ্বৈতচিন্তায় চিৎসুখের দান অতি মহার্ঘ। চিৎসুখের তত্ত্ব-প্রদীপিকার ন্যায় একখানি গ্রন্থই অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট। চিৎসুখের তত্ত্ব-প্রদীপিকার চিন্তার গভীরতা ও বিচারশক্তির অদ্ভুত নৈপুণ্য দর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ তার্কিক দ্বৈতবেদান্তী ব্যাসরাজ বাদযুদ্ধে চিৎসুখকেই প্রধান মল্ল হিসাবে গ্রহণ করেন; এবং চিৎসুখের মত খণ্ডনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ব্যাসরাজ তদীয় ন্যায়ামৃতের প্রারম্ভেই চিৎসুখের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক কথার খণ্ডন করিয়া চিৎসুখের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়াছেন। ইহা হইতে চিৎসুখের আসন অদ্বৈত আচার্যগণের মধ্যে কত উচ্চে, তাহা বুঝা যায়। শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে যে খণ্ডন-যুগের সূচনা হইয়াছিল, চিৎসুখে তাহার বিকাশ এবং মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিতে তাহার পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মজিজ্ঞাসুর অমূল্য রত্ন। শঙ্করানন্দই মধ্বাচার্যের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অমলানন্দ স্বামী

বেদান্তকল্পতরুর রচয়িতা অমলানন্দ স্বামী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অপর নাম ব্যাসাশ্রম। যাদব বংশের রাজা শ্রীকৃষ্ণের সময়ে অমলানন্দ কল্পতরু রচনা করেন। তিনি কল্পতরুর আরম্ভে গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন।[১] তিনি রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্ভবতঃ যাদবরাজ রামচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্র মহাদেবের ভ্রাতা। রামচন্দ্রের পূর্বে মহাদেব দেবগিরির রাজা ছিলেন। মহাদেবের নাম অমলানন্দ কল্পতরুর আরম্ভ-শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অমলানন্দ উভয়ের রাজত্বকালেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। মহাদেব ১২৬০—১২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, পরে রামচন্দ্র রাজা হন। ইহা হইতে অমলানন্দের আবির্ভাবকালও খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। অমলানন্দের গুরুর নাম অনুভবানন্দ, বিদ্যাগুরু সুখপ্রকাশ। সুখপ্রকাশ চিৎসুখাচার্যের শিষ্য, সুতরাং অমলানন্দ চিৎসুখের প্রশিষ্য। অমলানন্দ বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী টীকার উপর বেদান্তকল্পতরু নামে এক পূর্ণাঙ্গ টীকা প্রণয়ন করেন। কল্পতরু ব্যতীত অমলানন্দ শাস্ত্রদর্পণ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শাস্ত্রদর্পণে ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের বাচস্পতি-মতানুসারী তাৎপর্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় অমলানন্দ বিবৃত করিয়াছেন। পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর পঞ্চপাদিকা-দর্পণ নামে একখানি টীকা রচনা করিয়া অমলানন্দ শঙ্করের ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অমলানন্দের কল্পতরু অতি উপাদেয় রচনা। কল্পতরুর চিন্তার যে মৌলিকতা আছে, তাহা আমরা বাচস্পতিমিশ্রের বেদান্তমত-বিচারপ্রসঙ্গে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। কল্পতরুর উপর অপ্যয় দীক্ষিত কল্পতরু-পরিমল ও খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে কোণ্ডভট্টের পুত্র লক্ষ্মী নৃসিংহ আভোগ নামে টীকা রচনা করিয়া কল্পতরুর দানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বেই শঙ্করের বেদান্তমতের বিবরণপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৩শ শতকেই প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকা, গীতার টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন

১। কীর্ত্যা যাদববংশমুন্নময়তি শ্রীজৈত্র দেবাত্মজে
কৃষ্ণে ক্ষ্মাভৃতি ভূতলং সহ মহাদেবেন সংবিভ্রতি।
ভোগীন্দ্রে পরিমুঞ্চতি ক্ষিতিভরপ্রোদ্ভূতদীর্ঘশ্রমং
বেদান্তোপবনস্য মণ্ডনকরং প্রস্তৌমি কল্পদ্রুমম্ ॥—কল্পতরুর আরম্ভ শ্লোক।
কল্পতরুর সমাপ্তিতেও অমলানন্দ রাজা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা মহাদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। —কল্পতরুর সমাপ্তি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ—১৪শ শতকে প্রসিদ্ধ টীকাকার আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম অভয়ানন্দ এবং বিদ্যাগুরু শ্বেতগিরি। আনন্দপূর্ণ শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের উপর খণ্ডন-ফক্কিকা-বিভঞ্জন নামে টীকা ও বাদীন্দ্রের মহাবিদ্যা-বিড়ম্বনের উপর টীকা রচনা করিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অদ্বৈত-মতের স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন। আনন্দপূর্ণের বিচারচাতুর্য অদ্ভুত। উল্লিখিত টীকাদ্বয় ব্যতীত ইনি পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার টীকা, প্রকাশাত্মযতির পঞ্চপাদিকা-বিবরণের টীকা, মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধির ভাবশুদ্ধি নামে টীকা, সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক-বার্তিকের উপর ন্যায়কল্পলতিকা টীকা ও মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বের টীকারত্ন নামে টীকা রচনা করিয়া শঙ্কর-বেদান্তের বিশেষ সৌষ্ঠব এবং পূর্ণতা সাধন করেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মধ্বাচার্যের আবির্ভাবে বেদান্ত-বিটপিতে এক নূতন ভাব-কুসুমের বিকাশ হয়। ভক্তপ্রবর মধ্বের অবদানে ভক্তিবাদ নবজীবন লাভ করে। অপর দিকে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মনীষার বিকাশ হওয়ায় দার্শনিক বাদযুদ্ধ প্রবলাকার ধারণ করে। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ বিশেষতঃ মধ্বের আক্রমণ এবং ন্যায়-বৈশেষিকের তর্ক-শরজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া চিৎসুখ, শঙ্করানন্দ প্রমুখ আচার্যগণ অদ্বৈতবাদকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্ত ও চতুর্দশ শতক

চিৎসুখ, অমলানন্দ প্রভৃতির নবশক্তিতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে অদ্বৈতবাদের বিজয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠিলেও তখনও প্রতিপক্ষগণের আক্রমণ এবং প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়াই চলিয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে (১২৬৭-১৩৮১ খৃষ্টাব্দে) রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রবীণ আচার্য বেঙ্কটনাথের অভ্যুদয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। বেঙ্কটনাথ বা বেদান্ত-মহাদেশিকাচার্য তত্ত্বমুক্তাকলাপ, সর্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি রচনা করিয়া রামানুজমত দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তত্ত্ব-মুক্তাকলাপ পদ্যে লিখিত। ইহাতে ৫০০ শ্লোক আছে। সর্বার্থসিদ্ধি তত্ত্বমুক্তাকলাপেরই ব্যাখ্যা, ইহা গদ্যে লিখিত। সর্বার্থসিদ্ধির উপর নৃসিংহদেবের আনন্দবল্লরী নামে টীকা আছে। সর্বদর্শন-সংগ্রহে বিদ্যারণ্য এই গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ন্যায়পরিশুদ্ধি এবং ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন নামক গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে প্রমাণ ও প্রমেয়-তত্ত্ব নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ন্যায়পরিশুদ্ধি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে শব্দপ্রমাণ, চতুর্থে স্মৃতিজ্ঞানের স্বরূপ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রমেয়-তত্ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। ন্যায়পরিশুদ্ধির উপর শ্রীনিবাসাচার্যের ন্যায়সার নামে টীকা আছে। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনে ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে। উহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে দ্রব্য, জীব, ঈশ্বর, নিত্য বিভূতি, বুদ্ধি ও অদ্রব্য প্রভৃতি প্রমেয়-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে। বেঙ্কট শতদূষণী নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে একশত দোষ বা অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।* শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের প্রত্যুত্তরে শতদূষণী লিখিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। শতদূষণীর বিচার-শৈলী যেমন সূক্ষ্ম তেমনই গভীর এবং চিত্তাকর্ষক। বেঙ্কটের শতদূষণীর উপর দোদ্দয়াচার্যের চণ্ডমারুত নামে টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীভাষ্যের উপর বেঙ্কটের রচিত তত্ত্বটীকা, রামানুজাচার্যের রচিত গদ্যত্রয়ের উপর গদ্যত্রয়-টীকা, রামানুজের লিখিত গীতা-ভাষ্যের উপর তাৎপর্য-চন্দ্রিকা টীকা প্রভৃতি বিবিধ টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকরণ-সারাবলী, সেশ্বরমীমাংসা, মীমাংসা-পাদুকা, বাদিত্রয়-খণ্ডন (এই গ্রন্থে শঙ্কর, ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডিত হইয়াছে) প্রভৃতি গ্রন্থ বেঙ্কটের দার্শনিক প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। যাদবাভ্যুদয় কাব্য,

---

* সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী শতভূষণী নামে গ্রন্থ লিখিয়া বেঙ্কটের শতদূষণীর প্রতিটি দোষের খণ্ডন করিয়াছেন।

সঙ্কল্প-সূর্যোদয় নামে নাটক (এই গ্রন্থে রামানুজমত নাটকাকারে প্রপঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুকরণে লিখিত), গরুড়পঞ্চবিংশতি, অচ্যুতশতক, পাদুকাসহস্র, অভীতিস্তব প্রভৃতি বেঙ্কটের অতুলনীয় ভগবৎশরণাপত্তি ও কবিপ্রতিভার বিজয়প্রশস্তি। এক বেঙ্কটের অবদানেই রামানুজের দর্শন সর্বাঙ্গ-পুষ্ট হইয়াছিল। চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে বেঙ্কটের প্রতিভার জ্যোতিঃ সর্বত্র বিকীর্ণ হওয়ায় অদ্বৈতবাদের গরিমা ম্লানায়মান হয়। এই সময়ে বিদ্যারণ্য আবির্ভূত হইয়া অদ্বৈতবাদের ম্লানিমা বিদূরিত করেন। দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্যের শিষ্য অক্ষোভ্য মুনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে দ্বৈতবেদান্তে এবং নব্যন্যায়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য-লাভ করেন। তিনি শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ বিদ্যারণ্য স্বামীকে বাদযুদ্ধে আহ্বান করেন। মহামতি বেদান্তদেশিকাচার্য উক্ত বিচারে মধ্যস্থের কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বিচারের ফলাফল সম্পর্কে মধ্বমতাবলম্বিগণ বলেন যে,

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥

অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মতে বিদ্যারণ্য বিচারে বিজয়মাল্যের অধিকারী হন—— "অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামুনিঃ"। বিচারের ফলাফল যাহাই হউক, অক্ষোভ্য মুনি যে দ্বৈতবেদান্তিগণের অন্যতম প্রধান আচার্য ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই শতাব্দীতেই বাদিহংসাম্বুবাচার্য বা দ্বিতীয় রামানুজাচার্য ন্যায়কুলিশ নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করেন। বরদবিষ্ণু আচার্য সুদর্শনাচার্যের শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকা টীকার উপর ভাবপ্রকাশিকা নামে টীকা রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বেঙ্কট তাঁহার ন্যায়পরিশুদ্ধিতে ভাবপ্রকাশিকা টীকার নাম করিয়াছেন। বেঙ্কটের পুত্র বরদগুরু আচার্য বেদান্তদেশিকের অধিকরণসারাবলীর টীকা রচনা করিয়া রামানুজমতের পুষ্টিসাধন করেন। লোকাচার্য পিল্লাই নামক জনৈক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিক তত্ত্বনির্ণয়, তত্ত্বশেখর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন এবং স্বীয় মতের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। এইরূপে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ-সম্প্রদায় যে আক্রমণ-ধারা প্রবর্তিত করেন, ভারতীতীর্থ, বিদ্যারণ্য, সায়নাচার্য প্রভৃতি অদ্বৈতাচার্যগণ প্রতিপক্ষের সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া অদ্বৈত-শশীকে প্রতিবাদী রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করেন।

ভারতীতীর্থ

আচার্য ভারতীতীর্থ শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ ছিলেন। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য স্বামীর গুরু বলিয়া পরিচিত। ভারতীতীর্থের গুরুর নাম ছিল বিদ্যাতীর্থ। ভারতী-তীর্থ বৈয়াসিক-ন্যায়মালা নামে বেদান্তদর্শনের অধিকরণমালা রচনা করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর

বিদ্যারণ্য খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪শ শতকের শেষভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহাকে শঙ্করাচার্যের অবতার বা দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য বলা হইয়া থাকে। সর্বশাস্ত্রে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত ভারতের বুকে কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি একাধারে অসামান্য পণ্ডিত এবং চাণক্যের ন্যায় কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন। মাধবাচার্যই বিজয়নগর রাজ্যের সংস্থাপক। তিনি ১৩৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করিয়া ঐ রাজ্যের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন; এবং ৩০ বৎসর কাল বিজয়নগর-রাজ বীরবুক্কের মন্ত্রিপদে আসীন থাকিয়া বিজয়নগর রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁহার পরিচালনা-গুণে বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যরূপে পরিণত হয়। বীরবুক্কের আদেশে তিনি কিছুকালের জন্য জয়ন্তীপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মাধবাচার্য তদীয় অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভাবলে দক্ষিণ ভারত হইতে মুসলমান প্রভাব বিদূরিত করেন এবং মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য সংগঠন করেন। গুরুতর রাজকার্যের অবসরে তাঁহার গ্রন্থকর্তৃ-জীবন প্রস্ফুটিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে অসংখ্য গ্রন্থমালা রচনা করিয়া মাধব ভারতীর পাদপীঠ সুষমা-মণ্ডিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিভা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কূটনীতিবিৎ, অক্লান্তকর্মা মাধবাচার্য পরিণত বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ হইয়া শেষ জীবন যাপন করেন। এইরূপ জীবনও বড় দেখা যায় না। যিনি রাজনৈতিকের চূড়ামণি, তিনিই আবার সন্ন্যাসীর অগ্রণী, অক্লান্তকর্মা অথচ সর্বকর্ম-সন্ন্যাসী। মাধব তৎকৃত 'পরাশর-মাধবের' প্রারম্ভে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐ পরিচয়মূলে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম মায়ন ও মাতার নাম ছিল শ্রীমতী এবং প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য এবং ভোগনাথ নামে মাধবের দুই সহোদর ছিল। বোধায়ন-সূত্রসেবী সায়ন-মাধব যজুঃশাখীয় ব্রাহ্মণ কুলে ভরদ্বাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[১] মাধবাচার্যের কৌলিক নাম সায়ন বলিয়া মনে হয়।

মাধবাচার্যের জীবনী

বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহের আরম্ভে মাধবাচার্য শঙ্করানন্দকে গুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তিনি বিদ্যাতীর্থ গুরুর পাদপদ্মে গ্রন্থার্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তরে মাধবাচার্য ভারতী-তীর্থকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাতীর্থ মাধবের গুরু ভারতীতীর্থের গুরু ছিলেন। সম্ভবতঃ মাধবের পরমগুরু বলিয়া মাধব বিদ্যাতীর্থের পাদপদ্মে

১। শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্তির্মায়নঃ পিতা।
সায়নো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥
বোধায়নং যস্য সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং যস্য গোত্রং সর্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥ —পরাশর-মাধব, আরম্ভ শ্লোক।

প্রণতি জানাইয়াছেন। অথবা উঁহারা উভয়েই মাধবের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাতীর্থের দেহান্তের পর মাধব ভারতীতীর্থের নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং পরিণত জীবনে শঙ্করানন্দের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রেই গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া তাঁহার বাণীপূজা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। বেদান্তে পঞ্চদশী, বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অনুভূতি-প্রকাশ, জীবন্মুক্তি-বিবেক, অপরোক্ষানুভূতির টীকা, সূতসংহিতার টীকা, ঐতরেয়-উপনিষদ্দীপিকা। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্দীপিকা, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্দীপিকা,[১] বৃহদারণ্যক-বার্তিকসার, শঙ্কর-বিজয় মাধবের অক্ষয় কীর্তি। তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহ বিভিন্ন দার্শনিক মতের অপূর্ব সার সংকলন। মীমাংসাদর্শনে তিনি জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তর রচনা করিয়া পূর্বমীমাংসার অধিকরণগুলির আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ব্যাকরণে তিনি মাধবীয় ধাতুবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে এই ধাতুবৃত্তি তাঁহার রচিত নহে, তাঁহার ভ্রাতা সায়নের রচিত। স্মৃতিতে তিনি পরাশরমাধব নামে পরাশরসংহিতার ব্যাখ্যা রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু-সম্পর্কে উহাতে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

মাধবাচার্যের গ্রন্থমালা

মাধবাচার্যের 'কালমাধব' স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রামাণিক সংগ্রহগ্রন্থ। প্রসিদ্ধ স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও স্বীয় মতের সমর্থনে কালমাধবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিদ্যারণ্যের কীর্তি অতুলনীয়। তিনি বিদ্যাশঙ্করের যে সমাধি মন্দির রচনা করাইয়াছিলেন, ঐ মন্দিরের গাত্রে প্রভাতসূর্যের অরুণালোক-পাত দেখিয়া মাস, তিথি প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়। ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য কৃতিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক।

অদ্বৈতবেদান্তী বিদ্যারণ্য শঙ্কর-বেদান্তের ব্যাখ্যায় তাঁহার অসামান্য শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি শঙ্করমতের ব্যাখ্যায় বিবরণ মত অনুসরণ করিয়াছেন। প্রকাশাত্মযতির পঞ্চপাদিকা-বিবরণের বিশ্লেষণে তিনি বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পঞ্চদশী প্রাঞ্জল এবং সরস রচনা। ঐ সকল রচনায় স্থানে স্থানে বিদ্যারণ্যের মৌলিক চিন্তার সমাবেশও পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশীর প্রারম্ভেই তিনি সত্য, সনাতন ব্রহ্ম সংবিদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐ সংবিদের উদয়ও নাই, অস্তও নাই, উহা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ—'নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা' (পঞ্চদশী ১।৭)। শব্দ, স্পর্শাদি বিজ্ঞান পরস্পর বিভিন্ন মনে হইলেও জ্ঞেয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জড়াংশই জ্ঞানের ভেদ সাধন করে।

বিদ্যারণ্যের বেদান্তমত

১। বিদ্যারণ্য ১০৮ খানি উপনিষদের উপরই দীপিকা নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

ঐ জ্ঞেয় অংশ বাদ দিলে জ্ঞানের কোন তারতম্য থাকে না। জ্ঞান একরূপেই প্রকাশ পায়। জ্ঞেয় বিষয়সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল। ঐ পরিবর্তনশীল বিষয়-বিবর্তনের মধ্যে যাহা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে এবং যাহা স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ তাহাই জ্ঞান, তাহাই সত্য। অপরাপর পরিবর্তনশীল সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেও ঐ নিত্যচৈতন্য বিরাজ করে। চৈতন্যের অভাব কোন দেশে কোন কালেই নাই। সুতরাং উহাই একমাত্র সত্য বস্তু। সত্য, শাশ্বত-চৈতন্যই আত্মা। চৈতন্যময় আত্মা আনন্দময়ও বটে। আত্মাই সকলের একমাত্র প্রিয়তম। আত্মার প্রীতি সম্পাদন করে বলিয়াই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বিত্ত প্রভৃতিকে গৌণভাবে প্রিয়তম বলা হইয়া থাকে। আত্মপ্রীতিই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য। ইহা হইতে আনন্দই যে আত্মার স্বরূপ, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়। এক নিত্যচৈতন্যই অনাদি-অজ্ঞানবশতঃ জীব-চৈতন্য, ঈশ্বর-চৈতন্য, কূটস্থ-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য, এই চতুর্বিধ রূপে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপ-শারীরক-রচয়িতা সর্বজ্ঞাত্ম মুনি প্রভৃতি জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-চৈতন্য, এই তিনপ্রকার চৈতন্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য কূটস্থ সাক্ষি-চৈতন্যকে যোগ করিয়া চারপ্রকার চৈতন্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একই মহাকাশ যেমন উপাধি-ভেদে ঘটের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ, ঘট-মধ্যস্থিত জলে প্রতিফলিত হইয়া জলাকাশ, অপরিচ্ছিন্ন অনন্তবিসারী নীলাকাশ-মহাকাশ, এবং আকাশপথে ভ্রাম্যমান মেঘমণ্ডলের বাষ্পীয় প্রবাহে প্রতিবিম্বিত হইয়া মেঘাকাশ, বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠান, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, চিরস্থির নির্বিকার চৈতন্যকে কূটস্থ-চৈতন্য বা সাক্ষী-চৈতন্য। অপরিচ্ছিন্ন ভূমা চৈতন্যকে ব্রহ্ম-চৈতন্য; এবং কূটস্থ-চৈতন্যে যে বুদ্ধি কল্পিত বা অধ্যস্ত হয়, সেই অধ্যস্ত বদ্ধিতে কূটস্থ-চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বকে জীব-চৈতন্য। আর, ভূমা ব্রহ্ম-চৈতন্যে আশ্রিত বা অধিষ্ঠিত অনাদি মায়ায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর-চৈতন্য বলা হইয়া থাকে। জীব-চৈতন্য কূটস্থ-চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হইলেও অজ্ঞানাধিক্য-বশতঃ জীব এবং কূটস্থ-চৈতন্য যে অভিন্ন, তাহা সংসারী জরামরণশীল জীব বুঝিতে পারে না। অনাদি-অজ্ঞানই জীবের দৃষ্টির তিরস্করণী। এই তিরস্করণীর প্রভাবেই জীবের ব্রহ্মদৃষ্টি তিরোহিত হয়। ইহাই মূলাজ্ঞান। এই অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—আবরণ শক্তি এবং বিক্ষেপ শক্তি। যে-শক্তি কূটস্থ-চৈতন্যকে জীবের দৃষ্টিপথ হইতে আবৃত করিয়া রাখে, তাহাই আবরণ শক্তি। বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে আবরণ শক্তিবশে সমাবৃত কূটস্থ-চৈতন্যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম (বা লিঙ্গ) শরীরধারী জীবভাবের প্রতিভাস হইয়া থাকে। মাণ্ডূক্যোপনিষদে আমরা জীবাত্মার প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব ও তুরীয়, এই চারপ্রকার অবস্থার পরিচয় পাইয়াছি। (৮ম পরিচ্ছেদের ১২৭-১২৯ পৃঃ দেখুন) সুষুপ্তি অবস্থায় সর্বপ্রকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিলীন হইলে, অজ্ঞান-সাক্ষী জীবকে প্রাজ্ঞ বা আনন্দময় বলা হইয়া থাকে। স্বপ্ন অবস্থায় জীবের স্থূল শরীরের অভিমান থাকে না বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান তখনও বিদ্যমান থাকে। ঐ সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবকে তৈজস নামে এবং জাগরিত অবস্থায় ব্যষ্টি স্থূলাভিমানী জীবকে বিশ্ব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। এই সকল অবস্থার অতীত নিরুপাধি

অবস্থাই তুরীয়াবস্থা। তুরীয়াবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করে। আত্ম-চৈতন্যের এই প্রকার বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে বিদ্যারণ্য তৎকৃত পঞ্চদশীর চিত্রদীপে চিত্রপটের দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত জীব ও জগৎ মায়ার চিত্র। সদানন্দ ব্রহ্মই সেই চিত্রের ভিত্তি। অভিজ্ঞ শিল্পী যখন কোন পট-ভিত্তিতে চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন তিনি প্রথমতঃ পটখানিকে ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লন। পরে, চিত্রাঙ্কনের উপযোগী করিবার জন্য ঐ পটের গায় মণ্ড প্রভৃতি লেপন করেন। তারপর, ঐ পট-ভিত্তিতে পেন্সিল বা তুলিদ্বারা স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়সকল অঙ্কিত করেন এবং সর্বশেষে উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসের দ্বারা অঙ্কিত চিত্রগুলির নয়নাভিরাম পূর্ণ রূপ দান করেন। মায়া-চিত্রিত জীব ও জগচ্চিত্রের ভিত্তি বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। মায়াময় (মায়া-পরিচ্ছিন্ন বা মায়োপাধি) পরমাত্মা ঈশ্বর ও অন্তর্যামী; সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা, আর, সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী পরমাত্মা বিরাট্ নামে অভিহিত হন। মায়াতীত পরব্রহ্ম যখন মায়ার আবরণে আবৃত হইলেন, তখনই তাহাতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। সূক্ষ্ম শরীরের কল্পনা মায়াময় পরব্রহ্মে অস্ফুট মসীরেখামাত্র। স্থূল শরীরের বিকাশই জগচ্চিত্রের বিবিধ বর্ণবিন্যাস বা স্পষ্ট অভিব্যক্তি। পরমাত্মার ভিত্তিতেই মায়ার তুলিকায় স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রে অঙ্কিত বিচিত্র পুতুলগুলি নানারূপ বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া এবং নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া চিত্রপটে শোভা পায় বটে, কিন্তু ঐ সকল চিত্রিত পোষাক পরিচ্ছদের কোন কার্যকারিতা নাই। চিত্রিত বসন-ভূষণ আসল বসন-ভূষণের ন্যায় দেখায় সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ উহা আসল নহে, নকল এবং মিথ্যা। ব্রহ্ম-ভিত্তিতে মায়ার তুলিকায় চিত্রিত জীব ও জগতের বিচিত্র খেলাও সেইরূপ পুতুলবাজী মাত্র। পুতুলের বসন-ভূষণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের ন্যায় জীব ও জগতের মায়িক সুষমাও আসল নহে, নকল এবং মিথ্যা। জীব ও জগচ্চিত্রের বিচিত্র অভি-ব্যক্তিতে চৈতন্যের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায় বটে, চৈতন্যের উহা বাস্তব রূপ নহে, চৈতন্যের আভাস। বিভিন্ন উপাধিবশতঃ একই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীব, জগৎ সমস্তই একই চৈতন্যের শরীরে মায়ার খেলা। জীবে চৈতন্য ব্যক্ত, জড়ে উহা অব্যক্ত। বুদ্ধিগত চিদাভাসই জীব সুতরাং জীবে বুদ্ধির খেলা এবং চৈতন্যের বিকাশ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। জড়ের বুদ্ধিগত চিদাভাস নাই, এইজন্যই জড়ের চৈতন্য অব্যক্ত। আত্ম-চৈতন্য সর্বব্যাপী এবং অসীম। জীব ও জড়ে কোথায়ও চৈতন্যের অভাব নাই। কেবল চৈতন্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা-নিবন্ধন জীবকে চেতন ও জড় বিশ্বপ্রপঞ্চকে অচেতন বলা হইয়া থাকে। চেতন, অচেতন সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চই মায়ার বিলাস। মায়া পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ। মায়া স্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিবশে ব্রহ্ম-গাত্রে জীব ও জগচ্চিত্র রচনা করে। জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা বিধ্বস্ত হইলে জীব ও জগৎ কিছুই থাকিবে না, সমস্ত জীব ও জগচ্চিত্রের অন্তরালে পরমাত্মা পরব্রহ্মই ফুটিয়া উঠিবে। জীব শিবরূপে ব্রহ্ম পারাপারে মিলিয়া যাইবে। বিদ্যারণ্যের মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব। মায়ায় চৈতন্যের

প্রতিবিম্ব ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় চৈতন্যের প্রতিবিম্ব জীব। মায়া ও অবিদ্যা বিদ্যারণ্যের মতে অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। মায়া শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান, অবিদ্যা মলিন-সত্ত্বপ্রধান —"রজস্তমো'নভিভূত শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা মায়া এবং তদভিভূত মলিন সত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা"।[১] বিবরণের মতে ঈশ্বর বিম্ব, জীব প্রতিবিম্ব। বিবরণের এই মত বিদ্যারণ্য অঙ্গীকার করেন নাই। বিদ্যারণ্যের মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব। অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব-চৈতন্য অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি, শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়ায়-প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর-চৈতন্য সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি।

সাক্ষীর স্বরূপ নিরূপণে বিদ্যারণ্য বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে চিৎসুখের দার্শনিক মতের বিচারপ্রসঙ্গে বিদ্যারণ্যের মতের পরিচয় দিয়াছি। কূটস্থ-চৈতন্য বা অন্তর্যামীই সাক্ষী।

সাক্ষী

অন্তর্যামী স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দেহদ্বয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং স্বয়ং কূটস্থ, নির্বিকার, নির্লেপ ও উদাসীন। এইজন্য কূটস্থ-চৈতন্যকেই সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। চিৎসুখাচার্যের মতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মই জীবাভিন্ন হইয়া সাক্ষী বলিয়া কথিত হন। চিৎসুখ ও বিদ্যারণ্য এই উভয়ের মতেই (অনুদাসীন চিৎ) জীব বা ঈশ্বর কেহই সাক্ষী নহেন। সাক্ষী জীব ও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত। কেহ কেহ আবার জীবকেই সাক্ষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে নিরুপাধি, নির্লেপ, কূটস্থ-চৈতন্যেরই সাক্ষী সংজ্ঞা যুক্তিযুক্ত। আচার্য শঙ্কর বিবেক-চূড়ামণিতে উদাসীন, কূটস্থ-চৈতন্যকেই সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন :—

> ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
> অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ॥
> দেহেন্দ্রিয়মনোধর্মা নৈবাত্মানং স্পৃশন্ত্যহো॥
> রবে র্যথা কর্মণি সাক্ষিভাবো বহ্নে র্যথাবায়সি দাহকত্বম্।
> রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গ স্তথৈব কূটস্থ চিদাত্মনো মে॥
>
> —বিবেক-চূড়ামণি ৫০৭-৫০৮ শ্লোক।

কূটস্থ সাক্ষী-চৈতন্যেরও উর্ধ্বে অক্ষয়, অব্যয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বা চরম জ্ঞান। বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীর "তত্ত্ব-বিবেকে" চিন্ময়, আনন্দঘন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া, "ধ্যানদীপে" পরব্রহ্মের

১। সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া'বিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ-শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥

পঞ্চদশী ১।১৬-১৭ শ্লোক।

উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। "আমি সেই পরব্রহ্ম" এইরূপে পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই জীবের জীবন মধুময় হয়।

সায়নাচার্য

প্রসিদ্ধ বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য বিদ্যারণ্যের সহোদর। সায়ন বিদ্যারণ্য ও বিজয়নগর-রাজ বীরবুক্কের অনুরোধে ও উৎসাহে সমগ্র বেদের ভাষ্য রচনা করিয়া বেদ রক্ষা করেন। ইঁহার মত বৈদিক পণ্ডিত দ্বিতীয় কেহ ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহার দার্শনিক দৃষ্টি অদ্বৈতমুখী ছিল। শঙ্করের দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুসরণ করিয়া ইনি সমগ্র বেদের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতির উপদেশের মূলে যে চিদানন্দঘন অদ্বয় ব্রহ্ম বিরাজ করে, তাহাই তিনি তদীয় ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈদিক ভাষ্যকার উবট এবং মহীধর শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন এবং বাজসনেয়ী সংহিতার যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহারা অদ্বৈতবাদের পথই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা হইতে অদ্বৈতবাদই শ্রুতির রহস্য একথা মনে করা অসঙ্গত নহে।

আনন্দ গিরি বা আনন্দজ্ঞান

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকেই আনন্দজ্ঞান বা আনন্দ গিরি আবির্ভূত হইয়া সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্যের অতি প্রাঞ্জল এবং সরস টীকা প্রণয়ন করিয়া ভাষ্যের সারগর্ভ উক্তির রহস্য জিজ্ঞাসুর নিকট সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। আনন্দজ্ঞান প্রশ্ন ও ঐতরেয় ভাষ্যের টীকায় শঙ্করানন্দ ও বিদ্যারণ্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে শঙ্করানন্দ ও বিদ্যারণ্যের পরবর্তী তাহা নিঃসন্দেহ। আনন্দজ্ঞানের বিদ্যাগুরু অনুভূতি স্বরূপাচার্য, দীক্ষাগুরু শুদ্ধানন্দ। এই শুদ্ধানন্দ অদ্বৈত-মকরন্দের টীকাকার স্বয়ম্প্রকাশের গুরু শুদ্ধানন্দ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। শুদ্ধানন্দের গ্রন্থকর্তৃ-জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুভূতি স্বরূপাচার্য সারস্বতপ্রক্রিয়া নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন এবং বেদান্তে গৌড়পাদের রচিত মাণ্ডূক্যকারিকার শাঙ্কর ভাষ্যের টীকা, আনন্দবোধের ন্যায়-মকরন্দের উপর সংগ্রহ নামে টীকা, ন্যায়দীপাবলীর চন্দ্রিকা টীকা ও প্রমাণমালার উপর নিবন্ধ নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। আনন্দ গিরি সম্ভবতঃ গুজরাট প্রদেশবাসী ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে তিনি জনার্দন নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি মীমাংসা, বেদান্ত ও নব্যন্যায়ে অসামান্য পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালেই বেদান্ত-তত্ত্বালোক এবং বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সন্ন্যাস জীবনে আনন্দজ্ঞান দ্বারকা মঠের মঠাধীশ ছিলেন এবং সমগ্র শঙ্কর-ভাষ্য এবং সুরেশ্বরের বার্তিকের উপর টীকা ও স্বতন্ত্র বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন এবং প্রতিপক্ষ-মত

খণ্ডনে যত্নবান্ হন। ইঁহার গ্রন্থসম্পদ্ অতুলনীয়।[১] শাঙ্কর ভাষ্যের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণই আনন্দজ্ঞানের সাধনা। অপরাপর দার্শনিক মতের খণ্ডনেও আনন্দজ্ঞান কম প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় দেন নাই। তিনি বেদান্ত-তত্ত্বালোকে বিভিন্ন দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আনন্দজ্ঞানের দার্শনিক মত।

পরিণামবাদী এবং ভেদাভেদবাদী ভাস্করও খণ্ডনে বাদ যান নাই। ন্যায়-বৈশেষিক-মতের খণ্ডনে আনন্দজ্ঞান বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ রচনা করেন। বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যের লক্ষণ ও দ্রব্যের বিভাগ এবং ভাব, অভাব প্রভৃতি পদার্থের খণ্ডন করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকমতের পদার্থনির্ণয়ের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ-পদার্থের এবং প্রমা ও অপ্রমা, সত্য ও মিথ্যাজ্ঞানের লক্ষণ ও স্বরূপের খণ্ডন ; প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রমাণের লক্ষণ, ব্যাপ্তির লক্ষণ এবং বিভিন্নপ্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণ ও স্বরূপের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত জাতিবাদ, সমবায়, অভাব প্রভৃতি খণ্ডিত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকের খণ্ডনে আনন্দজ্ঞান শ্রীহর্ষ এবং চিৎসুখের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহাদের খণ্ডন-শৈলীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াই আনন্দজ্ঞান ন্যায়-বৈশেষিকমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার আনন্দজ্ঞান শঙ্করমতের মণ্ডনে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তের বিরোধী ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতের খণ্ডনেও সেইরূপ মনীষার বিকাশ দেখাইয়াছেন। তিনি যে-সকল সিদ্ধান্তে পেঁৗছিয়াছেন, তাহা আমা-দিগকে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি ও আনন্দবোধের ন্যায়-মকরন্দের সিদ্ধান্তের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আনন্দবোধের মত অনুবর্তন করিয়া শুক্তি-রজতের অনির্বচনীয়তা সাধন করিতে গিয়া আনন্দজ্ঞান বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট রজতের স্বীয় অধিষ্ঠান বা আশ্রয়-শুক্তিতেই অভাববোধের উদয় হইয়া থাকে, সুতরাং শুক্তিতে অধ্যস্ত রজত সত্য নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্মুখস্থিত হইয়া, "ইদংরূপে" উহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া

১। (১) ঈশা-ভাষ্য-টীকা, (২) কেনোপনিষদ্ভাষ্য-টীকা, (৩) কেনোপনিষদ্ ভাষ্য-বিবরণ-ব্যাখ্যা, (৪) কঠোপনিষদ্ভাষ্য-টীকা, (৫) মাণ্ডুক্যভাষ্য-ব্যাখ্যা, (৬) মাণ্ডুক্য কারিকার গৌড়পাদীয় ভাষ্য-ব্যাখ্যা, (৭) তৈত্তিরীয়-ভাষ্য-টীকা, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্য-টীকা, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্য-বার্তিক-টীকা, (১০) বৃহদারণ্যক-বার্তিক-টীকা—শাস্ত্রপ্রকাশিকা, (১১) বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-টীকা, (১২) শারীরক-ভাষ্য-টীকা-ন্যায়নির্ণয়, (১৩) গীতা-ভাষ্য-বিবেচন, (১৪) পঞ্চীকরণ-বিবরণ, (১৫) বেদান্ত-তর্ক-সংগ্রহ, (১৬) উপদেশসাহস্রী-টীকা, (১৭) বাক্যবৃত্তি-টীকা, (১৮) আত্মজ্ঞানোপদেশ-টীকা, (১৯) ত্রিপুটী-প্রকরণ-টীকা, (২০) গঙ্গাপুরী ভট্টারকের পদার্থতত্ত্ব নির্ণয়ের বিবরণ, (২১) প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য-টীকা, (২২) ঐতরেয়-ভাষ্য-টীকা, (২৩) শতশ্লোকী-টীকা, (২৪) বেদান্ত-তত্ত্বালোক, (২৫) চুলিকোপনিষদ্-ভাষ্য-টীকা, (২৬) মিতভাষিণী, (২৭) শঙ্কর-বিজয়, (২৮) শঙ্করাচার্যের অবতার কথা, (২৯) গুরুস্তুতি প্রভৃতি গ্রন্থমালা আনন্দ গিরি রচনা করিয়াছিলেন।

উহা অত্যন্ত অসৎও নহে। একই বস্তু একই সময়ে সৎ ও অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং উহাকে অনির্বাচ্যই বলিতে হইবে। অনির্বচনীয় অর্থ এই, যে-কোন রূপেই উহার স্বরূপ নির্বচন করিতে চেষ্টা কর না কেন, কোনরূপেই উহা নির্ণয়যোগ্য হয় না।[১] এই অনির্বচনীয় শুক্তি-রজতের উপাদান অনির্বাচ্য অবিদ্যা। মিথ্যা বস্তুর উপাদান মিথ্যাই হইবে, উপাদান সত্য হইলে উপাদেয়ও সত্যই হইয়া দাঁড়ায়—'নচ অবস্তুনো বস্তু উপাদানম্ উপপদ্যতে'। অধিষ্ঠান-শুক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইলে রজতের অভাববোধের উদয় হয় সুতরাং রজত মিথ্যা; পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হইলে সমস্ত দ্বৈত জগদিন্দ্রজালই অন্তর্হিত হয়, অতএব অনির্বচনীয় শুক্তি-রজতের ন্যায় জগদিন্দ্রজালও অনির্বচনীয় এবং মিথ্যা বলিয়াই জানিবে। এই মিথ্যা বিশ্বপ্রপঞ্চেরও উপাদান অনাদি-অনির্বাচ্য অবিদ্যা। অবিদ্যা ও মায়া ভিন্ন নহে, অভিন্ন। আনন্দজ্ঞানের মতে অবিদ্যা বহু নহে, এক; অবিদ্যার কার্য বহু। এক অবিদ্যারই বহুরূপে ভাতি হইয়া থাকে। অবিদ্যার আশ্রয় সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মাশ্রয়ে বিদ্যমান আছে বলিয়াই অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য—জীব, জগৎপ্রপঞ্চ সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। অপর-দিকে, অবিদ্যা নিজ সংস্পর্শবশতঃ স্বীয় আশ্রয় পরব্রহ্মে জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির বিকাশ ঘটাইতেছে। ফলে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইতেছেন, জগতের সৃষ্টি, লয় প্রভৃতি সাধন করিতেছেন। এক ব্রহ্মই মায়াবশে বহুরূপে প্রকাশিত হন; জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাবের সৃষ্টি করেন। অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, এবং এককে জগতের রঙ্গমঞ্চে বহুরূপে, জীব, জগৎ প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত করে। মূলে একই বিরাজ করে। বহুর অন্তরালে একের অনুসন্ধানই তত্ত্বানুসন্ধান। সর্বত্র এক ব্রহ্মের উপলব্ধি এবং ঐ ব্রহ্মাগ্নিতে বহুর—জীব, জগৎ প্রভৃতি বিভাবের আহুতিই বেদান্তের লক্ষ্য। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হন কিরূপে? আর, অজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের তিরোধান সম্ভব হইলে, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দজ্ঞান বলেন যে, ব্রহ্মের অবিদ্যা সম্বন্ধ মিথ্যা এবং অবিদ্যাবশতঃ একের জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিবিধরূপে ভাতিও মিথ্যা। মিথ্যারূপে ভাতি সত্য, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপের কোন হানি করে না। এক বস্তুতঃ বহু হন না, বহুরূপে প্রতিভাত হন মাত্র। এই ভাতি মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপের প্রচ্যুতি ঘটিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। শুক্তিতে মিথ্যা রজতের ভাতি শুক্তির স্বরূপের হানি সাধন করে কি? এই মিথ্যা আবিদ্যক বিভাবের নিবৃত্তি এবং এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপলব্ধিই বেদান্ত-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে সত্য, শিব-সুন্দরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে, আবিদ্যক জীব ও জগদ্ বিভাবের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই মূলে বিরাজ করিবে।

১। যেন যেন প্রকারেণ পরোনির্বক্তুমিচ্ছতি।
তেন তেনাত্মনা'যোগস্তদনির্বাচ্যতা মতা।। —বেঃ তর্ক সংগ্রহ, ১৩৬ পৃঃ।

অখণ্ডানন্দ

আনন্দজ্ঞানের সমসাময়িক কালেই আনন্দ গিরির শিষ্য অখণ্ডানন্দ পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর তত্ত্বদীপন নামে গভীর, বিচারবহুল এক উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্য-ধারার অশেষ পুষ্টিবিধান করেন। আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ নরেন্দ্র গিরি ঈশা-ভাষ্য-টিপ্পনী প্রভৃতি রচনা করিয়া এবং প্রজ্ঞানানন্দ আনন্দজ্ঞানের বেদান্ত-তত্ত্বালোকের উপর তত্ত্ব-প্রকাশিকা নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন।

রামাদ্বয়

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে অব্যয়াশ্রমের শিষ্য পণ্ডিত রামাদ্বয় বেদান্ত-কৌমুদী রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। রামাদ্বয় স্বীয় বেদান্ত-কৌমুদীর উপর বেদান্ত-কৌমুদী-ব্যাখ্যান নামে এক টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।[১] ঐ টীকায় রামাদ্বয় জনার্দনের নাম করিয়াছেন। জনার্দন আনন্দজ্ঞানের গৃহস্থাশ্রমের নাম। ইহা হইতে রামাদ্বয় যে আনন্দ গিরির পরবর্তী, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। রামাদ্বয়ের বেদান্ত-কৌমুদী চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তর্কের ভিত্তিতে ঐ সকল পরিচ্ছেদে ব্রহ্মসূত্র চতুঃসূত্রীর শঙ্কর-ভাষ্যোক্ত বিষয়বস্তুরই সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বেদান্ত-কৌমুদীতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রমা এবং প্রমাণ-তত্ত্বের (Epistemology) পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রমা ও প্রমাণ-তত্ত্বের বিচারে রামাদ্বয়ের দান শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণযোগ্য। রামাদ্বয়ের পূর্বে পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির পঞ্চপাদিকা এবং বিবরণে, প্রকটার্থ-বিবরণে, বিমুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধিতে, অখণ্ডানন্দের তত্ত্বদীপন প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈতবেদান্তোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ এবং প্রমার স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। রামাদ্বয় তাঁহার গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের স্বরূপের বিশ্লেষণে প্রকটার্থ-বিবরণের ভাব ও ভাষা উভয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন। পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির চিন্তার ছায়াও স্পষ্টতঃ রামাদ্বয়ের বেদান্ত-কৌমুদীতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপঞ্চপাদিকা-বিবরণের প্রত্যক্ষ নিরূপণের শৈলী যে অতি অপূর্ব, তাহা আমরা এই গ্রন্থের ১০ম পরিচ্ছেদে (১৮১-৮২ পৃঃ) বিবরণোক্ত বেদান্তমতের বিচারপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি।

১। বেদান্ত-কৌমুদী এবং বেদান্ত-কৌমুদী-ব্যাখ্যান অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। Madras Government Oriental Manuscript Licraryতে বেদান্ত-কৌমুদীর হস্তলিখিত আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে বেদান্ত-কৌমুদী-ব্যাখ্যানের প্রথম অধ্যায়ের অনুলিপি পাওয়া যায়। ঐ অনুলিপির শেষে যে তারিখ দেখা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, শেষ নৃসিংহ নামক জনৈক আচার্য ষোড়শ শতকের প্রথমে (A. D. 1512) টীকার ঐ অংশ নকল করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেদান্ত-কৌমুদী যে ১৫শ শতকের পরবর্তী কালের রচনা নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায়।

প্রকাশাত্মযতির প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়া বেদান্ত-কৌমুদীর প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বিচার করিলে, প্রকাশাত্মযতির নিকট রামাদ্বয় কতখানি ঋণী, তাহা সুধী পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বিমুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধির দার্শনিক মতও রামাদ্বয়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি বহুস্থলে বিমুক্তাত্মনের মত উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্ত-কৌমুদীতে পূর্ববর্তী বৈদান্তিক আচার্যগণের চিন্তার ছায়া লক্ষিত হইলেও, রামাদ্বয়ের এই কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য যে, তিনি তাঁহার বেদান্ত-কৌমুদীতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রমা ও প্রমাণ-তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামাদ্বয়ের পূর্বপর্যন্ত কোন গ্রন্থেই প্রমাণ-তত্ত্বের এইরূপ পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। প্রকাশাত্মযতি, প্রকটার্থ-বিবরণকার এবং রামাদ্বয়ের বিচার-শৈলী অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষা রচনা করিয়া নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদান্তোক্ত প্রমাণ-তত্ত্বের এক সর্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। রামাদ্বয়ের বেদান্ত-কৌমুদী প্রমাণ-তত্ত্বের তমসাচ্ছন্ন পথে যে নির্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

প্রমাণের স্বরূপ বিচারে প্রথমতঃ "প্রমার" কথাই মনে পড়ে। প্রমার পরিচয় দিতে গিয়া রামাদ্বয় নৈয়ায়িকমতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, "যথার্থানুভবঃ প্রমা," অর্থাৎ যে-জ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুটি যেইরূপ, সেইরূপেই যদি উহা অনুভবের বিষয় হয়, তবেই সেই জ্ঞান প্রমা বা সত্যজ্ঞান বলিয়া জানিবে।

বেদান্ত-কৌমুদীর প্রমার লক্ষণ।

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে-জ্ঞানের বিষয়টি পূর্বে জ্ঞাত ছিল না এবং যেই জ্ঞানের বিষয়টি পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, এইরূপ জ্ঞানই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান—'স্মৃতিব্যাবৃত্তং প্রমাত্বম্ অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্', (বেদান্ত-পরিভাষা ১৫ পৃঃ), [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত]। এই দুইটি লক্ষণের তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রমার স্বরূপ নির্বচনে রামাদ্বয় ন্যায়-বৈশেষিকের অনুকরণে জ্ঞেয় বিষয়ের যথার্থতা এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সারূপ্যের (correspondence) প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিয়াছেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র পূর্বের অনবগতি এবং বাধাভাবকে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলায়, প্রমার নির্বচনে জ্ঞাতার প্রাধান্যই বজায় রাখিয়াছেন। কেননা, পূর্বতন, অনবগতি ও বাধাভাব প্রভৃতির জ্ঞাতার নিকটই স্ফুরণ হইয়া থাকে। যেরূপেই বিচার করি না কেন, এই প্রমাজ্ঞান যে অদ্বৈতবেদান্তের মতে চরম সত্য নহে, ইহা যে আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেদান্তের পরিভাষায় এইরূপ জ্ঞান অধ্যস্তজ্ঞান। অধ্যাস অজ্ঞানমূলক; যে-পর্যন্ত আবিদ্যক অধ্যাস বা অজ্ঞানের খেলা চলে, মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে, সেই পর্যন্তই এই জ্ঞান সত্য বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাস ভাঙ্গিয়া গেলে, মনোবৃত্তি বিলীন হইলে, জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এই ত্রয়ীর বোধ তিরোহিত হইবে। তখন এক অখণ্ড, স্বয়ংজ্যোতিঃ, চিদানন্দ-ঘন পরব্রহ্মই বিরাজ করিবে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় তুল্যরূপ না হইলে, সেখানে জ্ঞান বাধিত হয়। বিষয়ের অবাধ বা যাথার্থ্যই জ্ঞানের সত্যতার পরিচায়ক, ইহা রামাদ্বয় ও

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র উভয়েই ভাষান্তরে মানিয়া লইয়াছেন। প্রমাজ্ঞানকে যে পূর্বের অজ্ঞাত বা অনধিগত বিষয়সম্পর্কেই উদিত হইতে হইবে, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের এই "অনধিগত" বিশেষণটি মানিয়া লইতে রামাদ্বয় কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। রামাদ্বয় তদীয় বেদান্ত-কৌমুদীতে ধারাবাহিক জ্ঞানে এবং পূর্বে জ্ঞাত বা দৃষ্ট বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া "অনধিগত" বিশেষণটি ত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'অজ্ঞাত-জ্ঞাপনং প্রমাণমিতি তদসারম্' (বেদান্ত-কৌমুদী, পুথি ১৮ পৃঃ)। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র "অনধিগত জ্ঞান" বলিয়া স্মৃতিজ্ঞান ভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানকে বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে যেই জাতীয় জ্ঞান অধিগত বা পূর্বে জ্ঞাত হইয়াই উৎপন্ন হয়, সেই জাতীয় জ্ঞান (অর্থাৎ স্মৃতিজ্ঞান) ভিন্ন জ্ঞানই অনধিগত জ্ঞান। স্মৃতিজ্ঞান অধিগত বা জ্ঞাত বিষয়সম্পর্কেই উদিত হইয়া থাকে। যে-বিষয় পূর্বের জানা বা দেখা নাই, সেই বিষয়ে কখনও কাহারও স্মৃতি হয় না। সুতরাং "অধিগত জ্ঞান" বলিলে একমাত্র স্মৃতিজ্ঞানকেই বুঝায়, স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানই অনধিগত জ্ঞান। ধারাবাহিক জ্ঞান বা একই বিষয়সম্পর্কে উৎপন্ন পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান স্মৃতিজ্ঞান নহে বলিয়া, উহা "অনধিগত" জ্ঞানই হইবে। ঐরূপ জ্ঞান প্রমা হইতে কোনও বাধা নাই। প্রমাজ্ঞানের যাহা করণ বা সাধন, সেই প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিই প্রমাণ।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের স্বরূপ বিচার।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যে জ্ঞাতা পুরুষের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞেয় বিষয়টি প্রতিভাত হয়; এবং দ্রষ্টা পুরুষ "আমি ইহা দেখিয়াছি" এইরূপ অনুভব করেন। এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এই ত্রয়ীরই স্পষ্টতঃ ভাতি হইয়া থাকে। চৈতন্য ব্যতীত অদ্বৈতবেদান্তের মতে অপর কাহারও বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। চৈতন্যই একমাত্র আলোক, চৈতন্য ব্যতীত অপর সকল জড় বস্তুই অন্ধকার সদৃশ। জড় বিষয়ের যে প্রকাশ হইয়া থাকে, সেখানে জড়ের মধ্য দিয়া চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বিষয়টি জ্ঞানে অধ্যস্ত বা কল্পিত হয়। বিষয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের প্রকাশই বিষয়ের প্রকাশ। বিষয়-পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের ঐরূপ প্রকাশের দ্বারা বিষয়টিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হয়। জ্ঞাতার অন্তঃকরণই বিষয় প্রকাশের দ্বার। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সাহায্যে জ্ঞাতা দূরস্থিত বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ ঘটিলেই, সত্ত্বগুণপ্রধান স্বচ্ছ অন্তঃকরণ দূরবিসারী আলোকরেখার ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে বহির্গত হইয়া বিষয় যেই স্থানে বিদ্যমান থাকে, সেই স্থানে গমন করে এবং ঐরূপে জ্ঞাতা পুরুষ ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে যোগ সাধন করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে অন্তঃকরণের আলোকরেখার আকারে বহির্গমনকেই অন্তঃকরণের বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা; এবং অন্তঃকরণের বৃত্তির অন্তরালে যেই চৈতন্য বিরাজ করে, সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাণ-চৈতন্য বলিয়া পরিচিত। ঐ বৃত্তি-চৈতন্য বা প্রমাণ-চৈতন্যই প্রমেয়ের সহিত প্রমাতার সংযোগ ঘটায়। ঐরূপ সংযোগের ফলে প্রমাতৃ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য সংযুক্ত হয় এবং উহাদের ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া অভেদবোধের উদয়

হয়। ইহারই ফলে জ্ঞাতা ''আমি বিষয় জানিয়াছি'' এইরূপে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। 'বৃত্তেরুভয়সংলগ্নতয়া তদভিব্যক্ত চৈতন্যস্যাপি তথাত্বেন ময়েদং বিদিতমিতি সংশ্লেষপ্রত্যয়ঃ', (বেদান্তকৌমুদী, পুঁথি, ৩৬ পৃঃ)। যেই মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয়, ঐ সংযোগ অন্তঃকরণের মধ্যে একপ্রকার আলোড়ন জাগাইয়া তোলে। ঐ আলোড়নের ফলে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হয়। অন্তঃকরণের অন্তরালে অন্তঃকরণের ভাসক যে চৈতন্য আবৃত চৈতন্যের ন্যায় বিরাজ করে, অন্তঃকরণের বৃত্তিবশতঃ ঐ চৈতন্যই উজ্জ্বলিত হইয়া উহার অজ্ঞানের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হয় এবং বৃত্তিপথে বিষয়সংযুক্ত হইয়া বিষয়ের আবরণ বিধ্বস্ত করিয়া বিষয়কে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত করে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্বদা-প্রত্যক্ষ। জ্ঞান কখনও অপ্রত্যক্ষ থাকে না। ঐ সদা-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞেয় বিষয়ও যখন অভেদসম্বন্ধে অন্বিত হয়, তখন জ্ঞেয় বিষয়ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের গোচর হয়। বেদান্তপরিভাষায় আমরা প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য, এই ত্রিবিধ চৈতন্যের পরিচয় পাইয়াছি। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য, অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ-চৈতন্য এবং বিষয়-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়-চৈতন্য। একই চৈতন্য ত্রিবিধ উপাধিবশতঃ তিনপ্রকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ স্বীয় বৃত্তিবশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে দীর্ঘ আলোকরেখার আকারে বহির্গত হইয়া দূরস্থিত বিষয়ের নিকট গমন করে এবং ঘটাদি জ্ঞেয় বা দৃশ্যবস্তুর আকার গ্রহণ করে। ফলে, বিষয়-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হইয়া যায়। অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ হওয়ায়, অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিতও বিষয়-চৈতন্যের এবং বিষয়ের অভেদ হইয়া থাকে। ঘটাদি জড় বিষয়ও যখন প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায়, তখন চৈতন্যের প্রত্যক্ষের দ্বারা জড় বিষয়ও সাক্ষাদ্‌ভাবেই প্রত্যক্ষের গোচর হয়, ইহাই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে বিষয়-প্রত্যক্ষের রহস্য। 'ঘটাদে র্বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বন্তু প্রমাত্রভিন্নত্বম্', (বেদান্তপরিভাষা, ৩৩ পৃঃ)। প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত জড় ঘটাদি বস্তুর অভেদ সম্ভব হয় কিরূপে? তারপর, ''আমি ঘট'' এইরূপে তো কেহ বিষয় প্রত্যক্ষ করে না, ''আমি ঘট দেখিতেছি'' এইরূপে আমা হইতে ভিন্ন হইয়াই তো ঘটাদি বিষয় প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন, প্রমাতা বা প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত জড় ঘটাদি বস্তুর যে অভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, প্রমাতৃ-চৈতন্যের অস্তিত্ব ব্যতীত জড় ঘটাদির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়াই বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘটাদি জড় বস্তু ঘট-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত বা কল্পিত। অধ্যাসবশে ঘট-চৈতন্য ও ঘটের অভেদ সাধিত হয়। অন্তঃকরণ-বৃত্তিবশতঃ ইন্দ্রিয়-পথে বহির্গত হইয়া দৃশ্য বিষয়ের আকার গ্রহণ করে বলিয়া, অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়-চৈতন্য যে অভিন্ন হইবে তাহাতে আপত্তি কি? প্রমাণ-চৈতন্য বা অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য অভিন্ন হইলে, অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য বা প্রমাতৃ-চৈতন্যও স্বীয় বৃত্তি দ্বারা বিষয়-চৈতন্যের

সহিত অভিন্নই হইবে। এইরূপে বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ সিদ্ধ হওয়ায়, (বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত) বিষয়ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্নই হইয়া যাইবে। প্রমাতার অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না। সুতরাং প্রমাতৃ-চৈতন্যের প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা বলিয়া জানিবে। প্রমাতার সহিত অভিন্ন হইয়া বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে, "আমি ঘট" (অহংঘটঃ) এইরূপে জ্ঞানোদয় না হইয়া "এইটি ঘট" (অয়ংঘটঃ) এইরূপে আমা হইতে ভিন্নরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, যেই বস্তুসম্পর্কে যে-প্রমাতার যেই প্রকার পূর্বতন সংস্কার অন্তঃকরণে বিদ্যমান আছে এবং যেই আকারে অন্তঃকরণের বৃত্তির উদয় হইয়াছে, (অন্তঃকরণের বৃত্তির উদয়ে সেই সুপ্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া) সেই আকারের অনুরূপেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে। বৃত্তিজ প্রত্যক্ষের ইহাই রহস্য যে, বৃত্তি পূর্বতন সংস্কারের অনুরূপই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। যেখানে "ইদং রূপে" অন্তঃকরণ-বৃত্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে ইদংরূপেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে, অহংরূপে হইবে না। উল্লিখিত দৃষ্টিতেই প্রকাশাত্মযতিও তদীয় বিবরণে বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন। (বিবরণ, ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যে-জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বের মূলে যে জ্ঞান বিরাজ করিতেছে, তাহার সহিত অভিন্ন হইয়াই বিষয় প্রকাশিত হইবে, নতুবা তমঃস্বরূপ জড় বিষয়ের প্রকাশ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হয় না। রামাদ্বয়ও উল্লিখিত দৃষ্টিতেই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন। রামাদ্বয়ের মতেও বৃত্তির সাহায্যে বিষয়-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ সিদ্ধ হওয়ায় এবং প্রমাতৃ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্যের সংযোজকরূপে বৃত্তি বিরাজ করায়, "আমি বিষয় দেখিয়াছি" এইরূপে আমা হইতে ভিন্নরূপেই বিষয় প্রত্যক্ষের গোচর হইয়া থাকে। বিষয়গত অজ্ঞান নিবৃত্তি করতঃ জ্ঞেয় বিষয়কে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়া বিষয় ও জ্ঞাতার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বৃত্তিই প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিষয়গত অজ্ঞান বিভিন্ন। যখনই কোনও বিষয়সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই ঐ জ্ঞেয় বিষয়ের আবরক অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উহা উৎপন্ন হয়। "যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্তি অজ্ঞানানি"। বিষয় সকল অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকে, ইহাই রামাদ্বয়ের সিদ্ধান্ত। আনন্দজ্ঞানের মতে আমরা দেখিয়াছি যে, অজ্ঞান এক, বহু নহে, অজ্ঞানের কার্য বহু। আনন্দজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত রামাদ্বয় গ্রহণ করেন নাই। রামাদ্বয় বিষয়-ভেদে ও জ্ঞান-ভেদে অজ্ঞানের ভেদই উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধারাবাহিক জ্ঞানস্থলে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র অন্য জাতীয় বিরোধী বৃত্তিজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত একটি বৃত্তিই অঙ্গীকার করিয়াছেন, বৃত্তির ভেদ স্বীকার করেন নাই। রামাদ্বয় সে-ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে নবীন বৃত্তির উৎপত্তি এবং ঐ বৃত্তি-জন্য ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় ও লয় অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানই তাঁহার মতে বিভিন্ন অজ্ঞান-বৃত্তিকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়াছে। জ্ঞানের ধারা চলিতে থাকায় বৃত্তি-ভেদ এবং বিভিন্ন অজ্ঞান-বৃত্তির নিবৃত্তি আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই। বৃত্তি-ভেদে অজ্ঞান-ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। বিভিন্ন অজ্ঞান-বৃত্তির সমূলে নিবৃত্তি হইলে এক

অখণ্ডব্রহ্ম-চৈতন্যই বিরাজ করিবে। সেই অখণ্ড পরমাত্ম-চৈতন্যের সাক্ষাৎকারই বেদান্ত-জিজ্ঞাসার চরম লক্ষ্য।[১]

জয়তীর্থ

খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৩১৭—১৩৮০ খৃষ্টাব্দে) অক্ষোভ্য মুনির শিষ্য দ্বৈতবেদান্তের অন্যতম প্রধান আচার্য জয়তীর্থ আবির্ভূত হন। বিদ্যারণ্য-স্বামী তৎকৃত সর্বদর্শন-সংগ্রহে মধ্বমতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে জয়তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়তীর্থ নব্যন্যায়ে অসামান্য পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মধ্বাচার্যের রচিত বিভিন্ন ভাষ্যের টীকা এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থমালা প্রণয়ন করিয়া মধ্বমতের অশেষ পুষ্টি সাধন করেন এবং অদ্বৈতমত ছিন্ন ভিন্ন করেন। ইনি মধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপর তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকা এবং মধ্বমতানুসারে স্বাধীন-ভাবে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা—ন্যায়সুধা, মধ্বাচার্য-প্রণীত তত্ত্বোদ্দ্যোতের ব্যাখ্যা—তত্ত্বোদ্দ্যোত-টীকা, মধ্বাচার্যের তত্ত্বসংখ্যানের ব্যাখ্যা—তত্ত্বসংখ্যান-টীকা, তত্ত্ব-বিবেকের ব্যাখ্যা—তত্ত্ববিবেক-টীকা, প্রমাণ-লক্ষণ-টীকা, ঋগ্‌ভাষ্যের টীকা, প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-টীকা, গীতা-তাৎপর্যনির্ণয়ের টীকা, মায়বাদ-খণ্ডন-টীকা, বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়-টীকা উপাধি-খণ্ডন-টীকা, ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য-টীকা, প্রশ্নভাষ্য-টীকা, বাদাবলী, (বাদাবলী শঙ্করের মত খণ্ডন ও মধ্বমত স্থাপনের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়। ইহা অতি সূক্ষ্ম বিচার-বহুল নিবন্ধ। এই বাদাবলীকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী শতকে ব্যাসরাজ স্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ খণ্ডনগ্রন্থ ন্যায়ামৃত রচনা করেন।) প্রমাণ-পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া মধ্বমতের পূর্ণতা সাধন করেন। আনন্দজ্ঞান সমগ্র শাঙ্কর-ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়া শঙ্কর-বেদান্তে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, জয়তীর্থও মধ্বাচার্যের বিভিন্ন ভাষ্যের টীকা ও স্বতন্ত্র গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া দ্বৈতবেদান্তে সেইরূপ উচ্চস্থানই লাভ করিয়াছেন। জয়তীর্থ মধ্বমতের একটি স্তম্ভবিশেষ। তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্রই পরিস্ফুট। অদ্বৈতমত খণ্ডন ও স্বীয় পক্ষ স্থাপন, এই উভয় অংশেই জয়তীর্থের প্রতিভা অতুলনীয়। জয়তীর্থ অদ্বৈতবেদান্তের ব্যূহ আক্রমণ করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী, আনন্দজ্ঞান, অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়-পতাকা বহন করেন।

১। রামাদ্বয় ও ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের প্রমাণ-বিচারের শৈলী আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রমাণ তত্ত্বের (Epistemology) বিচার-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখুন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই সময়েই বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব রঘুনাথ মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের গোড়া পত্তন করেন। রঘুনাথের প্রদীপ্ত প্রতিভার অবদানে ন্যায়ের ক্ষেত্র নব নব সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া গৌরবোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নবদ্বীপ প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থে পরিণত হইল। রঘুনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকা রচনা করিয়া ন্যায়-চিন্তার এক নবরূপ দান করেন। তিনি শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দীধিতির প্রারম্ভে "অখণ্ডানন্দবোধায় নিত্যায় পরমাত্মনে" বলিয়া সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, পরব্রহ্মকে নমস্কার করিয়া অদ্বৈত-বেদান্তবাদের প্রতি তাঁহার মনের গোপন প্রীতি নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রঘুনাথ শিরোমণিরই সমসাময়িক কালে প্রেমের অবতার, কাঙালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-দেব জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীক্ষেত্রে দেহরক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমগ্র বাংলা দেশ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ভক্তি-প্রবাহ প্রেমের রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বেদান্তবাদে অনেকের মতে মধ্বাচার্যের মতানুগামী ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি নিম্বার্কের মতাবলম্বী। মহাপ্রভু বেদান্তের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। তিনি উহার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। প্রসিদ্ধি আছে, বেদব্যাস পুরাণ-ইতিহাস, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি রচনা করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিসের অভাবে তাঁহার মন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় তিনি সমাধিযোগে আত্মস্থ হইলেন। সহসা তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদ্‌-ভাগবতের মাধুর্যমণ্ডিত পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হইল। তাঁহার মন প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া তিনি যে তত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই চিদানন্দঘন সবিশেষ তাৎপর্য তিনি খুঁজিয়া পাইলেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরব্রহ্মতত্ত্বে। অতএব ব্যাসদেব-প্রণীত শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড়পুরাণও শ্রীমদ্‌ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীও তদীয় "ষট্‌সন্দর্ভে"র প্রথম সন্দর্ভে "ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ"।

এইরূপ উক্তি দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্যার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব মনে করিতেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বর্ণিত আছে বেদান্ততত্ত্বের শেষ কথা। উহাতেই বিধৃত আছে সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যের অফুরন্ত প্রবাহ। রসময় শ্রীকৃষ্ণই অখিল রসের মূর্ত বিগ্রহ এবং শক্তিমান্‌-রূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব। আর, জীব ও জগৎ তাঁহারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শক্তি। সেই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ—শ্রীমদ্‌ভাগবতেই মহাপ্রভু এই তথ্য আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধুর ভাবধারা এবং তদুপযোগী দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য চৈতন্যদেবের জীবনে ও সাধনায় যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বস্তুতই অসামান্য। জাতীয় জীবনে তিনি সেই রসামৃত ধারার প্লাবন জাগাইয়াছিলেন। সমগ্র জাতি তাঁহার প্রচারিত প্রেমের আদর্শে ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার প্রেমের আঙিনায় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি নাম-প্রেমের মালা গাঁথিয়া আচণ্ডালের গলে দোলাইলেন।

প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কালক্রমে কাব্য, দর্শন, ভক্তিরস ও সাধনমার্গে সংস্কৃত ও বাংলা—এই উভয় ভাষায় বিবিধ গ্রন্থরাজি রচিত হয়। চৈতন্যদেব নিজে প্রথম জীবনে আদর্শ অধ্যাপক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর হইতে তাঁহার জীবনে অদ্ভুত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভাবে তন্ময় হইয়া পড়েন। ইহার পরই তাঁহার অধ্যাপন-লীলা পর্বের সমাপ্তি ঘটে। উত্তর জীবনে তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ায় শ্রীশ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসী হন এবং তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি নিজে সাক্ষাদ্‌ভাবে খুব কম গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর এবং মহত্তর কাজের ভার তাঁহার উপর। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভাব নিজের অধ্যাত্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ভাবাদর্শ সমগ্র জাতির জীবনে নিজ আচরণের দ্বারা প্রসারিত করাই তাঁহার জীবনব্রত। তবুও শাস্ত্র-প্রচারের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। উপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই সূত্রাকারে, সিদ্ধান্তের উপদেশ দিয়া শাস্ত্ররচনার ভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে এবং শ্রীরূপের অগ্রজ সনাতন গোস্বামীকে কাশীধামে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও সাধনা বিষয়ে স্বয়ং শিক্ষা দান করেন এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে এই তত্ত্ব-প্রচারের প্ররোচনা দান করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব 'শিক্ষাষ্টক' নামক স্বরচিত আটটি শ্লোকে সমগ্র বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-স্মৃতি পঞ্চরাত্র প্রভৃতির সারমর্ম এবং জীব-জীবনের চরম ঋদ্ধির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা-পদ্ধতি এমনই অপূর্ব ছিল যে, তিনি পুরীধামে নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকে এবং কাশীতে অসামান্য বৈদান্তিক শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বেদান্তসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যা শুনাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিভূত করেন। চৈতন্যদেবের প্রচারিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বই যে ব্রহ্মসূত্রের রহস্য ইহা তিনি নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করেন। তাঁহার প্রবর্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই শ্রীরূপ-সনাতন এবং বিশেষ করিয়া রূপ-সনাতনের

সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় গ্রন্থরাজিতে নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি ও কৃপা লাভ করিয়াই শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামিগণ ভাগবতের মধুর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য এবং দর্শন রচনা করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য এবং দর্শনের ভাণ্ডারে গোস্বামিগণের দান অমূল্য। তাঁহারা সকলেই ছিলেন সুপণ্ডিত, ভাবুক কবি, দার্শনিক ও সাধক। শ্রীসনাতন গোস্বামী তদীয় বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য আলোচনা করেন। তিনি বৈধী ভক্তির যাবতীয় রীতি-নীতি ও ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করেন—হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে ও উঁহার স্বরচিত দিগ্‌দর্শনী টীকায়। ঐ মহাগ্রন্থ বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি বা বৈষ্ণব স্মৃতি বলিয়া সমাদৃত। শ্রীরূপ গোস্বামী ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রণয়ন করেন। অখিল রসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের সহিত ভক্তিরসের কি সম্বন্ধ? জীবের সাধনপথে তাহার স্থান কোথায়? রসানুগা ভক্তি কিরূপে ভাবভক্তিতে পরিণতি লাভ করিতে পারে এবং কি প্রকারে সাধক ভাগবতবর্ণিত ব্রজভাবের অনুগত হইয়া আনন্দময়ের অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতে পারেন, শ্রীরূপ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তাহারই সন্ধান দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থটির উপর শ্রীজীব গোস্বামী রচনা করেন—'দুর্গমসঙ্গমনী" নামে টীকা এবং পরবর্তী কালে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণয়ন করেন—"ভক্তিসারপ্রদর্শনী" নামে টীকা। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরই পরিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের অত্যুজ্জ্বল ব্রজ-ভাবরসের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী গোপীদের অপ্রাকৃত প্রেমমাধুরী, হাবভাব-হেলাদি, বিলাস-বিচ্ছিত্তি ও কিলকিঞ্চিৎ ভাবরস প্রভৃতির চমৎকারিতা দেখাইয়াছেন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি এই দুইখানি মহাগ্রন্থ ভক্তিরস শাস্ত্রের বেদস্বরূপ। শ্রীরূপের প্রণীত "লঘুভাগবতামৃতে" ধামতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, প্রকট ও অপ্রকট লীলাতত্ত্ব প্রভৃতির হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দৃষ্ট হয়। ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলি কৌমুদী এই তিনখানি নাট্যগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের নাট্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপের রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিও প্রসিদ্ধ :—হংসদূত (গীতিকাব্য), উদ্ধবসন্দেশ, স্তবমালা, নাটকচন্দ্রিকা, পদ্যাবলী (সংগৃহীত কোষ কাব্য), রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ইত্যাদি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের আলোচিত সিদ্ধান্ত বিবিধ প্রকরণগ্রন্থে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রীজীব গোস্বামীর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, কোষ, চম্পূ, স্তব, টীকা, ভাষ্য এবং দর্শন শাখায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সুধীসমাজে সুপরিচিত—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গণধাতুসংগ্রহ, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ভক্তিরসামৃতশেষ, মাধবমহোৎসব, গোপাল চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর), ব্রহ্মসংহিতা (পঞ্চমাধ্যায়) টীকা—দিগ্‌দর্শনী, দুর্গমসঙ্গমনী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা), লোচনরোচনী (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা), ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা), সুখবোধিনী (গোপালতাপনী-টীকা), শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসমাহার, রাধিকাকরপদচিহ্নসমাহৃতি, পদ্মপুরাণস্থ

যোগসার স্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীভাষ্য, রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, সূত্রমালিকা, লঘুতোষিণী (ভাগবতের টীকা) এবং তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ (ছয়টি একত্রে ষট্সন্দর্ভ বা ভাগবতসন্দর্ভ), আলোচ্য ষট্সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ এই চারিটির অনুব্যাখ্যা সর্বসংবাদিনী। তাঁহার প্রণীত 'ষট্সন্দর্ভ' ও 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে শ্রীজীব অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজমান সেই সম্বন্ধই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের ভিত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুই ব্রহ্মসূত্রের আলোচনায় এই মতবাদের সূচনা করেন, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্মসূত্রের যে স্বাভাবিক মুখ্য অর্থ মৌলিক শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা ও বিভিন্ন প্রকরণগ্রন্থের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই মুখ্য অর্থের তত্ত্ব আবিষ্কারের পথেই মহাপ্রভু শক্তি ও শক্তিমানের এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণী টীকায়, শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভ ও সর্বসংবাদিনী ব্যাখ্যায় মহাপ্রভুর প্রচারিত তত্ত্বের সঙ্কেত পাওয়া যায়। শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত যে অর্থ নির্দিষ্ট আছে —"বৃংহতি বৃংহয়তি চ"—ইহাই হইল (ব্রহ্ম শব্দের) মুখ্য অর্থ। যিনি নিজে বড় এবং যিনি অপরকেও বড় করেন তিনিই ব্রহ্ম। বিষ্ণুপুরাণেও (১,১২,৫৭) বলা হইয়াছে—

"বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।"

যিনি নিজে বড় এবং অপরকেও বড় করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই বড় করিয়া তোলার শক্তি আছে। অতএব তিনি অসামান্য শক্তিমান্। ইহা শুধু কল্পনাবিলাস নহে। শ্রুতি স্পষ্টতঃই তাঁহার অসমোর্ধ্ব শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে তাঁহার পরাশক্তির কথা শুনা যায়—

"পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥" (শ্বেতাশ্ব ৬।৮)।

ব্রহ্ম সবিশেষ-তত্ত্ব। তিনি রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ," (তৈত্তিরীয় ২।৭)। সর্বজ্ঞতা, সত্যস্বরূপতা বা আনন্দরূপতা নির্বিশেষ বস্তুতে নাই। পরব্রহ্ম যে চিদ্বিলাস, লীলাময় তাহাও "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) এই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার লীলা দুইপ্রকারে নিষ্পন্ন হয়—একটি তাঁহারই মায়াদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ লীলা প্রকটিত হয়, আর একটি তাঁহারই স্বরূপশক্তিময়ী লীলা, যাহাতে তিনি একাধারে আনন্দের আস্বাদ্য এবং আস্বাদয়িতারূপে তাঁহার পরিকরবৃন্দ লইয়া বিলাস করেন। এইরূপে অসীম অনন্ত শক্তির তিনিই মূল কেন্দ্র বা আশ্রয়। পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তিই প্রধান। পরাশক্তি (চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি), জীবশক্তি (বা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি) এবং মায়াশক্তি। জীব এবং জগৎ উভয়ই হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি। আর পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্বশক্তিমান্।

জীবশক্তির অংশরূপেই অনন্ত কোটি জীবের সত্তা। জীবশক্তির কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।। গীতা ৭।৫।

জগৎও যে তাঁহারই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম, গীতার উক্তি হইতে তাহাও নিঃসংশয়ে জানা যায় :—

ভূমিরাপো'নলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। গীতা ৭।৪।

ব্রহ্মের মায়াশক্তির কথা শ্রুতিতেও শুনা যায় :—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।। শ্বেতাশ্ব ৪।১০।

এইরূপে নিখিল বিশ্বের সহিতই পরব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিমান্-রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজমান তাহার স্বরূপটি কিরূপ? এই প্রশ্নেরই সমাধান প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন—উহা ভেদসম্বন্ধও নহে, অভেদসম্বন্ধও নহে, ভেদাভেদসম্বন্ধও নহে; কিন্তু উহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। শক্তিমান্ হইতে তাঁহার শক্তিকে কোনক্রমেই পৃথক্ করা যায় না। অগ্নির দাহিকা-শক্তি অগ্নিতে সদাই বিদ্যমান। দাহিকাশক্তিরহিত অগ্নির কল্পনাও করা যায় না। শক্তিমান্ বস্তুটি বিশেষ্য, শক্তি তাহার বিশেষণ। বিশেষ্য-বিশেষণের এই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। স্বরূপকে কার্যোন্মুখ বা প্রকাশোন্মুখ করিয়া তোলাই শক্তির শক্তিত্ব। —"স্বরূপস্য কার্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং ন স্বতঃ" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় সর্ব-সংবাদিনী, ৩৬ পৃঃ, সাহিত্য পরিষৎ সং)। কার্যোন্মুখ বিশেষ্যকেই বলা যাইতে পারে বিশেষণ। অতএব উভয়ে মিলিয়া মিশিয়াই হইল একটি বস্তু। অগ্নি ও উত্তাপ, সূর্য ও কিরণ, কস্তূরী ও গন্ধ, ইহারা উভয়ে পরস্পর মিলিয়াই অগ্নি, সূর্য ও কস্তূরীরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ইহা হইতে যেন মনে হয়, শক্তি ও শক্তিমানের সম্পর্ক এক বা অভিন্ন। শক্তিকে যেন শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করা যায় না। ফলে, ইহাদের অভেদসম্পর্কই স্বীকার করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে কেবল অভেদসম্পর্কই স্বীকৃত হয় নাই। শক্তি ও শক্তিমানের যদি ভেদই না থাকে তাহা হইলে শক্তিকেই বা পৃথগ্‌ভাবে স্বীকার করিয়া লাভ কি? প্রতিবাদীর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামী বলেন :—

"ইতি মতং তু ন বেদান্তিনাং মতম্, সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা
শক্তিস্তম্ভাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ।" (সর্বসংবাদিনী)

ইহা বেদান্তিগণের অভিমত নহে। কারণ, মন্ত্রাদির প্রভাবে অনেক সময় শক্তির প্রকাশ চাপা পড়ে কিন্তু বস্তুটি থাকিয়াই যায়। অতএব শক্তি ও শক্তিমান্ এক এবং অভিন্ন—এমন কথা বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে অগ্নির দাহিকাশক্তিকে

স্তিমিত করিয়া রাখা যায়। সেক্ষেত্রে উহার স্পর্শে কোন কিছু পুড়িয়া যাইতে পারে না, কিন্তু আগুন দেখা যায়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ বলিয়াই গণ্য করা উচিত।

শক্তি ও শক্তিমানের এই যে অভেদ ও ভেদ, এই উভয়বিধ সম্পর্কের প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া পরব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ভেদাভেদ সম্বন্ধটি তাঁহাদের মতে "অচিন্ত্য" বা চিন্তার অতীত। তর্ক বা চিন্তার দ্বারা ইহাকে (জীব ও পরব্রহ্মের সম্বন্ধকে) ঠিক ভেদও বলা যায় না, আবার অভেদও বলা যায় না। এইজন্য উহাকে বলা হয় "অচিন্ত্য"।

"তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ অভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতো র্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চাচিন্ত্যৌ ইতি।" (জীবগোস্বামিকৃত সর্বসংবাদিনী, ৩৬-৩৭ পৃঃ)।

শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না বলিয়া ভেদ প্রতীতি হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীতি হয়। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ, উহা চিন্তার অতীত বা অচিন্ত্য সন্দেহ নাই। কস্তুরীর দৃষ্টান্তদ্বারাই এই তথ্যটিকে সহজভাবে বোঝা যায়। কস্তুরীর গন্ধ কস্তুরীতেই আছে। সুতরাং মনে হয় যেন কস্তুরী ও উহার গন্ধের মধ্যে কোনই ভেদ নাই, উহা এক বা অভিন্ন। কিন্তু এইরূপ অভেদ স্বীকারেও সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, কস্তুরীর গন্ধ কস্তুরীর আশে পাশেও ছড়াইয়া পড়ে। কস্তুরীর বাহিরেও যখন কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যায়, তখন উহাদের অভেদসম্পর্কই বা মানা যায় কিরূপে? তাহা হইলে বলিতে হয়, কস্তুরী ও উহার গন্ধের মধ্যে ভেদ আছে। ইহাতেও আর এক সমস্যা দেখা দেয়। কস্তুরী ও উহার গন্ধের মধ্যে ভেদ থাকিলে কস্তুরীর উপাদান ও তাহার গন্ধের উপাদানের মধ্যেও যে ভেদ থাকিবে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেননা, উপাদানভেদই বস্তুভেদের কারণ (বা নিয়ামক)। বিভিন্ন উপাদানে বস্তু গঠিত হইলে, সেই বস্তুও ভিন্নই হইবে, কদাচ অভিন্ন হইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে সগন্ধ কস্তুরীর গন্ধ বাহির হইয়া গেলে, আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িলে কস্তুরীর ওজন কমিয়া যাওয়া উচিত ; কিন্তু দেখা যায়, কস্তুরীর ওজন উহাতে কমে না। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, কস্তুরী ও উহার গন্ধের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ কল্পনা করাও যেমন কঠিন, ভেদ সম্বন্ধ সুস্থির করাও তেমনই কঠিন। কিন্তু চিন্তায় ভাসে না বা চিন্তা করিতে পারা যায় না বলিয়াই যে সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধকে অস্বীকার করিতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই।

আচার্য শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের--

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।" (১।৩।২)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—লৌকিক জগতে দেখা যায় মণি-মন্ত্র প্রভৃতি বস্তুর শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞানের গোচর। অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কাসহ—যুক্তিতর্কের দ্বারা যাহার নিরূপণ সম্ভবপর হয় না, এইপ্রকারের জ্ঞান। কিন্তু সেই জ্ঞানকে অস্বীকার

করাও চলে না। কারণ, যেই জ্ঞানের কার্য দেখা যায়, সেই জ্ঞান স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর কি? ("অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানং কার্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি।") শ্রীধরস্বামী অচিন্ত্য শব্দের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বলিয়াছেন :—

"যদ্বা, অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ।" অর্থাৎ যাহা ভিন্ন এবং অভিন্ন এইরূপ বিকল্প বা বিরুদ্ধ চিন্তার অযোগ্য তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু এই অচিন্ত্য তত্ত্বে কোনও প্রমাণ নাই এমন নহে, উহা অর্থাপত্তি প্রমাণের গোচর —"কেবলমর্থাপত্তি জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি।"

শাস্ত্রপ্রমাণে ও নানাবিধ শ্রুতিবচনে ব্রহ্ম যে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার তিনি যে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন এইরূপ উল্লেখও বহুতর দৃষ্ট হয়। শক্তির প্রভাবেই যে পরব্রহ্মের নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় তাহাও শাস্ত্রে দেখা যায়। কেবল অভেদ স্বীকার করিলে বিষ্ণুপুরাণোক্ত[১] পরতত্ত্বের চতুর্বিধরূপের বর্ণনাকে একার্থে পর্যবসিত বলিতে হয়। সেক্ষেত্রে একার্থবোধক চারিটি শব্দের উল্লেখে পুনরুক্তি দোষ ঘটে; শক্তিবৈচিত্র্য কথারও কোন সার্থকতা থাকে না। পক্ষান্তরে, কেবল ভেদ স্বীকারেও অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মের বৈচিত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ এবং শক্তি ভিন্ন বস্তু ইহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অসমোর্ধ্ব প্রভাব ব্যাহত হয়।

অতএব কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ কোনটিকেই একান্তভাবে স্বীকার করা যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ এবং সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে এসকল বিষয়ে নানা যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অচিন্ত্য বলিতে তর্কের অগোচর, ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব এইরূপ বিকল্পচিন্তার অযোগ্য তত্ত্বকে বুঝায়। শক্তিমাত্রই অচিন্ত্য জ্ঞানের গোচর। বস্তুর শক্তি হেতুদ্বারা স্থির করা যায় না, তাই বলিয়া বস্তুর শক্তি অস্বীকার করিতে হইবে এমনও কোন যুক্তি নাই। আর, পরব্রহ্মের যে শক্তি উহা অসাধারণ এবং অচিন্ত্যই বটে। তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই অঘটন-ঘটন সম্ভবপর হয়। শ্রুতিও ব্রহ্মের বিবিধ বিচিত্রশক্তির কথাই ঘোষণা করেন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধবশতঃই জীব ও জগতের সহিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী প্রকটিত হয়। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান উপজীব্য তত্ত্ব[২]।

১। জ্ঞাতশ্চতুর্বিধো রাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো।
বিজ্ঞাতা চাপি কার্ৎস্ন্যেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা।।
—বিষ্ণুপুরাণ, ৬, ৮, ৭।

চতুর্বিধরূপ যথা—পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ এবং লীলামূর্তি।
ত্রিবিধ শক্তি যথা—পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, অবিদ্যাশক্তি।

২। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থে এই মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের স্বীয় সম্প্রদায়সিদ্ধ একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করেন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ। তিনি প্রথম জীবনে ভেদবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতানুবর্তী ছিলেন। পরবর্তী কালে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের নাম "গোবিন্দভাষ্য।" কথিত আছে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং বিশেষভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করেন। গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অনুমতিক্রমে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরের বিচারসভায় যোগদান করেন এবং বিচারে তিনি জয়মাল্য লাভ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য দেখিতে চাহেন। সেই সময় শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাষ্য দেখাইবার জন্য প্রতিবাদিগণের নিকট কতক সময় চাহিয়া লন এবং পরে শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে বসিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করেন[১] এবং শ্রীগোবিন্দের নামানুসারে ভাষ্যের নাম রাখেন "গোবিন্দভাষ্য।"

গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম, এই চারিটি ব্রহ্মের শক্তি এবং পরব্রহ্ম শক্তিমৎতত্ত্ব। এই পঞ্চ তত্ত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয় না।

"চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্ ব্রহ্ম ইত্যদ্বৈতবাক্যে'পি সঙ্গতিরিতি।"
(গোবিন্দভাষ্য)।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদসম্পর্কই শ্রীবলদেবের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত। জীব ব্রহ্মের অধীন—"জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাঃ" (গোবিন্দভাষ্য)। ব্রহ্মের অধীন এবং ব্রহ্মের ব্যাপ্য বলিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদসম্পর্ক। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন, ইহাই শ্রীশ্রীবলদেবের মত। জীব ও জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাহাও তিনি তাঁহার "প্রমেয়রত্নাবলী" গ্রন্থে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এক ঈশ্বর হইতে বহু নিত্য চেতন জীব বিভিন্ন, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য—

"ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ।" (প্রমেয়রত্নাবলী, ৪।৫)।

জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদের কথা তিনি গোবিন্দভাষ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন (২।৩।৪১ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য)। গীতার ভাষ্যেও তিনি জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন (গীতা ২।১২ শ্লোকের গীতাভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ সিদ্ধান্তরত্নেও অনুরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগতের পারমার্থিক এবং সনাতন ভেদের কথা যেমন তিনি (বলদেব) বলিয়াছেন, ঔপচারিক অভেদের কথাও তিনি বলিয়াছেন। উভয় মতের সামঞ্জস্যবিধান করিতে গিয়া বলা যায়, বলদেবের মতে মাধ্বমতের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে মাধ্ব-মতের অনুসরণ করেন নাই। তিনি [ভাস্করসম্মত] ঔপচারিক ও [নিম্বার্কানুমোদিত]

১। গোবিন্দভাষ্যের মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করেন নাই। ইহা হইতে এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে, তাঁহার অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তবে, মাধ্বমতের প্রভাব তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

পরব্রহ্ম অনন্তশক্তির আধার। পরব্রহ্মের গুণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। গুণ গুণী হইতে অভিন্ন। তথাপি অচিন্ত্য শক্তিবশেই ভেদের প্রতীতি হইয়া থাকে। এই ভেদ বাস্তব ভেদ নহে, ঔপচারিক বা কল্পিত "বিশেষ" মাত্র (বিশেষস্তু ভেদ-প্রতিনিধি র্ন ভেদঃ। (গীতা ১।১ শ্লোকের বলদেবভাষ্য দ্রষ্টব্য)। পরব্রহ্মে স্বগত-ভেদ নাই কিন্তু অচিন্ত্য বিশেষবশেই ভেদবৎ প্রতীতি ঘটে। ইহাই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিমত। বলদেব প্রথম জীবনে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এই কারণে তাঁহার সিদ্ধান্তে মাধ্বমতের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মধ্বাচার্য ছিলেন বিশুদ্ধ ভেদবাদী। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মে যেমন কেবল ভেদ, জগৎ ও ব্রহ্মেও সেইরূপ কেবল ভেদ বিদ্যমান। চেতন বলিয়া জীবে আছে ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ, আর জড় জগৎ ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু বলদেবের মতে ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই। ব্রহ্ম হইলেন সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদশূন্য। অতএব মাধ্বমতের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্যও সুস্পষ্ট। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের সমর্থক। তিনি ব্রহ্মের অদ্বয়তত্ত্ব সমর্থন করেন নাই। কিন্তু শ্রীবিদ্যাভূষণ ব্রহ্মকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীজীব গোস্বামীর মতের সহিত বলদেবের মতের অংশতঃ মিলও লক্ষণীয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে পরতত্ত্ব-পরব্রহ্ম ইহাও বলদেবের হার্দ অভিমত। এই মতটি গৌড়ীয় মতের অনুকূল। শ্রীবলদেব অনেক বিষয়েই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতের অনুবর্তী হইয়া, প্রাচীন মাধ্বমতের সহিত গৌড়ীয় মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতকে বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অনুসরণ করিয়া গোবিন্দভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, গীতাভূষণ নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদে বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যের অভাব বিদূরিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সিদ্ধান্তরত্নাবলী, প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, জীব গোস্বামি-কৃত ষট্সন্দর্ভের টীকা, লঘুভাগবতামৃতের টীকা, সাহিত্যকৌমুদী, ব্যাকরণকৌমুদী, কাব্যকৌস্তুভ, সিদ্ধান্তদর্পণ, স্তবাবলী টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের সর্বপ্রকার পুষ্টিবিধান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি ও প্রেমবাদ জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিলে স্মার্ত রঘু-নন্দন সমাজের শৃঙ্খলারক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং নব্যস্মৃতির প্রবর্তন করেন। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্য প্রচারে ব্রতী হন। এক দিকে কুলিশ কঠোর ন্যায়শাস্ত্রের জটিল তর্কজাল, অপর দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্বেলিত ভক্তিপ্রবাহ, এই বিরুদ্ধ-ভাবের দ্বন্দ্বে মুখরিত নদীয়ায় তখন অদ্বৈতবাদের প্রসার রুদ্ধ হয়।

মধ্বের দ্বৈতবাদ, ভাস্করাচার্যের ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ, নিম্বার্কের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ (যে দুইটিকে একযোগে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হয়), এবং সর্বোপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ক্রমশঃ বিশেষ পুষ্টিলাভ করে।

ভাস্করাচার্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক এবং শ্রীরামানুজাচার্যের পূর্ববর্তী। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর ভাষ্য রচনা করেন। ভাস্কর ভাষ্য হইতে আচার্য ভাস্করের মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে কারণরূপী ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু কার্যরূপে ব্রহ্ম জীব, জগৎ প্রভৃতি ভেদে বহু। জীব চৈতন্যময় পরিণামশক্তি এবং জগৎ অচেতন পরিণামশক্তি—এই দুই পরিণামশক্তিই ব্রহ্মের। উক্ত দ্বিবিধ পরিণামশক্তি-বিশিষ্ট কারণরূপী ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। জীব ও জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য। অনাদি অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধিবশেই ব্রহ্মের জীবরূপে পরিণতি ঘটে। কারণরূপে ব্রহ্মে জীবে কোন ভেদ নাই, ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের যে ভেদ উহা ঔপাধিক। এইজন্য তাঁহার মতে ভেদ ও অভেদে পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু ব্রহ্মরূপ একই কারণ হইতে উৎপন্ন সকল বস্তু ভিন্ন হইলেও, কারণের দিক দিয়া বিচার করিলে সকলই অভিন্ন, তবে কার্যরূপে সকলই ভিন্ন বটে। কিন্তু এই ভেদ সত্য হইলেও ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে।

নিম্বার্কাচার্যের অভিমত স্বাভাবিক ভেদাভেদ বলিয়া পরিচিত, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ভাস্করাচার্যের মতের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়। আচার্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন অনন্ত শক্তিমান্, বৃহত্তম, আর জীব হইতেছেন ব্রহ্মের অংশ এবং অণু। তাঁহার মতে জগৎ অচিৎ বা জড়। ব্রহ্ম বিভু চিৎ, জীব অণু চিৎ। ব্রহ্ম কারণ, জীব কার্য। ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব অংশ; ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক, ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত। অতএব ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। অচিৎ জগতের সহিত বিভু চিৎ ব্রহ্মের ভেদ খুবই স্পষ্ট। এই যে ভেদ উহা স্বাভাবিক। কিন্তু আর এক দিক দিয়া বলা যায়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অভেদও আছে। কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়। কারণ ও কার্যের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। অংশী ও অংশের মধ্যেও আলোচ্য ভেদাভেদ সম্বন্ধই বিরাজ করে। এই ভেদাভেদ স্বাভাবিক ভেদাভেদ বলিয়া পরিচিত। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" নামে সম্প্রদায়-সিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ভাষ্য হইল শ্রীনিবাসাচার্যকৃত "বেদান্তকৌস্তভ"। শ্রীল নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাস অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার স্পর্শ তদীয় বেদান্তকৌস্তভের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কেশব-কাশ্মীরী-প্রণীত 'বেদান্তপ্রভাবৃত্তি'তে শ্রীনিবাসকৃত বেদান্তকৌস্তভের আরও বিস্তৃত এবং তথ্যবহুল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধবমুকুন্দের "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থও বিচারবহুল এবং নানা তথ্যে সমৃদ্ধ। "পরপক্ষগিরিবজ্রে" শ্রীরামানুজ ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদবিরোধী অনুমান-শৈলী অনুসরণ করতঃ মাধবমুকুন্দ অদ্বৈত-গিরিশিরে অশনিসম্পাতকরিয়াছেন এবং রামানুজোক্ত

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মাধ্বোক্ত দ্বৈতবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া নিম্বার্কানুমোদিত স্বাভাবিক ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্যোক্ত ঔপচারিক ভেদাভেদবাদও মাধবমুকুন্দ খণ্ডন করিয়াছেন। মুখ্যতঃ অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদসম্মত অধ্যাসের খণ্ডনই মাধবমুকুন্দের এই বিপুলায়তন "পরপক্ষগিরিবজ্র" রচনার উদ্দেশ্য। এইজন্য "অধ্যাসগিরিবজ্র" নামেও এই গ্রন্থখানি সুধীসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই খণ্ডনগ্রন্থের উপাদান পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, মাধ্বপণ্ডিত জয়তীর্থ মুনি-প্রণীত "ন্যায়সুধা" গ্রন্থ হইতে এবং তদীয় শিষ্য আচার্য ব্যাসরাজের "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ হইতে বিবিধ যুক্তিলহরী এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। মাধবমুকুন্দের "পরপক্ষগিরিবজ্রে" দ্বৈতকেশরী ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃতের প্রভাব স্পষ্টতঃই সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অদ্বৈতবাদের খণ্ডনে বদ্ধপরিকর মাধবমুকুন্দ মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তের সমর্থনে অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা "লঘুচন্দ্রিকা"য় গৌড় ব্রহ্মানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থে মাধবমুকুন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। ইহা হইতে "পরপক্ষগিরিবজ্রে"র রচয়িতা আচার্য মাধবমুকুন্দ যে খুব প্রাচীন নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনেক সুধী মনে করেন যে, মাধবমুকুন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাঙ্গালী।[১]

মাধবমুকুন্দের দার্শনিকমতের পরিচয়।

নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের সমর্থনে মাধবমুকুন্দ বলেন, শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ, এই দ্বিবিধ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। উভয় মতের সমর্থক শ্রুতিই সমবল। এই অবস্থায় একের দ্বারা অপরের বাধ কল্পনা করা সঙ্গত মনে হয় না। উভয়প্রকার শ্রুতিকে তুল্যভাবেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা স্বাভাবিক; এবং শ্রুতির মর্যাদা রক্ষার জন্য ভেদাভেদ-বাদই বাদরায়ণ দর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) প্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া

১। "অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত 'পরপক্ষগিরিবজ্রে'র ভূমিকাতে ভূমিকালেখক মহাশয় প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আচার্য মাধবমুকুন্দ বঙ্গদেশান্তর্গত অরুণঘটা গ্রামবাস্তব্য ছিলেন। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রামের নাম অরুণঘটা বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ আড়ংঘাটাই অরুণঘটা হইবে। এই আড়ংঘাটা শিয়ালদহ—গোয়ালনন্দ লাইনে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন এবং ইহা নদীয়া জেলায় অবস্থিত।"

শিবপুরস্থ নিম্বার্কাশ্রম হইতে প্রকাশিত
পরপক্ষগিরিবজ্রের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত।

মন্তব্য,—আচার্য মাধবমুকুন্দ আড়ংঘাটাবাসী হইলেও, তিনি তাঁহার গ্রামে বসিয়াই এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, এই গ্রন্থে জয়তীর্থ, ব্যাসরাজ, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতির যে-সকল গ্রন্থের বিবরণ দেখা যায়, তাহা সেই সময়ে গ্রামে বসিয়া সংগ্রহ করা কেবল দুষ্কর ছিল না, অসম্ভব ছিল বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং মাধবমুকুন্দ সেইকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে—কাশীধামে কিংবা প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীধামবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীমুকুন্দের কৃপালাভে ধন্য হইয়া এইরূপ বাদবহুল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক।

সঙ্গত।[১] 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যও জীব এবং ব্রহ্মের সর্বপ্রকার ঐক্য বুঝায় না। জীব ও ব্রহ্ম সর্বথা অভিন্ন হইলে ভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণ্য ব্যাহত হয়। সুতরাং জীব নিয়ম্য, ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীবের স্থিতি, জীবের কর্মপ্রবৃত্তি সমস্তই ব্রহ্মের অধীন। জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য, পরব্রহ্ম ব্যাপক; ব্রহ্ম আধার, জীব আধেয়, ইহাই ব্রহ্মের 'তাদাত্ম্য' উপদেশের রহস্য। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্' এই সর্বাত্মভাবোপদেশের মর্মও উল্লিখিত দৃষ্টিতেই বিচার করিতে হইবে। পুরুষোত্তম বিশ্বাত্মা, পরব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জীব ও জগৎ ঈশ্বরপরতন্ত্র। পুরুষোত্তম স্বাধীন, জীব ও জড়বর্গ পুরুষোত্তমের অধীন। নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা পরব্রহ্ম, জীব ও জগতের শাসক ও ভাসক। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" (বৃহদাঃ, অক্ষর ব্রাহ্মণ, ৩।৮।৯)।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং

"জগদ্‌বশে বর্ততে'দঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরম্।"
"অহং সর্বস্য প্রভবঃ," "মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।"

এই সকল স্মৃতি এবং গীতার উক্তিতে এই তত্ত্বই নিঃসংশয়ে ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি জীব ও জগতের নিয়ন্তা বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বাধীন; নিয়ম্য জীব ও জড়বর্গ তাঁহারই অধীন। বিশ্বনিয়ন্তৃত্ব এবং বিশ্বপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনসত্তা এই দুইটি ধর্মই একাধারে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজ করে। যিনি বিশ্বনিয়ন্তা তিনিই স্বতন্ত্র-সত্তাবিশিষ্ট পুরুষোত্তম। এইরূপে সর্বাত্মত্ব এবং স্বতন্ত্রসত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই, জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য অবধারণ করিতে হইবে।[২]

যাহাদের স্থিতি এবং প্রবৃত্তি স্বাধীন নহে, পরমেশ্বরের অধীন, সেই চিৎ ও অচিদ্রূপ বিশ্বকেই পরতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। এই পরতন্ত্রসত্ত্ব দুই প্রকার—কূটস্থ এবং বিকারী। জন্মাদি বিকার রহিত হইয়া যাহা শাশ্বত তাহাই

১। ন চ তেষাম্ ইতরেতরবাধ্যবাধকভাবো বক্তুং শক্যঃ, তুল্যবলত্বাৎ। তথা চ সর্বেষামেব স্বার্থপ্রামাণ্যসিদ্ধয়ে ভিন্নাভিন্নং ব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ত্বেনাভিপ্রেতং ভগবতঃ সূত্রকারস্য।

—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬১৭ পৃঃ, শিবপুর নিম্বার্কাশ্রম সং।

২। এতদেব সর্বাত্মত্বং স্বতন্ত্রসত্ত্বঞ্চ পুরস্কৃত্য অভেদবাক্যজাতস্য প্রবৃত্তিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়স্য শ্রী-পুরুষোত্তমস্য একত্বাৎ। এবং তস্য বিশ্বাত্মনঃ স্বতন্ত্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরব্রহ্মণঃ তদাত্মীয়নিয়ম্য-পরতন্ত্র সত্তাশ্রয়ং চিদচিদ্রূপং বিশ্বমিতি ফলিতম্।

—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬১৮ পৃঃ,
শিবপুর নিম্বার্কাশ্রম সং।

কূটস্থ সত্ত্ব বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষাদিপদ-প্রতিপাদ্য চেতন বস্তুই এই কূটস্থ সত্ত্বের আশ্রয় বা আধার হইয়া থাকে, আর যাহা বিকারযুক্ত হইয়াও প্রবাহরূপে নিত্য, তাহাকেই বিকারী পরতন্ত্রসত্ত্ব বলে। মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, ক্ষেত্র প্রভৃতি পদবাচ্য অচেতন বস্তুই বিকারী পরতন্ত্রসত্ত্বের আধার।[১] পরতন্ত্রসত্ত্বের আশ্রয় বিবিধ চিন্ময় জীব ও অচিৎ জড়বর্গকে অবলম্বন করিয়াই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে হইবে। যে সকল শ্রুতিতে ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা চিন্ময় জীব ও অচিৎ প্রকৃতির পরব্রহ্মের ন্যায় স্বতন্ত্রসত্তা নাই ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। "নেতি নেতি" এইরূপে সাধারণভাবে যে নিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহার দ্বারা স্বতন্ত্রসত্তার আধার বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্মের জীব ও জড়প্রকৃতি হইতে ভিন্নতাই সূচিত হইয়া থাকে।[২]

চেতন ও অচেতন বর্গ হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন, স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম নিখিল হেয়-গন্ধরহিত এবং সর্বপ্রকার কল্যাণগুণের আকর বলিয়া পরিচিত। এইরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জীব ও জগতের নিয়ন্তা, "সর্বস্য বশী, সর্বস্যেশানঃ." "সংসার-বন্ধ-স্থিতি-মোক্ষহেতুঃ," "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিরূপে শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। নিখিল বিশ্বই ব্রহ্মাত্মক। ইহাই শ্রুতি "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" এইরূপ উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম বিশ্বাত্মা হইলেও তিনি যে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট নহেন; স্থূল সূক্ষ্মধর্মবিশিষ্ট চিৎ ও অচিদ্‌বর্গ হইতে বিলক্ষণ, এই রহস্যই "নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত নিষেধের দ্বারা ধ্বনিত হইয়াছে।

'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতির ব্যাখ্যায় মাধবমুকুন্দ বলেন—বিশ্বাত্মা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি স্বতন্ত্রসত্তার আধার পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই 'তৎ' পদের অর্থ। আর, স্বতন্ত্র পরব্রহ্মাত্মক চেতনই ত্বং পদার্থ। আলোচ্য 'তৎ' পদার্থের সহিত অভিন্ন, ত্বং পদার্থের আশ্রয় সর্বান্তরাত্মা বাসুদেবই ত্বংপদার্থের বাচ্য। এই 'তৎ' ও 'ত্বম্' বস্তুতঃ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহাই শ্রুত্যুক্ত অভেদবোধক 'অসি' পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এইভাবে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত তাদাত্ম্য বা জীব-ব্রহ্মের অভেদ উপদেশও এইমতে সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[৩]

১। পরপক্ষগিরিবজ্রের বঙ্গানুবাদ ৬১৮-৬১৯ পৃঃ দেখুন।

২। ভেদনিষেধপরাণাং চেতনাচেতননিষ্ঠস্বতন্ত্রসত্ত্বাদায় প্রবৃত্তিঃ। "নেতি নেতি" ইত্যাদি-সামান্যনিষেধবাক্যানাঞ্চ ব্রহ্মণঃ সর্ববৈলক্ষণ্যজ্ঞাপনেন প্রবৃত্তিশ্চেতি নিরবদ্যম্।

—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬১৯ পৃঃ।

৩। 'তত্ত্বমসি' ইত্যত্র বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম সার্বজ্ঞ্যাদিধর্মনিলয়ঃ সর্বশক্তিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ তৎপদার্থঃ, তদাত্মকশ্চেতনঃ ত্বংপদার্থঃ, উক্তলক্ষণতৎপদার্থাভিন্নতদাত্মক ত্বংপদার্থাবিচ্ছিন্নসর্বান্তরাত্মা বাসুদেবঃ ত্বংপদার্থঃ অসীতি তাদাত্ম্যোপদেশার্থঃ।

—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬২৫ পৃঃ,
শিবপুর, নিম্বার্কাশ্রম সং।

"অথ যো'ন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যো'সাবন্যো'হমস্মীতি ন বেদ যথা পশুঃ।" তাৎপর্য এই যে, যেই ব্যক্তি অন্য দেবতাকে ঐ দেবতা আমা হইতে অন্য, আমিও উপাস্য ঐ দেবতা হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদবুদ্ধিতে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না, যেমন পশু জানে না।

যখন সমস্তই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ," "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" এই জগতে কোন বস্তুই নানা নহে। যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তুকে নানা বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জনন-মরণের স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান। এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিতে ভেদদৃষ্টির যে নিন্দা ধ্বনিত হইয়া থাকে, তাহাদ্বারা ভেদবাদের অসারতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে নাকি?

প্রতিবাদীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলেন, প্রতিবাদী অদ্বৈতবেদান্তী আলোচ্য শ্রুতির যেরূপ মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা শোভন হয় নাই। ঐসকল শ্রুতির দ্বারা ভেদবাদের নিন্দা সূচিত হয় নাই। "অথ যো'ন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাস্য ও উপাসকের ভেদদৃষ্টির যে নিন্দা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার রহস্য এই যে, নিখিল বিশ্বই শ্রীকৃষ্ণময়, বাসুদেবাত্মক,—"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।" এই অবস্থায় বিশ্বাত্মা বাসুদেব হইতে ভিন্নরূপে যেই ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতার উপাসনা করেন, তিনি কিছুই জানেন না। উপাসনার জগতে তিনি পশুরই তুল্য; অর্থাৎ অজ্ঞান পশু যেমন কিছুই জানে না, অজ্ঞানী জীবও সেইরূপ দেবোপাসনা-তত্ত্ব কিছুই বোঝে না। প্রদর্শিত শ্রুতিতে ভেদের নিন্দা করা হয় নাই। বাসুদেব হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে দেবোপাসনারই নিন্দা করা হইয়াছে। 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা' নামক দশশ্লোকীয় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য পুরুষোত্তম উল্লিখিত শ্রুতিটির যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা মাধবমুকুন্দের উক্তিকেই সমর্থন করে। আচার্য পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"যঃ পুমান্ শ্রীভগবতঃ সর্বেশ্বরাৎ শাস্ত্রযোনেঃ জগজ্জন্মাদিকারণাৎ মোক্ষদাতুঃ পুরুষোত্তমাদন্যাং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিরূপাং দেবতামুপাস্তে, উপাসনাপ্রকারমাহ—অসৌ ব্রহ্মরুদ্রাদিঃ দেবো'ন্যঃ ঈশ্বরঃ, অহমন্যো জীব ইতিভাবেন, ন স বেদ তত্ত্বতো জানাতি—তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা পশুরিতি।" (পুরুষোত্তমাচার্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ১১১ পৃঃ)।

অপর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতি পরস্যায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি।।" যেই ব্যক্তি নিজের ভজনীয় বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়া, পুরুষোত্তম হইতে ভিন্নরূপে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতির যজন-পূজন করেন, তিনি স্বীয় বৈষ্ণবধর্ম হইতে বিচ্যুত হন, পাপভাগী হন এবং বৈষ্ণবের পরমগতি প্রাপ্ত হন না।

স্মৃতিও এই কথাই সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন। স্মৃতিতে বলা হইয়াছে, 'যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই দুর্মতি তৃষ্ণার্ত হইয়া পুণ্যতোয়া সুরধুনীর তীরে কূপ খনন করে।'

নিত্য সত্য পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুই চরাচর নিখিল বিশ্বের একমাত্র শাস্তা এবং যতিগণের পরমগতি। যেই জন বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিয়া শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে অন্য দেবতার ভজন-পূজন করেন, কোটিকল্পেও তাঁহার গতি বা উদ্ধার হয় না। এইরূপ বিবিধ শ্রুতি-স্মৃতিতে শ্রীবাসুদেব হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে দেবগণের উপাসনারই নিষেধ করা হইয়াছে, শ্রুতিসিদ্ধ ভেদের নিন্দা করা হয় নাই। ভেদবাদকেও তো বহুশ্রুতি এবং স্মৃতিতে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (মুণ্ডক, ৩।১।১) একই বৃক্ষে অর্থাৎ জীবদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি পক্ষী সর্বদা মিলিত হইয়া অবস্থান করে। ইহারা পরস্পর সখা।

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" (শ্বেতাশ্ব, ১।৯)। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর ও জীব ইঁহারা উভয়েই অজ হইলেও ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর প্রভু, জীব প্রভুত্ববিহীন এবং ঈশ্বরের অধীন।

"যমাত্মানমন্তরো যময়তি" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জানা যায় যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অন্তরে বিরাজ করতঃ জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" এই কঠোপনিষদের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই উভয়েই জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়া কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন।

প্রদর্শিত শ্রুতির অর্থের অনুবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীগীতায় পার্থসারথি বলিয়াছেন—
"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।" (গীতা, ১৫।১৬)।

এই জগতে দুইটি পুরুষ বিরাজ করেন, তন্মধ্যে একটি ক্ষর বা বিকারী পুরুষ, অপরটি অক্ষর পুরুষ। জন্ম-মৃত্যুর নিগূঢ়পাশে আবদ্ধ জীব ক্ষর পুরুষ, সর্ববিধবিকারাতীত কূটস্থ-পুরুষ অক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উপরে যিনি বিরাজ করেন তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন।[১]

শ্রুতি এবং স্মৃতিসমর্থিত এই ভেদবাদ ব্রহ্মসূত্রকারও "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" (ব্রঃ সূঃ, ১।১।২১), "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।" (ব্রঃ সূঃ, ১।২।২০) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় ভেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করা যায় কিরূপে? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি জীব ও পরমাত্মা-পুরুষোত্তমের ভেদ সুদৃঢ় করিবার জন্য পুনরায় বলিয়াছেন—

> পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
> জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ।। (শ্বেতাশ্ব, ১।৬)।

১। (ক) উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। গীতা, ১৫।১৭

(খ) যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।। গীতা, ১৫।১৮

যেই জীব নিজেকে এবং নিজের চালক, প্রবর্তক পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জানেন, তিনিই অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন। আলোচ্য শ্বেতাশ্বতরোক্ত তত্ত্বের পুনরুক্তিতে মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্ বলেন—"অস্তি খল্বন্যো'পরো ভূতাত্মা, স বা এষো'ভিভূতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈরিত্যতো'ভিভূতত্বাৎ সংমূঢ়ত্বং প্রযাতি, সংমূঢ়ত্বাৎ আত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ।" (মৈত্রায়ণীয়, ৩।২)। তাৎপর্য এই, ভূতাত্মা বা জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন সন্দেহ নাই। জীবাত্মা প্রাকৃত গুণের দ্বারা অভিভূত এবং সংমোহিত হইয়া থাকেন। এইজন্য জীবের অন্তরতম প্রদেশে বিরাজমান, জীবের নিয়ন্তা ও চালক শ্রীভগবান্‌কে জীব দেখিতে পায় না। মুক্তি অবস্থায় নিরঞ্জন (নিষ্কলুষ) মুক্ত জীব ভগবানের সাম্য লাভ করে, (মুক্তিতেও জীব এবং শ্রীভগবানের অভেদ হয় না)।

"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুণ্ডক, ৩।১।৩)। এই মুণ্ডক শ্রুতি স্পষ্টতঃই মোক্ষে জীব ও পুরুষোত্তমের ভেদ প্রকাশ করে এবং এই ভেদ সত্য, স্বাভাবিক বলিয়াই সিদ্ধ হয়।

"তস্মাৎ ভেদশ্রুতীনাং পারমার্থিকভেদপরত্বমেবেতি সিদ্ধম্।" (পরপক্ষ-গিরিবজ্র, ৫৯২ পৃঃ)। ভেদের সত্যতা স্বীকার করিলেও ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক-সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী মাধ্বের মতের অনুবর্তন করেন নাই। ভেদের ন্যায় অভেদকেও সত্য, স্বাভাবিক এবং শ্রুত্যনুমোদিত বলিয়াই উঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, এবং উভয়বিধ শ্রুতিকেই সমবল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভেদের দ্বারা অভেদশ্রুতির কিংবা অভেদোক্তির দ্বারা ভেদবোধক শ্রুতির বাধের পরিকল্পনা এই সম্প্রদায় করেন নাই, ইহা সুধী অবশ্য লক্ষ্য করিবেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রুতিসাগর মন্থন করিয়া নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে জীব ও ব্রহ্মের পূর্ণ ভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

সূত্রবদ্ধ পক্ষী যেমন পরিশ্রান্ত হইয়া বন্ধনস্থানকে আশ্রয় করে, সংসারারণ্যে বিচরণশীল শ্রান্ত জীবও সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে। (যথা—"শকুনিঃ সূত্রেণ প্রতিবদ্ধ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি, ৬।৮।২ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জীব এবং পরমেশ্বর যে ভিন্ন তত্ত্ব তাহাই প্রমাণিত হয়। জীবের সহিত পরমেশ্বরের ভেদ থাকিলেও অজ্ঞানী জীব সেই ভেদ বুঝিতে পারে না। মধুকরের দ্বারা সংগৃহীত কুসুমরস একত্রিত হইয়া মধুরূপে পরিণত হইলে ঐ পুষ্পরস যেমন জানিতে পারে না আমি অমুক বৃক্ষের রস। (যথা—'সৌম্য-মধুকৃত' ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি, ৬।৯।৯)। নদীসমূহ সাগরে মিলিত হইলে নদী যেমন জানে না, আমি গঙ্গা, আমি যমুনা, অজ্ঞানী জীবও সেইরূপ ঈশ্বরে অবস্থিত থাকিয়াও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বুঝিতে পারে না। ("ইমাঃ সৌম্য নদ্যঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি, ৬।১০।১ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদের বোধক বহুবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে মাধ্ব তদীয় ভেদবাদ উপপাদন করিয়াছেন।

"স আত্মা তত্ত্বমসি" এই অভেদবাদের বিশ্লেষণে মাধ্ব-সম্প্রদায় 'অ'কার প্রশ্লেষ অঙ্গীকার করতঃ "স আত্মা অতত্ত্বমসি" এইরূপ পদচ্ছেদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভেদ-সিদ্ধান্তের উপপাদন করিয়াছেন। মাধ্ব 'অ'কারের [নঞ্ পদের] সাদৃশ্য অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, "অতৎ" পদের তৎসদৃশ অর্থাৎ 'ব্রহ্মসদৃশ তুমি জীব', এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টিতেই ভেদবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায় সর্বত্র অভেদবোধক শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ঐরূপ ব্যাখ্যা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তাঁহারা বলেন, শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা যেমন আছে, ভেদের কথাও বহু আছে। আবার, ভেদের নিষেধের কথাও আছে। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং সর্বপ্রকার শ্রুতিই তুল্যবল বলিয়াই গ্রহণ করা স্বাভাবিক। অভেদ-শ্রুতিও প্রমাণ, ভেদ-শ্রুতিও প্রমাণ, ভেদের নিষেধের শ্রুতিও প্রমাণ। এই অবস্থায় অভেদশ্রুতিকে প্রবল মনে করিয়া ভেদবোধক শ্রুতির দৌর্বল্য কল্পনা করা (যাহা অদ্বৈতবেদান্তী করিয়াছেন) যেমন অস্বাভাবিক, সেইরূপ মাধ্বমতের অনুবর্তন করিয়া অভেদবোধক শ্রুতির অর্থের কষ্টকল্পনাও অশোভন। এই অবস্থায় নিম্বার্কোক্ত ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই মতে অভেদবোধক শ্রুতির এবং ভেদের নিষেধের শ্রুতিরও যে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই, তাহা আচার্য মাধব-মুকুন্দ বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে ভেদের ন্যায় অভেদও সত্য; সুতরাং অভেদবোধক শ্রুতি ভেদ-শ্রুতির ন্যায়ই প্রবল সন্দেহ নাই। যে সকল শ্রুতিতে ভেদের নিষেধ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত ভেদবাদের সমর্থক শ্রুতির বিরোধ সুস্পষ্ট। এইজন্য ভেদের নিষেধের প্রতিপাদক শ্রুতির মর্ম উদ্‌ঘাটন ভেদের উপপাদনের জন্যই অবশ্যকর্তব্য। মাধবমুকুন্দ তাঁহার গ্রন্থে নিষেধ-শ্রুতির মর্ম বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন।

"যত্র—সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃহদাঃ, ২।৪।১৪)। যখন সকলই পরমাত্মস্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? এই বৃহদারণ্যক শ্রুতির ব্যাখ্যায় মাধবমুকুন্দ বলেন—'সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রভৃতি সকলই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় বলিয়া, নিজেই নিজেকে দর্শন করে'—"আত্ম-ন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।" সুষুপ্তিতে কর্ম ও করণ একই তত্ত্ব হইয়া যায়। অতএব ভেদ-দর্শনের তখন কোনরূপ সাধনই থাকে না। ইহাই শ্রুতিতে প্রশ্নচ্ছলে বলা হইয়াছে—"কেন কং পশ্যেৎ?" "নেহ নানাস্তি" শ্রুতির দ্বারাও ভেদের নিষেধ ধ্বনিত হয় নাই। যিনি নিখিল-কল্যাণগুণাকর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব জন্ম-স্থিতি প্রভৃতি লাভ করে, সেই জগজ্জন্মাদিকারণ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে নানাত্ব দর্শন করিয়া জীব সংসার-সাগরে ডুবিয়া মরে। এইরূপে আলোচ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মে নানাত্ব দর্শনেরই নিন্দা করা হইয়াছে, ভেদের নিষেধ করা হয় নাই। "নান্যতো'স্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট কোন দ্রষ্টা (জীব) নাই, ইহাই স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে কোথায়ও ভেদের নিন্দা ধ্বনিত হয় নাই।

নিগূঢ় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্যনির্ণয়ে ছয়প্রকার রীতি (ষড়্‌বিধ লিঙ্গ) শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই রীতিতে শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিলেও ভেদবাদ যে শ্রুতির অনুমোদিত এবং সত্য তাহা সহজেই বুঝা যায়।

অথর্ব বেদান্তর্গত মুণ্ডক উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই পারমার্থিক ভেদের উপক্রম বা আরম্ভ জানিতে পারা যায়। ঐ মুণ্ডক শ্রুতিরই উপসংহারে "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" বলিয়া, কলুষমুক্ত জীব ও পরব্রহ্মের যে সাম্য বা সমতা (অভেদ নহে) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাদ্বারাও ভেদবাদ যে শ্রুতিসিদ্ধ ইহা জানা যায়। "তয়োরন্যঃ" জীব ও পরমাত্মা এই দুইএর অন্যতর (জীব) সংসার বৃক্ষের স্বাদু ফল ভোগ করে, আর একজন পরমাত্মা কোনরূপ ফলই ভোগ করেন না—"অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি," "অন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" এই শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের অন্যত্ব অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কীর্তিত হওয়ায় এবং এইরূপে অন্যত্বের আভাস ও স্পষ্টোক্তি শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, ভেদবাদকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ঈশ্বরের সহিত জীবের যে সত্য-স্বাভাবিক ভেদ আছে, তাহা একমাত্র শাস্ত্রোক্তি হইতেই জানা যায়। শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় না। সুতরাং এই শ্রুতিসিদ্ধ ভেদবাদ যে শাস্ত্রৈকগম্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির ফলে জীব পুণ্যপাপের ঊর্ধ্বে উঠিয়া শ্রীভগবানের সমতা লাভ করে। অতএব "পুণ্যপাপে বিধূয়" ইহাই শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। জীব শ্রীভগবানের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইপ্রকার উক্তি অর্থবাদমাত্র। "অন্যো'নশ্নন্" শ্রুতির এইরূপ উক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদই যে যুক্তিসিদ্ধ তাহাতে সন্দেহ কি? জীব সুখদুঃখময় স্বীয় কর্মফল ভোগ করে। পরমেশ্বর কর্মফল ভোগ করেন না। এইরূপে জীবে কর্মফলের ভোক্তৃত্ব এবং ঈশ্বরে অভোক্তৃত্ব আছে; এবং ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম আছে বলিয়াই জীব ও পরব্রহ্ম অভিন্ন হইতে পারেন না, বিভিন্নই হইবেন। এইরূপেই শ্রুতিতে জীবেশ্বর-ভেদে উপপত্তি বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।[১]

বৃহদারণ্যকোক্ত অন্তর্যামিব্রাহ্মণেও উল্লিখিত বিবিধ হেতুমূলে (ষড়্‌বিধলিঙ্গমূলে) ভেদবাদই সমর্থিত হইয়াছে।[২] "হে কাপ্য। তুমি সেই অন্তর্যামীকে জান কি? এইরূপে উপক্রম বা আরম্ভবাক্যে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ সুস্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে। "এষ তে আত্মা অন্তর্যামী" ইত্যাদি সমাপ্তি বাক্যেও যুষ্মৎশব্দগম্য কাপ্যকে অন্তর্যামী আত্মা হইতে ভিন্নভাবেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আলোচ্য ব্রাহ্মণে একুশবার "এষ তে আত্মা," এইরূপে জ্ঞাতা কাপ্য হইতে জ্ঞেয় আত্মার ভেদ ব্যাখ্যা

১। পরপক্ষগিরিবজ্র, ৫৯২-৫৯৩ পৃষ্ঠা।

২। অন্তর্যামিব্রাহ্মণে'পি ষড় বিধতাৎপর্যলিঙ্গোপেতবাক্যং ভেদে প্রমাণম্।

—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৫৯৫ পৃঃ।

করা হইয়াছে। অন্তর্যামীকে জানিবার, বুঝিবার পক্ষে শাস্ত্রই একমাত্র উপায়, অন্য কোন উপায় নাই, সুতরাং ইহার শাস্ত্রবেদ্যতা (অপূর্বতা)ও অনস্বীকার্য। "স বৈ ব্রহ্মবিৎ." "স বেদবিৎ" এইরূপ শ্রুতির দ্বারা উক্ত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ফলও প্রকাশ করা হইয়াছে।

"তচ্চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য। সূত্রমবিদ্বান্ তঞ্চান্তর্যামিনম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বলা হইয়াছে যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য। সমগ্র বিশ্ব যাহাতে সূত্রাকারে গ্রথিত, যিনি জীব ও জগতের অন্তর্যামী সেই সূত্রাত্মা অন্তর্যামীকে না জানিয়া তুমি যদি ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত-গণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গাভীসকল গ্রহণ কর, তবে তোমার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইবে "মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি।" এইরূপ উক্তি নিঃসন্দেহে নিন্দাত্মক অর্থবাদ। "যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদে উপপত্তি বা যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে বৃহদারণ্যকোক্ত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ যে ভেদবাদই সন্দেহাতীতরূপে উপপাদন করে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। "ভেদেনৈনমধীয়তে" (ব্রঃ সূঃ, ১।২।২০)। এই সূত্রোক্তিও নিঃসন্দেহে ভেদবাদ সমর্থন করে।

আলোচ্য ভেদবাদের সমর্থনে ভেদবাদী মাধ্বতার্কিক জয়তীর্থ, ব্যাসরাজ, প্রভৃতির যুক্তিলহরী মাধবমুকুন্দের তর্কের প্রাণ সঞ্চার করিলেও, একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, আচার্য মাধবমুকুন্দ ভেদবাদী মাধ্বমতের অনুবর্তন করেন নাই। সেই মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। ভেদবাদী মাধ্বতার্কিকগণ অভেদবোধের সমর্থক শ্রুতিসমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। ঐ সকল শ্রুতির অর্থের কষ্টকল্পনা করিয়া ভেদবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। ঐরূপ প্রয়াস মাধব-মুকুন্দের হৃদয়ে রেখাপাত করে নাই। তিনি ভেদের বোধক শ্রুতির ন্যায় অভেদ-বোধক শ্রুতির প্রামাণ্যও স্বাভাবিক বলিয়াই অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছেন—"তথৈ-বাভেদো'পি স্বাভাবিকঃ।" (পরপক্ষগিরিবজ্র ৬২৭ পৃঃ)। এই স্বাভাবিক অভেদ-বাদের সমর্থনে মাধবমুকুন্দ বলেন—ব্রহ্ম বিশ্বাত্মা, জীব ও জগতের নিয়ন্তা, সর্ব-ব্যাপী, চরাচর জগতের অন্তরবিহারী এবং স্বতন্ত্র। জীব ও জগৎ ব্রহ্মাত্মক, পর-ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের ব্যাপ্য এবং ব্রহ্মাশ্রিত। সুতরাং জীব ও জগতের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সত্তা নাই; উহারা অপৃথক্সিদ্ধ। অপৃথক্সিদ্ধ বিধায় জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও বটে।[১]

জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্সিদ্ধ হইলেই জীব ও জগৎ যে ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মাভিন্ন হইবে, ইহা অনুমানের সাহায্যে অনায়াসে উপপাদন করা যাইতে পারে।

১। তথৈবাভেদো'পি স্বাভাবিকঃ, ব্রহ্মণঃ সর্বাত্মত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ব্যাপকত্ব-স্বতন্ত্রসত্ত্ব-সর্বাধারত্বযোগাৎ। "এষ সর্বভূতান্তরাত্মা;" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ;" "অন্তর্বহিশ্চ আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রো'খিগুণঃ," "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তয়োশ্চ ব্রহ্মাত্মকত্ব-তন্নিয়ম্যত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্ব-তদধীন-সত্ত্ব-তদাধেয়ত্বাদিযোগেন তদপৃথক্সিদ্ধত্বাদভেদো'পি স্বাভাবিকঃ।—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬২৭-৬২৮ পৃঃ।

ঐরূপ অভেদানুমানের ব্যাপ্তি হিসাবে বলা যায় যে,—(ক) যে বস্তু যদাত্মক হইয়া থাকে, সে তাহা হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বা অভিন্নই হইয়া থাকে। যেমন মৃন্ময় (মৃদাত্মক) ঘট, মাটি হইতে অভিন্ন হয়। চরাচর জগৎও ব্রহ্মাত্মক বিধায় ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই বটে। (খ) জীবকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জীব-শরীর যেমন জীব হইতে অভিন্ন; ব্রহ্ম-নিয়ম্য জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বা অপৃথক্‌সিদ্ধ। (গ) ব্রহ্মাধীন বলিয়াও চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধই হইবে। কেননা, যে যদধীন হয়, সে তাহা হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধই হইয়া থাকে। যেমন, প্রাণাধীন ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বা অভিন্ন। চেতনাচেতন জগতের পরব্রহ্মই আধার এবং জগৎ আধেয়। (ঘ) এই ব্রহ্মাধেয়ত্ব-নিবন্ধন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ভৌতিক বস্তুসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভৌতিক বস্তুরাজির মহাভূতই আধার এবং ভৌতিক বস্তুসকল আধেয়। এই আধেয় ভৌতিক বস্তুরাজি মহাভূত হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়াই জানিবে। আলোচ্য অনুমান "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্," "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃত্যনুমোদিত বলিয়াই প্রমাণের মর্যাদালাভ করে। সুতরাং ভেদের ন্যায় অভেদও যে শ্রুতিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহ কি?[১]

এইরূপে মাধবমুকুন্দ তাঁহার গ্রন্থে স্বাভাবিক ভেদবাদের ন্যায় স্বাভাবিক অভেদ-বাদও সমর্থন করিয়াছেন। ভেদবাদী মাধ্বতার্কিকগণের ন্যায় অভেদবাদকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই এবং কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া অভেদ-শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনারও প্রয়াস করেন নাই।

"ভেদেনৈনমধীয়তে" (ব্রঃ সূঃ, ১।২।২০)। এই সূত্রোক্ত ভেদবাদকে যাঁহারা ব্যাবহারিক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই অদ্বৈতবেদান্তীর যুক্তিও মাধবমুকুন্দের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। ভেদবাদ ব্যাবহারিক এবং মিথ্যা হইলে, সূত্রোক্ত সর্বপ্রকার মতবাদই মিথ্যা, শূন্যই তত্ত্ব এইরূপ শূন্যবাদীর সিদ্ধান্তকেই বা ব্রহ্মসূত্রের রহস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? সে ক্ষেত্রেও "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিকে প্রমাণ হিসাবে উপন্যাস করিয়া বৌদ্ধ ও বেদের ব্যাখ্যাতার আসন দাবী করিতে পারেন নাকি? বেদান্তমতের বৌদ্ধমতে প্রবেশেই বা বাধা কোথায়?[২] এইরূপে মাধবমুকুন্দ ব্যাবহারিক ভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

১। চেতনাচেতনরূপং জগৎ ব্রহ্মাপৃথক্‌সিদ্ধিযোগ্যং ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ মৃদাদিবৎ, তন্নিয়ম্যত্বাৎ জীব-শরীরবৎ, তদধীনত্বাৎ প্রাণায়ত্তেন্দ্রিয়বৎ, তদাধেয়ত্বাৎ ভূতভৌতিকবদিত্যাদ্যনুমানান্যপি শ্রুতিমূলকানি অত্র অনুসন্ধেয়ানি। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। "বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ" ইতি স্মৃতেশ্চ।—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬২৮ পৃষ্ঠা, শিবপুর, নিম্বার্কাশ্রম সং।

২। ন চ ব্যাবহারিকভেদপরমিদং সূত্রমিতি বাচ্যম্, এবং তর্হি বৌদ্ধো'পি বেদব্যাখ্যাতা, তচ্ছাস্ত্রঞ্চ বেদব্যাখ্যানং স্যাৎ। সো'পি ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাখ্যায় অন্তে মিথ্যৈব এষো'র্থঃ, বাস্তবং তু শূন্যমেব তত্ত্বমিতি ভবানিব বদেৎ, অসদ্বা ইত্যাদি বাক্যং তস্য তাত্ত্বিকং স্যাৎ।—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৫৯৬ পৃষ্ঠা।

মাধবমুকুন্দ রামানুজ-সম্প্রদায়োক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরও অপূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং জীব ও জগদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন এই, জড়জগৎ এবং সুখদুঃখভাগী জীব ব্রহ্মের শরীর হইতে পারে কিরূপে? তাহাতে ব্রহ্ম জড় এবং সুখদুঃখময় হইয়া পড়িবেন নাকি? মায়াবাদে দুঃখকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীবের অনন্ত দুঃখরাশিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সংসারী জীবও অনন্ত, তাহাদের দুঃখও অনন্ত। এই অবস্থায় জীব ব্রহ্মের শরীর হইলে শরীরী ব্রহ্মের অনন্ত দুঃখভোগও অপরিহার্য নহে কি? এই দৃষ্টিতে তত্ত্ববিচার করিলে এই মত মায়াবাদ হইতে নিকৃষ্টতর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে।

"মায়াবাদাদপি মহদ্দুষ্টো'য়ং পক্ষঃ।" (পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬১৫ পৃঃ)। এই মতে ঈশ্বরেরই একাংশে নিত্য-দুঃখিত্ব, অপরাংশে নিত্য-সুখিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আংশিক সুখবাদ বা দুঃখবাদ স্বীকারের দ্বারা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সমর্থিত হইতে পারে না। এইজন্যই এই মতকে অজ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট স্তরের বলিয়া মাধবমুকুন্দ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অজ্ঞানবাদেও অজ্ঞানী জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে পাপী-তাপী জীবকে এবং অচেতন জড়জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া বর্ণনা করায়, ঐরূপ জীব ও জগদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মও যে হেয়গুণবিশিষ্টই হইবেন, অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট হইবেন না তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপভেদ স্বাভাবিক বলিয়া জীবের দুঃখে পরমেশ্বরের দুঃখ-ভোগের প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই স্বীকার্য। তাহাতে যে কোন শ্রুতি-স্মৃতিরই কোনরূপ অনুপপত্তি নাই, তাহা আমরা পূর্বেই বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি।

ভাস্করোক্ত ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ

ভাস্করাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাস্কর-ভাষ্যে নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সমর্থন করেন নাই। এই মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। এবং তাহার স্থলে ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন। এই ঔপাধিক ভেদাভেদবাদও প্রাচীন মত। ভাস্করের পূর্বেও ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বৃত্তিকার প্রভৃতির গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাস্করের পরবর্তীকালেও এই মতের প্রচার ও প্রসার কেশব, অমৃতানন্দ, ব্রহ্ম-প্রকাশিকাকার প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকটার্থ বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, বিবরণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থেও এই মতের পরিচয় সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং বেদান্তের চিন্তাজগতে ভাস্করোক্ত ঔপাধিক ভেদাভেদবাদেরও যে স্থান আছে তাহা অনস্বীকার্য। মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষ-গিরিবজ্রে এই ভাস্করীয় মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য বলেন, অপরিমিত অসংখ্য কল্যাণগুণনিলয় পরব্রহ্ম অনাদি উপাধিবশতঃ জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্যদ্বারা অভেদবোধের উদয় হইলে

ঔপাধিক ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে ; এবং জীব মুক্তিলাভ করে। জীব ও শিবের অভেদজ্ঞানই ঔপাধিক ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে। জীব ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও, জীব ও পরম শিবের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধির উদয় হয় তাহা স্বাভাবিক নহে, উপাধিকল্পিত। অভেদবুদ্ধির উদয় হইলে ঐ কল্পিত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। জীব ও শিব এক হইয়া যায়। ইহাই ভাস্করোক্ত বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য।

এইরূপ ভাস্করীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনে স্বাভাবিক ভেদবাদী বলেন, আলোচ্য ভাস্করমত বিচারসহ নহে বলিয়া ঐ মত অসঙ্গত এবং গ্রহণের অযোগ্য। ঔপাধিক ভেদবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, ভেদ ঔপাধিক বলিয়া ভাস্করাচার্য কি বুঝাইতে চাহেন ?—(১) তিনি কি এইরূপ বলিবেন যে, উপাধিদ্বারা বিচ্ছিন্ন সীমিত ব্রহ্মখণ্ডই অণুপরিমাণ জীব ? (২) অথবা জীব উপাধিদ্বারা বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ড নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও অণুরূপ উপাধিসংবলিত ব্রহ্মের প্রদেশ-বিশেষই জীব। (৩) কিংবা জীব ব্রহ্মের প্রদেশবিশেষ নহে, কিন্তু উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব। (৪) অথবা উপাধিসংযুক্ত চেতনান্তরই জীব। (৫) অথবা উপাধিই জীব ? উপরে বর্ণিত পাঁচটি পক্ষের মধ্যে কোন একটি পক্ষকেই নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। প্রথমতঃ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বস্তু, উপাধিদ্বারা অচ্ছেদ্য পরব্রহ্মের বিচ্ছেদের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ছেদ্য হইলে তাঁহার নিরবয়বত্ববোধক শ্রুতির বাধ অবশ্যম্ভাবী হয়। তারপর, উপাধিদ্বারা বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই জীব হইলে, জীব হইবে সাদি, ফলে তাহার (জীবের) অজত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতির বাধ ঘটিবে। ছেদন শব্দের অর্থ হইল (দ্বিধাকরণ), কাটিয়া দুই ভাগ করা। ভাস্করাচার্যের মতে জীব অসংখ্যবিধায় ব্রহ্মেরও অসংখ্য খণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। অখণ্ড ব্রহ্মের অসংখ্য খণ্ডের পরিকল্পনা সঙ্গত হইবে কি ?

জীব ব্রহ্মের খণ্ড নহে। অণুরূপ উপাধিসংবলিত অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশই জীব, এইরূপ কল্পনাও যুক্তিবিরুদ্ধ। উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশই জীব হইলে, উপাধিকল্পিত দোষসমূহও ব্রহ্মের প্রদেশ-বিশেষেই বিরাজ করিবে, ফলে, ব্রহ্মও ঔপাধিক দোষ-কলুষিতই হইয়া পড়িবেন নাকি ? তৃতীয়পক্ষও অসঙ্গত। উপাধি-সংযুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপই জীব হইলে, ব্রহ্মেরই জীবত্বাপত্তি ঘটে, জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম এই মতে অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। উপাধি-সংবলিত চেতনান্তরই জীব, এই চতুর্থ পক্ষ গ্রহণ করিলে জীব ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ ভিন্নই হইল। সেরূপ ক্ষেত্রে ভেদবাদ আর ঔপাধিক রহিল না। নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদবাদই জয়যুক্ত হইল। ভাস্কর নিম্বার্কের কুক্ষিগত হইয়া পড়িলেন। পঞ্চম পক্ষানুসারে উপাধিই জীব হইলে, উপাধি বিনশ্বর বিধায় জীবও বিনশ্বরই হইয়া পড়িবে। আত্মার বিনাশ চার্বাক স্বীকার করেন। ভাস্করও সেই চার্বাকমতের অনুবর্তন করায়, ভাস্করীয় মত চার্বাকমতেই অনুপ্রবেশ করিবে নাকি ?[১]

১। পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬২৯-৬৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাস্করাচার্য বলেন, উপাধিদ্বারা ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মেরই জীবভাব স্বীকার করিলে, জীবাবস্থায় ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণসমূহ উপাধিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, ইহাও ভাস্করাচার্যকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। এখন কথা এই, পরব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ কি স্বাভাবিক, না ঔপাধিক? যদি ঔপাধিক হয়, তবে সেই উপাধি কি সত্য, না মিথ্যা? সত্য হইলে, তাহা কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন? ভিন্ন হইলে তাহাও কি ঔপাধিক? না, অন্য কোন কারণমূলক, না ব্রহ্মহেতুক? উপাধি ঔপাধিক বা উপাধিমূলক এমন কথা বলা যায় না, তাহাতে 'আত্মাশ্রয়' দোষ ঘটে। অন্য কোনও কারণমূলক বলিলে, 'অনবস্থা' দোষ সেরূপ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়। উপাধি-সম্বন্ধের জন্য হেত্বন্তর স্বীকার করিলে তাহার জন্যও পুনরায় হেত্বন্তর-কল্পনার আবশ্যকতা দেখা দেয় এবং এইরূপে অনবস্থাই আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং উপাধিমূলক হইলে এই ভেদসিদ্ধিতে কারণ কি হইবে? ব্রহ্মই কারণ বলিয়া নির্ধারিত হইলে "অন্যোʼন্যাশ্রয়" দোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দিবে নাকি? উপাধির সিদ্ধি হইলে তবেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি হইবে, এবং ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হইলেই উপাধির সিদ্ধি হইবে, এইরূপে অন্যোʼন্যাশ্রয় দোষ অবশ্যম্ভাবী হইবে। উপাধি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে, "উপাধিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদবুদ্ধির উদয় হইতেও কোনরূপ বাধা থাকিবে না। উপাধি মিথ্যা এইরূপও ভাস্করাচার্য বলিতে পারিবেন না। তাহাতে ভাস্করমত অদ্বৈতবেদান্তের অধ্যাসের অন্তরালে আত্মগোপন করিবে। এইজন্য উপাধি মিথ্যা এইরূপ সিদ্ধান্ত ভাস্কর কিছুতেই স্বীকার করিবেন না।

ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম ঔপাধিক এইরূপ কল্পনা দেখা গেল অচল। সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বাভাবিক হইলেও সেখানে আপত্তি হইবে এই যে, সেই সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন? না ভিন্নাভিন্ন? সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এইরূপ মত ভাস্কর স্বীকার করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে ঐরূপ মতের নিন্দাই ধ্বনিত হইয়াছে। সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে "সর্বজ্ঞত্বাদি গুণই ব্রহ্ম" এইরূপ বলিতেও ভাস্করাচার্যের আপত্তি করিবার কোনই কারণ দেখা যাইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্।" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার গুণরাজির যে সুস্পষ্ট ভেদের নির্দেশ রহিয়াছে তাহা বাধা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় যোজনায়, ভেদাভেদপক্ষকে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিলে, স্বীয় ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ সিদ্ধান্তকে বিসর্জন দিয়া ভাস্কর নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সহিতই হাত মিলাইতে বাধ্য হইবেন।[১]

ভেদ ঔপাধিক হইলে—আরও একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, মোক্ষ অবস্থায় ভাস্করের মতে জীব থাকে কি না? যদি থাকে, তবে উপাধির খোলস খসিয়া পড়িলেও জীবের

১। পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬৩১ পৃষ্ঠা।

স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদ বিদ্যমান থাকে বলিয়া, ঐ ভেদবাদকে আর ঔপাধিক বলা চলে না। স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়।[১] পক্ষান্তরে, মুক্ত অবস্থায় জীব যদি না থাকে, তবে জীবের স্বরূপ-নাশই মুক্তি হইয়া দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে মায়াবাদীর মুক্তির সহিত ভাস্করীয় মুক্তির কিছুই পার্থক্য থাকে না। অবশ্যই মায়াবাদী মুক্তিতে জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই স্বরূপ-বিনাশ স্বীকার করেন। ভাস্কর মোক্ষ অবস্থায় ঈশ্বরের বিনাশ স্বীকার না করিলেও জীবের বিনাশ স্বীকার করিতে বাধ্য হন বলিয়া, এই অংশে ভাস্করের সিদ্ধান্ত মায়াবাদেরই সমান হইয়া পড়ে।

ভাস্করের মতানুসারে অভেদ স্বাভাবিক এবং ভেদ ঔপাধিক হইলেও শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রায় পর্যালোচনা করিলে সুধী দেখিতে পাইবেন যে, অভেদের ন্যায় ভেদও স্বাভাবিকই বটে—ঔপাধিক নহে। চেতন জীব ও অচেতন জড়বর্গের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদের উপদেশ করা হইয়াছে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি," "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অভেদ সমর্থিত হইয়াছে। শ্রুতি তুল্যবল। সুতরাং কোন শ্রুতিকেই অপ্রমাণ এবং দুর্বল বলা চলে না। এই অবস্থায় ভেদ এবং অভেদ এই উভয়কেই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভেদ ও অভেদ অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং ঐরূপ বিরুদ্ধ ভেদাভেদ একই বস্তুতে থাকিবে কিরূপে? যাহা ভিন্ন, তাহা অভিন্ন নহে। যাহা অভিন্ন তাহাও ভিন্ন নহে। এইরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভেদাভেদ একই (ব্রহ্ম) বস্তুতে বিদ্যমান থাকে এইরূপ সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" (ব্রঃ সূঃ, ৩।২।২৭)। শ্রুতিতে যে ভেদ ও অভেদ এই উভয়েরই সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রুতির মর্ম দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমর্থনের জন্য আলোচ্য সূত্রে কুণ্ডলীপাকান্ সাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই যে, সুদীর্ঘ সর্প যখন কুণ্ডলী পাকাইয়া গোল হইয়া অবস্থান করে, তখন দীর্ঘতর সর্প এবং কুণ্ডলাকার সাপের স্বাভাবিক ভেদ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অবশ্য কুণ্ডলী সর্পেরই কুণ্ডলী; সুতরাং কুণ্ডলী যে সর্পাত্মক, সর্পের উহা ধর্ম এবং সর্পই কুণ্ডলীর আধার, কুণ্ডলী আধেয়, এইরূপে কুণ্ডলী যে সর্প হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? সর্পের সহিত অপৃথক্‌সিদ্ধ কুণ্ডলীর অভেদও স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছু নহে। লম্বমান অর্থাৎ দীঘল সর্পের সর্পরূপ ব্যক্ত, কুণ্ডলরূপ তখন অব্যক্ত। কুণ্ডলী পাকান অবস্থায় কুণ্ডলরূপ ব্যক্ত, সুদীর্ঘ সর্পরূপ অব্যক্ত। ব্যক্তভাব স্থূলাবস্থা, অব্যক্তভাব সূক্ষ্মাবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়।

১। উপাধিবিগমে'পি জীবস্বরূপস্য বিদ্যমানতাঙ্গীকারে ঔপাধিকভেদবাদো দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।
—পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬৩২ পৃষ্ঠা।

স্থূলাবস্থায় সূক্ষ্মরূপ স্থূলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে, সেইজন্য উহা স্থূলদর্শীর দৃষ্টিতে ভাসে না। সূক্ষ্মাবস্থায়ও স্থূলাবস্থা অনুরূপ ভাবেই বিরাজ করে। ফলে, সর্প ও কুণ্ডলীর স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই সিদ্ধ হয়। এই দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম ও বিশ্ব-প্রপঞ্চের সম্পর্ক বিচার করিলে, ঐরূপ স্বাভাবিক ভেদাভেদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নাম ও রূপোজ্জ্বল স্থূল জড়জগৎ পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট বা পরাধীন। অর্থাৎ উহা জগৎকারণ স্বতন্ত্রসত্তাশালী পরব্রহ্মের অধীন। সুতরাং পরাধীন ব্যক্ত জগৎ যে স্বাধীন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতি-গোচর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? নাম-রূপময় ব্যক্ত কার্য প্রত্যক্ষগম্য সন্দেহ নাই। ঐ কার্য-জগৎই যখন অব্যক্তাবস্থায় স্বীয় কারণে বিলীন থাকে, তখন বীজে অঙ্কুরের মত কারণে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত কার্য ব্যক্তরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণগোচর না হইলেও, অব্যক্ত নামরূপোজ্জ্বল কার্যের অস্তিত্ব তখন অস্বীকার করা যায় না। কার্যের সত্তা তখনও সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত উভয়বিধ কার্যই কারণাধীন, কারণাত্মক বা কারণাশ্রিত। সুতরাং কারণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধও বটে। কারণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ কার্য কারণাধীন এবং কারণাভিন্ন হইলেও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যক্ত কার্যরূপে কারণ হইতে কার্যের স্বাভাবিক ভেদও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অবস্থায় সূত্রোক্ত সর্পের দৃষ্টান্ত অনুসারে পরব্রহ্ম ও জড়জগতের স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কই স্বীকার্য।

অহির দৃষ্টান্তে অচেতন জড়প্রপঞ্চের সহিত পরব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্ক স্থাপন করতঃ চেতন জীববর্গেরও ব্রহ্মের সহিত স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, অচেতন জড়প্রপঞ্চের ন্যায় চেতন জীববর্গেরও ব্রহ্মের সহিত স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কই শ্রুতি এবং ব্রহ্মসূত্রের অভিমত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এই শ্রুতিতে ধ্যাতৃ-ধ্যেয়ভাবে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদের নির্দেশ করা হইয়াছে।

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্," এইসকল শ্রুতিতে প্রাপ্য-প্রাপকভাবে জীব ও ব্রহ্মের আলোচ্যভেদেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

"যমাত্মা নমন্তরো যময়তি," এই অন্তর্যামিব্রাহ্মণোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যরূপে পরব্রহ্ম এবং চেতন জীবের বিভেদই সূচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদান্তমহাবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতির কোন নির্দেশই উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদই যে শ্রুতির মর্ম তাহা কোন মতে অস্বীকার করা চলে না। জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ-সম্পর্ককে আরও স্পষ্টতর করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মসূত্রকার "প্রকাশাশ্রয়বদ্‌বা তেজস্ত্বাৎ।" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮) এই সূত্রে সূর্য ও সূর্যপ্রভাকে দৃষ্টান্তহিসাবে উপন্যাস করিয়াছেন। সূর্যের প্রভা ঐ প্রভার আশ্রয় সূর্য হইতে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে বলিয়া সূর্য ও সূর্যপ্রভার যে স্বভাবসিদ্ধ ভেদ আছে, তাহা কোন মনীষী দার্শনিকই অস্বীকার

করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, প্রভা সূর্যাশ্রিত, সূর্যই প্রভার আধার, প্রভা আধেয়। সূর্য অস্ত গেলে প্রভাও বিলীন হইয়া যায়। সূর্য ও প্রভা সুতরাং অপৃথক্‌সিদ্ধ (অবিনাভাবসিদ্ধ) বলিয়া উহাদের অভেদও স্বাভাবিক। প্রদর্শিত সূর্য ও সূর্যপ্রভার ন্যায় পরব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাংশ, ব্রহ্মাধীন চেতন জীববর্গেরও স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কই বুঝিতে হইবে।

জীব অণুপরিমাণ, ব্রহ্ম পরমমহৎ; জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি, পরব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি; এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। তারপর, জীব ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মই জীবের আধার বা আশ্রয়। ব্রহ্ম ব্যাপক, জীব ব্রহ্মব্যাপ্য। জীব ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বা অবিনাভাবসিদ্ধ বলিয়া, জীব ও ব্রহ্মের অভেদও যে স্বাভাবিক তাহা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্ক স্বীকার করিলে ভেদ প্রতিপাদক এবং অভেদের বোধক শ্রুতিসমূহের মধ্যে বিরোধেরও অবসান ঘটে।

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রভার সহিত সূর্যের যেমন আধারাধেয়ভাব আছে, উদয়াস্তভাবও আছে। সূর্য ও প্রভার দৃষ্টান্তে জীব ও ব্রহ্মের আধারাধেয়ভাব স্বীকার করিলে, সূর্য ও সূর্যপ্রভার ন্যায় জীব এবং ব্রহ্মের উদয়াস্তভাবেরও আপত্তি উঠিবে নাকি? ইহার উত্তরে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বলেন—জীব ও ব্রহ্মের আধারাধেয়ভাব শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধ—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।"

"যস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"

ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব ও ব্রহ্মের আধারাধেয়ভাব, আশ্রয়াশ্রয়িভাব জানা যায়।

"ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব", এই গীতোক্তি এবং "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ, ১।৩।১)। এই ব্রহ্মসূত্রও জীব ও ব্রহ্মের আধারাধেয়ভাব সমর্থন করে। সুতরাং ব্রহ্ম যে জীবের আশ্রয় এবং আধার তাহা অস্বীকার করা যায় না। আধারাধেয়ভাব থাকিলেই যে উদয়াস্তময়ভাবও থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। জীব ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মধৃত, ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ, অবিনাভাবসিদ্ধ, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, এই অংশেই সূর্য ও সূর্যপ্রভার দৃষ্টান্তের মর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত হইলে তাহা যে সর্বাংশে দার্ষ্টান্তিকের তুল্য হইবে এমন কোন কথা নাই। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক সর্বাংশে তুল্য হইলে সেখানে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবই থাকে না। আংশিক তুল্যতা, আংশিক সাদৃশ্যই দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের রহস্য। মুখের সহিত চন্দ্রের সর্বাংশে তুল্যতা থাকে কি? তাহা অভিপ্রেত কি? লাবণ্য ও মাধুর্যের দিক্ দিয়া মুখ ও চন্দ্রের আংশিক সাদৃশ্যই অভিপ্রেত। এ ক্ষেত্রে সূর্য-সূর্যপ্রভার ন্যায় অবিনাভাব এবং অপৃথক্‌সিদ্ধতা জীব এবং ব্রহ্মের আছে। ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার সূর্য ও প্রভার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রবীণ আচার্য কেশবকাশ্মীরী তাঁহার বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই দৃষ্টিতেই আলোচিত ব্রহ্মসূত্র-রহস্য বিচার করিয়াছেন এবং সম্প্রদায়োক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

বৈষ্ণববেদান্তের আলোচনায় আমরা তিনপ্রকার ভেদাভেদবাদের পরিচয় পাই—

(ক) নিম্বার্কের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ,
(খ) ভাস্করাচার্যের ঔপচারিক বা ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ,
(গ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

মাধবমুকুন্দ তাঁহার "পরপক্ষগিরিবজ্রে" ভাস্করোক্ত ঔপচারিক ভেদাভেদবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া ঐ মতের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনায়ই সুধী দেখিয়াছেন। মাধবমুকুন্দ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমালোচনা করিলেও, গৌড়ীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের কোন বিরূপ আলোচনা তাঁহার গ্রন্থে তিনি কোথায়ও করেন নাই। শ্রীনিবাসাচার্য, কেশবকাশ্মীরী প্রভৃতির গ্রন্থেও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভক্তি-ভাগীরথীর পবিত্র ধারা—যাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রবাহে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিম্বার্ক-মতানুরাগীদিগেরও চিত্ত জয় করিয়াছিল।

সাধনতত্ত্ব-সম্পর্কে শ্রীমন্নিম্বার্ক বলেন—ভেদাভেদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। নিম্বার্ক-কৃত "দশশ্লোকী"তে উপাস্যের যে বর্ণনা আছে, তাহা ঐ সাধন-পথের যাঁহারা পথিক তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রেমলক্ষণা ভক্তিই এই মতের উপাসনার মুখ্য সাধন। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য রচিত বেদান্তমঞ্জুষা টীকায় রুক্মিণী-সত্যভামা-শ্রীরাধামিলিত শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—"রুক্মিণী-সত্যভামা-ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদা উপাসনীয়ঃ।" 'ভক্তিমাল' গ্রন্থেও আলোচ্য নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কমতের বিবরণ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন এইরূপে দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ সর্বোপরি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে, সেই সময় মিথিলায় নৈয়ায়িকপ্রবর শঙ্করমিশ্রের আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে'র উপর টীকা রচনা করেন। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের টীকা রচনা করিয়াও শঙ্করমিশ্র 'ভেদরত্নপ্রকাশ' নামে গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীহর্ষের মতের খণ্ডন করেন। বৈশেষিক-দর্শনের উপর 'উপস্কার' নামে টীকা রচনা করিয়া দ্বৈতবাদ সমর্থন করেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেই রঙ্গরামানুজাচার্য রামানুজমতানুসারে প্রসিদ্ধ দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপনিষদ্-ভাষ্যের অভাব মোচন করেন। অনন্তাচার্য[১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন এবং

১। অনন্তাচার্য যাদবগিরিপ্রদেশের মালকোটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁহার ব্রহ্মলক্ষণ-নিরূপণ গ্রন্থে শ্রীভাষ্যের টীকা, শ্রুতপ্রকাশিকার রচয়িতা সুদর্শনাচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনন্তাচার্য যে সুদর্শনাচার্যের পরবর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। সুদর্শনাচার্য খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে আবির্ভূত

বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে দ্বিতীয় বাচস্পতিমিশ্র (ভামতীর টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে'র প্রতিবাদে 'খণ্ডনোদ্ধার' নামে একখানি সূক্ষ্ম বিচারবহুল গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমত আক্রমণ করেন। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম (ইনি নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম হইতে পৃথক্ ব্যক্তি) মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবমতের অনুকূলে 'তত্ত্বদীপিকা' নামে গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিরোধিতা করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কিংবা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য তৈলঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত ইনি প্রয়াগে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। সেখানে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের সুবোধিনী টীকা রচনা করেন। কবি-কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বল্লভাচার্যকে গৌরপরিকর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে বল্লভাচার্যের বন্দনা করিয়াছেন। বল্লভ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁহার পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বরও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে বল্লভের শিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতি বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় নামে একটি পৃথক্ সম্প্রদায় গঠিত করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মত হইতে বল্লভাচার্য-প্রবর্তিত দার্শনিক মতের কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীবল্লভাচার্যের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। শ্রীপাদ বল্লভের অদ্বৈতবাদে মায়ার সম্পর্ক নাই। মায়ার সম্বন্ধ নাই বলিয়াই উহাকে শুদ্ধ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ব্রহ্ম কারণ এবং জীবজগৎ তাহার কার্য। কার্য ও কারণ উভয়ই শুদ্ধ ও অভিন্ন। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য তাঁহার অণুভাষ্যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, সর্বশক্তিমৎ, এবং সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-বর্জিত। নির্গুণ হইয়াও তিনি সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মায়াকল্পিত নহে, উহা আরোপিতও নহে। তাঁহার মতে পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য অচিন্ত্য, "সর্বভাবসমর্থত্বাদচিন্ত্যৈশ্বর্যবৎ বৃহৎ" (১।১।২ ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য)। তাঁহার মতে রসস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্মতত্ত্ব। জীব ব্রহ্মের চিদংশ ও নিত্য। কিন্তু জীব অণু। জীব অংশ হইলেও

হন। অতএব অনন্তাচার্যের আবির্ভাবকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দী। অনন্তাচার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজি রচনা করেন—(১) জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, (২) প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, (৩) ব্রহ্মপদশক্তিবাদ, (৪) ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণ, (৫) বিষয়তাবাদ, (৬) মোক্ষকারণতাবাদ, (৭) শরীরবাদ, (৮) শাস্ত্রারম্ভসমর্থন, (৯) শাস্ত্রৈক্যবাদ, (১০) সংবিদেকত্বানুমাননিরাস, (১১) সমাসবাদ, (১২) সামানাধিকরণ্যবাদ, (১৩) সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন প্রভৃতি। সমস্ত গ্রন্থেই অনন্তাচার্য শঙ্করমত খণ্ডন করিয়া রামানুজমত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণানন্দ, জীব তিরোহিতানন্দ, কিন্তু তথাপি শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম একই—ভিন্ন নহে। ইহাই হইল বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য বেদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত—এই শাস্ত্র-চতুষ্টয়কেই প্রধানভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বিধৃত। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠল নাথ পিতৃ-কৃত অণুভাষ্যের প্রথম আড়াই অধ্যায়ের টীকা এবং ভাগবতের সুবোধিনী টীকার উপর টিপ্পনী রচনা করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করেন।

এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের প্রবচন-ভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাস-ভাষ্যের উপর যোগবার্তিক নামে বিস্তৃত টীকা, ঈশ্বরগীতা, উপনিষদ্‌ এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য, যোগসার-সংগ্রহ, ব্রহ্মাদর্শ, দুর্জন-মুখ-চপেটিকা প্রভৃতি রচনা করিয়া দ্বৈতবাদী সাংখ্যমতের অশেষ সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন এবং অদ্বৈতবাদের মূলে আঘাত করেন। এইরূপে নব্যন্যায়ের অভ্যুত্থান, বৈষ্ণবমতের জাগরণ ও সাংখ্য-মতের বিকাশ প্রভৃতির ফলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে অদ্বৈতবাদের সহিত যে বাদযুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, সেই যুদ্ধে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতি আচার্যগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের প্রতিভার অমল জ্যোতিতে সর্বপ্রকার অদ্বৈত-বিরোধী সিদ্ধান্তের অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যার গৌরব-পতাকা বহন করেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

আচার্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য প্রকাশানন্দ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাশীধামে অবস্থান করিয়া বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে এক উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের পুষ্টিসাধন করেন।[১] প্রকাশানন্দ বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন, বিদ্যারণ্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং প্রকাশানন্দের স্থিতিকাল খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের পর, ষোড়শ শতকের পূর্ব (অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক) বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায়। প্রকাশানন্দের বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর নানাদীক্ষিত সিদ্ধান্ত-দীপিকা নামে টীকা রচনা করিয়া প্রকাশানন্দের মত জিজ্ঞাসুর নিকট সুগম করিয়া দিয়াছেন। প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিতে প্রদর্শিত "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" বিবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে স্থাপন করিয়াছেন। চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্যগণ "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" সমর্থন করেন নাই; দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের স্থলে "সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ" অঙ্গীকার করিয়াছেন। জগন্মিথ্যাত্ববাদী

১। বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ব্যতীত প্রকাশানন্দ তারা-ভক্তি-তরঙ্গিণী, মনোরমাতন্ত্ররাজ-টীকা, মহালক্ষ্মী-পদ্ধতি, শ্রীবিদ্যা-পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তন্ত্র-রহস্য প্রকাশ করেন। তিনি একাধারে তান্ত্রিক সাধক ও অদ্বৈতবেদান্তী ছিলেন।

অদ্বৈতবাদীর পক্ষে "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" মানিয়া লওয়াই শোভন বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টিকালীন বিশ্বের সৃষ্টি অঙ্গীকার করিলে জগতের সত্যতার প্রশ্ন উঠে না। এই জন্য প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য মধুসূদন সরস্বতী তদীয় অদ্বৈতসিদ্ধিতে দ্বৈতবেদান্তীর সহিত বাদযুদ্ধে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের যৌক্তিকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজ বলেন, জগৎ যে সত্য এবিষয়ে মানবমাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর, "এই সেই বস্তু, যাহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি, যাহা আমার জীবনের বিবিধ প্রয়োজন সাধন করিয়াছে," এইরূপে জাগতিক বস্তুসম্পর্কে সকলেরই (প্রত্যভিজ্ঞা) জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়, সুতরাং সৃষ্টিকে দৃষ্টির সমসাময়িক ও মিথ্যা বলা যায় কিরূপে? ব্যাসরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, নিখিল বিশ্ব-সৃষ্টিই জীবের ব্যক্তিগত অজ্ঞানের বিলাস এবং তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রমমাত্র। জীব যাহা দেখে, তাহা জীব নিজেই নিজের অজ্ঞানবশতঃ সাময়িক ভাবে সৃষ্টি করে। অনির্বচনীয় মায়ার বিচিত্র শক্তিই বিবিধ অনির্বচনীয় মিথ্যা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল। বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়াই বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত বিভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্রে আবিদ্যক বিশ্বপ্রপঞ্চকে জলবুদ্‌বুদের মত ক্ষণিক ও মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এক ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত দ্বৈত জগৎই ইন্দ্রজাল এবং অজ্ঞানের খেলা। বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে কোন সত্যতা নাই, বিশ্বের সত্যতা প্রতীতিকালীন মাত্র।[১] প্রতীতিকালেই মাত্র বিশ্ব সত্যরূপে প্রতিভাত সুতরাং মিথ্যা বিশ্বপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া জানাই মায়া বা অজ্ঞান। মিথ্যা বলিয়া বোঝাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। ঐরূপ জ্ঞানোদয় হইলে এক অদ্বিতীয়, আনন্দময় ব্রহ্মই বিরাজ করিবে, জীব ও জগৎ কিছুই থাকিবে না। প্রকাশানন্দ নৈষ্ঠিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন, এইজন্যই জগৎসম্পর্কে তিনি "দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী" হইয়া পড়িয়াছেন। গৌড়পাদ প্রভৃতি আচার্যগণ বিশ্ব-সৃষ্টিকে স্বপ্ন-সৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বপ্ন-সৃষ্টির তুল্য হইলে "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই" সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এক শ্রেণির অদ্বৈতাচার্যগণ বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতাকে প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজতের সত্যতা হইতে অতিরিক্ত, ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করায় অদ্বৈতবাদের সমস্যা জটিলতর হইয়া পড়ে। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী আচার্যগণ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া অদ্বৈতবাদের গতিপথ সুগম করিয়া

১। সর্বলোকাদিসৃষ্টিশ্চ তত্তদ্দৃষ্টিব্যক্তিমভিপ্রেত্য; যদা যৎ পশ্যতি, তৎসমকালং তৎ সৃজতীত্যত্র তাৎপর্যাৎ। নচাবিদ্যাসহকৃত-জীবকারণকত্বে জগদ্‌বৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ, জগদুপাদানস্য অজ্ঞানস্য বিচিত্রশক্তিকত্বাৎ। বশিষ্ঠবার্তিকামৃতাদাবাকরেচ স্পষ্টমেব উক্তম্। যথা—

অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্বেঽমী বুদ্‌বুদা ইব।

ক্ষণমুদ্‌ভূয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈকজলধৌ লয়ম্॥

ইত্যাদি। তস্মাৎ ব্রহ্মাতিরিক্তং কৃৎস্নং দ্বৈতজাতং জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপমাবিদ্যকমেবেতি প্রাতীতিকসত্ত্বং সর্বস্যেতি সিদ্ধম্।—অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৩৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ আমরা একাদশ পরিচ্ছেদে মণ্ডন ও সুরেশ্বরের দার্শনিকমতের বিচারপ্রসঙ্গে এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বাচস্পতিমিশ্রের ভামতীর বেদান্তমতের আলোচনায় প্রকাশ করিয়াছি, সেই আলোচন দেখুন।

দিয়াছেন। এই সমাধানের পথে প্রকাশানন্দের দান অতুলনীয়। প্রকাশানন্দ নামে চৈতন্যদেবের এক শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের শিষ্য প্রকাশানন্দ বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রচয়িতা প্রকাশানন্দ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

মল্লনারাধ্যাচার্য

ইনি দক্ষিণ ভারতে কোটীশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং "অদ্বৈতরত্ন" বা "অভেদরত্ন" নামে গ্রন্থ লিখিয়া দ্বৈতবাদের খণ্ডন এবং অদ্বৈতমত স্থাপন করেন। মল্লনারাধ্যাচার্যের অভেদরত্ন নৈয়ায়িক শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্নের খণ্ডন। আচার্য নৃসিংহাশ্রম অভেদরত্নের উপর "তত্ত্বদীপন" নামে এক টীকা রচনা করিয়া অভেদ বাদের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

রঙ্গরাজাধ্বরি

রঙ্গরাজাধ্বরি প্রসিদ্ধ আচার্য অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা। রঙ্গরাজের পিতার নাম আচার্য দীক্ষিত বা বক্ষঃস্থলাচার্য। কাঞ্চী নগরী ইহাদের বাসভূমি। কাঞ্চী পণ্ডিতের আকর। কাঞ্চীই বেদান্তমহাদেশিকাচার্য বা বেঙ্কটনাথের জন্মভূমি। কাঞ্চীর নিকটবর্তী "অড়য়প্পন" নামক গ্রামে দীক্ষিত পরিবার বাস করিতেন। আচার্য দীক্ষিত নানারূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া দীক্ষিত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। রঙ্গরাজ বিজয়নগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক। শ্রীকৃষ্ণদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজয়নগরের রাজা ছিলেন; সুতরাং রঙ্গরাজের স্থিতিকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। রঙ্গরাজ "অদ্বৈতবিদ্যামুকুর" ও পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর "পঞ্চপাদিকা-বিবরণ-দর্পণ" নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। রঙ্গরাজ বিভিন্ন শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতের খণ্ডনে এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপনে অলোকসামান্য মনীষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অতিমানুষ প্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তা অপ্পয় দীক্ষিতের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। অপ্পয় দীক্ষিত পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অদ্বৈতবেদান্তে দীক্ষালাভ করেন। রঙ্গরাজই অপ্পয় দীক্ষিতের বিভিন্ন শাস্ত্রে সর্বাতিশায়ী পাণ্ডিত্যের মূল প্রস্রবণ। ন্যায়রক্ষামণির প্রারম্ভে এবং পরিমলের প্রথম পাদের সমাপ্তিতে অপ্পয় দীক্ষিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় তদীয় পিতৃদেবের বিভিন্ন শাস্ত্রে অলোকসামান্য বিদ্যাবত্তার ও সর্বতোমুখী প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন।[১] এইরূপ পাণ্ডিত্য বড়ই বিরল। রঙ্গরাজাধ্বরির রচিত

১। (ক) যং ব্রহ্ম নিশ্চিতধিয়ঃ প্রবদন্তি সাক্ষাৎ তদ্দর্শনাদখিলদর্শনপারভাজম্।
তং সর্ববেদসমশেষবুধাধিরাজং শ্রীরঙ্গরাজমখিনং গুরুমানতোঽস্মি।
—ন্যায়রক্ষামণির প্রারম্ভ শ্লোক।

গ্রন্থরাজি মৌলিক চিন্তার সমাবেশে সুধীজনের উপভোগ্য হইয়াছে। রঙ্গরাজের পৌত্র নীলকণ্ঠ দীক্ষিত তদীয় "নলচরিতে" রঙ্গরাজের গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে" (সিঃ লেশ সং, ২৭২-৭৩ পৃঃ, অদ্বৈতমঞ্জরী সং) অদ্বৈতবিদ্যাকার বলিয়া তদীয় পিতৃদেবের অদ্বৈতবিদ্যামুকুরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত-স্থাপনে স্বীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

নৃসিংহাশ্রম

অদ্বৈতাচার্য নৃসিংহাশ্রম জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য এবং রামতীর্থের সতীর্থ। নৃসিংহাশ্রম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন। ইনি ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত-তত্ত্ববিবেক নামে এক অতি উপাদেয় প্রমেয়বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্-ব্যতীত তিনি ভেদ-ধিক্কার, অদ্বৈত-দীপিকা, অদ্বৈতপঞ্চরত্ন, পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর—ভাবপ্রকাশিকা টীকা, সংক্ষেপ-শারীরকের ব্যাখ্যা—তত্ত্ববোধিনী, মল্লনারাধ্যের অভেদরত্নের উপর—তত্ত্বদীপন নামে টীকা, বৈদিকসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈত-বিরোধী মতবাদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।[১] নৃসিংহাশ্রমের প্রত্যেকখানি গ্রন্থই যুক্তির গভীরতায়, তর্কের সাবলীল গতিতে এবং রচনা-কৌশলে অতুলনীয় হইয়াছে। ইঁহার মত পণ্ডিত কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। নৃসিংহাশ্রমই অপ্পয় দীক্ষিতকে তাঁহার পিতা রঙ্গরাজাধ্বরি ও পিতামহ আচার্য দীক্ষিতের অসামান্য অদ্বৈত-বিদ্যাবত্তা ও অদ্বৈত-নিষ্ঠার কথা স্মরণ করাইয়া শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতমত পরিত্যাগ করাইয়া অদ্বৈতবাদের বিবিধ নিবন্ধ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় অপ্পয় দীক্ষিত, কল্পতরুপরিমল, ন্যায়রক্ষামণি, সিদ্ধান্ত-লেশ-সংগ্রহ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের অপূর্বগ্রন্থরাজি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতকে সুদৃঢ়

(খ) কণভক্ষ-পদক্ষক-পক্ষ-পরিষ্করণক্ষণতক্ষণদক্ষগিরম্
অতিকর্কশ-তর্কশত-ক্ষুভিত-ক্ষপিত-ক্ষপণক্ষণ-ভঙ্গপদম্। ১
কপিলোক্তিনিরাকরণপ্রবণং কৃতপন্নগসূক্তিপরিষ্করণম্।
নয়মৌক্তিকভূষিত ভট্টমতং বিমলাদ্বয়চিৎসুখমগ্নধিয়ম্।। ২
মহতামপি মান্যতমং বিদুষাং বিনিবেশ্য গুরুং হৃদি বৈশ্বজিতম্।
নয়সংহতিশালিনি কল্পতরৌ বিবৃতশ্চরণঃ প্রথমঃ প্রথিতঃ। ৩
--কল্পতরু পরিমল, ১ম অঃ ১ম পাদের সমাপ্তি শ্লোক।

১। নৃসিংহাশ্রমের বেদান্ত-তত্ত্ববিবেকের উপর জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য অগ্নিহোত্রীর তত্ত্ববিবেচনী নামে টীকা আছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর রচয়িতা ভট্টোজি দীক্ষিতও তত্ত্ববিবেকের উপর বিবরণ নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য নারায়ণাশ্রম নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈত-দীপিকার উপর বিবরণ নামে টীকা ও ভেদাধিক্কারের উপর সৎক্রিয়া নামে টীকা রচনা করিয়া নৃসিংহা-শ্রমের দার্শনিকমত বুঝিবার পথ সুগম করেন। ভেদাধিক্কার-সৎক্রিয়ার উপর শুদ্ধানন্দ স্বামীর জনৈক শিষ্য ভেদাধিক্কার সৎক্রিয়োজ্জ্বলী নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ভিত্তিতে স্থাপন করেন। নৃসিংহাশ্রমের মতে জগতের মিথ্যাত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই অদ্বৈতবেদান্তের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য। জগতের মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করিতে গিয়া তিনি চিৎসুখাচার্যের মতের অনুবর্তন করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বীয় উপাধি বা আশ্রয়ে যে বস্তুর অভাববোধের উদয় হয়, তাহাই মিথ্যা—"প্রতিপন্নোপাধৌ অভাব-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্", (বেদান্ত-তত্ত্ববিবেক ১২ পৃঃ, পণ্ডিত সং)। শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, ঐ ভ্রান্ত রজতের আশ্রয় শুক্তি। ঐ আশ্রয়-শুক্তিতে রজতের অভাব আছে, সুতরাং ঐ অভাবের প্রতিযোগী রজত মিথ্যা। ঐ মিথ্যা-রজত সত্য-রজতের ন্যায় প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা সত্য নহে। ব্রহ্মাশ্রয়ে বিরাজমান বিশ্ব-প্রপঞ্চও ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই বিশ্বপ্রপঞ্চের অভাব নিশ্চয় করা যায়, সুতরাং দৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চ সত্য নহে, মিথ্যা। নৃসিংহাশ্রম তদীয় অদ্বৈত-দীপিকায় "জগতের মিথ্যাত্ব সত্য, কি মিথ্যা ?" এই দ্বৈতবাদীর আপত্তির উত্তরে জগতের মিথ্যাত্বেরও মিথ্যাত্ব নানারূপ যুক্তির সাহায্যে উপপাদন করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে ব্রহ্ম এবং জগতের মিথ্যাত্ব এই দুইটি সত্য বস্তু অঙ্গীকার করায়, অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, জগতের মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তবে জগতের সত্যতাই আসিয়া দাঁড়ায়। মধ্বমতাবলম্বী দ্বৈতবেদান্তিগণের উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে নৃসিংহাশ্রম বলেন যে, দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ যেমন মিথ্যা, সেইরূপ যাহা বিশ্বপ্রপঞ্চের সমানস্বভাব তাহাও মিথ্যা বলিয়াই জানিবে। জগৎ যেরূপ ব্যাবহারিক সৎ এবং মিথ্যা, জগতের মিথ্যাত্বও সেইরূপ ব্যাবহারিক সৎ এবং মিথ্যা। নির্বিশেষ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে সর্বপ্রকার ব্যাবহারিক বোধই মিথ্যা বলিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় জগতের বোধও যেরূপ তিরোহিত হইবে, জগতের মিথ্যাত্ববোধও সেইরূপ তিরোহিত হইবে। এক অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মই বিরাজ করিবে। সুতরাং জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও তাহাতে জগৎ সত্য হইবার আপত্তি আসে না। অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে "জগতের মিথ্যাত্ব সত্য, না মিথ্যা ?" এই প্রশ্নের উত্তরে নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈত-দীপিকায় উল্লিখিত মতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। নৃসিংহাশ্রমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধ্বমতের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে প্রগাঢ় যুক্তিতর্কের সাহায্যে নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জগতের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব উপপাদন করিয়াছেন। আমরা মধুসূদনের উপপাদন তাঁহার মতের বিবরণ-প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখাইব।

চৈতন্য এক এবং অভিন্ন, উপাধিভেদেই চৈতন্যের ভেদ হইয়া থাকে। জগতের সর্বত্রই চৈতন্যের সত্তা বিরাজমান। জ্ঞেয় জড় বস্তুর অন্তরালেও স্বপ্রকাশ চৈতন্য বিদ্যমান আছে এবং সেই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যই বিষয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া বিষয়কে প্রকাশ করিতেছে। এই বিষয়-চৈতন্য যখন প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইবে, তখনই বিষয় জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের গোচর হইবে। দূরস্থ বিষয়-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ উপপাদন করিবার জন্য অন্তঃকরণের বৃত্তি নির্গমনের

আবশ্যকতা অবশ্যস্বীকার্য।[১] অন্তঃকরণবৃত্তির নির্গমনের ফলে উৎপন্ন বিষয়-প্রত্যক্ষের যে বিবরণ নৃসিংহাশ্রম বেদান্ত-তত্ত্ববিবেকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয়ের মধ্য দিয়া সসীম ভাবে অসীমের যে স্ফুরণ হয়, সীমার বাঁধন ছিড়িয়া সেই অসীম চৈতন্যকে প্রত্যক্ষতঃ সর্বত্র উপলব্ধি করাই বেদান্ত-জিজ্ঞাসার লক্ষ্য।

অপ্পয় দীক্ষিত

অপ্পয় দীক্ষিত সংস্কৃতশাস্ত্র-গগনের উজ্জ্বল মার্তণ্ড। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা কোন এক বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সারস্বত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার মনীষালোক বিকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি একাধারে কবি, আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থসম্পদ্ অতুলনীয়।[২] বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি ১০৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চার শত। তদীয় গ্রন্থরাজির মধ্যে শিবার্কমণি-দীপিকা, বেদান্তকল্পতরু-পরিমল, ন্যায়রক্ষামণি এবং সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ দার্শনিক সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। অপ্পয় দীক্ষিত শিব-প্রেমে প্রেমিক ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদের প্রতিও তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবার্কমণি-দীপিকায় তিনি লিখিয়াছেন, যদিও বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতির অদ্বৈতবাদই তাৎপর্য বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং পণ্ডিতগণের বিচারে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যও অদ্বৈতপর বলিয়াই প্রতিভাত হয়, তবুও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, একমাত্র শিবের অনুগ্রহেই জীবের অদ্বৈত-নিষ্ঠা

১। যথা অন্তঃকরণবৃত্ত্যা ঘটাবচ্ছিন্নং চৈতন্যম্ উপাধীয়তে তথা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-ঘটাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যয়োর্বস্তুত একত্বেঽপি উপাধিভেদাদ্ ভিন্নয়োরভেদোপাধিসম্বন্ধেন ঐক্যাদ্ ভবত্যভেদ ইত্যন্তঃ-করণাবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য বিষয়াভিন্নতদধিষ্ঠানচৈতন্যস্যাভেদসিদ্ধ্যর্থং বৃত্তের্নির্গমনং বাচ্যম্।
—বেদান্ত-তত্ত্ববিবেক ২২ পৃঃ, পণ্ডিত সং।

২। অপ্পয় দীক্ষিতের রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ:—অলঙ্কার শাস্ত্রে—কুবলয়ানন্দ, চিত্র-মীমাংসা, বৃত্তি-বার্তিক ও নাম-সংগ্রহমালা। ব্যাকরণে—নক্ষত্রবাদাবলী, প্রাকৃতচন্দ্রিকা, মীমাংসায়—বিধি-রসায়ন, ও তাহার ব্যাখ্যা-সুখোপযোজনী, মীমাংসাধিকরণমালা, বাদ-নক্ষত্রমালা, চিত্রকূট ও উপক্রম-পরাক্রম। বেদান্তে—(অদ্বৈতবাদে)—বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল, ন্যায়রক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, মতসার-সংগ্রহ ও ন্যায়মঞ্জরী, (রামানুজমতে)—নয়ময়ূখ-মালিকা, (মধ্বমতে)—ন্যায়মুক্তাবলী, (শৈবমতে)—শিবার্কমণি-দীপিকা, রত্নত্রয়-পরীক্ষা, মণিমালিকা, শিখরিণী-মালা, শিবতত্ত্ব-বিবেক, শিবকর্ণামৃত, শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়, শিবার্চন-চন্দ্রিকা, শিবধ্যান-পদ্ধতি, শিবানন্দলহরী, রামায়ণ-তাৎপর্য-সংগ্রহ, মহাভারত-তাৎপর্য-সংগ্রহ, দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতি, এতদ্ব্যতীত রামানুজমত-খণ্ডন, মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দন, যাদবাভ্যুদয়-টীকা, পঞ্চরত্নস্তব, ও তাহার ব্যাখ্যা, কৃষ্ণধ্যানপদ্ধতি, বরদরাজস্তব, আত্মার্পণ প্রভৃতি। দীক্ষিত নিজেই স্বরচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। অনেক গ্রন্থ অপ্রকাশিত। এইরূপ মনীষীর রচিত সমস্ত গ্রন্থই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উৎপন্ন হয়।[১] এইরূপে শিব-প্রেমিক অপ্পয় দীক্ষিত শৈবমত ও অদ্বৈতমতের মধ্যে অবিরোধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মত শিবাদ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শিবার্কমণি-দীপিকায় তিনি শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং সগুণ ব্রহ্মবাদী। শিবার্কমণি-দীপিকা শ্রীকণ্ঠের শৈব-ভাষ্যের অতি উপাদেয় টীকা। শাঙ্কর ভাষ্যের ভামতী যেমন ভাষ্যের দুর্গম পথযাত্রীর যথার্থ আলোক, অপ্পয়ের শিবার্কমণি-দীপিকাও শ্রীকণ্ঠের শৈব-ভাষ্য-পাঠার্থীর সেইরূপ শৈব-ভাষ্যের বন্ধুর পথের উজ্জ্বল আলোক। শিবার্কমণি-দীপিকায় অপ্পয় দীক্ষিত ন্যায়, মীমাংসা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সর্বতোমুখী প্রতিভা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা শৈব-ভাষ্যের টীকা হইলেও এই টীকায় গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তার অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায় অপ্পয় দীক্ষিত সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিবার্কমণি-দীপিকায় শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত স্থাপিত হইয়াছে, বেদান্তকল্পতরু-পরিমলে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায়ও দীক্ষিত ঐরূপ দৃঢ়তার এবং চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণি-দীপিকায় লিখিয়াছেন যে, চিন্নবোম্ম নৃপতির ছত্র-চ্ছায়ায় অবস্থান করিয়া তাঁহার আদেশেই তিনি শিবার্কমণি-দীপিকা প্রণয়ন করেন।[২] এই চিন্নবোম্ম নৃপতি কে? অপ্পয় দীক্ষিত বেদান্তদেশিকের যাদবাভ্যুদয় নামক কাব্যের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিজয়নগর-রাজগণের এক বংশপরিচয় পাওয়া যায়; উহাতে দেখা যায় যে, রাজা রামের তিম্ম (তিরুমলই) নামে পুত্র এবং তিম্মের চিন্নতিম্ম নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিম্ম ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং তাহার আট বৎসর পর ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিম্মের পুত্র চিন্নতিম্ম রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় অপ্পয় দীক্ষিত যুবক অপ্পয় দীক্ষিত ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭২ বৎসরে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে। দীক্ষিতের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রাজা চিন্নবোম্ম তাঁহাকে বিবিধ রাজ-সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। "যাত্রাপ্রবন্ধে" দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, চিন্নবোম্ম

১। যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখরগিরামাগমানাঞ্চনিষ্ঠা
সাকং সর্বৈঃ পুরাণ-স্মৃতিনিকর-মহাভারতাদিপ্রবন্ধৈঃ।
তত্রৈব ব্রহ্মসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভান্তি বিশ্রান্তিমন্তি
প্রত্নৈরাচার্যরত্নৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদ্যৈস্তদেব।
তথাপ্যনুগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ।
অদ্বৈত-বাসনা পুংসামাবির্ভবতি নান্যথা॥—শিবার্কমণি-দীপিকার প্রারম্ভ শ্লোক।

২। ভাষ্যমেতদনঘং বিবৃণুতি স্বপ্নজাগরণয়োঃ সমংপ্রভুঃ।
চিন্নবোম্ম নৃপরূপভৃৎ স্বয়ং মাং ন্যযুঙ্ক্ত মহিলার্ধবিগ্রহঃ॥
—শিবার্কমণি-দীপিকা ১ পৃষ্ঠা।

তাঁহার স্বর্ণাভিষেকের সময়ে আচার্য দীক্ষিতকে স্বুবর্ণদ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন।[১] সম্ভবতঃ বিজয়-নগররাজ এই চিন্নবোম্মই চিন্নতিম্ম। অপ্পয়ের পিতা, পিতামহও বিজয়নগর-রাজের আশ্রিত ছিলেন। রাজপরিবারের আশ্রয়ে থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে শাস্ত্রানুশীলন করিয়া অপ্পয় দীক্ষিতের পিতামহ আচার্য দীক্ষিত এবং পিতৃদেব রঙ্গরাজাধ্বরি নানাশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যে ও বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পিতা রঙ্গরাজের নিকট নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া অদ্বৈতবাদের চরম দীক্ষা লাভ করিলেও, অপ্পয় দীক্ষিতের চিত্ত সর্বদা শিবপ্রেমে উদ্‌বেল থাকায় তিনি শৈব-বেদান্ত-মত সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে "শিবার্কমণি-দীপিকা", "শিবতত্ত্ব-বিবেক" প্রভৃতি রচনা করিয়া শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। অপ্পয় দীক্ষিত যখন শৈব-বেদান্ত-সাধনায় সমাহিত, তখন নর্মদার আশ্রম হইতে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য নৃসিংহাশ্রম অপ্পয় দীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার পিতা, পিতামহের অদ্বৈতবাদে অবিচল নিষ্ঠার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে অদ্বৈতমতে গ্রন্থ-রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করেন। নৃসিংহাশ্রমের প্রেরণায় অপ্পয় দীক্ষিতের চেতনার সঞ্চার হয়, চিত্তের গতি পরিবর্তিত হয় এবং অপ্পয় দীক্ষিত পিতৃ-পিতামহ-সেবিত অদ্বৈত ব্রহ্ম-বিদ্যার সমর্থনে বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল প্রভৃতি রচনায় মনোনিবেশ করেন। অপ্পয় গুরু-প্রদত্ত শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কোনও মহাপুরুষের (নৃসিংহাশ্রমের) উদ্দীপনায় যে তিনি কল্পতরু-পরিমল প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ-প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন, তাহা অপ্পয় দীক্ষিত কল্পতরু-পরিমলের প্রারম্ভে অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন—

> গুরুভিরুপদিষ্টমর্থং বিস্মৃতমপি তত্র বোধিতং প্রাজ্ঞৈঃ।
> অবলম্ব্য শিবমধীয়ন্ যথামতি ব্যাকরোমি কল্পতরুম্॥

—পরিমলের প্রারম্ভ-শ্লোক।

অপ্পয় দীক্ষিতের কল্পতরু-পরিমল ভামতীর টীকার টীকা হইলেও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থরাজির মধ্যে তাহা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। পরিমলে অপ্পয় দীক্ষিত ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন; তাঁহার মীমাংসোক্ত ন্যায়সমূহের ব্যাখ্যা অতি উপাদেয় হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যগণও তাঁহাদের গ্রন্থে শ্রদ্ধার সহিত পরিমলের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ" অদ্বৈতবেদান্তচিন্তার রত্নাকর। রত্নাকরে যেমন কোন রত্নেরই অভাব নাই, অপ্পয় দীক্ষিতের বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-রত্নাকরেও কোন চিন্তামণিরই অভাব নাই। বিভিন্ন অদ্বৈতাচার্যের চিন্তা-কুসুম আহরণ করিয়া তর্কের সূত্রে অপ্পয় দীক্ষিত এই সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-কুসুম-দাম রচনা করিয়াছেন।

১। হেমাভিষেকসময়ে পরিতো নিষণ্ণ-
সৌবর্ণসংহতিমিষাচ্চিনবোম্ম ভূপঃ।
অপ্পয়দীক্ষিতমণেরনবদ্যবিদ্যা-
কল্পদ্রুমস্য কুরুতে কণকালবালম্॥—অপ্পয়দীক্ষিত-কৃত যাত্রা-প্রবন্ধ।

এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতির ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাদের সহিত অপরাপর দার্শনিক মতের অবিরোধ, তৃতীয়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন ও চতুর্থে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল উক্ত গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। বিধি-বিচার, ব্রহ্মকারণতা-বাদ, মায়াকারণতা-বাদ, একজীববাদ, অনেকজীববাদ, প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, সাক্ষীর স্বরূপ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিভিন্ন অদ্বৈতাচার্যগণের মতের সরস, তথ্যপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় "সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ" পাঠে জানিতে পারা যায়। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতের এইরূপ সার-সংগ্রহও গ্রন্থকারের কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সকল আচার্যই যখন অদ্বৈতবাদী এবং এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় কোন তত্ত্ব নাই, তখন এত মত-ভেদ সেখানে দাঁড়ায় কিরূপে? ইহার উত্তরে অপ্পয় দীক্ষিত একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন। ব্রহ্ম সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা, ইহাই অদ্বৈত-বাদের রহস্য। ব্রহ্মের সত্যতা, এবং স্বরূপ-সম্বন্ধে কোন অদ্বৈতবাদীরই কোনরূপ মতানৈক্য নাই। কারণ, সত্যবস্তুর স্বরূপ একরূপই হইবে, সত্য বস্তু নানাপ্রকার হইতে পারে না। জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ অদ্বৈতবেদান্তের মতে মিথ্যা। অবাস্তব জীবও জগৎ সম্পর্কে দার্শনিকগণ স্বীয় প্রতিভা অনুসারে বিভিন্নপ্রকার তর্কের অবতারণা এবং বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা-কৌশল প্রদর্শন করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। "প্রাচীন আচার্যগণ আত্মার একত্বসিদ্ধির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন এবং আত্মার একত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ যত্নও করিয়াছেন। কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁহাদের বিশেষ আদর বা আস্থা ছিল না, তবে অল্পবুদ্ধিদিগের প্রবোধের জন্য ব্যবহার-সিদ্ধিসম্পর্কেও তাঁহারা নানাবিধ পন্থা বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।"[১] ফলে, অদ্বৈতবেদান্তেও নানা মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। ঐসকল মতবাদ অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্কলিত বিভিন্নপ্রকার মতবাদের কোন সমালোচনা বা তুলনা-মূলক বিচার তিনি করেন নাই। তাহার কারণ এই মনে হয়, প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থের এইরূপ লেখার শৈলী ছিল যে, সংগ্রহকারগণ নিরপেক্ষভাবে মতবাদ উদ্ধৃত করিতেন। স্বীয় সমালোচনা দ্বারা অনুকূল-প্রতিকূল মত বিচার করিতে চেষ্টা করিতেন না। মাধবাচার্যের সর্বদর্শন-সংগ্রহেও এইরূপ রীতিই দেখিতে পাওয়া যায়। অপ্পয় দীক্ষিতের কল্পতরু-পরিমল, ন্যায়রক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ প্রভৃতি বেদান্ত-গ্রন্থের যে কোন একখানা গ্রন্থই অপ্পয় দীক্ষিতের কীর্তিকে চিরস্মরণীয় রাখিবে। অপ্পয় রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি মতের সমর্থনেও যেমন গ্রন্থ লিখিয়াছেন,

---

১। প্রাচীনৈর্ব্যবহারসিদ্ধিবিষয়েষ্বাত্মৈকসিদ্ধৌ পরম্
সংনহ্যদ্ভিরনাদরাৎ সরণয়ো নানাবিধা দর্শিতাঃ।
তন্মূলানিহ সংগ্রহেণ কতিচিৎ সিদ্ধান্তভেদান্ ধিয়ঃ
শুদ্ধ্যৈ সংকলয়ামি তাতচরণব্যাখ্যাবচঃখ্যাপিতান্ ॥

—সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের আরম্ভের দ্বিতীয় শ্লোক।

ঐ সকল মতের খণ্ডনেও তিনি সেইরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতমতের খণ্ডনে অপ্পয় দীক্ষিত কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইহাদ্বারা রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতির মত যে তাঁহার অনুমোদিত নহে, অদ্বৈতবাদই অভিপ্রেত, ইহাই বুঝা যায়। অদ্বৈতবাদী অপ্পয় দীক্ষিত শিব-প্রেম ও শিবের চরণ-কমল মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্তে পুণ্যভূমি চিদম্বরমে শিব-পাদপদ্ম ধ্যান করতঃ এই বলিতে বলিতে তিনি জীবনলীলা সাঙ্গ করেন—

আভাতি হাটকসভানট-পাদপদ্ম
জ্যোতির্ম্ময়ো মনসি মে তরুণারুণো'য়ম্।

দীক্ষিতের প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তার ধারা অপ্রতিহত গতিবেগ লাভ করিয়াছে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ঐ ধারায় স্নান করিয়া চিরকাল কৃতার্থ হইবেন এবং শ্রদ্ধাবনতচিত্তে অপ্পয় দীক্ষিতের স্মৃতির পূজা করিবেন। সিদ্ধান্ত-লেশ-সংগ্রহে নানা জীববাদের বিরুদ্ধে একজীববাদ, অবচ্ছেদবাদের পরিবর্তে প্রতি-বিম্ববাদ, ব্রহ্মের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানতা প্রভৃতি অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অপ্পয় দীক্ষিত অকাট্য যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মায়া ও অবিদ্যার স্বভাব ও কার্যাবলীর আলোচনায় প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির বিরোধে শ্রুতির প্রামাণ্য-স্থাপনে অপ্পয় দীক্ষিত অসামান্য বিচার-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ন্যায়রক্ষামণিতে আনন্দময়াধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২–১৯ সূত্র) রামানুজের আনন্দময় সগুণ ব্রহ্মবাদ পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করিয়া উহা খণ্ডন করতঃ শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ অপূর্ব মনীষার সহিত অপ্পয় দীক্ষিত স্থাপন করিয়াছেন। আনন্দময়াধিকরণের সূত্রসকল যে শঙ্করমতেরই অনুকূল তাহা দীক্ষিত দৃঢ়তর যুক্তির সহিত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যত্তু আনন্দময়ব্রহ্মবাদে সূত্রাস্বারস্যমুক্তং তদপি ন যুক্তম্, পুচ্ছব্রহ্মবাদ এব সূত্রাণাং স্বারস্যস্য সমর্থিতত্বাৎ। (ন্যায়রক্ষামণি, আনন্দময়াধিকরণ) অপ্পয় দীক্ষিতের পরিমল ভাষাবিন্যাসের চাতুর্যে, তর্কের সাবলীল গতিতে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের গাম্ভীর্যে ও ভাবের সৌন্দর্যে সুধীমণ্ডলীর চিত্ত জয় করিয়াছে।[১]

সদানন্দযোগীন্দ্র

খৃষ্টীয় ১৫শ—১৬শ শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার নামে অদ্বৈতবেদান্তের একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে মীমাংসক আচার্য আপোদেব বেদান্তসারের উপর বালবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন। জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য, নৃসিংহাশ্রমের

১। আমরা ভামতীর বেদান্তমতের বিচার প্রসঙ্গে কল্পতরু ও পরিমলের দার্শনিক মতের আলোচনা করিয়াছি। বাচস্পতির বেদান্তমত এই পুস্তকের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখুন।

সতীর্থ রামতীর্থ স্বামী সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নামে টীকা, সংক্ষেপ-শারীরকের টীকা, উপদেশসাহস্রীর টীকা, পঞ্চীকরণের উপর আনন্দজ্ঞানের বিবরণ নামে যে টীকা আছে, ঐ টীকার টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি-সাধন করেন। এই রামতীর্থ স্বামী অনেকের মতে মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যাগুরু। মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থে "শ্রীরাম-বিশ্বেশ্বর-মাধবানাম্" বলিয়া যে গুরুর নমস্কার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাম বলিয়া রামতীর্থ স্বামীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে আচার্য নৃসিংহ সরস্বতী সদানন্দের বেদান্তসারের উপর সুবোধিনী নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এই সময়েই ভট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতা, আচার্য নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য রঙ্গোজী ভট্ট অদ্বৈত-চিন্তামণি রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের গৌরব বর্ধন করেন। সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র (অপ্পয় দীক্ষিতের সমসাময়িক) অদ্বৈতবিদ্যা-বিলাস, বোধার্যাত্মনির্বেদ, গুরুরত্ন-মালিকা, ব্রহ্মকীর্তন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠসূরি অদ্বৈতদৃষ্টিতে মহাভারতের টীকা, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার টীকা, শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রসারে সহায়তা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকেই রাঘবেন্দ্র বা রাঘবানন্দ সরস্বতী সর্বজ্ঞাত্ম-মুনির সংক্ষেপ-শারীরকের উপর বিদ্যামৃতবর্ষিণী নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত-বেদান্তমতের অশেষ পুষ্টিসাধন করেন। রাঘবেন্দ্র ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনেও অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং ন্যায়াবলী-দীধিতি, মীমাংসা-সূত্র-দীধিতি, মীমাংসাস্তবক, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর তত্ত্বার্ণব নামে টীকা, পাতঞ্জল-রহস্য, মনুসংহিতার টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে অদ্বৈতবাদ আচার্য নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতির অবদানে প্রতিপক্ষের বাধা অতিক্রম করিয়া নব জীবন লাভ করে।

ব্যাসরাজ স্বামী

অদ্বৈতচিন্তা-স্রোতের অগ্রগতিতে যিনি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ব্যাসরাজ স্বামী। ইনি দ্বৈতবেদান্তী আচার্যগণের শিরোমণি। প্রবীণ দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থের বাদাবলীর বিচার-শৈলী অনুসরণ করিয়া ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃত নামে চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত এক অতি উপাদেয় বিচারবহুল গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হন। এই বাদযুদ্ধে ব্যাসরাজ পদ্মপাদ, প্রকাশাত্ম যতি, আনন্দবোধ, চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্যগণের জগতের মিথ্যাত্বের সংজ্ঞা এবং ঐ সংজ্ঞা-সিদ্ধির অনুকূল যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জগতের সত্যতা স্থাপনে অপূর্ব বিচার শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের খণ্ডন ও মণ্ডন এই উভয়াংশে চিৎসুখের তত্ত্বপ্রদীপিকা অদ্বৈতবেদান্তের অতুলনীয় গ্রন্থ। এইজন্য ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃতে চিৎসুখকেই প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিয়া প্রারম্ভেই তত্ত্বপ্রদীপিকার যুক্তিজালের অসারতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাসরাজের ন্যায় তীক্ষ্ণধী তার্কিক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত অতি অল্পই আবির্ভূত হইয়াছে। ব্যাসরাজ "তর্কতাণ্ডব" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তদীয় তর্কতাণ্ডবের চার খণ্ডে গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যায়াচার্যগণের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারপ্রকার প্রমাণের লক্ষণেরই দোষ ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের লক্ষণ-নির্ণয়-নৈপুণ্য সর্বজন-বিদিত। ব্যাসরাজের অসামান্য প্রতিভা ন্যায়-চিন্তাকেও আঘাত করিয়াছে। ইহা হইতে ব্যাসরাজের মনীষা কিরূপ প্রদীপ্ত ছিল, সুধী পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ব্যাসরাজ জয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকার উপর তাৎপর্যচন্দ্রিকা নামে বৃত্তি রচনা করিয়া মাধ্ব-মতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এই তাৎপর্য চন্দ্রিকারই অপর নাম মাধ্বচন্দ্রিকা। এই গ্রন্থ বৃত্তি হইলেও ব্যাসরাজ ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। অভেদ-বাদের বিরুদ্ধে ভেদবাদ সমর্থন করিয়া, ব্যাসরাজ ভেদোজ্জীবন নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া মধ্বমতের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। মধ্বাচার্যকৃত উপাধি-খণ্ডন, মায়াবাদ-খণ্ডন, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন এবং তত্ত্বোদ্দ্যোত প্রভৃতি গ্রন্থের উপর টিপ্পনী সন্নিবেশিত করিয়া ব্যাসরাজ মধ্বাচার্যের মতবাদকে জয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছেন। ব্যাসরাজের কীর্তির তুলনা নাই। ইঁহারই প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মধ্ব-চিন্তা-ধারা অপ্রতিহত গতিবেগ লাভ করিয়াছে এবং সেই পুণ্যপ্রবাহে স্নান করিয়া দ্বৈতবেদান্তী কৃতার্থ হইয়াছেন। ব্যাসরাজ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন এবং প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ইনি আচার্য সুব্রহ্মণ্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার বিদ্যাগুরু লক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থ। ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃত রচনা করিয়া এবং ব্যাসরাজের শিষ্য শ্রীনিবাসতীর্থ ন্যায়ামৃতের উপর প্রকাশ নামে টীকা লিখিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলে, ব্যাসরাজ জীবিত থাকাকালেই প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি নামে অতুলনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়ামৃতের প্রতিকথার খণ্ডন করেন এবং অদ্বৈতবাদকে বিজয়শ্রীতে ভূষিত করেন। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাসরাজের হস্তগত হইলে স্বীয় গ্রন্থের প্রতি-অক্ষর খণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির যুক্তিজালের খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়া ব্যাসরাজ তদীয় প্রতিভাবান্ শিষ্য ব্যাসরামাচার্যকে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির গূঢ় দার্শনিক রহস্য গ্রন্থকারের মুখ হইতে জানিবার জন্য মধুসূদনের নিকট প্রেরণ করেন। স্বীয় গুরু ব্যাসরাজের আদেশে ব্যাসরামাচার্য ছদ্মবেশে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়ন করিয়া, ব্যাসরাজকৃত ন্যায়ামৃতের উপর ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী নামে এক উপাদেয় টীকা রচনা করিয়া মধুসূদনের অদ্বৈত-সিদ্ধির যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া ন্যায়ামৃতের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। মধু-সূদনের ছদ্মবেশী শিষ্য ব্যাসরামাচার্যের এইরূপ অশিষ্টোচিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লঘুচন্দ্রিকা নামে টীকা রচনা করিয়া এবং মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র সিদ্ধিব্যাখ্যা নামে টীকা লিখিয়া ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী-রচয়িতা ব্যাসরামাচার্যের এবং ন্যায়ামৃত-প্রকাশ-রচয়িতা শ্রীনিবাস তীর্থের যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তস্থাপনে মনোনিবেশ করেন। বলভদ্রের সিদ্ধিব্যাখ্যা

এখন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সিদ্ধিব্যাখ্যা ব্যতীত বলভদ্র অদ্বৈতসিদ্ধি-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির সার সংকলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। লঘুচন্দ্রিকা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর অতুলনীয় কীর্তি। লঘুচন্দ্রিকার যুক্তিলহরী এমনই অপূর্ব যে, ঐসকল যুক্তিজাল আর খণ্ডন করা যায় বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মানন্দের পরবর্তীকালে দ্বৈতবেদান্তী বনমালী মিশ্র ন্যায়ামৃত-সৌগন্ধ বা বনমালা নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহীশূর অনন্তাচার্য ন্যায়ভাস্কর রচনা করিয়া, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর চন্দ্রিকা টীকার যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলে অদ্বৈতবাদী বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায় অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিপক্ষগণের সর্বপ্রকার যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ব্রহ্মানন্দের চন্দ্রিকার উপর বিট্‌ঠলেশী নামে অপূর্ব টীকা রচনা করেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীকা প্রভৃতির যতপ্রকার প্রতিবাদ হইয়াছে বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায় সেই সমস্তের যোগ্য প্রত্যুত্তর দান করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির চরম পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। রামসুব্বাশাস্ত্রী অনন্তাচার্যের ন্যায়ভাস্করের খণ্ডন লিখিয়া, রাজুশাস্ত্রী ন্যায়ভাস্করের খণ্ডনে ন্যায়েন্দুশেখর রচনা করিয়া এবং পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী ন্যায়ভাস্কর-খণ্ডন নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বনমালী মিশ্র ও অনন্তাচার্যের আক্রমণচেষ্টা ব্যর্থ করেন। এইরূপে খণ্ডন ও মণ্ডনের ফলে বেদান্ত-চিন্তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, অদ্বৈতবাদের চরম অভিব্যক্তি সাধিত হয়। এই হিসাবে ব্যাসরাজ ও তাঁহার শিষ্যগণের আক্রমণ অদ্বৈতবাদের পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের প্রকারান্তরে কল্যাণই করিয়াছেন বলা যায়।

অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্বপক্ষ গ্রন্থে ব্যাসরাজের বেদান্তমতের পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদন সরস্বতী তদীয় গ্রন্থে ব্যাসরাজের মতের আলোচনায় ব্যাসরাজের ভাষাও সম্পূর্ণ আহরণ করিয়াছেন। ব্যাসরাজ পঞ্চপাদিকা, বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ন্যায়-মকরন্দ, তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রমুখ যাবতীয় গ্রন্থ-রত্নাকর মন্থন করিয়া তাহার বাদামৃত আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রুতি ছাড়িয়া অনুমান-প্রমাণকেই প্রধানতঃ গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেই আনন্দবোধ, চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্যগণ জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাসরাজ তদীয় ন্যায়ামৃতে অনুমান প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের যুক্তির অসারতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ন্যায়ামৃতে বলিয়াছেন—

ব্যাসরাজের দার্শনিক মত

প্রমাণং চাত্র অনুমানম্। বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তি-রূপ্যবদিত্যানন্দবোধোক্তেঃ, অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী পটত্বাদংশিত্বাৎ পটান্তরবদিতি, তত্ত্বপ্রদীপোক্তেঃ। (ন্যায়ামৃত ১।১—৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)।

আনন্দবোধ ও চিৎসুখের উল্লিখিত অনুমানপ্রক্রিয়ায় ব্যাসরাজ নানারূপ দোষ উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাসরাজের মতে দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, অংশিত্ব প্রভৃতি কোন হেতুকেই মিথ্যাত্বের সাধক হেতু বলা চলে না। মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে ঐ সকল হেতুর সম্পর্কে ব্যাসরাজ যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া ঐসকল হেতুমূলে যে জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা

যাইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্বের পাঁচটি সংজ্ঞা বা লক্ষণ আমরা অদ্বৈতবেদান্তে দেখিতে পাই। পদ্মপাদের মতে—যাহা "সদসদ্‌বিলক্ষণ" তাহাই মিথ্যা, প্রকাশাত্ম যতির মতে যে বস্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে নিবারিত (negated) হয় (জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্), অথবা যে-বস্তুর যাহা আশ্রয়, সেই আশ্রয়েই সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব পাওয়া গেলে, ঐ বস্তু মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। চিৎসুখের মতে বস্তুর অত্যন্তাভাবের অধিকরণে যেই বস্তুর প্রতীতি হয় ঐ বস্তু মিথ্যা— 'স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্' (চিৎসুখী, ৩৯ পৃঃ)। আনন্দবোধের মতে যাহা সদ্‌ভিন্ন, তাহাই মিথ্যা। উল্লিখিত পাঁচটি মিথ্যাত্ব লক্ষণের কোনটিই বিচারসহ নহে বলিয়া ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃতে পাঁচটি মিথ্যাত্ব লক্ষণের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই নানারূপ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে ঐ সকল লক্ষণের ব্যাসরাজ-প্রদত্ত দোষ পরিহার করিয়া ঐ লক্ষণগুলি যে অযৌক্তিক নহে, তাহা নানাভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। তারপর, অদ্বৈতবাদীর মতে জগতের মিথ্যাত্বটি মিথ্যা, না সত্য? এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া ব্যাসরাজ দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদী জগতের মিথ্যাত্বকে সত্যও বলিতে পারেন না, মিথ্যাও বলিতে পারেন না। মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে। কেননা, সত্য ব্রহ্মের পাশে, জগতের মিথ্যাত্ব বলিয়া আর একটি সত্য বস্তু আসিয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, জগতের মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তবে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈতদীপিকায় দেখিয়াছি যে, জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহার মিথ্যাত্ব এই উভয়ই মিথ্যা। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগৎ সত্য হইবার আপত্তি উঠে না। মধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈতসিদ্ধিতে মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব পক্ষই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।[১]

অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে জগতের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় একান্ত আবশ্যক। দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে, অদ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্তী জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর। পক্ষান্তরে, সগুণ ব্রহ্মবাদী দ্বৈতবেদান্তীর মতে জগৎ সত্য। জগতের সত্যতা সুস্থির হইলেই দ্বৈতবাদ এবং সগুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিপাদন সম্ভবপর হয়। এইজন্যই ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য এত ব্যস্ত। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খণ্ডন যেমন ন্যায়ামৃতের বিশেষ প্রতিজ্ঞা, জগতের মিথ্যাত্ব সাধন সেইরূপ অদ্বৈতবাদের মূল প্রতিপাদ্য। ন্যায়ামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে, জগতের সত্যত্ব মিথ্যাত্বের দ্বন্দ্বই চরমে উঠিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ব্যাসরাজ অদ্বৈতবেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়া ভেদবাদ এবং জীবাণুত্ববাদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে যে শঙ্করসিদ্ধান্তে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে,

---

১। আমরা এই সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিজাল এবং ঐ সম্পর্কে ব্যাসরাজের বক্তব্য মধুসূদন সরস্বতীর বেদান্তমত-বিচার-প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করিয়াছি।

"আরাদুপকারক" বা গৌণ সাধন এবং বেদান্ত শ্রবণের অঙ্গ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত ব্যাসরাজ খণ্ডন করিয়া মুক্তি অদ্বয় জ্ঞান-লভ্য নহে, ভগবৎপ্রসাদ এবং উপাসনা-লভ্য, এই স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, অদ্বৈত-বেদান্তীর জীবন্মুক্তি ও নির্বিশেষ মুক্তিবাদ খণ্ডন করিয়া ব্যাসরাজ সাধনার তারতম্যা-নুসারে মুক্ত পুরুষেরও আনন্দের তারতম্য অঙ্গীকার করিয়াছেন—"তস্মাৎ সাধনা-তারতম্যান্মুক্তি-তারতম্যম্।" ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃত দ্বৈতবেদান্তীর বাস্তবিকই অমৃত-ভাণ্ড। ন্যায়ামৃত ও তাৎপর্যচন্দ্রিকায় ব্যাসরাজ লোকোত্তর মনীষা ও অসামান্য দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিচারের কৌশল ও দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি গ্রন্থের সর্বত্রই পরিস্ফুট। মধ্বমতে ন্যায়ামৃতের ন্যায় গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। শ্রীভাষ্য পাঠ করিলে যেমন শাঙ্করভাষ্যের রহস্য সহজে বোধগম্য হয়, সেইরূপ ন্যায়ামৃত পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতসিদ্ধির রহস্য বোধ সহজ হয়।[১]

মধুসূদন সরস্বতী

মধুসূদন সরস্বতী ফরিদপুর জিলায় কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে বৈদিক কাশ্যপ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের উল্লেখ করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। দীক্ষিতের অল্পকাল পরেই—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে মধুসূদন সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মধুসূদনের পিতার নাম প্রমোদন পুরন্দরাচার্য, পিতামহ কৃষ্ণ-গুণার্ণব বেদাচার্য। মধুসূদনের পিতা পুরন্দরাচার্য সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অসামান্য কবি ছিলেন। বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান মধুসূদনের বংশের বিশেষত্ব ছিল। এইজন্যই সম্ভবতঃ মধুসূদনের পিতামহ বেদাচার্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। দেব-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি পবিত্র কর্মানুষ্ঠানে মধুসূদনের পিতৃপুরুষের উৎসাহের সীমা ছিল না। প্রমোদন পুরন্দরের দীঘি এবং পুরন্দরের স্থাপিত জগজ্জননী কালী মাতা আজও কোটালিপাড়ায় বর্তমান। ইহা হইতে মধুসূদন যে কোটালিপাড়া নিবাসী ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। বালকবয়সেই মধুসূদনের প্রতিভার স্ফুরণ হয়। তিনি পিতার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ

১। ব্যাসরাজের সমসাময়িককালেই শুদ্ধাদ্বৈতবেদান্তী বল্লভাচার্যের পৌত্র, বিট্‌ঠলনাথের পুত্র গিরিধর শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড রচনা করিয়া এবং গিরিধরের ভ্রাতা প্রমেয়ার্ণব নামে গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য ব্রজনাথজী বল্লভাচার্য-রচিত বেদান্ত-ভাষ্যের উপর "মরীচিকা" নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে এবং শুদ্ধাদ্বৈত মত স্থাপনে সহায়তা করেন। এই সকল খণ্ডন-প্রচেষ্টা ব্যাসরাজের খণ্ডনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়।

করেন। কৈশোরে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। তাঁহার অতিমানুষ প্রতিভা পাণ্ডিত্যের জ্যোতিকে বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছিল। সর্বত্রই তিনি বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার চিত্তে ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রবাদ এই যে, সর্বত্র বিজয়ী মধুসূদন তাঁহার দেশীয় চন্দ্রদ্বীপ-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত মর্যাদা না পাইয়া বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং সংসার ছাড়িয়া প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় চৈতন্যদেবের দর্শন না পাইয়া তিনি নবদ্বীপে মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এই সময় চৈতন্যদেবের মতের সমর্থনে একখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হয় এবং এই ইচ্ছাকে রূপদান করিবার জন্য তিনি কাশীতে গমন করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডনোদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করার আবশ্যকতা অনুভব করেন। কাশীধামে শ্রীরামতীর্থের নিকট অদ্বৈতবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের গাম্ভীর্য দেখিয়া অদ্বৈতবাদের প্রতি মধুসূদনের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং চৈতন্যদেবের মতের সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করার সঙ্কল্প মধুসূদন পরিত্যাগ করেন। কাশীর চতুঃষষ্টি ঘাটস্থিত দণ্ডীস্বামী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট মধুসূদন দণ্ড্যাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবন-দর্পণে অদ্বৈতবেদান্তকে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করেন এবং গুরু শ্রীরামতীর্থের আদেশে অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিয়া ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক কথার খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদকে জয়যুক্ত করেন। মধুসূদন মাধব সরস্বতীর নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীরাম সরস্বতী মধুসূদনের পরমগুরু ছিলেন। মধুসূদন তদীয় বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন গুরুদেবের পাদপদ্মে তাঁহার প্রণতি জানাইয়াছেন। মধুসূদনের বিষ্ণুভক্তি, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি অতিপ্রগাঢ় ছিল। তিনি গীতার টীকার পরিসমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনাবিল প্রেম নিবেদন করিয়াছেন :—

> বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
> পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

মধুসূদন নিষ্কাম কর্মযোগী ছিলেন। বহু উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াও মধুসূদন সম্পূর্ণ নিরভিমান। অহমিকা কখনও মধুসূদনের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে নাই। তিনি একাধারে পরম জ্ঞানী এবং পরম ভক্ত। তিনি তাঁহার অদ্বৈত বিজ্ঞানকে কৃষ্ণ-প্রেমরসে সুধাময় করিয়া জীবনে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলী প্রেমময়ের রাতুল চরণে উপহার দিয়া তিনি আনন্দ সাগরে মিশিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধির সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন :—

> কুতর্কগরলাকুলং ভিষজিতুং মনো দুর্ধিয়াং
> ময়ায়মুদিতো মুদা বিষঘাতিমন্ত্রো মহান্।

অনেন সকলাপদাং বিঘটনেন যন্নো'ভবৎ
পরং সুকৃতমর্পিতং তদখিলেশ্বরে শ্রীপতৌ ॥
গ্রন্থস্যৈতস্য যঃ কর্তা স্তূয়তাং বা স নিন্দ্যতাম্।
ময়ি ন্যাস্যেব কর্তৃত্বমনন্যানুভবাত্মনি ॥

মধুসূদন বংশের অলঙ্কার, বাঙ্গালীর গর্ব। মধুসূদনকে বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গজননী রত্নপ্রসবিনী হইয়াছেন। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন"। বাঙ্গালীর মর্মস্থলে মধুসূদনের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই আসনের বেদীমূলে পূজার অর্ঘ সাজাইয়া বাঙ্গালী চিরকাল গৌরববোধ করিবে। দুঃখের বিষয় অনেক আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী মধুসূদনের ন্যায় বাঙ্গালী মনীষীর নাম পর্যন্তও জানেন না। ইহাই আমাদের দেশের শিক্ষার বিড়ম্বনা।

মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি অদ্বৈতবেদান্তের রত্নভাণ্ডার। অদ্বৈতবেদান্তের এমন কোন চিন্তা-রত্ন নাই, যাহা এই ভাণ্ডারে নাই। তর্কের আলোক-সম্পাতে সত্য-জিজ্ঞাসার পথ যতদূর সুগম করা যাইতে পারে, মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে তাহা করিয়াছেন। তাঁহার মানসৈশ্বর্যের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অদ্বৈতচিন্তা গৌরবময় প্রেরণা এবং অপ্রতিহত গতিবেগ লাভ করিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে অদ্বৈতচিন্তা প্রতিবাদীর আক্রমণধারা ব্যর্থ করিয়া চিরপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনভাবে নব্য-ন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অদ্বৈততত্ত্ব-বিচারের এমন পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। অদ্বৈতসিদ্ধিই অদ্বৈততত্ত্ব-বিচারের পরম এবং চরম অবলম্বন। এই গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের অনুকূল এবং প্রতিকূল সমস্ত তথ্যই তর্কের সূত্রে গ্রথিত করিয়া বিশেষভাবে বিচার করা হইয়াছে। এই বিচার ও বিতর্কের রহস্য বুঝিতে পারিলে জিজ্ঞাসুর আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। সংশয়ের কাল মেঘ তাঁহার মানসলোককে ঢাকিয়া রাখে না। জ্ঞানের অরুণালোকে তাঁহার চিন্তারাজ্যের দিক্‌চক্রবাল উদ্‌ভাসিত হয়। এইজন্যই মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি বেদান্ত-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশ পথে অপরিহার্য পাথেয়। অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন তদীয় সিদ্ধান্তবিন্দু ও বেদান্ত-কল্পলতিকার উল্লেখ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তবিন্দু শঙ্করাচার্যের রচিত দশশ্লোকীর ব্যাখ্যা। মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর রত্নাবলী নামে টীকা আছে। মধুসূদনের শিষ্য পুরুষোত্তম সরস্বতীও সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর এক টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত বিরোধী মতের খণ্ডন ও অদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বেদান্ত-কল্পলতিকা প্রবন্ধ আকারে লিখিত বেদান্তের গ্রন্থ। মধুসূদনের গীতা-গূঢ়ার্থ-দীপিকা গীতার অতি উপাদেয় ব্যাখ্যা; তদীয় ভাগবতের টীকা, রাস-পঞ্চাধ্যায়ের টীকাও অতি মনোরম টীকা। তাঁহার সংক্ষেপ-শারীরকের ব্যাখ্যা সর্বজ্ঞাত্ম মুনির অদ্বৈতবাদের গূঢ়রহস্য প্রকাশে অতুলনীয়। এতদ্‌ব্যতীত মধুসূদনের মহিম্নঃস্তোত্র-টীকা, ভক্তিরসায়ন, প্রস্থানভেদ, অদ্বৈতরত্ন-রক্ষণ, নির্বাণ-দশক-টীকা বেদস্তুতি-টীকা, আত্মবোধ-টীকা প্রভৃতিও মৌলিক চিন্তার সমাবেশে অদ্বৈতবেদান্তে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

মধুসূদনের গ্রন্থাবলী

অদ্বৈতসিদ্ধিই মধুসূদনের সমস্ত গ্রন্থমালার মধ্যমণি, সুতরাং মধুসূদনের অদ্বৈত-বিচার-প্রসঙ্গে আমরা অদ্বৈতসিদ্ধির দার্শনিক পরিস্থিতিরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মধুসূদনের দার্শনিক মত

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধি বা স্থাপন করিতে হইলে দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দ্বৈতজাল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, কোনমতেই অদ্বৈতবাদ সাধন করা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য অদ্বৈতাসিদ্ধিকার তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভেই দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈতবেদান্তিগণ জগতের সত্যতা স্বীকার করেন। জগৎ সত্য হইলে অদ্বৈতবাদ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, জীব এবং ব্রহ্ম যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদ সাধন করা চলে না। কেননা, জীবও সত্য, ব্রহ্মও সত্য, এই দুইটি সত্য পদার্থ অঙ্গীকার করায় অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদই হইয়া দাঁড়ায়। ''ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'' ইহাই হইল অদ্বৈতবাদের রহস্য। মধ্ব-মতাবলম্বিগণ জীব ও ব্রহ্মের চিরভেদই স্বীকার করেন, অভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং দ্বৈতবেদান্তীর সহিত অদ্বৈতবেদান্তীর বিরোধ চিরন্তন। ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃতে দ্বৈতবাদ চরমে পৌঁছিয়াছে; এবং ব্যাসরাজের আক্রমণের ফলে অদ্বৈতবাদ যুক্তিসিদ্ধ কি না, এইরূপ সন্দেহও জিজ্ঞাসুর মনে আসা স্বাভাবিক। সেইজন্যই মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি-রচনায় অগ্রসর হন এবং ব্যাসরাজের সিদ্ধান্তের দোষ ও অসঙ্গতি দেখাইয়া অদ্বৈতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। সেই সময় মধুসূদন অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা না করিলে ব্যাসরাজের আক্রমণে অদ্বৈতবাদ টিকিত কি না সন্দেহ। মধুসূদন নব্যন্যায়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার-শৈলী অনুসরণকরতঃ অদ্বৈত তত্ত্ববিচারে মনোনিবেশ করেন। মধুসূদন বাঙ্গালী, তর্কনৈপুণ্য তাঁহার জন্মগত অধিকার। তর্কতাণ্ডব-পণ্ডিত ব্যাসরাজের সহিত বাদযুদ্ধে মধুসূদন অনুমানকে প্রধান অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতি অন্তঃ-সলিলা সরস্বতীর মত তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধি-ক্ষেত্রের অন্তস্থলে বিরাজ করিয়া তর্কের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ফলে, তাহার তর্ক জল্প বা বিতণ্ডায় পর্যবসিত হয় নাই। তর্কের আলোকে তিনি আনন্দময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তদীয় মনন পূর্ণতালাভ করিয়াছে। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধির বিচারের বিশেষত্ব। সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ নির্ধারণে মধুসূদনের বিচারশক্তির অপূর্ব লীলা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে মিথ্যার স্বরূপ নিরূপণে মধুসূদনের যে কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা দেখা যায় না। তাঁহার মতে যাহা সত্য, তাহা চিরকালই আছে এবং থাকিবে। সত্যের রূপান্তর ও ভাবান্তর নাই। সত্য শাশ্বত, স্বতঃপ্রমাণ এবং স্বপ্রকাশ। অসৎ কাহাকে বলে? যাহা কোন কালেই নাই, বা থাকিবে না, আমাদের জীবনে যাহার কার্যকারিতাও কিছু দেখা যায় না, এইরূপ আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীক বস্তুকেই অসৎ বলা হইয়া থাকে। মিথ্যা কি? যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, অথচ শেষ পর্যন্ত সত্য নহে; জীবনে যাহার কার্যকারিতা কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না, যাহা (বাধ্য

বলিয়া) সৎও নহে, (সম্মুখস্থিত হইয়া ইদংরূপে প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া) অসৎ বা অলীকও নহে ; সৎ ও অসতের মাঝামাঝি, এইরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চক মিথ্যা বলিয়া জানিবে। এই মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান সত্য ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত বলিয়াই জগৎ সত্য, শিব, সুন্দর বলিয়া আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। অধিষ্ঠান ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান উদিত হইলে, জগদ্দর্শন থাকে না, জগতের মধ্য দিয়া সর্বত্র ব্রহ্মবোধেরই স্ফুরণ হয়। জগৎ ব্রহ্মদর্শীর নিকট মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্ম-সত্তাব্যতীত জগতের কোন সত্যতা নাই। জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে। বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বা বিসদৃশ, অসৎ আকাশকুসুম হইতেও বিলক্ষণ বা বিজাতীয়। এইরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ অনির্বচনীয় এবং মিথ্যা। "সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্" ইহাই মিথ্যার লক্ষণ। দ্বৈতবেদান্তী ব্যাসরাজ প্রভৃতির মতে যাহা সৎ নহে, তাহা অসৎ, যাহা অসৎ নহে, তাহাই সৎ। সৎ ও অসৎ এই দুইটির একটির অত্যন্তাভাবই অপরটির স্বরূপ। সৎ ও অসৎ ব্যতীত সৎও অসতের মাঝামাঝি অপর কোন "সদসদ্‌বিলক্ষণ" (অংশতঃ সৎ এবং অংশতঃ অসৎ) তত্ত্ব নাই। দ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ঐরূপ সদসদ্‌বিলক্ষণ, অনির্বচনীয় মিথ্যা বস্তু অপ্রসিদ্ধ। পদ্মপাদাচার্যের "সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্" এই মিথ্যাত্বলক্ষণের "সদসদ্-বিলক্ষণ" কথাটির অর্থ কি? (১) সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব? না, (২) সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ দুইটি ধর্ম? না, (৩) সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ একটি বিশেষ ধর্ম? ব্যাসরাজ তদীয় ন্যায়ামৃতে "সদসদ্‌বিলক্ষণ" কথাটির উল্লিখিত তিনপ্রকার অর্থের অবতারণা করিয়া ঐ ত্রিবিধ অর্থের কোন অর্থেই যে সত্য জগৎকে মিথ্যা, অনির্বচনীয় বলা চলে না, তাহা উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব কোথায়ও প্রসিদ্ধ নাই, উহা একটি অপ্রসিদ্ধ কল্পনা। এইরূপ কল্পনায় (সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া) প্রতিযোগীর অপ্রসিদ্ধি দোষ অনিবার্য। দ্বিতীয়তঃ, ঐরূপ কল্পনায় অসত্ত্বটি বিশেষ্য, সত্ত্ব এখানে বিশেষণ। বিশেষ্যের অভাব থাকিলে বিশেষণেরও অভাব অবশ্য থাকিবে। জগৎ মধ্বাচার্যের মতে সত্য, সুতরাং জগতে অসত্ত্বের অভাব আছে, ফলে, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বেরও অভাব স্বভাবতঃই আছে। ব্যাসরাজের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদী এইরূপ লক্ষণের দ্বারা কোন নূতন কথা বলিতেছেন না, কেবল সত্য জগৎপ্রপঞ্চ সম্পর্কে যাহা (মধ্বাচার্যের মতে) সিদ্ধই আছে, তাহারই সাধন করিতেছেন মাত্র। প্রতিযোগীর অপ্রসিদ্ধি এবং সিদ্ধ-সাধনতা, এই দুই দোষেই "সদসদ্‌বিলক্ষণ" কথাটির প্রথম অর্থ যে গ্রহণ-যোগ্য নহে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? তারপর, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই দুইটি ধর্মকেই যদি "সদসদ্‌বিলক্ষণ" কথাদ্বারা অদ্বৈতবেদান্তী বুঝাইতে চান, তাহাও অসম্ভব কল্পনা। কেননা, সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি অত্যন্তাভাব একই বস্তুতে (ধর্মীতে) থাকিবে কিরূপে? আরও দেখ, তোমার (অদ্বৈতবাদীর) মতে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং ধর্মরহিত। অতএব সত্তা

অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের ধর্ম হইতে পারে না। বিশুদ্ধ কূটস্থ ব্রহ্মে সত্তার অত্যন্তাভাব আছে। ব্রহ্ম অবাধিত এবং পরমার্থ সৎ বলিয়া ব্রহ্মে তোমার মতে অসত্তারও অত্যন্তাভাব আছে। সুতরাং (সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ দুইটি ধর্মই ব্রহ্মে বিদ্যমান আছে বলিয়া) ঐরূপ লক্ষণ অনুসারে বিশ্বপ্রপঞ্চের মত ব্রহ্মও অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় নাকি? তৃতীয়তঃ, ধর্মরহিত শুদ্ধ, কূটস্থ ব্রহ্মে সত্ত এবং অসত্ত এই দুইটি ধর্মের অত্যন্তাভাব থাকিলেও ব্রহ্মকে যেমন সত্যস্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন, বিশ্বপ্রপঞ্চও সেইরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকায় দৃশ্যমান বিশ্বকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্য বলিয়া অদ্বৈতবাদীর মানিয়া লওয়া উচিত নহে কি? ফলে, ঐরূপ লক্ষণের দ্বারা জগৎ মিথ্যা না হইয়া সত্যই হইয়া পড়ে এবং লক্ষণের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তারপর, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই দুইটি ধর্ম তো অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে মিথ্যাত্বের দৃষ্টান্তস্থল শুক্তি-রজতেও পাওয়া যায় না। শুক্তি-রজত বাধিত হয় বলিয়া সত্যত্বের অভাব শুক্তি-রজতে আছে বটে, কিন্তু শুক্তিজ্ঞান-বাধ্য অসৎ রজতে অসত্ত্বের অভাব তো পাওয়া যায় না; সুতরাং শুক্তি-রজত মিথ্যার দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? তৃতীয় কল্পে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় কল্পে যে দুইটি অভাবকে স্বতন্ত্র ভাবে বলা হইয়াছিল, সেই দুইটি অভাবকে তৃতীয় কল্পে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ফলে, দ্বিতীয় কল্পের সকল দোষগুলিই তৃতীয় কল্পেও আসিয়া পড়িতেছে।[১]

ব্যাসরাজের উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে মধুসূদন বলেন, ব্যাসরাজের আলোচিত তিনপ্রকার অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থটি অবশ্য গ্রহণযোগ্য নহে, দ্বিতীয় অর্থটিতে কোন অসঙ্গতি নাই, ঐ অর্থটি নির্দোষই বটে। 'সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাব-রূপধর্মদ্বয়বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ' (অদ্বৈতসিদ্ধি ৫০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং)। এইরূপ লক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তীর মতে বিরোধের কোনই আশঙ্কা নাই। কেননা, সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব; সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্মদ্বয়ের পরস্পরের অভাবই পরস্পরের স্বরূপ; এইরূপ ব্যাসরাজের সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অর্থ অদ্বৈতবেদান্তী গ্রহণ করেন না। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে যাহা কোনকালেই বাধিত হয় না, সেই (ত্রিকালাবাধ্য) পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই সত্যের অভাবই অসত্য নহে। কস্মিন্

১। সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই ধর্মদ্বয় যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ, সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট (সমানাধিকরণ) অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও পরস্পর বিরুদ্ধ। বিশ্বপ্রপঞ্চে যদি সত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষণাংশ থাকে, তবে আর অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশ থাকিতে পারে না। আবার, যদি বিশেষ্যাংশ থাকে, তবে আর বিশেষণাংশ থাকে না। এইজন্য উল্লিখিত অর্থেও পরস্পর বিরোধ অপরিহার্য। নির্ধর্মক ব্রহ্মে যেমন সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব আছে, সেইরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও আছে। শুক্তি-রজতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষণাংশের বিদ্যমানতা থাকিলেও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশ বিদ্যমান না থাকায় উক্তরূপ বিশিষ্ট সাধ্যের অভাবই শুক্তি-রজতে আছে; সুতরাং মিথ্যার দৃষ্টান্ত শুক্তি-রজতেই প্রকৃত সাধ্য নাই বলিয়া শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তই হইতে পারে না।

কালেও কোন ক্ষেত্রেই সত্য বলিয়া যাহা প্রতীতি গোচর হইতে পারে না, 'ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্' (অদ্বৈতসিদ্ধি ৫১ পৃঃ), সেইরূপ আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীক বস্তুকেই অসৎ বলা হইয়া থাকে। আকাশকুসুম নামে কোন বস্তু নাই, উহা একটা শব্দ মাত্র। "আকাশকুসুম সৎ" এইরূপ সত্য বা মিথ্যা (প্রমা বা ভ্রম) কোনরূপ জ্ঞানেরই উদয় হয় না। ঘটাদি দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ "ঘটঃ সন্" ঘট সত্য, এইরূপ সত্য প্রতীতির গোচর হয় বলিয়া দৃশ্য ঘটাদি জড়-বস্তুকে অলীক আকাশকুসুমের ন্যায় সত্যরূপে প্রতীতির সম্পূর্ণ অবিষয় বা অযোগ্য বলা যায় না। দৃশ্যপ্রপঞ্চ অদ্বৈতবেদান্তের মতে পরমার্থসৎ ব্রহ্মও নহে, অসৎ আকাশকুসুমও নহে। এই দুইএর মাঝামাঝি একপ্রকার অনির্বচনীয় বস্তু। এইরূপ অনির্বাচ্য বস্তুতে সত্য ব্রহ্মেরও অত্যন্তাভাব আছে, অসত্য আকাশকুসুমেরও অত্যন্তা-ভাব আছে। ফলে, ব্যাসরাজের প্রদর্শিত বিরোধের অদ্বৈতমতে কোন সম্ভাবনাই নাই। যাঁহারা সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব, এইরূপে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের বাচ্যার্থ নির্বচন করেন, সেই মধ্বাচার্য প্রভৃতির মতেই বিরোধের আশঙ্কার উদয় হয়। অদ্বৈতবাদীর মতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পর অভাবরূপ নহে বলিয়া বিরোধের প্রশ্নই উঠে না। সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব, সত্ত্ব ও অসত্ত্বের এইরূপ—ব্যাসরাজের কথিত অর্থ গ্রহণ না করিয়া, সত্ত্বকে পরমার্থতঃ সত্য ব্রহ্ম অর্থে, অসত্ত্বকে অলীক আকাশকুসুমাদির অর্থে গ্রহণ করায় শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তও অচল হইল না। কেননা, শুক্তি-রজতে সত্য ব্রহ্মের যেমন অভাব আছে, কস্মিন্ কালেও সত্যরূপে যাহা প্রতীতির বিষয় হয় না, এইরূপ আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎ বস্তুরও অভাব সেখানে আছে। শুক্তি-রজত সাময়িক ভাবে সত্য রজতের ন্যায় সম্মুখস্থিত হইয়া (ইদংরূপে) প্রতিভাত হয় বলিয়া উহাকে কোনমতেই আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলা চলে না। ব্রহ্ম নির্ধর্মক বলিয়া সত্ত্বাদি ধর্মরহিত হইয়াও যেরূপ সত্য হইয়া থাকে, প্রপঞ্চও সেইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দ্বিবিধ ধর্মরহিত বলিয়া সত্য হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে, প্রপঞ্চ যে সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ কি? সৎস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চ অধ্যস্ত বলিয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের সত্তার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যনিবন্ধনই ঘটাদি বস্তুর সত্যতা উপপাদন করা যায় বলিয়া ঘটাদি বস্তুর পৃথক্ সত্যতা স্বীকার করার কোনই আবশ্যকতা নাই। "ঘটঃ সন্" এই প্রতীতিতে যে সত্যতার প্রতিভাস হয়, তাহা ঘটের সত্তা নহে, ব্রহ্মেরই সত্তা। ঐ ব্রহ্মসত্তা সর্বত্র প্রপঞ্চে অনুগত হইয়া থাকে বলিয়া জগৎ সত্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রপঞ্চের সদ্রূপতার আপত্তির কোন মূল্য নাই। এইরূপে মধুসূদন সরস্বতী ব্যাসরাজের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া পদ্মপাদাচার্যের মিথ্যাত্ব লক্ষণের যৌক্তিকতা উপপাদন করিয়াছেন।[১] মধুসূদন

১। সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই দুইটি অভাবকে স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া লইলে যেমন পদ্মপাদের লক্ষণে কোন দোষ দেখা যায় না, সেইরূপ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবকে বিশেষ্য করিয়া সত্ত্বের অত্যন্তাভাবকে বিশেষণ ভাবে গ্রহণ করিয়া "সদসদ্‌বিলক্ষণ" শব্দে সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব অর্থ করিলেও কোন দোষ হয় না—অতএব 'সত্ত্বাত্যন্তাভাবত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তা-

ও ব্যাসরাজের মতের যে আলোচনা করা গেল, তাহাতে সুধী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে, ব্যাসরাজের সমস্ত আপত্তির মূলে সৎ এবং অসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য

ভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যমিত্যপি সাধু', (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৯ পৃঃ)। এই তৃতীয় কল্পের সমর্থনে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাব এই উভয় অভাবকে স্বতন্ত্রভাবে সাধ্য করিলে যেমন বিরোধ, ব্যাঘাত প্রভৃতি দোষের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ একই পক্ষে একটি বিশেষণ অপরটি বিশেষ্য করিয়া মিলিত ভাবে গ্রহণ করিলেও ব্যাঘাত বিরোধ প্রভৃতির কোন সম্ভাবনা থাকে না; পূর্ব প্রদর্শিত যুক্তিবলেই প্রতিপক্ষের উদ্ভাবিত সর্বপ্রকার দোষ বারণ করা যায়। যদি বল যে, এইরূপ বিশিষ্ট সাধ্য তো কোথায়ও প্রসিদ্ধ নাই, সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বলিয়া একটি মিলিত বিশিষ্ট সাধ্য কল্পনা করিলে তো সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি দোষই আসিয়া পড়িবে। মধুসূদন এইরূপ অপ্রসিদ্ধ সাধ্য অঙ্গীকার করিবেন কিরূপে? ইহার উত্তরে মধুসূদন বলেন, এইরূপ মিলিত বিশিষ্ট সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হইলেও বিশেষণাংশ এবং বিশেষ্যাংশকে পৃথক্ ভাবে ধরিয়া লইয়া—সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসদ্‌বস্তুতে এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সদ্‌বস্তুতে আছে বলিয়া, সাধ্যকে প্রসিদ্ধ করা যাইতে পারে। সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই ধর্মদ্বয়কে সাধ্য করিলেও সেই ধর্মদ্বয়কে পৃথক্‌ভাবে ধরিয়া লইয়াই সাধ্যকে প্রসিদ্ধ করিতে হইবে; নতুবা, কোন স্থলেই বিরুদ্ধ অভাবদ্বয় প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া ঐরূপ সাধ্যও অপ্রসিদ্ধই হইয়া দাঁড়াইবে। এখন প্রশ্ন এই যে, যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই সাধ্যকে প্রসিদ্ধ কর তবে শশ-শৃঙ্গকে কোন অনুমানে সাধ্য করিলে (যেমন ভূঃ শশবিষাণোল্লিখিতা ভূত্বাৎ) সেইরূপ সাধ্যও শশ এবং শৃঙ্গ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রসিদ্ধই হইবে, সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ সেখানেও দেওয়া চলিবে না। এই আপত্তির উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলেন, সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবের অর্থ এই, যেই সময়ে যে অধিকরণে বা ধর্মীতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকে, সেই সময়ে সেই অধিকরণে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও থাকে। (সত্ত্বাত্যন্তাভাব-সমানাধিকরণ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব) সত্য শব্দের অর্থ ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্ম। অসৎ শব্দে আকাশকুসুমকে বুঝায়। শুক্তি-রজতে সদ্ ব্রহ্মের অত্যন্তাভাব থাকাকালেই অসৎ আকাশকুসুমেরও অত্যন্তাভাব আছে, সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের মতে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দেওয়া চলে না। ঐরূপ সাধ্য শুক্তি-রজতে অদ্বৈতবাদীর মতে প্রসিদ্ধই আছে, উহা অপ্রসিদ্ধ নহে। ভাল, সাধ্যাপ্রসিদ্ধি বরং নাই হইল, ঐরূপ লক্ষণের তো শুদ্ধ ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হইবে। কেননা, ব্রহ্ম নির্ধর্মক বিধায় সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব, এই ধর্মদ্বয় শূন্যও বটে। ব্রহ্মে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই ধর্মদ্বয়ের অভাব অঙ্গীকার করায়, এবং সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাবই মিথ্যাত্বের সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মে মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় নাকি? এই আপত্তির উত্তরে মধুসূদন বলেন—ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং সদ্‌রূপ; সদ্‌রূপ অর্থই এই যে, ব্রহ্ম সর্বকালেই অবাধিত। বাধ্যত্বের অভাবই সদ্‌রূপতার স্বরূপ। ব্রহ্মের সদ্‌রূপতা ভাবরূপ নহে, উহা বাধ্যত্বের অভাবরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম অসৎ বাধ্য নহে। অভাবের আর অভাব নাই বলিয়া [সত্ত্বের বা] বাধ্যত্বাভাবের অভাব অর্থাৎ বাধ্যত্ব নির্ধর্মক ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। যদি বল যে, বাধ্যত্বের অভাবরূপ ধর্মই বা ব্রহ্মে স্বীকার করিবে কিরূপে? তাহাতে কি ব্রহ্ম সধর্মক হইবে না? ভাবও যেমন ধর্ম, অভাবও তো সেইরূপই ধর্ম। ধর্ম হিসাবে ইহাদের কোনই বিশেষ নাই। শ্রুতি ব্রহ্মে সর্বপ্রকার ধর্মেরই নিষেধ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, বাধ্যত্বের অভাব এখানে নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া অভাবরূপ ধর্ম স্বীকার করায় অদ্বৈতবেদান্তের মতে কোনই অসঙ্গতি নাই। তারপর, ব্রহ্ম অদ্বৈতবেদান্তের মতে নির্ধর্মক বলিয়া ভাবরূপ বা অভাবরূপ কোনরূপ ধর্মই ব্রহ্মে থাকে না, সুতরাং সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ের অর্থাৎ যাহা মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহারই বা ব্রহ্মে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? ব্রহ্মে মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অসম্ভব। মধুসূদনের বিচার-শৈলী প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে সহজ-বোধ্য হইবে না বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ বিচার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি নাই। অতি সংক্ষেপে মধুসূদনের বিচারের শৈলীর সহিত আমাদের সুধী পাঠকবর্গকে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

কি? এই প্রশ্নই বিরাজ করে। ব্যাসরাজের মতে সৎ ও অসৎ এই শব্দদ্বয় পরস্পর অভাব স্বরূপ, সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব। সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মাঝামাঝি "সদসদ্‌বিলক্ষণ" বলিয়া কিছুই নাই। অদ্বৈতবেদান্তের মতে সৎ ও অসৎ শব্দে সৎশব্দের অর্থ নিত্য সত্য ব্রহ্ম বস্তু, অসৎ শব্দের অর্থ অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি যাহা কোন কালেই নাই, যাহার বস্তুরূপে উপলব্ধিও অসম্ভব। এই দুইএর মাঝামাঝি একপ্রকার বস্তু আছে, যাহা একেবারে সৎও নহে, একেবারে অসৎও নহে; অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মও নহে, আকাশকুসুমও নহে; যাহা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া সত্য বলিয়া অনুভূত হয়, অথচ চিরকাল থাকে না—যেমন এই জগৎপ্রপঞ্চ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চই মিথ্যা এবং অনির্বাচ্য। সৎ ও অসৎকে পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপে গ্রহণ না করিয়া, অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে গ্রহণ করিলে অদ্বৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে ব্যাসরাজ এবং অপরাপর অদ্বৈতবাদের প্রতিপক্ষগণের অনেক আপত্তিই অচল হইয়া পড়ে।

মিথ্যাত্বের নির্দোষ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া মধুসূদন সরস্বতী অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে জগতের মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন—'বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ,' যাহা দৃশ্য, জড় বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মিথ্যা। জগৎ দৃশ্য, জড় এবং পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিবে। ঐ সকল হেতুর নিরূপণেও ব্যাসরাজ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের সাধক অনুমানের বিরুদ্ধে ব্যাস-রাজের প্রদর্শিত সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডনপূর্বক জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তের অনুকূলে বিভিন্নপ্রকার অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ সকল অনুমানে মধুসূদন সরস্বতী অলৌকিক প্রতিভা ও বিচার-শক্তির অপূর্ব লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। মিথ্যাত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং সাধক হেতুগুলি পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছেদে বিচার করিয়া মধুসূদন নির্ণয় করিয়াছেন। মিথ্যাত্ব অনুমানের বিরুদ্ধে ব্যাসরাজ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি যতপ্রকার প্রমাণ উপন্যাস করিয়াছেন, মধুসূদন একে একে তাহার প্রত্যেকটির এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, মধুসূদনের যুক্তিজালের আর খণ্ডন হয় বলিয়া মনে হয় না।

মধুসূদনের মতে জগৎ মিথ্যা, ইহা সাব্যস্ত হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, জগতের এই মিথ্যাত্ব সত্য, না মিথ্যা? মিথ্যাত্বকে যদি সত্য বল; তবে ব্রহ্ম ব্যতীত অপর আর একটি সত্য তত্ত্ব পাওয়া যায় বলিয়া অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। মিথ্যাত্বকে যদি মিথ্যা বল, তবে জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা, অর্থাৎ জগৎ সত্য, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়—'জগৎ সত্যং মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বাৎ,' (ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী ৪৩ পৃঃ, পুথি, কুম্ভঘোণ সং)। ব্যাসরাজের উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে—জগতের মিথ্যাত্ব অদ্বৈতবেদান্তের মতে মিথ্যাই বটে, সত্য নহে, সুতরাং ব্যাসরাজের দ্বৈতবাদের আপত্তি ভিত্তিহীন। মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তবে জগৎপ্রপঞ্চ সত্য হইয়া পড়ে, এইরূপ ব্যাসরাজের আশঙ্কার উত্তরে

মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব নিরুক্তি

বক্তব্য এই, ব্যাসরাজের উল্লিখিত অনুমানের মূলে যে ব্যাপ্তি জ্ঞানটি আছে, তাহা হইতেছে এই যে, দুইটি বিরুদ্ধ তত্ত্বের একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে। এইরূপ ব্যাপ্তি-বোধকে সব সময় সত্য বলা যায় না। গোত্ব এবং অশ্বত্ব এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ (contrary) ধর্ম। ইহারা একত্র কোথায়ও থাকে না, গোত্ব থাকিলে অশ্বত্ব থাকে না, আবার অশ্বত্ব থাকিলে গোত্ব থাকে না—'গোত্বাভাববান্ অশ্বত্বাৎ, অশ্বত্বাভাববান্ গোত্বাৎ,' এইরূপ ব্যাপ্তি অবশ্য নির্ণয় করা চলে। কিন্তু গোত্ব না থাকিলেই যে অশ্বত্ব থাকিবে, অশ্বত্ব না থাকিলেই যে গোত্ব থাকিবে (অশ্বত্ববান্ গোত্বাভাবাৎ, গোত্ববান্ অশ্বত্বাভাবাৎ) এইরূপ পাল্টা ব্যাপ্তি-বোধ সত্য হইবে কি? গরু না হইলেই তাহা ঘোড়া হইবে, তাহা কে বলিল? উহা গরু ভিন্ন গজ, মহিষ প্রভৃতি সকলই হইতে পারে, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসরাজের উক্ত ব্যাপ্তিটি নির্ভুল নহে, সবক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নহে। গোত্ব এবং অশ্বত্ব একত্র থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু গোত্ব এবং অশ্বত্ব এই দুইএর অভাব গজে দেখা যায়; সুতরাং ইহাদের উভয়ের অভাব যে একত্র থাকিতে পারে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? গোত্ব, অশ্বত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ বটে, গোত্ব থাকিলে অশ্বত্ব থাকে না, ইহাও সত্য, কিন্তু গোত্বের অভাব সাব্যস্ত হইলেই যে অশ্বত্বের ভাব নিশ্চয় হইবে, তাহা তো বলা যায় না। ইহারা বিরুদ্ধ (contrary) হইলেও সর্ব-প্রকারে বিরুদ্ধ (contradictory) নহে। ব্যাসরাজের ব্যাপ্তিটি সর্বপ্রকারে বিরুদ্ধ বস্তু (contradictory) সম্পর্কেই প্রযোজ্য; অর্থাৎ যেই বস্তুদ্বয় একত্র থাকে না, যাহাদের অভাবও কোন এক বস্তুতে দেখা যায় না, সেইরূপ স্থলেই একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবে এবং একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে শুক্তি-রজত এবং শুক্তি-রজতের অভাব, এই উভয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শুক্তিতে যদি রজতের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়, তবে আর রজতের অভাব শুক্তিতে পাওয়া যাইবে না; পক্ষান্তরে, যদি রজতের অভাব নিশ্চয় হয়, শুক্তিতে তবে রজতের অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠিবে না। কারণ, রজত এবং রজতের অভাব (বা রজতভেদ) এই দুইটি বোধ একদিকে যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, অপরদিকে তেমন ঐ দুইটি নিষেধ্য বস্তুর অবচ্ছেদক ধর্ম (determinant) বিভিন্ন। রজতের নিষেধে determinant বা নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইবে রজতত্ব, আর, রজতের অভাবের নিষেধে determinant বা নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইবে রজতত্বের অভাব, অথবা রজতের ভেদ। রজতত্ব এবং রজতত্বাভাব এই দুইটি (নিষেধ্যতাবচ্ছেদক) ধর্ম তো সর্বপ্রকারে পরস্পর বিরুদ্ধই বটে; সুতরাং এই দুইটি এবং এই দুইএর অভাব এক স্থানে কস্মিন্ কালেও থাকিবে না। একটি থাকিলেই অপরটির অসত্তা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইবে, কিংবা একটির অভাব থাকিলেই অপরটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে। রজতত্ব এবং রজতত্বাভাবের এই যুক্তি গোত্ব এবং গোত্বাভাব, অশ্বত্ব এবং অশ্বত্বাভাব প্রভৃতি স্থলেও উল্লিখিত রূপে প্রয়োগ করা চলিবে। গোত্ব এবং গোত্বাভাব প্রভৃতি যেমন একত্র থাকিবে না, উহাদের অভাবও একত্র দেখা যাইবে না। ভাব এবং অভাব কিছুই এক দেশস্থ হইবে না বলিয়া একের (গোত্বের) সত্যতায় এবং মিথ্যাত্বে অপরের

(গোত্বাভাবের) মিথ্যাত্ব এবং সত্যতা সাব্যস্ত করা চলিবে। কারণ, সেখানে determinant বা নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম গোত্ব এবং গোত্বাভাবত্ব এই দুই-ই হইবে। এমন কোন একটি নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বা determinant সেখানে পাওয়া যাইবে না, যেটি গোত্ব এবং গোত্বাভাব এই উভয়ে বিদ্যমান থাকিতে পারে। গজে যে গোত্ব এবং অশ্বত্ব এই দুই-ই অভাববোধের উদয় হয়, তাহার কারণ এই যে, সেখানে উভয়ের নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, determinant পৃথক্ নহে, একরূপই বটে। গরু এবং অশ্ব এই উভয়েই গজের অত্যন্তাভাব আছে, গজত্বের অত্যন্তাভাবত্ব উভয়ের নিষেধ্যতাবচ্ছেদক সাধারণ ধর্ম। সেই তুল্য ধর্মবশতঃই গজে উভয়েরই অভাব পাওয়া যায়। উভয়ের নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম তুল্য বলিয়াই একের (গোত্বের) নিষেধে, অপরের অশ্বত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। গোত্ব এবং অশ্বত্ব এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মস্থলে যেমন "বিরুদ্ধ দুই ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে" এই ব্যাসরাজোক্ত ব্যাপ্তিটির প্রয়োগ করা চলে না, সেইরূপ জগতের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্নেও ঐ দুইটির একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবে, এইরূপ আপত্তি চলিবে না। কেননা, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সেই স্থলেই বিরুদ্ধ ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে, যেখানে নিষেধের হেতুভূত ধর্মটি (নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম) determinant উভয় নিষেধ্য বস্তুতে বিদ্যমান থাকিবে না। নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মটি উভয়ে বিদ্যমান থাকিলে তখন আর একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে না। জগতের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব উভয়ই ব্যাবহারিক, উভয়ই দৃশ্য। দৃশ্যত্বই জাগতিক সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের সামান্য ধর্ম। দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, এই দৃষ্টিতেই ব্যাবহারিক জগৎ ও তাহার মিথ্যাত্ব উভয়ই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। জাগতিক সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব গোত্ব এবং অশ্বত্বের ন্যায় একত্র দেখা যায় না সত্য, কিন্তু গজে যেমন গোত্ব এবং অশ্বত্ব এই উভয়েরই অভাব পাওয়া যায়, সেইরূপ অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিতে জাগতিক সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব, এই উভয়েরই অভাব দেখা যায়। আকাশকুসুম ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, উহা অসৎ বা অলীক পদার্থ। মিথ্যা শুক্তি-রজতও সাময়িকভাবে সত্য মনে হয় বটে, কিন্তু আকাশকুসুমের কোনকালেই সত্যতাবোধের উদয় হইতে দেখা যায় না; সুতরাং আকাশকুসুম সত্য তো নহেই, উহা মিথ্যাও নহে। একই অধিকরণে যে দুই বস্তুর অভাব পাওয়া যায়, তাহাদের একটি মিথ্যা হইলেই অপরটি সত্য হয় না। (যেমন গোত্ব এবং অশ্বত্ব, গজে ইহাদের উভয়েরই অভাব আছে, সুতরাং গোত্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেই অশ্বত্বের সত্যতা নির্ণীত হয় না), অতএব জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেই জগতের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে না। এক কথায়, সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব ইহারা কোথায়ও একত্র থাকে না বলিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ (contrary) বটে, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের অভাব, গোত্ব গোত্বাভাবের ন্যায়, রজতত্ব ও রজতত্বাভাবের ন্যায়, ব্যাপক নহে। কেননা, ব্যাবহারিক সত্য ও মিথ্যা ব্যতীত অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতির (যেখানে ব্যাবহারিক সত্য ও মিথ্যা এই উভয়েরই অভাব পাওয়া যাইবে) অস্তিত্ব চিন্তা জগতে অস্বীকার করা যায় না। এইজন্য মিথ্যা নহে, অতএব সত্য এইরূপ বলা চলে না। কারণ,

মিথ্যা না হইলে উহা সত্য না হইয়া অলীক আকাশকুসুমও তো হইতে পারে। যেস্থলে পরস্পরের অভাবটি ব্যাপক হইবে, সেস্থলে ভাব ও অভাব ব্যতীত (গোত্ব ও গোত্বাভাব ব্যতীত) অপর কোন তত্ত্ব নাই সুতরাং সেক্ষেত্রে ভাব (গোত্ব) না হইলেই অভাব (গোত্বাভাব) হইবে এবং অভাব না হইলেই ভাব হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করা চলে। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্বকে মিথ্যা দেখিয়াই জগতের সত্যতা সিদ্ধান্ত করা চলে না। কেননা, অদ্বৈতবেদান্তের মতে দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা বলিয়া দৃশ্যত্বকেই মিথ্যাত্বের অবেচ্ছদক ধর্ম (determinant) ধরা যাইতে পারে। এই মিথ্যাত্বের অবচ্ছেদক ধর্মটি জগতের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব এই উভয় স্থলেই তুল্যরূপে বিদ্যমান। এইজন্যই জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগতের সত্যতার প্রশ্ন আসে না। জগতের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব এই উভয়ই মিথ্যা ইহাই সাব্যস্ত হয়। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে জগতের সত্যতা বা মিথ্যাত্ববোধ কিছুই থাকিবে না, সর্বপ্রকার ব্যাবহারিক বোধ বাধিত হইবে। জগতের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব, উভয়ই ব্যাবহারিক এবং দৃশ্য বলিয়া উভয়ে একজাতীয় (ব্যাবহারিক) সত্তাই বিরাজ করে এবং এক অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েই বাধিত হয়। জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহার মিথ্যাত্ববোধ এক ব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্য বলিয়াই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিবন্ধন জগতের সত্যতার নিশ্চয় করা যায় না।[১] এইরূপে মধুসূদন সরস্বতী ব্যাসরাজের সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" এই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের সিদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মধুসূদন ভেদবাদ-নিরাস, অখণ্ডার্থতা-নিরূপণ, একজীববাদ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্য অপূর্ব মনীষার সহিত অদ্বৈতসিদ্ধিতে স্থাপন করিয়াছেন। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির বেগবান্ যুক্তিপ্রবাহ নব নব চিন্তার লহরী তুলিয়া অসীম ব্রহ্ম-পারাবারের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। অদ্বৈত তীর্থযাত্রী সেই প্রবাহে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

১। অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব, নিরুক্তি ২০৭-২২২ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং দেখুন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্তের সপ্তদশ শতক

মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির পর অদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসে মৌলিক চিন্তার সমাবেশ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাসরাজের তীব্র আক্রমণ, মধুসূদনের সূক্ষ্ম গবেষণা ও বিচারের ফলে অদ্বৈতবাদ মধুসূদনের অবদানে এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, অদ্বৈতবেদান্তের আর কোন নূতন কথা বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্যই দেখা যায়, মধুসূদনের পর মধুসূদনের গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী ব্যতীত অদ্বৈতবাদের মৌলিক গ্রন্থ খুব কমই রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে মাদ্রাজের অন্তর্গত বেলাঙ্গুড়িনিবাসী ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষা নামে অদ্বৈতবেদান্তের প্রমাণ-তত্ত্বের (Epistemology) এক সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন এবং অদ্বৈতবাদ-সম্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণের রহস্যই অতি বিস্তৃতভাবে ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্যগণের প্রমাণের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তুলনামূলক বিচার করেন।[১] ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র আচার্য নৃসিংহাশ্রমের প্রশিষ্য এবং বেঙ্কটনাথের শিষ্য ছিলেন। বেঙ্কটনাথ গীতার উপর ব্রহ্মানন্দগিরি নামে টীকা রচনা করিয়া শঙ্করাচার্যের মত ব্যতীত অপরাপর সকল দর্শনের মত খণ্ডন করেন। বেঙ্কটনাথ মন্ত্রসারসুধানিধি অদ্বৈতরত্ন-পঞ্জর, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বেদান্তপরিভাষার উপর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রামকৃষ্ণাধ্বরী নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়া শিখামণি নামে অতি উপাদেয় টীকা রচনা করিয়াছেন। উদাসীন স্বামী শ্রীঅমর দাস রামকৃষ্ণাধ্বরির শিখামণির উপর মণিপ্রভা নামক টীকা রচনা করিয়া শিখামণি বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। বেদান্তপরিভাষার উপর শিবদাসের অর্থদীপিকা টীকা, নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র পেড্ডা দীক্ষিতের প্রকাশিকা নামে টীকা আছে। ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির রচিত টীকা, পূর্বস্থলীর মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের আশুবোধিনী টীকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মঃ মঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেদান্তবিশারদ মহাশয়ের টীকা পাওয়া যায়। বেদান্তপরিভাষা ব্যতীত ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর একখানি টীকা এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর তর্কচূড়ামণি নামে এক অপূর্ব টীকা রচনা

১। আমরা ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিচারের শৈলী এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখাইব।

করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তর্কচূড়ামণি টীকায় ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপরে লিখিত রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতিপ্রমুখ দশখানি টীকার মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এইরূপ খণ্ডন, মণ্ডনশক্তি ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের কম প্রতিভার পরিচায়ক নহে। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার পুত্র এবং শিষ্য রামকৃষ্ণাধ্বরির মুখেই শুনিতে পাই।[১] ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের প্রমাণ-তত্ত্বের বিচারের মৌলিকতা সর্বজন-স্বীকৃত। বেঙ্কটনাথ যেমন ন্যায়-পরিশুদ্ধিতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রও সেইরূপ অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে প্রমাণ-তত্ত্বের বিচার করিয়া অদ্বৈতবাদের পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছেন। ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অখণ্ড, নির্বিকল্প জ্ঞানের অপরোক্ষতা প্রমাণ করিয়া, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র ব্রহ্মের অপরোক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন; জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্য প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মবাদকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্ত্ব সম্পর্কে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের দান কে অস্বীকার করিবে?

কাশ্মীরী সদানন্দ যতি

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে কাশ্মীরী সদানন্দ যতি অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি নামে অতি উৎকৃষ্ট একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি অদ্বৈতবাদ অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিবিধ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীবের স্বরূপ-বিচারে অবচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদের ব্যাখ্যায় সদানন্দ যতি বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্মস্বরূপ এবং এক, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই অদ্বৈতবেদান্তের উদ্দেশ্য। অবচ্ছেদবাদ, প্রতিবিম্ববাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় এবং সমর্থনে অদ্বৈত-বাদের আগ্রহ নিতান্তই কম। ঐ সকল ব্যাখ্যা স্থূলধী ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনের জন্যই অদ্বৈতবাদে উপদিষ্ট হইয়াছে; নতুবা, যে দর্শনের মতে জীবই ব্রহ্ম সেই দর্শনে জীব এক না হইয়া বহু হইতে পারে কিরূপে? এক জীববাদই অদ্বৈতবেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। এই এক জীববাদ সাধারণের বোধগম্য হয় না বলিয়াই আবিদ্যক জীবভেদের উপদেশ করা হইয়াছে। যাঁহারা জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফল ভগবানের রাঙা চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহাদেরই অদ্বৈত-বাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। ঐরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে তবেই অনাবিল ব্রহ্ম-জ্ঞান-কমল তাঁহাদের

১। আসেতোরাস্থমেরোরপি ভুবি বিদিতান্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রান্
বন্দে'হং তর্কচূড়ামণি-মণিজননক্ষীরধীংস্তাতপাদান্।
যৎ কারুণ্যানুয়া'ভদধিগতমধিকং দুর্গ্রহং সক্ষ্মধীকৈ-
রপ্যাস্তং শাস্ত্রজাতং জগতি মখকৃতা রামকৃষ্ণাহ্বয়েন।।
—শিখামণি, প্রারম্ভ শ্লোক।

চিত্ত-সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়। যাঁহাদের নিদিধ্যাসন নাই, কেবল পাণ্ডিত্যখ্যাপনের জন্যই যাঁহারা অদ্বৈতবেদান্তের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের প্রকৃত অদ্বৈত তত্ত্ব-বোধের উদয় হয় না।[১] অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের আরম্ভে বিভিন্ন অদ্বৈতমতের সংকলনের যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া অনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরক সদানন্দ যতি যে দীক্ষিতের চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। সদানন্দ—"নতু বেদান্ত-শ্রবণ-মাত্রেণ নিদিধ্যাসনশূন্যস্য পাণ্ডিত্যমাত্রকামস্য" এই কথাটির দ্বারা তাঁহার সময়ে বেদান্তে সাধনার স্থান যে ক্রমে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যার অভিমান অধিকার করিয়া বসিতে-ছিল, সাধনা হইতে পাণ্ডিত্য বড় হইতেছিল, ইহারই হয় তো তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা মধুসূদনের পরবর্তী যুগে পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তিই অত্যধিক দেখিতে পাই। সাধনার দ্বারা জীবনে বেদান্তকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বিজিগীষুর সদম্ভ আস্ফালনই জ্ঞানের মন্দিরে নিয়ত শুনা যাইতেছে। ইহাই তো জাতীয় জীবনের অধঃপতনের সূচনা।

আমরা পূর্বেই নবম পরিচ্ছেদে শঙ্করোক্ত অদ্বৈতবাদের পরিচয়ে উল্লেখ করিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ কি, সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে গোপাল সরস্বতীর শিষ্য আচার্য গোবিন্দানন্দ ভাষ্য-রত্ন-প্রভা নামে শাঙ্কর ভাষ্যের এক অতি উপাদেয় প্রাঞ্জল টীকা রচনা করিয়া ভাষ্যের আশয় বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য রামানন্দ সরস্বতী ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী নামে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী এক বৃত্তি রচনা করেন। রামানন্দের ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী শঙ্করানন্দ-কৃত ব্রহ্মসূত্র-দীপিকা হইতে বিস্তৃত ও অতি প্রাঞ্জল। ইহাতে ভাষ্যের তাৎপর্য অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী ব্যতীত রামানন্দ বিবরণো-পন্যাস নামে পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর একখানি অতি উপাদেয়, প্রমেয় বহুল নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিবরণ-মতের পুষ্টিসাধন করেন। বিবরণোপন্যাসে রামানন্দ অপূর্ব বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই সময়েই অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ-তীর্থ অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের কৃষ্ণালঙ্কার নামে টীকা এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের উপর বনমালা টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী শ্রীভাষ্যের খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দই সম্ভবতঃ রত্নপ্রভার উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে নরহরি বোধসার নামে গ্রন্থ লিখিয়া, নরহরির শিষ্য দিবাকর পণ্ডিত নরহরির বোধসারের উপর টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করেন। আচার্য

১। প্রতিবিম্বাবচ্ছেদবাদানাং ব্যুৎপাদনে নাত্যন্তমাগ্রহঃ, তেষাং বালবোধনার্থত্বাৎ। কিন্তু—ব্রহ্মৈব অনাদিমায়াবশাৎ জীবভাবমাপন্নঃ সন্ বিবেকেন মুচ্যতে। ....অয়মেব একজীববাদাখ্যো মখ্যো বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। ইদঞ্চ অনেকজন্মার্জিতসুকৃতস্য ভগবদর্পণেন ভগবদনুগ্রহফলাদ্বৈতশ্রদ্ধা-বিশিষ্টস্য নিদিধ্যাসনসহিতশ্রবণাদিসম্পন্নস্যৈব চিত্তারূঢ়ং ভবতি। নতু বেদান্ত-শ্রবণমাত্রেণ নিদি-ধ্যাসনাদিশূন্যস্য পাণ্ডিত্যমাত্রকামস্য। (অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি ২১১-১৩ পৃঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং)।

রঙ্গনাথ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক-ভাষ্যানুসারী এক বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রহস্যবোধের পথ সুগম করেন। রঙ্গনাথ তাঁহার বৃত্তিতে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "ভূত-যোনিত্ব" অধিকরণে ২৩ সূত্রের পরে "প্রকরণত্বাৎ" বলিয়া একটি নূতন সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভামতী প্রভৃতি টীকায় ঐরূপ কোন সূত্র গৃহীত হয় নাই। নূতন ঐরূপ সূত্রের অবতারণার কোন যুক্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেই ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকা রচনা করিয়া মধুসূদনের বিরুদ্ধে রামাচার্যকৃত ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণীর সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির মতবাদ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তরঙ্গিণীর মত ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি মীমাংসকাচার্য খণ্ডদেবের মত এবং গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতও বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। খণ্ডন ও মণ্ডনে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর যুক্তিজাল অতুলনীয়। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরুর নাম পরমানন্দ সরস্বতী, বিদ্যাগুরু ষড়্দর্শন-নিষ্ণাত আচার্য নারায়ণতীর্থ এবং শিবরামাচার্য। ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপের হরিরাম সিদ্ধান্তবাগীশ ইহার গুরু ছিলেন বলিয়া জানা যায়। লঘুচন্দ্রিকা নাম দেখিয়া গুরু-চন্দ্রিকা বা বৃহচ্চন্দ্রিকা নামেও একখানি টীকা ছিল বলিয়া অনেক সুধী মনে করেন। ঐ গুরুচন্দ্রিকা বা বৃহচ্চন্দ্রিকা টীকা কাহার রচিত? কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর অন্যতম গুরু শিবরামাচার্য গুরুচন্দ্রিকা বা বৃহচ্চন্দ্রিকা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ টীকাবই সংক্ষেপ করিয়া লঘুচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছে। অবশ্যই এবিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকার শেষে লিখিয়াছেন যে :—

মহানুভবধৌরেয়শিবরামাখ্যবর্ণিনঃ।
এতদ্‌গ্রন্থস্য কর্তারো লেখকাঃ কেবলং বয়ম্‌॥

এইরূপ লেখাদৃষ্টে মনে হয় যে, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী শিবরামের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়াই লঘুচন্দ্রিকা লিপিবদ্ধ করেন। গুরুর প্রতি সম্মান ও স্বীয় নিরভিমান প্রদর্শনের জন্যই শিবরামকে গ্রন্থকার এবং নিজকে কেবল লেখক বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। লঘুচন্দ্রিকা ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর রত্নাবলী টীকা, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি—সূত্রমুক্তাবলী, অদ্বৈতচন্দ্রিকা, অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-বিদ্যোতন প্রভৃতি গ্রন্থমালা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ব্রহ্মানন্দের অকাট্য যুক্তির তীব্রতা এত অধিক যে, তাহা পাঠ করিলে ব্রহ্মানন্দের যুক্তিজাল কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মানন্দের চিন্তার নবীনতা এবং তর্কের সাবলীল গতি সুধী দার্শনিকের হৃদয় স্পর্শ করে। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগেই বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকার উপর বিট্‌ঠলেশী নামে অতি উপাদেয় টীকা রচনা করেন এবং এ পর্যন্ত অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীকা প্রভৃতির যত-প্রকার প্রতিবাদ হইয়াছে বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায় তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তকে অকাট্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সূক্ষ্মদর্শন, সত্যনিষ্ঠা ও বিচারপটুতার আর তুলনা নাই।

এই সপ্তদশ শতকেই রামাচার্যের প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। তদ্‌ব্যতীত এই সময়ে মধ্বমতাবলম্বী রাঘবেন্দ্র স্বামী প্রসিদ্ধ দ্বৈতবেদান্তাচার্য জয়তীর্থের গ্রন্থরাজির উপর বৃত্তি রচনা করিয়া স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্র-বাদের অশেষ পুষ্টিসাধন করেন। রাঘবেন্দ্র একজন অতি ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্বাচার্যের তত্ত্বোদ্দ্যোতের উপর জয়তীর্থের যে টীকা আছে, ঐ টীকার বৃত্তি এবং মধ্বের প্রমাণ-লক্ষণের উপর জয়তীর্থের ন্যায়কল্প-লতিকা নামে যে টীকা আছে, ঐ টীকার বৃত্তি, মধ্ব-ভাষ্যের উপর জয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার ভাবদীপ নামে বৃত্তি, জয়তীর্থের বাদাবলীর টীকা, মধ্বাচার্যের অণুভাষ্যের উপর জয়তীর্থের ন্যায়সুধার তত্ত্বমঞ্জরী নামে বৃত্তি, গীতা-বিবৃতি নামে গীতার ব্যাখ্যা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ প্রভৃতির মধ্বমতানুযায়ী ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া মধ্বমতের বিজয় ঘোষণা করেন। ষোড়শ শতকে ব্যাসরাজ ও মধুসূদনের আবির্ভাবে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের যে ভীষণ তর্কযুদ্ধ চরমে আসিয়া পেঁীছিয়াছিল, সপ্তদশ শতকেও তাহার বিরাম হয় নাই। তরঙ্গিণী-রচয়িতা রামাচার্য ও লঘুচন্দ্রিকার রচয়িতা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ব্যাসরাজ এবং মধুসূদনের বাদানলে নূতন চিন্তার আহুতি অর্পণ করিয়া সেই বাদ-বহ্নিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। রামানুজ-প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের চিন্তাপ্রবাহও এই সময় প্রবল বেগ ধারণ করে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীনিবাসাচার্য ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বেদান্তপরিভাষার খণ্ডনোদ্দেশ্যে পরিভাষার অনুকরণে যতীন্দ্রমত-দীপিকা নামে একখানি স্বীয় মতের অতি উপাদেয় প্রমাণ এবং প্রমেয় বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। যতীন্দ্রমত-দীপিকা ১০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১—৩ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয় নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রমেয়-তত্ত্ব, পঞ্চমে কালতত্ত্ব, ষষ্ঠে নিত্যবিভূতি, সপ্তমে ধর্মভূতজ্ঞান, অষ্টমে জীবের স্বরূপ, নবমে ঈশ্বর ও দশমে অদ্রব্য প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রামানুজমতের প্রমাণ ও প্রমেয়-তত্ত্ব অতিশয় শৃঙ্খলা ও নিপুণতার সহিত আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ রামানুজমতে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রামানুজমতে শ্রীনিবাস নামে একাধিক আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] বাধূলকুলসম্ভূত আচার্য শ্রীনিবাস দোদ্দয়মহাচার্য

১। উক্ত শ্রীনিবাস আচার্য ব্যতীত রামানুজের সম্প্রদায়ে শ্রীনিবাস নামে আরও দুই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শঠমর্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং মধ্বমতের বিরুদ্ধে আনন্দ-তারতম্যবাদ খণ্ডন নামে গ্রন্থ লিখিয়া মধ্বমতের মুক্তিতে আনন্দের তারতম্য খণ্ডন করেন। ইঁহার অনুয়াচার্য ও শ্রীনিবাস নামে দুই কৃতী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইঁহার পুত্র শ্রীনিবাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুয়াচার্যের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তত্ত্বমার্তণ্ড নামে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া ব্যাসতীর্থের মাধ্বচন্দ্রিকার মত খণ্ডন করেন। ওঙ্কারবাদার্থ এবং প্রণব-দর্পণ গ্রন্থে তিনি ব্যাসতীর্থের চন্দ্রিকার ওঙ্কার সংক্রান্ত মত খণ্ডন করেন এবং তদীয় বিরোধনিরোধ-ভাষ্য-পাদকায় তিনি অদ্বৈতমত বিধ্বস্ত করেন। অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণীতে শ্রীনিবাস শঙ্করাচার্যের আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন। তৎকৃত জিজ্ঞাসা-দর্পণে রামানুজের মত সমর্থন করিয়া, জ্ঞানরত্ন প্রকাশিকায়—মুক্তি একমাত্র জ্ঞান-লভ্য শঙ্করের এইমত খণ্ডন করিয়া, মুক্তি যে ধ্যান এবং উপাসনা-লভ্য এই স্বীয় মত স্থাপন করেন। ভেদ-দর্পণ গ্রন্থে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সাব্যস্ত করেন। সিদ্ধান্ত-চিন্তামণিতে রামানজমতের সিদ্ধান্তের সার

রামানুজদাসের গুরু ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই দোদ্দয়রামানুজদাস মহাচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বেঙ্কটনাথের শতদূষণীর উপর চণ্ডমারুত নামক টীকা রচনা করেন। দোদ্দয়রামানুজ তদীয় চণ্ডমারুতের প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীনিবাসগুরুবেশমহং ভজামি" বলিয়া গুরু শ্রীনিবাসের চরণে প্রণতি জানাইয়াছেন। চণ্ডমারুত ব্যতীত দোদ্দয় অদ্বৈতবিদ্যা-বিজয় নামে গ্রন্থ লিখিয়া পর পর তিন পরিচ্ছেদে অদ্বৈতবেদান্তের প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব, জীবেশ্বরবাদ ও অখণ্ডার্থতা খণ্ডন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মধ্বমত খণ্ডনেরও চেষ্টা করেন। উপনিষদ্‌মঙ্গলদীপিকা গ্রন্থে তিনি উপনিষদের বিশিষ্টাদ্বৈতমতানুযায়ী ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। তদীয় পারাশর্য-বিজয়ে ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ব্যাখ্যার যুক্তিযুক্ততা আলোচনা করেন এবং অপ্পয় দীক্ষিতের ন্যায়রক্ষামণির খণ্ডন করেন। ব্রহ্মসূত্রোপন্যাস লিখিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যার উপাদেয়তা এবং অপরাপর ভাষ্য-ব্যাখ্যার অসঙ্গতি প্রদর্শন করেন। তাঁহার সদ্‌বিদ্যা-বিজয় গ্রন্থে অবিদ্যার আশ্রয়তা-ভঙ্গ, লক্ষণ-ভঙ্গ, নিবর্তক-ভঙ্গ, নিবৃত্তি-ভঙ্গ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া অবিদ্যার খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হন। ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিজয়, বেদান্ত-বিজয়, পরিকর-বিজয় প্রভৃতিতেও তিনি তাঁহার স্বীকৃত বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের বিজয় ঘোষণায় বিরত হন নাই। এই সপ্তদশ শতকেই অনুয়াচার্যের পুত্র বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য বেদান্ত-কারিকাবলী নামে পদ্যে লিখিত একখানি গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের প্রমাণ ও প্রমেয়-তত্ত্ব বিশেষভাবে তর্কের ভিত্তিতে বিচার করেন এবং অদ্বৈত-বাদের খণ্ডন করেন।[১] এই সময়ে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য ব্রজনাথ ভট্ট বল্লভাচার্যের অণুভাষ্যের উপর মরীচিকা নামে বৃত্তি রচনা করিয়া বল্লভীয় দর্শনের সৌষ্ঠব সাধনে মনোনিবেশ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদান্তবাদও সপ্তদশ শতকে সঞ্জীবিত ছিল, বিচার পটুতাও এই সময়ে কম ছিল না। তবে, এই সময়ে যে সকল গ্রন্থরাজি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই টীকা এবং বৃত্তি। বেদান্তপরিভাষা, অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি প্রভৃতি দুই-তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্পই দেখা যায়।

সংকলন করেন। যতীন্দ্রমত-দীপিকার অনুকরণে "নয়দ্যুমণি" নামে গ্রন্থ লিখিয়া এবং বেঙ্কটের শতদূষণীর উপর সহস্রকিরণী নামে টীকা রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ইনি একজন স্তম্ভবিশেষ।

১। বেদান্ত-কারিকাবলীতে রামানুজের মতানুসারে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনপ্রকার প্রমাণ ও কাল, প্রকৃতি, নিত্যবিভূতি, বুদ্ধি, গুণ, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি প্রমেয়-তত্ত্ব বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্ত ও অষ্টাদশ শতাব্দী

ষোড়শ শতকের বেদান্ত-চিন্তার মৌলিকতা সপ্তদশ শতকেই ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তার দৌর্বল্য নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে দার্শনিক সমর চলিয়া আসিতেছিল, যে প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হইতেছিল, তাহা যেন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে একেবারে নির্বাণোন্মুখ হইল। পলাশীর ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ণয়ের পর ভারতের জাতীয় জীবন নিস্তেজ হইয়া পড়িল, সর্বপ্রকার শক্তির উৎস শুষ্ক হইল, জ্ঞানের প্রদীপ তৈলশূন্য হইল, সর্ববিষয়ে ভারতবাসীর সাধনার অভাব ঘটিল। এইরূপ দুর্দিনে চিন্তার দৈন্য অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃসময়ের সূচনায় বৈষ্ণবমতের জাগরণ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাংলা-মায়ের বুকে আচার্য বিশ্বনাথ ও বলদেব বিদ্যাভূষণের আবির্ভাবে নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়মত গৌরবময় প্রেরণা ও অপ্রতিহত গতিবেগ লাভ করে। অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মধ্যেও মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী, সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী, ধনপতিসূরি, আয়ন্ন দীক্ষিত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বৈত-বেদান্তের গৌরবময় ঐতিহ্য বিশ্বমানবের স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের প্রথমে নদীয়ার দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বলদেব বিদ্যাভূষণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। বিশ্বনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের মতানুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা—ভাগবতামৃত-কণা, গীতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুসার-রসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ললিত মাধবের টীকা, ব্রহ্ম-সংহিতার টীকা, আনন্দচন্দ্রিকা নামে উজ্জ্বল নীলমণির টীকা, উজ্জ্বল নীলমণিসার, উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ, গোপালতাপনীর টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। তদ্‌ব্যতীত অলঙ্কারকৌস্তভের টীকা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত নামে মহাকাব্য, স্তবামৃত-লহরী, ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, মাধুর্যকাদম্বিনী, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা টীকা, গোপীপ্রেমামৃত, গৌরাঙ্গলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থমালা রচনা করিয়া স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা, ভূয়োদর্শন ও ভগবদ্‌ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বিশ্বনাথ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। তাঁহার ভাগবতের টীকা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত নহে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশুকদেবকৃত টীকারই প্রচলন সমধিক। অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের শ্রীধরী, রামানুজমতে বীররাঘবীয়, মধ্ব-সম্প্রদায়ের মতে বিজয়ধ্বজী, বল্লভের সম্প্রদায়ের সুবোধিনী, গৌড়ীয়মতের ক্রমসন্দর্ভ যেমন ভাগবতের প্রামাণিক ব্যাখ্যা, বিশ্বনাথের টীকাও পরবর্তী কালে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণিক ব্যাখ্যা বলিয়া সমাদর লাভ করে। উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় বিশ্বনাথ অপ্রকট লীলাতেও রাধা প্রভৃতি গোপীবৃন্দের পরকীয়াত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এবিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত তাঁহার সিদ্ধান্তে পার্থক্য দেখা যায়।

বিশ্বনাথের সমসাময়িক কালেই বালেশ্বর জেলায় খাওয়াতকুলে বলদেব জন্ম-গ্রহণ করেন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে বলদেব ব্রহ্মসূত্রের উপর গোবিন্দভাষ্য, দশোপনিষদ্-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য বিষ্ণু-সহস্রনাম-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য রচনা করিয়া গৌড়ীয়মতের ভাষ্যের অভাব মোচন করিয়া আচার্য পদবী লাভ করেন। ঐ সকল ভাষ্য-গ্রন্থ ব্যতীত সিদ্ধান্তরত্ন নামে স্বীয় গোবিন্দ-ভাষ্যের এক বিবৃতি এবং ঐ বিবৃতির টীকা, সূক্ষ্মানাম্নী গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকা, প্রমেয়রত্নাবলী ও বেদান্তস্যমন্তক নামে প্রকরণ গ্রন্থ লিখিয়া স্বীয় বেদান্ত-ধারার পুষ্টিবিধান করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। এতদ্‌ব্যতীত তিনি ভাগবতের টীকা, জীবগোস্বামি-কৃত ষট্‌সন্দর্ভের টীকা, লঘুভাগবতামৃত-টীকা, সাহিত্য-কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকা, কাব্য-কৌস্তুভ, সিদ্ধান্তদর্পণ প্রভৃতি রচনা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে অলৌকিক প্রতিভা ও অভিনিবেশের পরিচয় প্রদান করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এই দুই জনই বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহারা স্বীয় মতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। ভক্তি, ভগবৎপ্রেম ও ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই, এই সত্যই বিশ্বনাথ ও বলদেব জনসমাজে প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যের দেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া অপরাপর মতবাদ অসার তৃণ-গুল্মের ন্যায় ভাসাইয়া নিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রেম ও ভক্তির সুবাসে বাসিত করিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর চৈতন্যদেবের এবং তাঁহারই আদর্শ প্রচারক বিশ্বনাথ ও বলদেবের আসন চিরদিন জাতির মর্মস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং অনন্তকাল বাঙ্গালী সেই আসনের বেদীমূলে পূজার অর্ঘ সাজাইয়া কৃতার্থ হইবে।

প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রবলতায় দেশ ভাসিয়া গেলেও অদ্বৈতবাদ তখনও একে-বারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সময়েই মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী তত্ত্বানুসন্ধান নামে একখানি অদ্বৈতবেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ এবং তাহার টীকা অদ্বৈতচিন্তা-কৌস্তুভ রচনা করিয়া অতি সরল ও সরস ভাষায় অদ্বৈতবেদান্ত-তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ধনপতি সূরি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গীতার শাঙ্করভাষ্যের উপর ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা নামে টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন করেন। এতদ্‌ব্যতীত ধনপতি সূরি মাধবের রচিত শঙ্কর দিগ্‌বিজয়ের উপর টীকা রচনা করিয়া এবং পদ্মপাদের রচিত প্রাচীন শঙ্করবিজয়ের লুপ্ত অংশ ঐ টীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের অদ্বৈত মতানুসারী টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের সৌষ্ঠব সম্পাদনের চেষ্টা করেন। ইঁহার পুত্র শিবদাস বা শিবদত্ত বেদান্তপরিভাষার উপর পদার্থদীপিকা-নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করেন। পরমসিদ্ধ যোগী সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী ব্রহ্মসূত্রের উপর ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা নামে অতি প্রাঞ্জল বৃত্তি রচনা করিয়া শঙ্করের মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের রহস্য জিজ্ঞাসুর নিকট সুগম করেন। ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি বার খানি উপনিষদের উপর দীপিকা নামে টীকা রচনা করিয়া এবং অদ্বৈতরসমঞ্জরী, আত্মবিদ্যা-বিন্যাস, সিদ্ধান্তকল্পবল্লী, সিদ্ধান্তলেশসার, কবিতাকল্পবল্লী প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। যোগমার্গে যোগ-সুধাসার

নামে যোগসূত্রের উপর বৃত্তি রচনা করিয়া যোগের পুষ্টি সাধন করেন। এতদ্-ব্যতীত তিনি বহু উপাদেয় কীর্তন রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কীর্তনের পদাবলী ভাষার মাধুর্যে এবং ভাবসম্পদে অতুলনীয়। সিদ্ধযোগী বলিয়া দক্ষিণ ভারতে সদাশিবের নাম এবং তাঁহার অলৌকিক বিবিধ যোগ-বিভূতির কথা অদ্যাপিও লোক-মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় যে, সদাশিব তুরস্ক দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নেনুরের নিকটে তাঁহার সমাধি নাকি আজও বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ভাস্কর দীক্ষিত তাঁহার গুরু কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর রচিত সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন নামক গ্রন্থের উপর রত্নতুলিকা নামে টীকা রচনা করিয়া এবং হরি দীক্ষিত ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্কর মতানুযায়ী এক অতি সরল বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈত-মতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সদাশিবেন্দ্রের সমসাময়িক কালে আচার্য আয়ন্ন দীক্ষিত ব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণয় নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদই যে ব্যাস-সূত্রের দার্শনিক রহস্য, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তদীয় ব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণয়ে দেখাইয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি আচার্যগণ প্রত্যেকেই শ্রুতি ও যুক্তিমূলে ব্রহ্মসূত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়া নিজ মতই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য এবং অপরাপর সকল মত ভ্রান্ত এবং অসার, এইরূপ সিদ্ধান্তেই পেঁাছিয়াছেন। প্রত্যেক ভাষ্যকারই অসামান্য মনীষীও বটেন, সাধক এবং সত্যানুসন্ধিৎসুও বটেন। তাঁহাদের পরস্পর মতবিরোধ, এবং পরস্পর মত খণ্ডনের চেষ্টা দেখিয়া ব্যাস-সূত্রের দার্শনিক রহস্য জিজ্ঞাসুর নিকট তমসাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হইবে। এই অবস্থায় ব্যাসের দার্শনিক রহস্য নির্ণয়ের পথ কি? আয়ন্ন দীক্ষিত সেই পথ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে ব্যাসের দার্শনিক মতের খণ্ডনের যে প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, সকল আচার্যই অদ্বৈতবাদই ব্যাস-সূত্রের দার্শনিক মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বিভিন্ন পুরাণেও অদ্বৈতবাদই উপনিষদের দার্শনিক রহস্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং কপিল, কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণও উপনিষদের ঐরূপ রহস্যই অনুমোদন করিয়াছেন। গীতা, স্মৃতি, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিলেও অদ্বৈতমতই উপনিষদের রহস্য বলিয়া বুঝা যায়। ব্যাস-সূত্র উপনিষদেরই সার সংকলন সুতরাং অদ্বৈতবাদই ব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক—তস্মাৎ সকলশ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণাগম-তন্ত্রাণাং ব্যাসাভিমতকেবলাদ্বৈত এব তাৎপর্যস্য অবধারিতত্বেন তাদৃশাদ্বৈতমেব পরমার্থ ইতি সিদ্ধম্। আয়ন্ন দীক্ষিত-কৃত ব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণয়। আয়ন্ন দীক্ষিত যুক্তিমূলে নিরপেক্ষভাবে ব্যাসসূত্রের যে তাৎপর্য অবধারণ করিয়াছেন, আমরাও এবিষয়ে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। ব্যাসের সূত্রই বেদান্তের ভিত্তি, ব্যাস-সূত্রের রহস্য অদ্বৈতপর বলিয়া নির্ণীত হইলে অনেক দার্শনিক মত-বিরোধের অবসান হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতবেদান্ত—ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতকে অদ্বৈত-চিন্তার মৌলিকতা হ্রাস পাইলেও একেবারে নির্বাপিত হইয়াছে বলা যায় না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে আসিয়া পেঁাছিলে দেখা যায় যে, স্বাধীন চিন্তার দৈন্য এখানে নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। পাণ্ডিত্য পল্লবগ্রাহিতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সৃজনী শক্তির অভাব ঘটিয়াছে। উদ্ভাবনী শক্তির স্থান অন্তঃ-শুষ্ক সমালোচনায় অধিকার করিয়াছে। জাতির অন্তর্মুখী চিন্তা ও সাধনার ধারা বহির্মুখে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জাতির এইরূপ দুর্দিনেও ভারতীয় দর্শন চিন্তার আকাশে দুই একটি ভাস্বর তারকার অভ্যুদয় না হইয়াছে এমন নহে। এই বিংশ শতকেই (ইং ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে) ভট্টপল্লী নিবাসী সর্বশাস্ত্রার্থ দর্শী মহামহোপাধ্যায় ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্য রচনা করেন। ভারতীয় দর্শন চিন্তার ইতিহাসে শৈবদর্শনের আমরা যেরূপ পরিচয় পাই, শৈবদর্শনপরমাচার্য শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্র শৈব-ভাষ্য ও ঐ শৈব-ভাষ্যের উপর অপ্পয় দীক্ষিতের শিবার্ক-মণিদীপিকা প্রভৃতি তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল গ্রন্থরাজি যেরূপ দেখিতে পাই, শাক্তদর্শনের সেইরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য প্রভৃতি দার্শনিক সংগ্রহকার-গণও তাঁহাদের গ্রন্থে শক্তিদর্শন সম্পর্কে নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছেন। অথচ মাধবাচার্য তদীয় সর্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনের বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শৈবাগমের উপর (১) শৈবদর্শন, (২) নকুলীশ পাশুপতদর্শন এবং (৩) প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের বিবরণ মাধবাচার্যের সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি। শৈব দর্শনের ন্যায় শাক্তদর্শন মাধবাচার্যের সময়ে প্রচলিত থাকিলে মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহে অবশ্যই উহার উল্লেখ করিতেন, নীরবতা অবলম্বন করিতেন না। প্রাচীন শাক্ত আগম এবং শক্তিপূজা-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দার্শনিক মতবাদ হিসাবে শৈব-দর্শনের ন্যায় শাক্তদশনও যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন। শাক্তদর্শন প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্মসূত্রের শৈব-ভাষ্যের ন্যায় শক্তিভাষ্য বিদ্যমান ছিল, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তিতে সুগঠিত না হইলে সেই বিদ্যা বা সাধনার ধারা সুধীসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। এইজন্যই দেখা যায়, অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ভেদাভেদবাদ এবং শৈব আগম প্রভৃতির প্রবক্তা সকল আচার্যই নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্রহ্মসূত্র-রহস্য বিচার করিয়াছেন এবং বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ভিত্তিতে স্বীয় মত ও পথের সন্ধান দিয়াছেন এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়সিদ্ধ তত্ত্বজিজ্ঞাসার ধারাকে ব্রহ্মবিদ্যা-সুরধুনীর সহিত সংযুক্ত করিবার

প্রয়াস করিয়াছেন। কাললুপ্ত শাক্তদর্শনের শুষ্কপ্রায় ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার সহিত যুক্ত করিবার মহদুদ্দেশ্যেই ৺তর্করত্ন মহাশয় ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শক্তিভাষ্যের উৎস হিসাবে তিনি প্রথমতঃ সপ্তশতী দেবীসূক্ত-ভাষ্য রচনা করেন। তারপর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শক্তিভাষ্য প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্য তাঁহার শক্তিপূজার তৃতীয় কুসুমাঞ্জলি। তিনি পরিণত বয়সে এই ভাষ্যের মালা গ্রথিত করিয়াছেন, এইজন্য তিনি সমগ্র জাতির নমস্য।

ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্যে এবং অপরাপর শক্তিভাষ্যেও মূলতঃ তিনি এই সিদ্ধান্তই শাস্ত্রোক্তি, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির ভিত্তিতে উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই চিদচিদ্‌ বিশ্বে এক মহিমময়ী মহাশক্তি বিরাজ করে এবং তাহাই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। সেই শক্তি এক। কিন্তু তাহার বিকাশ অনন্ত। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হয় সেইরূপ এক নিত্য মহাশক্তি হইতেই অনন্ত, অনিত্য শক্তিকণা বিচ্ছুরিত হইয়া জীব ও জগতে বিরাজ করিতেছে। চিৎ ও অচিৎভেদে নিত্য শক্তিকে দুইভাগে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।[১] চিদচিৎপরিব্যাপ্ত মহাসত্তা যাহা বিশ্বেশ্বরী মহাশক্তি বলিয়া পরিচিত, তাহা স্বতঃ নিরাকারা হইলেও ভক্তের অভীষ্ট পরিপূরণের জন্য, শরণাগত সাধককে অনুগৃহীত করিবার জন্য, স্বেচ্ছানুরূপ শরীর ধারণ করিয়া মহেশ্বরী সাকারাও হইতে পারেন। বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির সেই শরীর কিন্তু ভৌতিক নহে, উহা অভৌতিক, অলৌকিক, উহার গুণও অভৌতিক—"তদভৌতিকমভৌতিকগুণকং চ।" শক্তি-ভাষ্য মুখপ্রবন্ধ, ১ম পৃঃ। বিশ্বপ্রপঞ্চ এইমতে মিথ্যা নহে, সত্য। জগৎ-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যায় শক্তিভাষ্যকার বলিয়াছেন—"চিদচিদাত্মকঃ প্রপঞ্চঃ।"[২] যেই বিশ্বব্যাপিনী পরম ও চরম সত্তাকে মহাশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ শক্তিভাষ্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, সেই মহাশক্তি পরমশিবের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দুই যেন বাঁধা পড়িয়া এক হইয়া গিয়াছে। অচিৎ বা জড়প্রপঞ্চের পিছনে স্বপ্রকাশ চৈতন্য না থাকিলে অচিতের প্রকাশ অসম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, সেই নিত্য চৈতন্যসত্তা যাহা বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা পরব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, জড়-বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ জীবের দৃষ্টিতে ভাসে এবং প্রপঞ্চকে মধুময়, আনন্দময় করিয়া তোলে।

১। চিদচিৎপর্যাপ্তসত্তাবিশেষঃ শক্তিরিতি ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদিনামভিশ্চ ব্যপদিশ্যতে। স চৈকঃ। তদ্‌ব্যাপ্যাশ্চ নিত্যানিত্যভেদভিন্নাঃ শক্তয়োঽনন্তাঃ। নিত্যে পুনর্দ্বে এব চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-ভেদাৎ। শক্তিভাষ্য মুখপ্রবন্ধ, ১ পৃঃ

২। Brahman or self in its original unity, is neither exclusively spiritual nor exclusively material in character,—it is চিদচিদাত্মক।

—Introduction to Sakti Bhāṣya, p. iii, by MM. G. N. Kaviraj.

বিশ্বকবি গাহিয়াছেন :—

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

চিতের যাহা চরমাবস্থা তাহাই সদাশিব বা পুরুষ নামে পরিচিতি লাভ করে। অচিৎ-প্রপঞ্চের যাহা শেষ সীমা তাহাই বিশ্বপ্রসবিনী আনন্দময়ী মহাশক্তি, মূলাশক্তি প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।[১] এই শিব-শক্তিবাদ অনেকাংশে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদের কথাই পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাকালের বুকে যে কালীর লীলা, তাহা এই শক্তিবাদের কথাই ব্যক্ত করে। তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাও এই এক মহিমময়ী মহাশক্তিরই বিভিন্নপ্রকার বিলাসমাত্র। মহর্ষি অগস্ত্যের শক্তিসূত্র, মালিনীবিজয়তন্ত্র, স্বচ্ছন্দতন্ত্র, পরাত্রিংশিকা, ত্রিপুরারহস্য, মাতৃকাচক্রবিবেক, কামকলাবিলাস, আনন্দলহরী, সৌন্দর্যলহরী প্রভৃতি বিবিধ তন্ত্র-আগমে এই শক্তি-রহস্যই বিশেষভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই শক্তিবাদ এবং শাক্ত সাধনার মত ও পথ যে তন্ত্র-আগম-নিগমের ভাস্বর জ্যোতিতে আলোকিত তাহাতে সন্দেহ কি?

শক্তিভাষ্যকার তাঁহার এই শাক্ত মতবাদকে একশ্রেণির অদ্বৈতবাদ (সরূপাদ্বৈতবাদ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও কাশ্মীরীয় শিবাদ্বৈতবাদ হইতে আলোচ্য শাক্তাদ্বৈতবাদ বিভিন্ন। কারণ, নিত্য চিতের ন্যায় অচিৎ বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তি বা মূলাশক্তিকে ও সত্যসনাতনী আনন্দময়ী বলিয়া শক্তিভাষ্যে বিবৃত করা হইয়াছে। চরমে মূলা প্রকৃতি ও পরমশিব এই দুই-ই বিরাজ করিলে ইহাকে "অদ্বৈতবাদ" কিরূপে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে শক্তিভাষ্যকার বলেন, প্রপঞ্চ চিৎ ও অচিৎ এই উভয়াত্মক হইলেও ইহারও ঊর্ধ্বে এক অব্যাকৃত পরমা-আদ্যা প্রকৃতি আছে, যাহা বিশুদ্ধ চিদ্রূপা বা শুদ্ধবিদ্যারূপা বলিয়া সপ্তশতী দেবীস্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

"অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।"
"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"
"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"

এই দৃষ্টিতেই আলোচিত শক্তিবাদ অদ্বৈতবাদ।

ব্যাকৃত বা ব্যষ্টিপ্রপঞ্চ চিদচিৎ উভয়াত্মক হয়, তবে চিদচিদাত্মক ব্যষ্টিপ্রপঞ্চের মূলেও এক অব্যাকৃত মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তিকে মানিতেই হইবে, নতুবা এই বিরুদ্ধ-

---

১। The Principles of Pure Consciousness or Spirit and of unconsciousness or Matters—technically known as Siva or Puruṣa and Sakti or Prakriti—are as it were two distinct (and contradictory) aspects of the same Fundamental Reality related together by an eternal bond.

—Introduction to Sakti Bhāṣya by MM. Gopinath Kaviraj, p. 1.

স্বভাবাপন্ন চিৎ ও অচিতের মধ্যে ঐক্যের সূত্র বাঁধিয়া দিবে কে ? পরিণামে ব্যাকৃত জগৎপ্রপঞ্চ অব্যাকৃত এক অদ্বিতীয় আদ্যাশক্তিতে বিলীন হইয়া আত্মগোপন করিবে। এক মহীয়সী আদ্যাই তখন বিরাজ করিবে, সুতরাং অদ্বৈতবাদই শেষ পর্যন্ত শক্তিবাদের রহস্য বলিয়া বুঝা যাইবে।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥
(সপ্তশতী স্তোত্র)।

এই দেবী-সূক্তে ঐ অব্যাকৃত মহাশক্তিরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চিৎপ্রপঞ্চেরই কণাবিশেষ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বুদ্ধি যাহা মূলা প্রকৃতির প্রথম বিস্ফুরণ, সেই বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্বই জীব।[১] কর্ম ও অদৃষ্টবশতঃ শিবরূপী জীব সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে ; নিজের শিবরূপ ভুলিয়া যায়। নিজেকে সসীম স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া মনে করে। ইহাই অবিদ্যা —পরিচ্ছিন্নত্বমাত্রবোধশ্চ মোহঃ। এই মোহবশে জীবের আত্মাভিমান জাগরূক হয় এবং অহন্তার অভিমানে স্ফীত জীব কর্মফল ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষায় বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং কর্ম ও অদৃষ্টের জালে জড়িত হইয়া সংসারের আগুনে পুড়িয়া মরে। কর্মফল ভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতঃ মানাভিমানকে মহাদেবীর চরণকমলে অঞ্জলি দিয়া দেবীর করুণা ভিক্ষা করিলে, দেবীর প্রীত্যর্থ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে করুণাময়ী মহাদেবী জীবের ভববন্ধনের শৃঙ্খল মোচন করিয়া শরণাগত জীবকে মুক্তি প্রদান করেন। এইমতে মহাশক্তির করুণাই মুক্তি লাভের উপায়— তত্ত্বজ্ঞাননিদানন্তু মহাশক্তেঃ করুণা। এইসকল রহস্যই শক্তিভাষ্যে ভাষ্যকার শাস্ত্র-যুক্তি প্রভৃতির সাহায্যে উপপাদন করিয়াছেন।

এই শতকেরই মধ্যভাগে (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেঙ্কটাচার্যের শতদূষণীর খণ্ডনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক অসামান্য মনীষী মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় "শতভূষণী" নামে বিপুলকায় গ্রন্থ লিখিয়া বেঙ্কটাচার্যের শতদূষণীর প্রতিটি কথার, প্রত্যেকটি বক্তব্যের খণ্ডন করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়া অদ্বৈত-চিন্তাকে বিজয়ের মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন। শতভূষণীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা এবং প্রগাঢ় স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। শতভূষণী রচনার পর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে "অদ্বৈততত্ত্বশুদ্ধি" নামে একখানি মৌলিক অদ্বৈত-বেদান্ত

১। What is known as Jiva-consciousness is in reality a reflection on the medium of buddhi—the first evolute of Prakriti of Śiva-consciousness or Puruṣa.

—Introduction to Sakti Bhāṣya by MM. Gopinath Kaviraj, p. iii.

গ্রন্থ রচনা করেন। এই "অদ্বৈত-তত্ত্বশুদ্ধি" গ্রন্থে প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। প্রমাণের আলোচনায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদী প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি, এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করিলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনটি প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবাদীর অনুমোদিত বলিয়া "অদ্বৈততত্ত্বশুদ্ধি" গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণত্রয়ই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ঐ প্রমাণ-বর্তিকার সাহায্যে তত্ত্বের পথে পদক্ষেপ করা হইয়াছে। রামানুজ ও মাধ্ব বেদান্তমতের অভ্যুদয়ের পর অদ্বৈত-বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম, অবিদ্যা ও জগন্মিথ্যাত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বৈষ্ণব দার্শনিক সম্প্রদায় যে সকল দোষ বা "অনুপপত্তি" প্রদর্শন করিয়াছেন, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে তুলনামূলক দৃষ্টিতে ঐসকল তত্ত্বরহস্য বিচার করিয়া অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তকে অদ্বৈততত্ত্বশুদ্ধি-রচয়িতা শাস্ত্রী মহাশয় নির্দোষ যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদীদিগের মতের অসারতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। অবিদ্যায় রামানুজোক্ত "সপ্তধা অনুপপত্তি"র খণ্ডনে (অদ্বৈততত্ত্বশুদ্ধি ২৪০-২৮৪ পৃঃ) এবং অনির্বাচ্য অজ্ঞানের সমর্থনে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিচারধারা অসামান্য মনীষার ছাপ বহন করে। এইরূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যার্থের বিচার, অদ্বৈতোক্ত অখণ্ডার্থত্বের সমর্থন, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মিথ্যাত্ব সাধন প্রভৃতি সম্পর্কেও গ্রন্থকারের গবেষণা মৌলিকত্বের দাবী রাখে। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য, অদ্বৈতসিদ্ধি, শতভূষণী, অদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকাসকলও মৌলিক গবেষণায় সমুজ্জ্বল এবং নানা তথ্যে সমৃদ্ধ।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইউরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভাষায় বেদান্তের অনুবাদ এবং সাধারণের মধ্যে বেদান্তের প্রচারের চেষ্টা অনেক অংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় চিন্তার সংঘর্ষে ভারতীয় চিন্তার ধারা কতক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে; ভারতীয় চিন্তা ও সাহিত্য ইউরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। স্বাধীন ইউরোপ ভারতীয় চিন্তাকে স্বীয় ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। ভারত সনাতন চিন্তার ধারা ও সাধনা ভুলিয়া গিয়া ইউরোপের দ্বারে ভিক্ষার পাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই নাম বর্তমান সভ্যতা। এই সভ্যতার ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনের পরাজয় ও দৈন্যের ইতিহাস। কবে জাতি আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে, তাঁহার সাধনার পুণ্যতীর্থে সমবেত হইয়া "অভীঃ"র মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, তাহা একমাত্র সর্বান্তর্যামীই জানেন। আত্ম-প্রত্যয়ের মধ্যেই জাতীয় জীবনের ভাবী উন্নতির বীজ নিহিত আছে। জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্যই বেদান্তচিন্তার ক্রম-বিবর্তনের এই ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইল। বেদান্তই ভারতের প্রাণ, বেদান্তই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। সেই সাধনা ভুলিয়া গিয়া ভারত আজ মৃত, ভারতের

শিব আজ অন্তর্হিত, তাঁহার শবমাত্র পড়িয়া আছে। ভারত তাহার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা করিয়া বেদান্তের সেবায় উদ্‌বুদ্ধ হউক, জাগ্রত, জীবন্ত জাতিতে পরিণত হউক, এই আশায় উপনিষদের ভাষায় আমরাও সুপ্ত ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলি :—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

সমাপ্ত

ওঁ শান্তিঃ

সূচিপত্র

গ্রন্থ-সূচি

চ

ছ

জ

ড

ত

ফ

ব

গ্রন্থকার-সূচী

ল

শ

স

হ

শব্দ-সূচি

অ

আ

ত

দ

ধ

ন

প

ব

ভ